ইসলাম ও খিলাফত

ড. মফীজুল্লাহ কবীর

ইসলাম ও খিলাফত

ড. মফীজুল্লাহ কবীর
প্রো ভাইস চ্যান্সেলর,
অধ্যাপক, ইতিহাস বিভাগ
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, ঢাকা

নওরোজ কিতাবিস্তান

প্রকাশক :
মনজুর খান চৌধুরী
নওরোজ কিতাবিস্তান
৫, বাংলাবাজার
ঢাকা-১১০০

প্রথম প্রকাশ	:	জুলাই ১৯৭৪
দ্বিতীয় প্রকাশ	:	ফেব্রুয়ারি ২০০১
তৃতীয় প্রকাশ	:	জুলাই ২০০৬
চতুর্থ প্রকাশ	:	ডিসেম্বর ২০০৯

স্বত্ব :
মিসেস জোবাইদা কবীর

প্রচ্ছদ :
সুখেন দাস

কম্পিউটার কম্পোজ :
বরেন্দ্র কম্পিউটার
৩৪ নর্থব্রুক হল রোড, ঢাকা-১১০০

মুদ্রণে :
মৌমিতা প্রিন্টার্স
২৫ প্যারীদাস রোড, ঢাকা-১১০০

মূল্য : ৪০০.০০ টাকা

ISBN : 984-400-040-8

দ্বিতীয় সংস্করণের মুখবন্ধ

১৯৭৪ সালে 'ইসলাম ও খিলাফত' বইটির প্রথম সংস্করণ বাজারে বের হবার পর, গত বেশ কয়েকবছর আগে থেকে এই বইটি বাজারে পাওয়া যাচ্ছিল না। ১৯৮৬ সালে এ বই-এর লেখক আমার আব্বা ড. মফীজুল্লাহ কবীর ইন্তেকাল করেন (ইন্না লিল্লাহে ওয়া ইন্না ইলাইহে রাজেউন)। তিনি বেঁচে থাকলে বহু পূর্বেই বর্ধিত কলেবরে এই বইটির দ্বিতীয় সংস্করণ বের হত বলে আমি মনে করি।

শিক্ষকতার পেশায় আসার পর আমি লক্ষ্য করেছি স্নাতক ও সম্মানের ছাত্রছাত্রীদের মধ্যে এ বইটির যথেষ্ট চাহিদা রয়েছে। বাংলা ভাষায় লিখিত ইসলামের ইতিহাসের মধ্যে যে বইগুলি বাজারে পাওয়া যায়, সেগুলি প্রয়োজনের তুলনায় অপ্রতুল। সে কারণে এর দ্বিতীয় সংস্করণ বের করার ব্যাপারে আমরা অনেকদিন থেকেই চিন্তা-ভাবনা করছিলাম।

আজ এতবছর পর যুগোপযোগী করে সাধু ভাষা থেকে সম্পূর্ণ চলিত ভাষায় ও নতুন আঙ্গিকে ভুল-ত্রুটি সংশোধনসহ বইটি প্রকাশ করতে পেরে আমরা আনন্দিত। আশা করছি এটি ছাত্রছাত্রীদের মধ্যে যথেষ্ট সমাদৃত হবে। বইটি প্রকাশনার ব্যাপারে নওরোজ কিতাবিস্তান যে উদ্যোগ নিয়ে সহযোগিতা করেছে তার জন্য তাদেরকে আন্তরিক ধন্যবাদ জানাই।

ফেব্রুয়ারি-২০০১ইং

ইতিহাস বিভাগ
ঢাকা কলেজ,
ঢাকা।

হাসিনা নিগার কবীর

প্রথম সংস্করণের ভূমিকা

নানা ঘাত-প্রতিঘাত ও প্রতিকূল অবস্থার মধ্যে বহুদিন পর অবশেষে আমার 'ইসলাম ও খিলাফত' বইটি প্রকাশিত হতে যাচ্ছে। এ বইটির পাণ্ডুলিপি তৈরি হয়েছিল ১৯৬৯ সালে। তারপর বইটি থেকে থেকে থেমে থেমে বিভিন্ন সময়ে ছাপা হচ্ছিল। এর ফলে বানানের ও আঙ্গিকের আনুপূর্বিক সঙ্গতি রক্ষিত হয়নি। শেষের দিকে প্রুফ সংশোধনের দায়িত্বও আমি নিতে পারিনি। এ সব কারণে যথেষ্ট মুদ্রণ প্রমাদ ঘটেছে।

পঁচিশ বছরের শিক্ষকতা প্রসূত অভিজ্ঞতার আলোকে পরিচ্ছন্ন ঐতিহাসিক দৃষ্টিভঙ্গি সৃষ্টির প্রয়াসে বইটি রচনায় উদ্যোগী হয়েছিলাম। এ জন্য বিদেশী ভাষায় লিখিত বহু বই-পুস্তকের সাহায্য গ্রহণ করেছি। কিন্তু ইসলামের ইতিহাস বিষয়ে বাজারে প্রচলিত বহু নোট ও সাহায্য পুস্তক যেভাবে পরীক্ষা পাসের রক্ষাকবচ হিসেবে কাজ করছে তাতে এ বইয়ের প্রতি শিক্ষার্থীদের দৃষ্টি কতখানি আকৃষ্ট হবে জোর করে বলতে পারিনে। তথাপি শিক্ষার মান উঁচু করতে হলে এ ধরনের পাঠ্যবইয়ের বহুল প্রচার অত্যাবশ্যক। যতশীঘ্র আমাদের তরুণরা পরীক্ষার্থীর দৃষ্টিভঙ্গি পরিবর্তন করে শিক্ষার্থীর অনুসন্ধিৎসা নিয়ে পাঠ্যপুস্তক পাঠে এগিয়ে আসবে ততই মঙ্গল। স্বাধীনতা উত্তরকালে স্বল্প সময়ের মধ্যেই বাংলায় লিখিত একাডেমির ইতিহাস বিষয়ক পুস্তকসমূহ নিঃশেষ হয়ে যাওয়ায় এ সম্বন্ধে আমি যথেষ্ট আশাবাদী।

ডিগ্রী ক্লাসের ছাত্র-ছাত্রীদের পাঠ্যপুস্তক হিসেবে বাংলা একাডেমির বাংলা পাঠ্যপুস্তক প্রণয়ন পরিকল্পনাধীনে বইটি লিখিত হয়েছে। আমার দৃঢ় বিশ্বাস অনার্স শ্রেণীর ছাত্র-ছাত্রীরাও এর সাহায্যে যথেষ্ট উপকৃত হবে। বইটির রচনা ও মতামতের জন্য আমিই দায়ী। পাঠকদের কাছ থেকে বইটির ভ্রম সংশোধন ও উন্নয়নের জন্য সব উপদেশ ও পরামর্শ সাদরে গৃহীত হবে। যদি কখনও উন্নততর পরিবেশে বইটির দ্বিতীয় সংস্করণ প্রকাশিত হয় তবে একে সর্বাঙ্গীণ সুন্দর করার জন্য চেষ্টার ত্রুটি করবনা।

অধিক বিলম্বে হলেও বইটির প্রকাশনার জন্য বাংলা একাডেমি ও নওরোজ কিতাবিস্তানকে আমি ধন্যবাদ জানাই।

ইতিহাস বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় — মফীজুল্লাহ কবীর

২৮ জুলাই, ১৯৭৪ইং

সূচিপত্র

অধ্যায় সংখ্যা	নাম	পৃষ্ঠা সংখ্যা
১.	আরবদেশ ঃ ভূ-প্রকৃতি ও অধিবাসী	১১
২.	প্রাচীন মধ্যপ্রাচ্যে সেমিটিক সভ্যতা	২০
৩.	প্রাচ্য ও প্রতীচ্যের সংযোগ	৩১
৪.	আরবের প্রাচীন ইতিহাস	৩৭
৫.	জাহিলিয়া যুগ	৪২
৬.	হযরত মুহম্মদ (স) ঃ মক্কায়	৪৯
৭.	হযরত মুহম্মদ (স) ঃ মদীনায়	৬০
	খুলাফা-ই-রাশিদীন	
৮.	আবুবকর সিদ্দিক (রা)	৯৭
৯.	উমর ফারুক (রা)	১১৪
১০.	উসমান গনী (রা)	১৩৪
১১.	আলী মুর্তজা (রা)	১৪৩
১২.	খুলাফা-ই-রাশিদীনের যুগে রাজনীতি ও সমাজ	১৫২
	উমাইয়া যুগ	
১৩.	উমাইয়া বংশের প্রতিষ্ঠাতা মুআবিয়া	১৫৫
১৪.	কারবালার শোচনীয় হত্যাকাণ্ড	১৬৩
১৫.	উমাইয়া রাজ্যের সংগঠক আবদুল মালিক	১৬৮
১৬.	উমাইয়া রাজ্য বিস্তার ঃ ওয়ালীদ ও হাজ্জাজ ইবন ইউসুফ	১৭৭
১৭.	সুলায়মান ও উমর ইবন আবদুল আজীজ	১৮৫
১৮.	দ্বিতীয় ইয়াজিদ ও হিশাম	১৯১
১৯.	শেষ উমাইয়া খলিফাগণ	১৯৬
২০.	উমাইয়া বংশের পতন	২০২
২১.	উমাইয়া যুগে জ্ঞান-বিজ্ঞান ও সংস্কৃতি	২০৫
২২.	উমাইয়া শাসন ও সমাজ	২০৯

উৎসর্গ

স্নেহময়ী মায়ের

পুণ্য স্মৃতির উদ্দেশ্যে

অধ্যায় সংখ্যা	নাম	পৃষ্ঠা সংখ্যা
	আব্বাসীয় যুগ	
২৩.	আব্বাসীয় যুগ ঃ নতুন দিগন্ত	২১৪
২৪.	আব্বাসীয় বংশের প্রতিষ্ঠাতা ঃ সাফ্‌ফাহ ও মনসুর	২১৬
২৫.	আল মাহ্‌দী ও হাদী	২২২
২৬.	বাগদাদের স্বর্ণযুগ ঃ হারুনূর রশীদ	২২৬
২৭.	গৃহযুদ্ধ ঃ আমীন	২৩৫
২৮.	মামুন	২৪০
২৯.	মুতাসিম ও মুতাওয়াক্কিল	২৫০
৩০.	শেষ আব্বাসীয় খলিফাগণ ঃ মুন্তাসির হতে মুত্তাকী পর্যন্ত	২৫৫
৩১.	স্বাধীন রাজবংশের উদ্ভব (১) পশ্চিমাঞ্চলে	২৬১
৩২.	স্বাধীন রাজবংশের উদ্ভব (২) পূর্বাঞ্চলে	২৬৪
৩৩.	বুওয়াইহী বংশ	২৬৮
৩৪.	সলজুক বংশ	২৭৪
৩৫.	খিলাফতের গৌরবোদ্ধারের শেষ প্রচেষ্টা	২৮২
৩৬.	বাগদাদের পতন	২৮৬
৩৭.	আব্বাসীয় শাসন পদ্ধতি	২৮৯
৩৮.	আব্বাসীয় যুগে সামাজিক ও অর্থনৈতিক জীবন	৩০১
৩৯.	জ্ঞান-বিজ্ঞান ও শিল্পকলা	৩১১
৪০.	মুসলিম ধর্ম সম্প্রদায়সমূহ	৩৩৩
৪১.	আব্বাসীয় যুগে শিক্ষা পদ্ধতি	৩৪২
৪২.	স্পেনে মুসলিম শাসন	৩৪৭
৪৩.	ফাতিমীয় ও আইয়ুবী শাসকগণ	৩৭৯
৪৪.	প্রাচ্য ও প্রতীচ্যের সংঘাত ঃ ক্রুসেড	৩৮৯
*	ঘটনাপঞ্জী	৪০৫
*	উল্লেখযোগ্য সন তারিখ.	৪০৭
*	নির্ঘন্ট	৪০৯

ইসলাম ও খেলাফত

আরবদেশ ঃ ভূপ্রকৃতি ও অধিবাসী

আরবদেশ এশিয়ার দক্ষিণ-পশ্চিমে অবস্থিত একটি বৃহৎ উপদ্বীপ। এর আয়তন প্রায় একত্রিশ লক্ষ বর্গ কিলোমিটার, যা বাংলাদেশের বাইশ গুণ। অথচ দ্বীপাঞ্চলসহ সমগ্র উপদ্বীপের জনসংখ্যা প্রায় তিন কোটি যা বাংলাদেশের এক তৃতীয়াংশেরও কম। তন্মধ্যে সৌদি আরবের লোকসংখ্যা প্রায় এক কোটি সত্তর লক্ষ এবং ইয়ামনের লোকসংখ্যা এক কোটিরও ওপরে। আরব দেশের উত্তরে ইরাক, জর্ডন, ইজরাইল ও ফিলিস্তিন; পশ্চিমে লোহিত সাগর; দক্ষিণে ভারত মহাসাগর ও পূর্বদিকে পারস্যোপসাগর অবস্থিত। এ বিরাট ভূ-খণ্ডের প্রাকৃতিক ও রাজনৈতিক বিভাগগুলির সাথে আমাদের পরিচয় আবশ্যক। আরবদেশের দক্ষিণ-পশ্চিমে অবস্থিত ইয়ামন ব্যতীত সমস্ত উপদ্বীপই উচ্চ অনুর্বর মালভূমি ও মরুভূমি। ভূতাত্ত্বিকগণের মতে আরব উপদ্বীপ সম্ভবত এককালে আফ্রিকার সাহারা মরুভূমির অবিচ্ছেদ্য অংশ ছিল। পরবর্তীকালে ভৌগোলিক পরিবর্তনের ফলে নীল নদের উপত্যকা অঞ্চল ও লোহিত সাগর দ্বারা সাহারার সাথে এর সংযোগ ছিন্ন হয়েছে।

উপদ্বীপটি পশ্চিম দিক হতে পূর্বদিকে ক্রমশ ঢালু হয়ে গিয়েছে। আরবের পশ্চিমাঞ্চল জুড়ে উত্তরে মিদয়ান হতে দক্ষিণে ইয়ামন পর্যন্ত একটি পর্বত-শ্রেণী লোহিত সাগরের সাথে সমান্তরালভাবে বিদ্যমান। এ পর্বতের উচ্চতা স্থানে স্থানে ২৭৪৩ মিটার হতে ৩৬৫৭ মিটার পর্যন্ত উঠেছে। এই পর্বত-শ্রেণী হতে পশ্চিমে লোহিত সাগরের দিকে ভূ-ভাগ খাড়াভাবে নিচু হয়ে গিয়েছে; অপরপক্ষে পূর্বদিকে ভূ-ভাগ ক্রমশ ঢালু হয়ে পারস্যোপসাগরের দিকে চলে গিয়েছে। আরবের দক্ষিণ দিকের নিম্নভূমিকে 'তিহামা' বলা হয়। এ তিহামা অঞ্চল হতে আবার পশ্চিম, দক্ষিণ ও পূর্বদিক দিয়ে ছোট ছোট পর্বত-শ্রেণী উপরে উঠে এসেছে। পার্বত্য-অঞ্চল ও সমুদ্রকূলবর্তী নিম্নাঞ্চল ব্যতীত আরবের অভ্যন্তরে একটি মালভূমি অঞ্চল রয়েছে—এর নাম নাজ্‌দ্‌। এ নাজ্‌দ্‌ আরবের বর্তমান সৌদি রাজপরিবারের মূল আবাসভূমি।

উপরোল্লিখিত পর্বত ও উচ্চভূমি ব্যতীত আরবের বাকি অংশ প্রায়ই মরুভূমি। এ মরুভূমিকে আরবগণ মোটামুটি তিন শ্রেণীতে বিভক্ত করেছে। এগুলি যথাক্রমে নুফুদ, দাহনা ও হাররা। উত্তর-আরবের সাদা বা লালচে বালুর মরুভূমিকে 'নুফুদ' বলা হয়। এ অঞ্চল শুষ্ক হলেও শীতকালে এখানে প্রচুর বারিপাত হয় বলে এখানে মেষাদির চারণোপযোগী ঘাস জন্মে থাকে। লালবালির মরুভূমিকে 'দাহনা' বলা হয়। উত্তরে নুফুদের প্রান্তসীমা হতে আরম্ভ করে দক্ষিণের 'রাব'-উল-খালী' (শূন্যগৃহ) নামে পরিচিত অঞ্চল পর্যন্ত দাহনা অবস্থিত। গ্রীষ্মকালে এ অঞ্চল সম্পূর্ণ বাসের অনুপযোগী। তবে মাঝে মাঝে বৃষ্টিপাত হলে এখানেও গবাদি পশুর আহার্য-ঘাসের অভাব ঘটে না। আরবের পশ্চিম ও মধ্যভাগে অবস্থিত আগ্নেয়গিরির লাভা মিশ্রিত বালি-পাথরে গঠিত অঞ্চলগুলিকে হাররা বলা হয়। এগুলি বহুকাল পূর্বে অবস্থিত আগ্নেয়গিরির চিহ্ন-বিশেষ। অধুনা আরবদেশে কোন সজীব আগ্নেয়গিরির সংবাদ পাওয়া যায়নি।

মরুভূমির শ্রেণীবিভাগ

রাজনৈতিক বিভাগগুলির মধ্যে আরব উপদ্বীপের বিশাল অংশ জুড়ে অবস্থিত সৌদি আরব রাজনৈতিক গুরুত্ব ও আন্তর্জাতিক খ্যাতির জন্য বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। সৌদি আরবের পশ্চিম উপকূল অঞ্চলে ঐতিহাসিক হিজায ও এর প্রধান নগরী মক্কা, মদীনা ও জিদ্দা অবস্থিত। হযরত মুহম্মদ (স)-এর জন্মভূমি ও ইসলামের প্রাণকেন্দ্র হিসেবে মক্কা ও মদীনা বিশেষ প্রসিদ্ধ। সৌদি আরবের রাজধানী রিয়াদ এবং ধর্মীয় রাজধানী মক্কা। সৌদি আরবের পূর্ব উপকূলে তেল সমৃদ্ধ হাসা প্রদেশ অবস্থিত। আরব-মার্কিন তেল কোম্পানি দাহরান নগরীতে থেকে আরবের তেল সম্পদ আহরণ করে। পারস্যোপসাগরের উত্তর-পশ্চিমে তেল সমৃদ্ধ কুয়েত রাষ্ট্র অবস্থিত। সৌদি আরবের পূর্ব দিকে এবং পারস্যোপসাগরের পশ্চিম দিকে বাহরাইন দ্বীপপুঞ্জ অবস্থিত। এ দ্বীপপুঞ্জ মুক্তার জন্য বিখ্যাত। বাহরাইনের দক্ষিণে কাতার উপদ্বীপ। পারস্যোপসাগরের দক্ষিণে অর্ধচক্রাকারে বিস্তৃত রয়েছে উমানের সাতটি উপকূলবর্তী রাষ্ট্র। আরবের দক্ষিণ-পূর্ব উপকূলে মস্কতের সুলতানের রাজ্য। আরবের দক্ষিণ উপকূলে রয়েছে আদন রাজ্য এবং এর উত্তরে ও সৌদি আরবের দক্ষিণে স্বাধীন ইয়ামন গণতন্ত্র অবস্থিত।

রাজনৈতিক বিভাগ

আরবদেশ : ভূপ্রকৃতি ও অধিবাসী

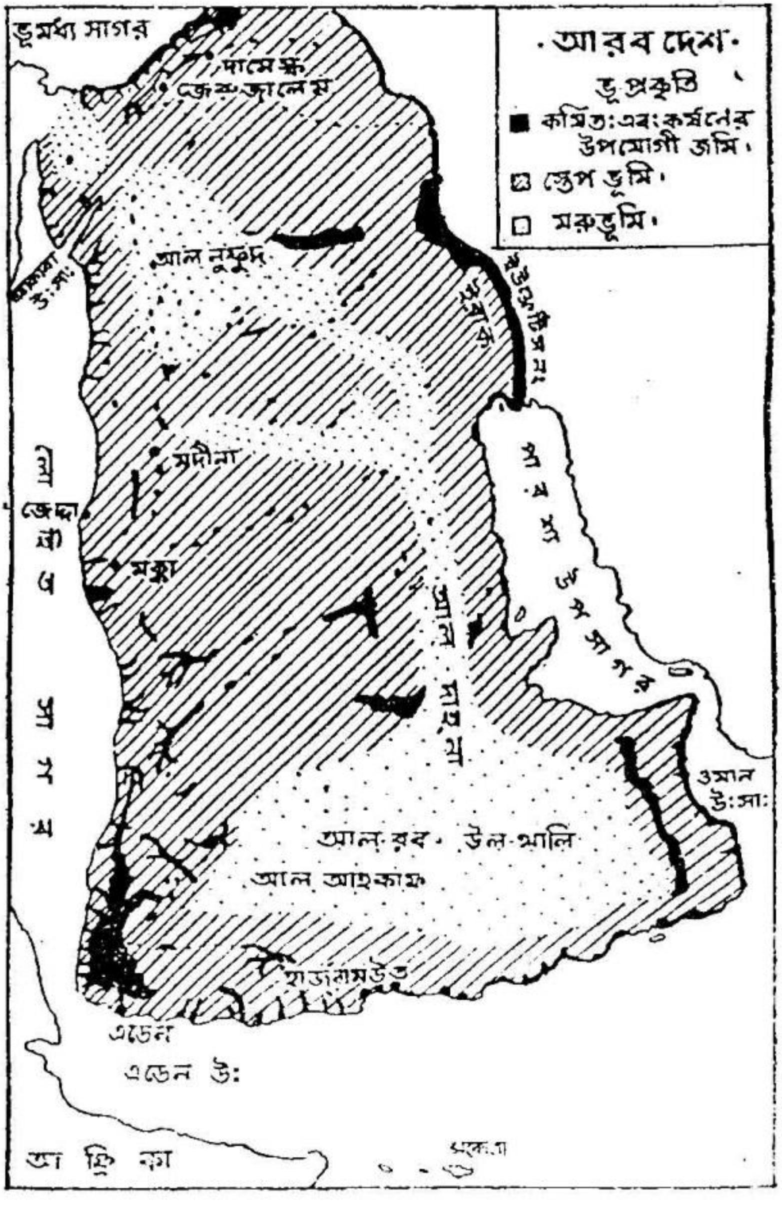

আরবের আবহাওয়া শুষ্ক ও অত্যন্ত উষ্ণ; পশ্চিমে ও দক্ষিণে সমুদ্রবেষ্টিত হলেও এ উষ্ণতা হ্রাসপ্রাপ্ত হয় না। দক্ষিণের সমুদ্র হতে উত্থিত আর্দ্র বাতাসে মাঝে মাঝে দক্ষিণাঞ্চলে বারিপাত হয়; কিন্তু এ বাতাস যতই অভ্যন্তরে প্রবেশ আবহাওয়া করে, ততই এর আর্দ্রতা হ্রাস-প্রাপ্ত হয়। 'সাবা' নামে অভিহিত মৃদুমন্দ পূবালি বাতাস আরব কবিগণের রচনায় বিশেষ সমাদর লাভ করেছে। উপকূল অঞ্চলের উর্বর ভূমি ব্যতীত আরবের অন্যত্র মরুদ্যানগুলিকে কেন্দ্র করেই জনবসতি গড়ে ওঠেছে। এ মরুদ্যানগুলিই মরুভূমির ভয়াবহতাকে কিয়ৎ পরিমাণে হ্রাস করেছে। ইসলামের জন্মভূমি হিজাযের অধিকাংশই মরুভূমি। কেবল এর উত্তরাঞ্চলে কতগুলি মরুদ্যান রয়েছে। হিজাযে একদিকে যেমন কোন কোন সময় দুই-তিন বছর ধরে কোন বৃষ্টিপাত হয় না, অন্যদিকে আকস্মিক বৃষ্টিঝড়ের দৃষ্টান্তও বিরল নয়। উপকূলবর্তী ইয়ামন, হাজরা-মাউত ও উমানে প্রচুর বারিপাত হয় বলে এ স্থানগুলি উর্বর ও চাষোপযোগী। আরবদেশে একটি উল্লেখযোগ্য নদীও নেই; কিন্তু নদীর বদলে এখানে রয়েছে অনেকগুলি উপত্যকা-পথ (ওয়াদী); আকস্মিক বন্যার সময় এ সব পথে পানি নিষ্কাশন হয় এবং অন্য সময় এগুলি উটের কারাভাঁর যাতায়াতের পথ হিসেবে ব্যবহৃত হয়। ইসলাম-পূর্ব যুগ হতে এ সব পথের সাহায্যে স্থলপথে বহির্বিশ্বের সাথে আরবের যোগাযোগ স্থাপিত হয়ে আসছে।

উদ্ভিদ ও প্রাণী

উপরোক্ত আলোচনা হতে স্পষ্ট প্রতীয়মান হচ্ছে যে, আরবের আবহাওয়া উদ্ভিদাদি জন্মাবার অনুকূল নয়। তথাপি আরবের স্থানে স্থানে বিশেষ করে হিজাযে প্রচুর খেজুর গাছ জন্মে। ইয়ামনেও মরুদ্যান অঞ্চলে গম এবং উমান ও হাসায় চাউল জন্মে। তায়িফে আঙ্গুর ও কোন কোন মরুদ্যান অঞ্চলে ডালিম, আপেল, বাদাম, কমলালেবু, তরমুজ এমন কি কলাও কিছু কিছু জন্মে।

আরবের নানা রকমের পাখির মধ্যে ঈগল, বাজ, শ্যেন, বুলবুলি, কাক, কবুতর, পেঁচা ইত্যাদি প্রধান। বন্য জন্তুর মধ্যে চিতাবাঘ, নেকড়ে বাঘ, শৃগাল, বানর ও হরিণ বিশেষ উল্লেখযোগ্য। গৃহপালিত পশুর মধ্যে উট, ঘোড়া, গাধা, উট খচ্চর, কুকুর, শিকারী-কুকুর (সালুকী), মেষ ও বিড়াল প্রধান। এদের মধ্যে আরব-জীবনে উট ও ঘোড়ার প্রয়োজনীয়তা সর্বাধিক। উট মরুভূমির জন্য অত্যাবশ্যকীয় প্রাণী। উট ব্যতীত মরুভূমির জীবন কল্পনা করা যায় না। সাধারণ কথায়, উটকে 'মরুভূমির জাহাজ' বলা হয়। কিন্তু মরুবাসীর জীবনে উটের ব্যবহার বহুবিধ। মরুভূমির ভয়াবহ বালুকাপথে উটই একমাত্র বাহন।

মরুবাসীরা উটের মাংস খায়; উটের দুধ পুষ্টিকর পানীয়। উটের চামড়া দিয়ে পোশাক ও অন্যান্য ব্যবহার্য জিনিস প্রস্তুত হয়। উটের গোবর জ্বালানির কাজ করে। উটের পশম দিয়ে তাবু তৈয়ার হয়। এমন কি উটের প্রস্রাব পর্যন্ত মরুবাসীরা ওষুধ হিসেবে সেবন করে থাকে। উটের কষ্ট-সহিষ্ণুতা সর্বজন বিদিত। মরুভূমিতে এটি বহুদিন যাবৎ পানাহার ব্যতীত টিকে থাকতে পারে। উটের গতিও অন্যান্য ভারবাহী পশুর তুলনায় বেশ দ্রুত। আরবি-সাহিত্যে উটের প্রয়োজনীয়তা ও জনপ্রিয়তার প্রভূত নিদর্শন রয়েছে। আরবি ভাষায় বিভিন্ন জাতের ও বয়সের উটের জন্য সহস্রাধিক শব্দ প্রচলিত রয়েছে। উট মরুবাসীর জন্য আল্লাহর বিশেষ দান। উত্তম জাতের উট উমান ও পূর্ব উপকূলে জন্মে। এদেরকে 'উমানিয়া' ও 'বাতিনিয়া' বলা হয়। হাসার উটও বিশেষ প্রসিদ্ধ। আরবের অশ্ব এর ক্ষিপ্রগতি ও প্রভুভক্তির জন্য বহু গল্পে ও জনশ্রুতিতে স্থান লাভ করেছে। আরবের নাজ্‌দ প্রদেশ উৎকৃষ্ট জাতের ঘোড়ার জন্য বিখ্যাত। অষ্টম শতাব্দীতে আরবগণ স্পেনে আরব-অশ্ব আমদানি করে। ভাল জাতের ঘোড়াকে আরবগণ 'আসিল' বলে অভিহিত করে। যুদ্ধ-বিগ্রহ, শিকার ও খেলাধুলার কাজে অশ্ব ব্যবহৃত হয়ে থাকে। অপেক্ষাকৃত সচ্ছল বা উচ্চশ্রেণীর লোকেরাই ঘোড়ার লালন-পালন করে থাকে। তাই উটের ব্যবহার যেমন সার্বজনীন ঘোড়ার ব্যবহার তেমন নয়। আরবের সর্দার শ্রেণীর লোকেরা ভাল জাতের ঘোড়া জন্মাবার জন্য যত্নের সাথে ঘোটক ও ঘোটকী পুষে থাকে। ঘোড়ার প্রভুভক্তি ও কষ্ট সহিষ্ণুতাও

অশ্ব বিশেষ প্রসিদ্ধ। উটের মত ঘোড়াকেও বিভিন্ন বয়সে বিভিন্ন নাম দেয়া হয়ে থাকে। ঘোড়ার সদ্ব্যবহার সম্বন্ধে আরবদের মধ্যে অনেক লোকাচার প্রচলিত আছে। কথিত আছে, হযরত মুহম্মদের (স) জীবদ্দশায় তাঁর মোট পনরটি অশ্ব

কুকুর ছিল। শিকারের জন্য বিশুদ্ধ জাতের কুকুর ব্যবহার আরবদের মধ্যে প্রচলিত রয়েছে। এসব কুকুরকে 'সালুকী' বলা হয়। এদের সাহায্যে খরগোস, হরিণ ইত্যাদি শিকার করা হয়। প্রসিদ্ধ আরব সর্দারগণ শিকারের জন্য সালুকী কুকুর ও বাজপাখি পুষে থাকেন।

আরবের অধিবাসী

আরবের ভূপ্রকৃতি ও আবহাওয়া অধিবাসীদের জীবন-যাত্রায়, দৈহিক ও মানসিক গঠনে, চরিত্র রূপায়ণে ও সামাজিক আচার-ব্যবহারে বিলক্ষণ প্রভাব বিস্তার করেছে। অধিবাসীরা প্রধানত দু' প্রকার, স্থায়ী বাসিন্দা ও বেদুঈন। যারা শহরে বা লোকালয়ে স্থায়ী বাসস্থান নির্মাণ করে বসবাস করে, তারাই স্থায়ী

বাসিন্দা। আরব-দেশে এই জাতীয় লোকের সংখ্যা নগণ্য। আরবের বর্তমান সৌদি সরকার বহু বেদুঈন আরব-পরিবারকে স্থায়ী বসবাস স্থাপনে উৎসাহদান ও সহায়তা করছে। সমগ্র আরব দেশে আধুনিককালেও শহরের সংখ্যা খুবই কম। শহরের অল্পসংখ্যক স্থায়ী বাসিন্দা ব্যতীত আরবের সকল অধিবাসীকেই বেদুঈন

বেদুঈন বলে অভিহিত করা হয়। বেদুঈনগণ কোথাও স্থায়ীভাবে বসবাস করতে পারে না। গৃহপালিত পশুর ঘাস ও পানির সন্ধানে বেদুঈনগণকে স্থান হতে স্থানান্তরে ঘুরে বেড়াতে হয়। বেদুঈনের জীবন যাযাবরের মত উদ্দেশ্যহীন ঘোরাফেরা নয়; মরুভূমির জীবন-যাত্রায় এটি একটি বিজ্ঞানসম্মত পদ্ধতি। "মরুভূমির সকল জীবিত বস্তুর উপর বেদুঈন, উট ও খেজুর গাছ—এ ত্রি-শক্তি সর্বময় কর্তৃত্ব বিস্তার করে রয়েছে; আর তারা মরুভূমির বালুর সাথে একত্রে জীবন-নাট্যের চারটি প্রধান অভিনেতা বিশেষ।" মরুভূমির উগ্র কঠোর প্রকৃতি, পানিরস্বল্পতা, অসহ্য উত্তাপ, অনুর্বরতা ও খাদ্যাদির অভাব ইত্যাদি প্রতিকূল শক্তির সাথে বেদুঈনকে আজীবন সংগ্রাম করতে হয়। মনে, প্রাণে, দেহে ও চারিত্রিক বৈশিষ্ট্যে প্রতিটি বেদুঈন যেন মরুভূমির রুদ্র ও বিভীষণ মূর্তিরই এক একটি প্রতীক। অসীম ধৈর্য ও কষ্ট সহিষ্ণুতা তার চরিত্রের প্রধান অঙ্গ। জীবন-সংগ্রামের কঠোরতা বেদুঈনকে অতিমাত্রায় আত্মকেন্দ্রিক করে তুলেছে। জীবন-ধারণের প্রশ্নই তার কাছে সর্বাপেক্ষা বড় প্রশ্ন। রুদ্র-কঠোর প্রকৃতি তাকে অবসর ও বিলাসের সুযোগ দেয়নি। এ আত্মকেন্দ্রিকভাব অন্যদিকে উচ্ছৃঙ্খলতা, ব্যক্তি স্বাতন্ত্র্য ও ব্যক্তি স্বাধীনতায় রূপ লাভ করেছে।

বেদুঈনকে অধিকাংশ সময়ই অভুক্ত, অর্ধভুক্ত ও সামান্য পোশাকে সন্তুষ্ট থাকতে হয়। তাই আপনার চেষ্টায় জীবিকার্জন সম্ভব না হলে তাকে লুণ্ঠন ও অপহরণের আশ্রয় নিতে হয়। বর্তমান সৌদি সরকার লুণ্ঠন ও অপহরণ প্রতিরোধ করবার জন্য বিশেষ চেষ্টিত। বছরের পর বছর ধরে বেদুঈন এক বেলা পর্যাপ্ত পরিমাণে খেতে পায় না। উটের দুধ ও কিছু খেজুর তার দৈনন্দিন খাদ্য। তার খাদ্যের মত তার পোশাকও স্বল্প। একটি বড় কুর্তা, একটি 'আবা ও শিরস্ত্রাণ (কুফিয়া)' বেদুঈনের সাধারণ পোশাক। এতদসত্ত্বেও বেদুঈনকে কখনও খাদ্যাভাবে প্রাণ হারাতে হয়নি। কারণ তার পরিবার ও গোত্র তার রক্ষণাবেক্ষণের জন্য দায়ী। আরবের চিরাচরিত আতিথেয়তাও অনাহার মৃত্যুর বিশেষ প্রতিবন্ধক। বেদুঈন তার অতিথির জন্য শেষ উষ্ট্রটিকেও জবেহ করতে দ্বিধাবোধ করবে না। এ অতিথি সৎকারের বেলায় তাদের নিকট আরব অনারব সবাই সমান।

বেদুঈন গোত্র

প্রত্যেক বেদুঈন গোত্রের এক একটি নির্দিষ্ট এলাকা রয়েছে। একে জিরা (زرار) বলা হয়। বেদুঈনগণ তাদের উট, মেষ ও পশু নিয়ে শরৎ-হেমন্ত, শীত ও বসন্তকালে এ এলাকায় ঘুরে বেড়ায়। এ এলাকায় তাদের কূপসমূহ থাকে। এক একটি জিরা দৈর্ঘ্যে ২৯০ কিঃ মিটার এবং প্রস্থে কিলোমিটার অথবা বেশি-কমও হতে পারে। এতে কূপের সংখ্যা পাঁচ হতে পঞ্চাশ পর্যন্তও হতে পারে। বৃষ্টিপাত ভাল হলে এবং ঘাস-পানির প্রাচুর্য হলে গোত্রের লোকেরা আপন আপন এলাকায় সীমাবদ্ধ থাকে। কিন্তু অনাবৃষ্টি হলে তারা চারণভূমির সন্ধানে প্রতিবেশী এলাকায় ভিড় জমায়। অবশ্য কোন শত্রু এলাকায় যাওয়া এক প্রকার অসম্ভব। সেজন্য আরবের গোত্রগুলি পরস্পরের সাথে মিত্রতা স্থাপন করে এবং মিত্রতাবদ্ধ গোত্রগুলি পরস্পরকে তাদের এলাকায় বিপদের দিনে গো-চারণের সুযোগ দেয়। এই পারিবারিক গোত্রীয় মিত্রতা শতাব্দীর পর শতাব্দী চালু থাকে এবং অনাবৃষ্টি, যুদ্ধ ও অন্যান্য বিপদাপদে এ গোত্রীয় সঙ্ঘগুলি মিত্রতাবদ্ধ পরিবারের সহায়তার জন্য এগিয়ে আসে। যখন দেশীয় সরকার শক্তিশালী থাকে, তখন এ গোত্রীয়সঙ্ঘগুলি শান্তিতে থাকে কিন্তু রাষ্ট্রীয় শাসন শৃঙ্খলা শিথিল হলে, গোত্র ও গোত্রসঙ্ঘগুলি পরস্পরের বিরুদ্ধে ঝাঁপিয়ে পড়ে। এরূপ অরাজকতাই বেদুঈনের কাম্য; কারণ এ অবস্থায় লুঠপাট ও অপহরণ অবাধে চলতে পারে।

গোত্রের বাৎসরিক জীবন

গ্রীষ্মকালে বেদুঈনগণ নিজ নিজ এলাকার কূপসমূহের চারপাশে পরিবার-পরিজন ও গবাদি পশু নিয়ে তাবু পেতে বসবাস করে। স্বল্প-পরিসর স্থানে গ্রীষ্মকালে স্ত্রী-পুরুষ, ছেলে-মেয়ে ও পরিবারের উট, ঘোড়া, মেষ এখানে দলবদ্ধ হয়ে অতি কষ্টে দিন কাটায়। এ সময় তাপমাত্রা ৫২ ডিগ্রী সেলসিয়াস পর্যন্ত ওঠে; খাদ্যাদি কমে আসে। অন্যপক্ষে বেদুঈনের জানমাল শত্রুর আক্রমণে বিপর্যস্ত হওয়ার সম্ভাবনা এ সময়ই সমধিক। জ্যৈষ্ঠ মাস হতে আশ্বিন মাস পর্যন্ত বেদুঈনের জীবন-যাপন মোটামুটি এরূপ। কার্তিক মাস হতে বারিপাত আরম্ভ হয়। তখন হতে বেদুঈনের প্রকৃত জীবনযাত্রা আরম্ভ হয়। তারা দলে দলে বৃষ্টি-বিধৌত অঞ্চলে পানি ও ঘাসের সন্ধানে বের হয়ে যায়। তখন হতে আগামী গ্রীষ্মের প্রারম্ভ পর্যন্ত তারা এভাবে ঘুরে বেড়ায়। প্রায় প্রতি দশদিন অন্তর বেদুঈনদের তাঁবু স্থানান্তরিত হয়। কিন্তু এই গতি ধীর, মন্থর ও আরামদায়ক। বছরের এ সময় সবার জন্য আনন্দের সময়।

আরবের প্রতি গোত্রে একজন নির্বাচিত শায়খ থাকেন। শায়খের পদ কোন পরিবারে বংশানুক্রমিক নয়। তিনি সম্প্রদায়ের নেতৃস্থানীয় ও বয়োবৃদ্ধ ব্যক্তি। কিন্তু কারও সাথে আলাপ-আলোচনা না করে তিনি কোন কাজ করতে পারেন না। অপরপক্ষে তাঁর সব কাজে তিনি গোত্রের জনমতকে প্রাধান্য দান করেন।

গোত্রের প্রধান শায়খ

তাই কোন বিষয়ে কর্মপন্থা নির্ধারণের পূর্বে তিনি গোত্রের বয়োজ্যেষ্ঠ ও অভিজ্ঞ লোকদের সাথে আলাপ-আলোচনা করে নেন। একবার সিদ্ধান্ত গৃহীত হলে নেতৃত্ব শায়খের হাতে ন্যস্ত হবে। তখন সবাই তাঁর আদেশ বিনা বাক্য ব্যয়ে শিরোধার্য করবে। অপরাপর ব্যাপারে শায়খ তাঁর সম্প্রদায়ের লোকদের পিতার সদৃশ। তিনি প্রতিটি পরিবারের সুবিধা-অসুবিধার খোঁজ খবর নিয়ে থাকেন; সব বিবাদ-বিসংবাদ মীমাংসার জন্য তাঁর নিকট নীত হয়। তাঁকে সদাশয় ও অতিথিপরায়ণ হতে হয়। আরবরা কখনও 'বখীল' বা কৃপণ শায়খের আনুগত্য স্বীকার করে না। অভুক্ত ও অর্ধভুক্ত বেদুঈনগণকে তাঁর গৃহে মাঝে মাঝে ভোজে আপ্যায়িত করতে হয়। তিনি সম্প্রদায়ের লোকজনকে নানা উপাচারে পরিতুষ্ট রাখেন।

রক্ত-সম্পর্ক ভিত্তিক পরিবার ও বংশগুলি নিয়ে আরবের সমাজ-জীবন গঠিত। এ রক্ত-সম্পর্ক বাস্তব অথবা কাল্পনিক হতে পারে। এক পরিবারের লোক একই তাঁবুতে বাস করে। কয়েকটি তাঁবুর সমষ্টি নিয়ে একটি 'কওম' ও

গোত্রীয় সংস্থা

কয়েকটি কওমের সমষ্টি নিয়ে একটি 'কবিলা' (গোত্র) গঠিত হয়। স্থান ও কাল বিভেদে গোত্রের শাখা উপশাখাগুলি বিভিন্ন নামে পরিচিত হয়। গোত্রে বা গোত্রের লোকদেরকে বুঝাবার জন্য গোত্রের নামের সাথে 'বনু' শব্দ যোগ করা হয়। যেমন—বনু-কুরাইশ, বনু-হাশিম ইত্যাদি। আরবের সমাজ জীবনের বৈশিষ্ট্য এই যে, এক পরিবারের লোক আপন পরিবারের স্বার্থরক্ষার খাতিরে অন্য পরিবারের বিরুদ্ধে সঙ্ঘবদ্ধ হয়; যদিও তারা একই কওমের অন্তর্ভুক্ত এবং কওমের স্বার্থরক্ষার জন্য তারা আবার সঙ্ঘবদ্ধভাবে অন্য কওমের বিরুদ্ধে লড়তে প্রস্তুত থাকে, যদিও উভয় কওম একই কবিলার অন্তর্ভুক্ত হয়। আবার বাইরের শত্রুর বিরুদ্ধে লড়বার সময় কবিলার সমস্ত লোক বিবাদ-বিসম্বাদ ভুলে সঙ্ঘবদ্ধভাবে অগ্রসর হয়। আরবে প্রচলিত একটি প্রবাদ বাক্য হতে এ সম্পর্ক বিশেষভাবে উপলব্ধি করা যায়। "আমি ও আমার ভাই আমার চাচাত ভাইয়ের বিরুদ্ধে; আমি ও আমার চাচাত ভাই অপরের বিরুদ্ধে।"

কবিলার সব লোক ব্যক্তিগত ও সমষ্টিগতভাবে প্রত্যেকটি লোকের জান, মাল ও ইজ্জত রক্ষার জন্য দায়ী। হত্যার বদলে সাধারণত হত্যাই কাম্য। কোন এক গোত্রের লোক অন্য গোত্রের একজন লোককে হত্যা করলে, তাদের মধ্যে

লড়াই বেধে ওঠে। কোন কোন সময় প্রাণের বদলে অর্থের (দিয়াত) দ্বারাও এ বিবাদ মীমাংসা হয়। আরবের গোত্রভিত্তিক সমাজ-ব্যবস্থায় কোন লোক গোত্র-সম্পর্ক ছাড়া বাঁচতে পারে না। গোত্রহীন লোকের রক্ষার দায়িত্ব কেউই গ্রহণ করে না। তাই রক্ত-সম্পর্কহীন ব্যক্তির গোত্রভুক্তির জন্য কতকগুলি প্রথা আরবদেশে প্রচলিত রয়েছে। যেমন কোন ক্রীতদাস তার প্রভু কর্তৃক মুক্তিপ্রাপ্ত হলে, সে যদি উক্ত পরিবারের অন্তর্ভুক্ত হয়ে থাকতে চায়, তবে তাকে পরিবারের 'মাওলা' বলে আখ্যায়িত করা হয়। এ প্রথা মধ্যযুগে বহুল প্রচলিত ছিল। একজন সম্পূর্ণ নবাগত ব্যক্তিও কোন পরিবার বা গোত্রের আশ্রয় ভিক্ষা করে পরিবারের "আশ্রিত" (দাখিল) হিসেবে গণ্য হতে পারে। এ প্রথা অনুসারে একটি গোটা পরিবার বা পরিবার গোষ্ঠী অন্য গোষ্ঠী বা গোত্রের আশ্রিত হতে পারে। আরবদের এ প্রথার সুযোগ গ্রহণ করে যে কোন অপরাধী ব্যক্তিও "আমি আপনার আশ্রিত" এ কথা বলে কোন পরিবারের বা গোত্রের আশ্রয় ভিক্ষা করতে পারে। আশ্রিত ব্যক্তিকে নিরাপদ স্থানে পৌছে না দেয়া পর্যন্ত সে পরিবারের রক্ষণাধীন থাকে।

গোত্রীয় চেতনা, গোত্রের জন্য মমত্ববোধ ও গোত্রের জন্য জানমাল উৎসর্গ করার প্রস্তুতিকে আসাবিয়া বলা হয়। বেদুঈনের ব্যক্তি-স্বাতন্ত্র্য ও ব্যক্তি-স্বাধীনতার

গোত্রীয় চেতনা : আসাবিয়া

চরম অভিব্যক্তির নামই আসাবিয়া। এ অনুভূতি পরবশ হয়ে আরবগণ গোত্রবর্হিভূত সব কিছুকে বিজাতীয়, ঘৃণার পাত্র ও শত্রুভাবাপন্ন বলে মনে করে। এই গোত্রীয় চেতনা একদিকে যেমন গোত্রীয়-সংহতিকে সযত্নে রক্ষা করে, অন্যদিকে পুরুষানুক্রমে গোত্রে গোত্রে শত্রুতা ও কলহ সঞ্জীবিত রাখে।

গ্রন্থনির্দেশ

১. পি. কে. হিট্টি : *হিস্ট্রি অব দি এরব্স,* মেকমিলান এণ্ড কোং লিঃ, পঞ্চম সংস্করণ, লণ্ডন, ১৯৫১।

২. এইচ. আর. পি. ডিক্সন : *দি এরাব অব দি ডেজার্ট,* এল্যান এণ্ড আনউইন, লণ্ডন, ১৯৪৯।

৩. রিচার্ড এইচ. সাঙ্গার : *দি এরাবিয়ান পেনিনসুলা,* কর্নেল ইউনিভার্সিটি প্রেস, নিউ ইয়র্ক, ১৯৫৪।

৪. রিডার বুলার্ড; সম্পাদক : *রয়্যাল ইনস্টিটিউট অব ইন্টারনেশানেল এফেয়ার্স, দি মিডল ইস্ট,* ৩য় সংস্করণ, অক্সফোর্ড ইউনিভার্সিটি প্রেস, ১৯৫৮।

প্রাচীন মধ্যপ্রাচ্যে সেমিটিক সভ্যতা

আধুনিক গবেষকগণের মতে আরবগণ শুধু যে সেমিটিক জাতির অন্তর্ভুক্ত তা নয় বরং আরবদেশই সমগ্র সেমিটিক জাতির লালনভূমি ছিল। প্রাচীন মধ্যপ্রাচ্যের সভ্যতায় যে সব সেমিটিক জাতির দান অপরিসীম তারা সবাই 'উর্বর অর্ধ-চন্দ্র ভূমি'তে (Festile Crescent) আধিপত্য বিস্তারের পূর্বে আরবদেশেই এক অভিন্ন মহাজাতি হিসেবে বহুকাল যাবৎ লালিত-পালিত হয়েছিল। এরা

সেমিটিক জাতির লালন ভূমি : আরব দেশ

ব্যবিলনীয়, আসিরীয়, ফিনিসীয় ও হিব্রুজাতি নামে ইতিহাসে বিশেষ প্রসিদ্ধ। এ মতবাদ অনুসারে সেমিটিক ও হেমিটিক জাতি যুক্তভাবে প্রথমে সম্ভবত পূর্ব আফ্রিকায় বসবাস করত। সেখান হতে সেমিটিক জাতি আরব উপদ্বীপে চলে আসে। অতঃপর আরব দেশে ভৌগোলিক কারণে অথবা জনসংখ্যা বৃদ্ধির জন্য একাধিকক্রমে সেমিটিক জাতির উল্লিখিত শাখাগুলি 'উর্বর অর্ধ-চন্দ্র' এলাকায় বাসস্থান পরিবর্তন করে। সবশেষে ইসলাম-প্রচারের পর বর্তমান ইতিহাসের আরবগণও অনুরূপভাবে উক্ত এলাকায় সাম্রাজ্য বিস্তার করে। এই মতবাদের সমর্থনে পণ্ডিতগণ ভাষাতাত্ত্বিক যুক্তির অবতারণা করেছেন। তাঁদের মতে ব্যাবিলনীয়, হিব্রু, আরামীয়, আরবি ও ইথিওপীয় ভাষার সৌসাদৃশ্য এদের উৎপত্তিগত ও মৌলিক ঐক্য সূচিত করে। এতদ্ব্যতীত এসব জাতির সামাজিক রীতিনীতি, ধর্মীয় বিশ্বাস ও দৈহিক গঠন তুলনা করে দেখলেও এ সাদৃশ্য বিশেষ পরিস্ফুট হয়ে ওঠে। কাজেই এ সব জাতি ঐতিহাসিককালে বিভিন্ন সভ্যতার জনক হিসেবে পরিচিত হওয়ার আগে নিশ্চয়ই একক ও অভিন্ন জাতি হিসেবে কোন এক দেশে বসবাস করত। এ মতবাদের ফল এ দাড়ায় যে, প্রাচীন মধ্যপ্রাচ্যের সভ্যতা প্রধানত সেমিটিক জাতির সৃষ্টি এবং উক্ত জাতির নবীনতম ও সর্বশেষ শাখা হিসেবে ইতিহাসের আরবগণ তাদের স্বগোত্রীয়গণের প্রদর্শিত পথে 'উর্বর অর্ধচন্দ্র' এলাকায় রাজ্য-বিস্তার করে সেমিটিক জাতির সামগ্রিক সভ্যতার উত্তরাধিকারী বলে পরিগণিত হয়। এ কারণে আমরা প্রাচীন মধ্য-প্রাচ্যের বিখ্যাত সেমিটিক জাতিগুলির নাম ও সভ্যতায় তাদের বিশেষ দান সম্বন্ধে সংক্ষিপ্ত আলোচনা করব।

'উর্বর অর্ধচন্দ্র' অঞ্চলের সেমিটিক সভ্যতায় উৎপত্তি ও বিকাশের যুগ মোটামুটি খ্রিঃ পূ ২৫০০ সাল হতে খ্রিঃ পূঃ ষষ্ঠ শতাব্দী পর্যন্ত স্থায়ী হয়। এ যুগে আক্কাদীয়, আমেরীয়, অসিরীয় ওকালদীয় শাখার সেমিটিকগণ উক্ত অঞ্চলে বিশেষ করে নিম্ন মেসোপটেমীয় অঞ্চলে সাম্রাজ্য বিস্তার করে।

প্রাচীন মাধ-প্রাচ্য সেমিটিক সভ্যতা

আনুমানিক খ্রিঃ পূঃ ১৫০০ সাল হতে উর্বর অর্ধচন্দ্রের পশ্চিমাঞ্চলে সিরিয়া-ফিলিস্তিনে আরও কয়েকটি সেমিটিক জাতি সভ্যতা বিকাশে সক্রিয় অংশ গ্রহণ করে। এরা কানানীয় (ফিনিসীয়), আরামীয় ও হিব্রু নামে খ্যাত। মোটামুটিভাবে পূর্বাঞ্চলের সেমিটিকগণ রাজ্য শাসনে ও সম্রাজ্য বিস্তারে বিশেষ দক্ষতা প্রদর্শন করে আর পশ্চিমাঞ্চলের সেমিটিকগণ ব্যবসা-বাণিজ্য, কৃষ্টি, সংস্কৃতি ও ধর্ম-দর্শনে নিজেদের প্রতিভার পরিচয় দেয়। সেমিটিক সভ্যতার এ গৌরবময় যুগে বিভিন্ন রাজা বা সম্রাট কর্তৃক আরবের অংশ বিশেষ দখলের চেষ্টা বিশেষ প্রণিধানযোগ্য।

পূর্বাঞ্চলের সভ্যতা

নিম্ন মেসোপটেমীয় অঞ্চলের প্রথম সেমিটিক জাতি আক্কাদীয় নামে পরিচিত। প্রায় এক হাজার বছর ধরে ক্রমান্বয়ে আরব ও সিরিয়ার মরুভূমি হতে বেদুঈনগণ নিম্ন মেসোপটেমীয় অঞ্চলে অনুপ্রবেশ করতে থাকে। ঐ অঞ্চলে তখন বিখ্যাত সুমেরীয় জাতি রাজত্ব করত। সেমিটিকগণ সুমেরীয়দের কাছ থেকে গৃহনির্মাণ, ভূমিকর্ষণ, লিখন-পদ্ধতি ও নানা জ্ঞান-বিজ্ঞান শিখে নেয়। সেমিটিকদের রাজা সারগন সুমেরীয় ক্ষমতাকে পর্যুদস্ত করে আক্কাদীয় বংশের প্রতিষ্ঠা করে।

নারাম-সিন (খ্রিঃ পূঃ ২২৭০—২২৩৩) উত্তরে আসিরিয়া ও পূর্বে পারস্যের লুরিস্তান ও খুজিস্তান পর্যন্ত সাম্রাজ্যের সীমানা বর্ধিত করে "পৃথিবীর চারপ্রান্তের রাজা" উপাধি গ্রহণ করেন। নারাম-সিন 'মাগান' নামক একটি স্থানও জয় করেন। একে পূর্ব ও মধ্য-আরবের কোন স্থান বলে মনে করা হয়।

আক্কাদীয়গণের পতনের পর আমোরীয় সেমিটিকগণ সিরিয়ার দিক হতে দাজলা-ফোরাত উপত্যকা অঞ্চলে আগমন করে ব্যাবিলনে একটি রাজ্য স্থাপন করে। এই বংশের ষষ্ঠ রাজা হম্মুরাবি (খ্রিঃ পূঃ ১৭২৮—১৬৮৬) ভূমধ্যসাগরের তীর পর্যন্ত রাজ্যের সীমানা বর্ধিত করেন। তিনি "সুমের ও আক্কাদের রাজা এবং পৃথিবীর চারপ্রান্তের রাজা" উপাধি গ্রহণ করেন। তিনি বহু জনহিতকর কাজ করে

প্রচীন ব্যাবিলন: হম্মুরাবির আইন

গিয়েছেন। তাঁর রাজত্বের সর্বাপেক্ষা উল্লেখযোগ্য ঘটনা বিভিন্ন প্রচলিত আইনের সঙ্কলন। "হম্বুরাবি-বিধি" নামে প্রসিদ্ধ এ আইন হতে প্রাচীন ব্যাবিলনের রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক ও সামাজিক সংস্থা সম্পর্কে আমরা অনেক কিছু জানতে পারি। পরবর্তী ইহুদি আইনের (Mosaic Law) সাথে এর যথেষ্ট মিল রয়েছে। সমাজের লোকেরা উচ্চ অভিজাত শ্রেণী, মধ্যবিত্ত ব্যবসায়ী, শিল্পী ও সাধারণ লোক এবং দাসশ্রেণী—এ তিনভাগে বিভক্ত ছিল। ফৌজদারী দণ্ডবিধি কঠোর ছিল। "চক্ষুর বদলে চক্ষু ও দাঁতের বদলে দাঁত" এ আইনের ভিত্তি ছিল। এ আইনে নারীর অধিকার মোটামুটি সংরক্ষিত ছিল। এ আইনে বিশেষ বিশেষ অপরাধের জন্য বিশেষ দণ্ড বিধিবদ্ধ ছিল। অসাধু ঠিকাদার ও হাতুড়ে ডাক্তারের জন্য কঠোর শাস্তির ব্যবস্থা ছিল। এ আইন মূলত সুমেরীয় আইনের সংশোধিত ও পরিবর্তিত রূপ। হম্বুরাবির সময় ব্যবসা-বাণিজ্যের বহুল প্রসার ঘটে এবং ব্যবসায়-সংক্রান্ত চুক্তি-পত্র, দলিল-দস্তাবেজ, সাক্ষ্য-প্রমাণাদি ও প্রমিসারী নোটের (অর্থের অঙ্গীকার পত্র) প্রচলন হয়। ব্যাবিলনীয় সেমিটিকগণ সাহিত্য-ক্ষেত্রেও বিশেষ উন্নতি লাভ করে। অবশ্য সাহিত্যে তাদের কোন মৌলিকতা বা স্বকীয়তা ছিল না। সুমেরীয় সাহিত্যের বিষয়বস্তুকে তারা নতুন রূপ দান করে। এ সাহিত্যের মধ্যে "গিলগামেশের কাহিনী" ও তথাকথিত "ব্যাবিলনীয় জবের" কাহিনী বিশেষ উল্লেখযোগ্য। প্রথমোক্ত কাহিনীতে একজন দুঃসাহসিক বীরের অমরত্ব লাভের ব্যর্থ চেষ্টা ও দ্বিতীয়টিতে একজন ধার্মিক প্রবরের শোচনীয় দুঃখ-দুর্দশার কথা বর্ণিত হয়েছে। প্রথমোক্ত কাহিনীতে এক প্রলয়ঙ্করী বন্যারও বর্ণনা রয়েছে। এ যুগে বিজ্ঞানে কোন উল্লেখযোগ্য উন্নতি সাধিত হয়নি।

আসিরীয় সভ্যতা

দাজলা-ফুরাত উপত্যকার উত্তরে অবস্থিত পার্বত্য অঞ্চল আসিরিয়া নামে অভিহিত হত। সেমিটিকদের যে শাখা এ অঞ্চলে বসবাস করতে আরম্ভ করল, তারা সমভূমির সেমিটিকগণ হতে ভিন্ন প্রকৃতির হয়ে উঠল। সমভূমির অধিবাসীরা শান্তিপ্রিয় ছিল। আসিরিয়ার অধিবাসীরা পার্বত্য-অঞ্চলের অপেক্ষাকৃত অনুর্বর ও শীতল আবহাওয়ায় বসবাস করে দৈহিক গঠনে ও চারিত্রিক বৈশিষ্ট্যে শক্তিশালী ও কষ্ট-সহিষ্ণু হয়ে গড়ে উঠল। এজন্য তারা রোমানদের পূর্বে প্রাচীন পৃথিবীর সর্বাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ সামরিক জাতি। এদের সূর্যদেবতা আসুরের নাম হতে দেশ ও জাতির নামকরণ করা হয়েছে।

আসিরীয়গণের প্রথম প্রসিদ্ধ রাজার নাম প্রথম তিগলাথ-পিলেসার (খ্রিঃ পূঃ ১১১৬—১০৯৩)। রাজা আশুর-নাসির-পালের সময় (খ্রিঃ পূঃ ৮৮৪—৮৫৯)

তারা দিগ্বিজয়ে বহির্গত হয়। তিনি উত্তর সিরিয়া জয় করে ভূমধ্যসাগর পর্যন্ত রাজ্যসীমা বর্ধিত করেন। আশুর-নাসির-পালের পুত্র তৃতীয় শালমানেজারের সময় কারকার নামক স্থানে তিনটি রাজার মিলিত শক্তির সঙ্গে আসিরীয়গণকে যুদ্ধ করতে হয়। জুনদুবের আরব শায়খ এদের অন্যতম। আসিরীয়গণের সাথে আরবদের এ প্রথম যোগসূত্র। রাজা তৃতীয় তিগলাথ-পিলেসারের সময় আরামীয় শহর দামিস্ক ও হিব্রুদের ইসরাইল অধিকৃত হয়। তিনি জাবিবী ও শামসী নামক দুইজন আরব রানীকে করদানে বাধ্য করেন। দ্বিতীয় সারগনের (খ্রিঃ পূঃ ৭২২—৭০৫) সময় আসিরীয় সাম্রাজ্য গৌরবের উচ্চ শিখরে আরোহণ করে। তিনি সামুদ জাতির আরবগণকে বশ্যতা স্বীকারে বাধ্য করেন এবং একজন সাবায়ী রাজাও তাকে করদানে বাধ্য হয়। সম্রাট সারগনের বংশধরগণ মিসর পর্যন্ত নিজেদের আধিপত্য বিস্তার করেন। তারাও আরবদেশের অংশ বিশেষ দখল করে আরবদের কাছ থেকে কর আদায় করেন এবং সিরিয়ার বেদুঈন উপদ্রব দমন করবার জন্য বার বার অভিযান প্রেরণ করেন। এ যুগে আসিরীয়গণের নতুন রাজধানী নাইনিভা (Ninevah) "পশ্চিম এশিয়ার রানী" বলে স্বীকৃত হয়।

আসিরীয় সভ্যতার সর্বাপেক্ষা উল্লেখযোগ্য বিষয় তাদের সামরিক সাজ-সজ্জা ও যুদ্ধ কৌশল। অন্যপক্ষে তাদের ইতিহাস অকুণ্ঠ নরহত্যা, অবাধ লুটতরাজ ও নির্মম ধ্বংসকার্যের কলঙ্ক কালিমায় মসীলিপ্ত। তাদের সমাজে পুরুষের প্রাধান্য প্রতিষ্ঠিত হয় এবং স্ত্রীলোকদের জন্য অন্তঃপুর প্রথার সূত্রপাত হয়। স্থাপত্য ও ভাস্কর্যে তারা বিশেষ পারদর্শিতা অর্জন করে। তারা বিরাট জাঁকজমকপূর্ণ প্রাসাদাদি নির্মাণ করে। তারা প্রাসাদদ্বারে ও নগরদ্বারে মানুষের মস্তকবিশিষ্ট পক্ষযুক্ত প্রকাণ্ড ষাঁড়ের মূর্তি স্থাপন করে মানব-মনে ত্রাসের সঞ্চার করেছিল। প্রাসাদের অভ্যন্তরের প্রাচীর-গাত্রে যুদ্ধ ও শিকারের দৃশ্যাদি সমন্বিত নানা চিত্র শোভা পেত। তারা সাম্রাজ্য-শাসন-ব্যবস্থার উদ্ভাবক। বিজ্ঞানকে যুদ্ধবিগ্রহের কাজে ব্যবহার করে তারা চিকিৎসা-শাস্ত্রের উন্নতি বিধান করে। বিভিন্ন রোগের কারণ সম্বন্ধে পঠন-পাঠনের ফলে এ সময় পাঁচ শতাধিক ওষুধ আবিষ্কৃত হয়। সম্রাট আশুর-বানি-পাল (খ্রিঃ পূঃ-৬৬৮-৬২৬) সাহিত্য ও শিল্পকলার একজন বড় পৃষ্ঠপোষক ছিলেন। রাজধানী নাইনিভায় তিনি যে পাঠাগার নির্মাণ করেছিলেন, বিগত শতাব্দীতে তা ভূগর্ভ হতে উদ্ধার করা হয়। এই পাঠাগারে ন্যূনাধিক ২৫০০০ মাটির চাকতি পাওয়া গিয়েছে। এগুলিতে তাঁর লিখিত হাজার হাজার পত্র, ব্যবসায়-সংক্রান্ত দলিল ও অন্যান্য মূল্যবান তথ্যাদি লিখিত রয়েছে। কোন কোন লিপিতে সামরিক বিজয় ও যুদ্ধ-বিগ্রহের কাহিনী সালঙ্কারে ও সবিস্তারে বর্ণিত হয়েছে। উত্তর আরবের তায়মা নামক স্থানে সর্বশেষ কালদীয় রাজার একটি প্রাদেশিক আবাস ছিল।

নতুন ব্যাবিলন ঃ কালদীয় সভ্যতা

হম্বুরাবির পর প্রায় এক হাজার বছর পর্যন্ত ব্যাবিলনের খ্যাতি লুপ্তপ্রায় হয়ে থাকে। আসিরীয় সাম্রাজ্যের পতনের পর কালদীয়গণের অভ্যুত্থানের ফলে ব্যাবিলনের নতুন যুগের সূচনা হয়। কালদীয় রাজা দ্বিতীয় নেবুকাদ নেজার (খ্রিঃ পূঃ ৬০৫−৫৬২) ব্যাবিলনকে নতুন খ্যাতি ও সমৃদ্ধি দান করেন। তিনি মিসরের রাজাকে পরাজিত করে সিরিয়ায় মিসরের কর্তৃত্ব লোপ করেন। তিনি ৫৮৬(খ্রিঃ পূঃ) সালে ইহুদি রাজ্যের রাজধানী জেরুজালেমের ধ্বংস সাধন করেন। তিনি ব্যাবিলন নগরীকে পুনরায় নির্মাণ করে এর সৌন্দর্য বিধান করেন। স্থাপত্য-শিল্পে তাঁর অপরিসীম অনুরাগ ছিল; তিনি বহু জনহিতকর কাজও করে গিয়েছেন। এ সব কাজের মধ্যে পানি সেচের ব্যবস্থা, রাস্তাঘাট, মন্দির ও প্রাসাদ নির্মাণ উল্লেখযোগ্য। তাঁর নির্মিত ব্যাবিলন নগরের প্রাচীরটি এত প্রশস্ত ছিল যে, এর দুই পার্শ্বে ছোট ছোট দু' সারি বাড়ি ছিল ও মধ্যে ঘোড়ার গাড়ি যাবার পথ ছিল। নগরের মন্দিরগুলির মধ্যে কালদীয় দেবতা মারদুকের মন্দিরটি সর্বাপেক্ষা বৃহৎ ও জাঁকজমকপূর্ণ ছিল। নেবুকাদনেজারের প্রাসাদের রমণীয় 'শূন্য-উদ্যান' গ্রীকদের কাছে প্রাচীন পৃথিবীর সপ্তম আশ্চর্যের এক আশ্চর্যের বস্তু বলে আখ্যায়িত হয়। কালদীয়গণ জ্ঞান-বিজ্ঞানে বিশেষ করে অঙ্ক ও খগোল-বিজ্ঞানে (জ্যোতির্বিজ্ঞান) পারদর্শিতা অর্জন করে। তারা সাতদিনের একটি সপ্তাহ গণনা করে এক একটি দেবতার নামে এক একদিনের নামকরণ করেছিল। এ সাতটি দেবতা ছিল আকাশের সাতটি গ্রহ। সপ্তাহের সপ্তম দিন বিশ্রামের জন্য ধার্য ছিল। কালদীয়গণ গ্রহ উপগ্রহ পর্যবেক্ষণ করে বারটি রাশিচক্র (Signs of Zodiac) আবিষ্কার করে। তারা গ্রহনাদি (সূর্য ও চন্দ্র) সম্বন্ধে নির্ভুল পূর্বাভাস দিতে পারত। কালদীয় বৈজ্ঞানিকগণ বছরের দৈর্ঘ্য নিরূপণে প্রায় নির্ভুল ছিল। গ্রহ-নক্ষত্রের নিয়মিত পর্যবেক্ষণের ফলে কালদীয়গণ জ্যোতির্বিদ্যায় বিশেষ দক্ষতা অর্জন করে। তারাই সর্বপ্রথম মানুষের ভাগ্য ও অদৃষ্ট গণনা করার জন্য এ জ্যোতির্বিদ্যার প্রচলন করে। এভাবে অংশত বিজ্ঞান ও অংশত কুসংস্কারের ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত জ্যোতিষ মানুষের জীবনে এক অভাবনীয় প্রভাব বিস্তার করতে থাকে। আগেই বলা হয়েছে, কালদীয়গণ তাদের সাতজন দেবতাকে সাতটি গ্রহের সঙ্গে এক ও অভিন্ন করে দেখেছিল। তাদের বিশ্বাস স্বর্গের এ গ্রহের গতিবিধি মর্ত্যে মানুষের কর্ম ও অদৃষ্টকে প্রভাবিত করে। তখন হতে মানুষ বিশেষ করে রাজা-বাদশাহগণ জ্যোতিষীর সাথে পরামর্শ না করে কোন কাজে হাত দিতেন না। কুরআনে বাবিল (ব্যাবিলন) শহরের জ্যোতিষীদের উল্লেখ রয়েছে।

পশ্চিমাঞ্চলের সভ্যতা

আগেই উল্লেখ করা হয়েছে। ফোরাত উপত্যকায় যেমন সেমিটিক জাতির কয়েকটি দল পর পর সভ্যতা গঠনে ও পরিবর্ধনে সহায়তা করেছিল, সেরকম উর্বর অর্ধচন্দ্র এলাকার পশ্চিমাংশে বর্তমান সিরিয়া-প্যালেস্টাইনেও সেমিটিকগণের কয়েকটি শাখা একইরকম সভ্যতা বিস্তারে বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা গ্রহণ করেছিল। সেমিটিকগণের এ শাখাগুলির নাম কানানীয় (ফিনিসীয়), আরামীয় ও হিব্রু।

কানানীয় বা ফিনিসীয় সভ্যতা

কানানীয়গণ বা ফিনিসীয়গণ ভূমধ্য সাগরের পূর্ব উপকূলে খ্রিঃ পূঃ ৩০০০ সাল হতে অনেকগুলি নগর-রাষ্ট্রে বিচ্ছিন্নভাবে বসবাস করত। মাঝে মাঝে কোন কোন নগর-রাষ্ট্র অন্যান্য নগর-রাষ্ট্রের উপর প্রাধান্য বিস্তারের প্রয়াস পেত। উত্তরে, পূর্বে ও দক্ষিণে বড় বড় শক্তিশালী সাম্রাজ্য দ্বারা বেষ্টিত হওয়ায় রাষ্ট্রগুলির স্বাধীনতা ও ঐক্য বরাবর বিপন্ন ছিল। তাছাড়া ফিনিসীয়গণ স্বভাবতই শান্তিপ্রিয় জাতি ছিল। রাজ্যজয়ে বা যুদ্ধবিগ্রহে তাদের আগ্রহ ছিল না। তাই কোন সাম্রাজ্য কর্তৃক আক্রান্ত হলে তারা প্রচুর অর্থ দিয়ে শান্তি প্রতিষ্ঠা করত এবং নিবিষ্ট মনে আপন আপন ব্যবসা-বাণিজ্যে ব্যাপৃত হত। বাণিজ্যে ও শিল্পকলায় তাদের চরমোৎকর্ষ সাধিত হয়। গ্রীকদের পূর্বে তারাই পৃথিবীর সর্বশ্রেষ্ঠ ব্যবসায়ী, নৌ-চালনায় পারদর্শী ও ঔপনিবেশিক সম্প্রদায় ছিল। পরবর্তীকালে তারা কিছুদিন গ্রীকদের প্রতিদ্বন্দ্বীও ছিল। ফিনিসীয়গণ ধাতবশিল্পে ও কাচশিল্পে পারদর্শিতা অর্জন করে। তারা বয়নশিল্পে বিশেষ খ্যাতি লাভ করে। তাদের তৈয়ারি বেগুনি রংয়ের কাপড় (Purple) পৃথিবীবিখ্যাত ছিল। প্রাচীন রাজা-বাদশাহগণ ও পুরোহিতগণ এ রংয়ের পোশাক পরিধান করতেন। ক্যাথলিক পুরোহিতগণ ও প্রাচ্যদেশীয় গীর্জার পাদরিগণ আজও ঐ রংয়ের পোশাক পরে থাকেন। ফিনিসীয়গণ তাদের বিভিন্ন পণ্য বোঝাই জাহাজ নিয়ে সমুদ্র পথে প্রথম আন্তর্জাতিক বাণিজ্য আরম্ভ করে এবং ব্যবসা-বাণিজ্যের সাহায্যে প্রাচ্য ও প্রতীচ্যের মধ্যে যোগসূত্র স্থাপন করে। ফিনিসীয়গণের নৌচালনা ও শিল্পোন্নয়নে বিশেষ মৌলিকতা ছিল না, কিন্তু তথাপি সভ্যতার ইতিহাসে এদের একটি অতি উল্লেখযোগ্য ও স্থায়ী অবদান রয়েছে। তারা প্রাচীন মিসরীয় লিখন-পদ্ধতি দ্বারা প্রভাবিত হয়ে একটি সহজ লিখন-পদ্ধতি উদ্ভাবন করে। তারা ২২টি ব্যঞ্জন বর্ণ আবিষ্কার করে এবং বর্ণমালার Alphabet নাম তাদের প্রথম দুই অক্ষর Aleph ও Beth হতেই উদ্ভূত হয়েছে। ফিনিসীয়গণ বিভিন্ন দেশে উপনিবেশ স্থাপন করে তন্মধ্যে ভূমধ্য সাগরে অবস্থিত সাইপ্রাস, সিসিলি, সার্ডিনিয়া প্রভৃতি দ্বীপ, মিসর, ফ্রান্স ও স্পেনের দক্ষিণ উপকূল অঞ্চল ও উত্তর আফ্রিকা বিশেষ উল্লেখযোগ্য। তারাই সর্বপ্রথম আটলান্টিক মহাসাগরে সমুদ্রযাত্রা করে ও আফ্রিকা প্রদক্ষিণ করে।

আরামীয় সভ্যতা

আরামীয় সেমিটিকগণ কানানীয়গণের (ফিনিসীয়গণের) মতই আরবের মরুভূমি হতে আনুমানিক খ্রিঃ পূঃ ১৫০০ সালে সিরিয়া ও প্যালেস্টাইনের মধ্যবর্তী অঞ্চলে এসে বসতি স্থাপন করে। এরপর তারা সিরিয়া অঞ্চলে চলে যায়। আমারীয় ও কানানীয় সভ্যতায় প্রভাবিত হয়ে তারা দামিস্কের আশে পাশে অনেকগুলি নগররাষ্ট্র স্থাপন করে। তন্মধ্যে আরাম বা দামিস্ক প্রধান। ফিনিসীয়গণ যেমন বাণিজ্যের জলপথ নিয়ন্ত্রণ করত, তেমনি আরামীয়গণ স্থলভাগের বাণিজ্য-পথের পুরোভাগে অবস্থিত থেকে যাবতীয় স্থল-বাণিজ্য নিয়ন্ত্রণ করত। এজন্য তাদেরকে "অভ্যন্তরীণ এশিয়ার ফিনিসীয়" বলে অভিহিত করা হত। খ্রিঃ পূঃ ৭৩২ সালে আরামীয়গণ আসিরিয়ার হাতে স্বাধীনতা হারায়। এর পরেও বহুদিন যাবৎ বাণিজ্য ক্ষেত্রে আরামীয়গণের প্রভাব ও প্রতিপত্তি অক্ষুণ্ন থাকে। তাদের সাহায্যে ফিনিসীয় বর্ণমালা সমগ্র উর্বর অর্ধচন্দ্র অঞ্চলে ছড়িয়ে পড়ে। আরামীয় ভাষা কিন্তু অন্যান্য সেমিটিক ভাষা হতে পৃথক ছিল। যীশু খ্রিস্টের জন্মের কয়েক শতাব্দী পূর্বে আরামীয় ভাষাই সমগ্র উর্বর অর্ধচন্দ্র অঞ্চলের ভাষা বলে পরিগণিত হয়। এ ভাষাই যীশু খ্রিস্টের মাতৃভাষা ছিল।

হিব্রু সভ্যতা

হিব্রুগণ (ইসরাইল বংশীয় বা ইহুদিগণ) দু দলে পরপর কানান রাজ্যে প্রবেশ করে। প্রথম দল আরামীয়গণের সাথে খ্রিঃ পূঃ ১৫০০ সালে আরবের মরুভূমি হতে আসে। হিব্রু কিংবদন্তী অনুসারে তারা তাদের পূর্বপুরুষ আব্রাহামের (ইব্রাহীমের) নেতৃত্বে শত শত বছর ধরে একটি বাসস্থানের অনুসন্ধানে ঘুরতে ঘুরতে অবশেষে কানানে এসে বসতি স্থাপন করে। খ্রিঃ পূঃ ত্রয়োদশ শতাব্দীর শেষভাগে মিসর হতে দ্বিতীয় হিব্রু দল হযরত মুসা (আ)-এর নেতৃত্বে সিনাই উপদ্বীপ হয়ে প্যালেস্টাইনে আসে। তখন হতে তাদের প্রকৃত ইতিহাস আরম্ভ হয়। সিনাইয়ে অবস্থান কালে হযরত মুসা (আ) মিদয়ানের একজন ধর্মনেতার কন্যার পানিগ্রহণ করেন। ইহুদিগণ সিনাইয়ে চল্লিশ বছর অবস্থান করে। এখানে অবস্থানকালে হযরত মুসার (আ) আধ্যাত্মিক বিকাশ ঘটে। প্যালেস্টাইনে ইহুদিগণের বারটি সম্প্রদায়কে একক অদ্বিতীয় যিহোভার বিশ্বাসে ঐক্যবদ্ধ দেখা যায়। সেখানে স্থানীয় কানানিগণ ব্যতীত 'ফিলিস্তাইন' নামক এক জাতির লোক

তাদের বৈরী হয়ে দাঁড়ায়। হিব্রুগণ তাদের নেতা ড্যাভিডের (দাউদ আ) নেতৃত্বে ফিলিস্তাইনিগণকে পরাজিত করে খ্রিঃ পূঃ ১০০০ সালে একটি স্বাধীন রাজ্যের প্রতিষ্ঠা করে। তাঁর পুত্র ও উত্তরাধিকারী সলমনের (সুলায়মান আঃ) সময় হিব্রু রাজ্য উন্নতির সর্বোচ্চ সোপানে আরোহণ করে। জলপথে ও স্থলপথে এক সুদূরপ্রসারী ব্যবসা-বাণিজ্য তাঁর আয়ের প্রধান উৎস ছিল। আকাবা উপসাগরে তাঁর একটি বিরাট নৌবহর ছিল। তিনি জেরুজালেমে একটি জমকালো উপাসনালয় নির্মাণ করেন। তাঁর রাজত্বকালে 'শেবার রানী' নাম্নী এক আরব রানী তাঁকে মূল্যবান উপঢৌকন পাঠান। আরবের সিনাই অঞ্চল তাঁর রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত ছিল। সুলায়মান (আ)-এর মৃত্যুর পর হিব্রু রাজ্য দু'ভাগে বিভক্ত হয়ে পড়ে। উত্তরাঞ্চলের রাজ্যের নাম ছিল ইসরাইল আর দক্ষিণাঞ্চলের রাজ্যের নাম ছিল জুদা। আগেই বলা হয়েছে যে, কালক্রমে রাজ্য দুটি আসিরীয় ও কালদীয় সাম্রাজ্যের অধীনতা স্বীকার করতে বাধ্য হয়। খ্রিঃ পূঃ ৭২১ সালে সম্রাট দ্বিতীয় সারগন ইসরাইল অধিকার করেন। খ্রিঃ পূঃ ৫৮৭ সালে সম্রাট নেবুকাদনেজার জেরুজালেম শহর ধ্বংস করেন। খ্রিঃ পূঃ ৫৩৮ সালে পারস্য সম্রাট সাইরাস (Cyrus) কালদীয়গণকে পরাজিত করে ইহুদিদেরকে জেরুজালেমে ফিরে আসবার অনুমতি দান করেন।

বিশ্বসভ্যতায় হিব্রুদের দান

হিব্রুগণ অপরাপর প্রাচীন সেমিটিকগণ হতে ভিন্ন প্রকৃতির ছিল। যুদ্ধ-বিগ্রহ, কূটনীতি, জ্ঞান-বিজ্ঞান বা শিল্পকলায় তারা কোন স্বকীয়তা বা মৌলিকতা প্রদর্শন করতে পারেনি, কিন্তু বিশ্বসভ্যতায় তাদের সর্বশ্রেষ্ঠ ও চিরস্থায়ী দান তাদের ধর্ম ও নীতি-জ্ঞান। তারা সমগ্র মানবজাতির ধর্ম ও নীতি-জ্ঞানের প্রথম শিক্ষক। '*ওল্ড টেস্টামেন্ট*' এই নীতি-জ্ঞানের অনবদ্য ও চিরন্তন উৎস। ধর্মের ক্ষেত্রে একত্ববাদের উদ্‌গাতা ইহুদিগণই। যুগে যুগে সাধক, কবি, লেখক ও বক্তা '*ওল্ড টেস্টামেন্ট*' হতে অপূরণীয় অনুপ্রেরণা লাভ করেছে। তাদের ধর্মবিশ্বাসের সাথে 'নবুয়তের' ধারণা ওতপ্রোতভাবে জড়িত। অধ্যাপক হিট্টি বলেন, "এই নবুয়তবাদের ভিত্তির উপরই খ্রিস্ট (তাঁর ধর্ম) গড়েছেন এবং সম্মিলিত ইহুদি-খ্রিস্টান কাঠামোর উপরেই মুহম্মদ (স) তাঁর ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠিত করেছেন।" ইহুদিগণের একত্ববাদ প্রচারে আমস, ইসাইয়া, জেরেমিয়া, এজেকিল ও হোসিয়া প্রমুখ ধর্মনেতা বিশিষ্ট ভূমিকা গ্রহণ করেন।

মিসরের প্রাচীন সভ্যতা

রাজনৈতিক ইতিহাস

মধ্যপ্রাচ্যের প্রাচীন সেমিটিক সভ্যতার সংক্ষিপ্ত বিবরণ দেয়া হল। আগেই বলা হয়েছে যে, সেমিটিক জাতি ও এদের স্বগোত্রীয় হেমিটিকগণ প্রথমে এক মহাজাতি হিসেবে আফ্রিকায় বসবাস করত। হেমিটিকগণ মিসরে এক উন্নত সভ্যতার সৃষ্টি করে। মিসরের ইতিহাসে মোটামুটি দুটি যুগ লক্ষ্য করা যায়। প্রথমটি হল অতি প্রাচীন যুগ; দ্বিতীয়টি বিভিন্ন রাজবংশের যুগ। খ্রিঃ পূঃ ৩৪০০ সাল পর্যন্ত অতি প্রাচীন যুগ ধরা হয়। রাজবংশের যুগ ৩৪০০ সাল হতে আরম্ভ হয়ে ৫২৫ সালে শেষ হয়েছে। প্রথম যুগে মিসর ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র রাজ্যে বিভক্ত ছিল এবং ক্রমান্বয়ে এরা নিজেদের স্বাধীন সত্তার বিলোপ করে দক্ষিণ ও উত্তর মিসরে দুটি বড় রাজ্যের সৃষ্টি করে। কালক্রমে এ দুটি রাজ্যও একটি বৃহৎ রাষ্ট্রে রূপান্তরিত হয়। সমগ্র মিসর এক রাজার দ্বারা শাসিত হওয়ার পর হতে মিসরের রাজবংশের যুগ আরম্ভ হয়। এ যুগে মিসরের রাজাকে 'ফের'আউন' বলা হত। এ যুগকে আবার প্রাচীন রাজবংশের যুগ, সামন্ত-যুগ, মধ্য-রাজ্যের যুগ, হিকসস অধিকারের যুগ ও সাম্রাজ্যের যুগ এই পাঁচটি ভাগে বিভক্ত করা হয়। প্রাচীন রাজবংশের যুগে মিসরের বিখ্যাত পিরামিডগুলি নির্মিত হয়। তন্মধ্যে ফের'আউন খুফুর পিরামিড সর্ববৃহৎ। কথিত আছে, এক লক্ষ লোক বিশ বছর পরিশ্রম করে এই পিরামিড নির্মাণ করেছিল। এ যুগের পর অন্তর্কলহের ফলে বিভিন্ন সামন্ত রাজ্যের উদ্ভব হয় এবং মিসরের রাজনৈতিক ঐক্য বিনষ্ট হয়। মধ্য রাজবংশের যুগে মিসরের রাজনৈতিক ঐক্য পুনঃপ্রতিষ্ঠিত হয় এবং অর্থসম্পদে, সাহিত্যে ও শিল্পকলায় মিসরের প্রভূত উন্নতি সাধিত হয়। মধ্যবর্তী রাজবংশের যুগের পর দুই শতাব্দী পর্যন্ত মিসরে হিক্সস নামক বিদেশী আক্রমণকারী যোদ্ধৃ-সম্প্রদায় রাজত্ব করতে থাকে। এরপর মিসরে সাম্রাজ্যের যুগ আরম্ভ হয়। খ্রিঃ পূঃ ১৫৮০ সাল হতে ৫২৫ সাল পর্যন্ত এই যুগ স্থায়ী হয়। এ যুগের ফের'আউন তৃতীয় তূতমোসিস সিরিয়া, ফিনিসিয়া, প্যালেস্টাইন ও ব্যাবিলনিয়া জয় করেন। মিসরের রাজধানী থীবস (Thebes) পৃথিবীর সর্বাপেক্ষা সমৃদ্ধিশালী নগরীতে পরিণত হয়। এ যুগের শেষের দিকের তুতনখামেন নামক ফের'আউনের সমাধি ১৯২২ সালে আবিষ্কৃত হয়েছে। দ্বিতীয় রামসেসের আমলে ইহুদি নির্যাতনের ফলে হযরত মুসা (আ)-এর নেতৃত্বে ইসরাইলগণ মিসর ত্যাগ করে। এর পর কিছুকাল মিসর আফ্রিকার রাজাদের শাসনাধীনে থাকে। খ্রিঃ পূঃ ৫২৫ সালে পারস্য সম্রাট ক্যাম্বিসেস নীলনদের উপত্যকা অধিকার করেন।

সভ্যতায় মিসরের দান

প্রাচীন যুগে মিসরে কৃষির উন্নতি সাধিত হয়। সেচ-ব্যবস্থা উন্নত হয়। মিসরবাসিগণ এ যুগে এক প্রকার চিত্রলিপির প্রবর্তন করে। তারা প্রথম পঞ্জিকা আবিষ্কার করে। পুরাতন রাজবংশের যুগে রাজা একক ক্ষমতাসম্পন্ন হয়ে ফের'আউন বা ফারাও নামে অভিহিত হন। ফারাও শব্দের অর্থ "বৃহৎ গৃহ"। তিনি রাজপুরুষ ও দেবতা উভয় গুণে গুণান্বিত হন।

ফের'আউন

সমাজে শ্রেণীবিভাগ ছিল—উচ্চ অভিজাত-সম্প্রদায়, মধ্যবিত্ত-সম্প্রদায় ও দাস। জল ও স্থলপথে মধ্যপ্রাচ্যের যাবতীয় বাণিজ্যে মিসরের প্রাধান্য ছিল। মিসরীয়গণ অত্যন্ত ধর্মপরায়ণ ছিল। মৃত্যুর পর অমরত্ব লাভের ঐকান্তিক ইচ্ছা তাদেরকে ধর্মকর্মে অনুপ্রাণিত করে। নীলনদের দেবতা ওসিরিসকে কেন্দ্র করে একটি উপাখ্যানের সৃষ্টি হয়। ওসিরিস তার কুমতি ভ্রাতা সেঠ কর্তৃক নিহত হয়। তার দেহ খণ্ড-বিখণ্ড করে দেশের নানাস্থানে ছড়িয়ে দেয়া হয়। তার বিধবা পত্নী আইসিস শরীরের টুকরাগুলিকে একত্র করে তাঁকে পুনরুজ্জীবিত করেন। এভাবে ওসিরিসের অমরত্ব লাভ ঘটে। তাঁকে মিসরে প্রথম মমী বলা হয়। তখন হতে মৃতদেহকে মমী করে কবরে রাখার প্রথা চালু হয়। ফের'আউনকে মমী করে বিরাট সমাধিতে রাখা হত। এগুলির নাম পিরামিড। ওসিরিস ব্যতীত মিসরবাসীদের আরও অন্যান্য দেবতা ছিল। সূর্যদেবতার নাম ছিল রা; এটন নামেও এ দেবতা পরিচিত হত। আমুন-রা নামক এক মহান দেবতার নামও এদের মধ্যে প্রচলিত ছিল। মিসরীয়গণের

লিখন পদ্ধতি ও সাহিত্য

চিত্রলিপির কথা আগেই উল্লিখিত হয়েছে। তারা প্যাপাইরাস নামক এক প্রকার পাতায় লেখা শুরু করেছিল, উদ্ভিজ্জ আঠার সাথে প্রদীপের কালি মাখিয়ে কালি প্রস্তুত করেছিল। প্রাচীন মিসর সাহিত্যে বিশেষ উন্নতি লাভ করে। তাদের ধর্মীয় সাহিত্যই এ প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য। মৃত-দেহের সাথে রক্ষিত বিস্তারিত লিপিতে মৃতের বিচার ও কঠোর পরীক্ষার বিষয় বর্ণিত আছে। একে 'মৃতের পুস্তক' নামে অভিহিত করা হয়। মৃত ব্যক্তি পরকালে বিচারের জন্য যাত্রা করলে তাকে বিচারকদের সম্মুখে নতজানু হয়ে প্রথমে বিভিন্ন পাপ হতে নির্দোষিতার কথা ঘোষণা করতে হয়। যেমন "আমি চুরি করিনি", "মিথ্যা কথা বলিনি", "পরচর্চা করিনি"। তারপর একে একে নিজের সৎকর্মের তালিকা আওড়াতে হয়, যেমন "আমি পবিত্র, আমি ক্ষুধার্তকে অন্নদান করেছি, তৃষ্ণার্তকে পানি দিয়েছি, বিবস্ত্রকে বস্ত্র দিয়েছি, নৌকাহীনকে পার করেছি।" এভাবে বিচারকদের সম্মুখে কঠোর পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়ে মৃতব্যক্তি ওসিরিসের সম্মুখে নীত হয় এবং অনন্ত জীবন লাভ করে। মধ্যরাজ্যের যুগ মিসরীয় সাহিত্যের চরমোৎকর্ষের যুগ। এ সময় সাহিত্যের বিভিন্ন দিক উন্নত হয়। জনপ্রিয় সাহিত্যের মধ্যে "দুই ভ্রাতার গল্প" বাইবেল ও কুরআনের ইউসুফ (আ) ও তদীয় ভ্রাতাগণের কাহিনীর

অনুরূপ। প্রাচীন মিসরীয় সাহিত্যের সর্বাপেক্ষা সুন্দর, মহীয়ান ও ভাবগম্ভীর সাহিত্য ফের'আউন ইখনাটনের "সূর্যদেবতার প্রশস্তি"। এতে তিনি সর্বশক্তিমান, মহানুভব এক স্রষ্টার উদ্দেশ্যে ভক্তি নিবেদন করেছেন ঃ

তুমি সুন্দর ও মহান
সকল দেশের উপর তুমি আলোর মহিমায় উজ্জ্বল;
তোমার কিরণ পরিব্যাপ্ত চরাচরে,
ব্যাপ্ত তোমার সকল সৃষ্টিতে;
বহুমুখী তোমার কীর্তি
আমাদের দৃষ্টিসীমা বহির্ভূত;
হে একক স্রষ্টা, তুমি অদ্বিতীয় ক্ষমতাবান।
আপনার মনে তুমি পৃথিবী সৃষ্টি করেছ
যখন তুমি ছাড়া আর কেউ ছিল না।

সাহিত্য ছাড়া মিসরীয়গণ বিজ্ঞানেও বিশেষ উন্নতি লাভ করে। তন্মধ্যে জ্যোতিষ ও অঙ্ক প্রধান। তারা সৌর-গণনা পদ্ধতি আবিষ্কার করে তিরিশ দিনের এক মাস ও বার মাসের এক বছর নির্ধারিত করে। পিরামিড নির্মাণে ও ভূমির সীমানা নির্ধারণে তাদের জীবনে জ্যামিতি ও গণিতের বিশেষ প্রয়োজন অনুভূত হয়। অঙ্কের যোগ, বিয়োগ ও ভাগ তাদের জানা ছিল। কিন্তু গুণন-পদ্ধতি তাদের জানা ছিল না। দশমিকের অঙ্ক সম্বন্ধে তাদের জ্ঞান ছিল, কিন্তু ভগ্নাংশ সম্বন্ধে তারা অজ্ঞ ছিল। চিকিৎসা-বিজ্ঞানেও মিসরীয়গণ উন্নতি লাভ করে। তাদের মধ্যে চক্ষু ও দন্ত-চিকিৎসক, অস্ত্র-চিকিৎসক ও অন্যান্য বিশেষজ্ঞ ছিল। এ চিকিৎসা-বিজ্ঞান গ্রীক পণ্ডিতগণের মাধ্যমে প্রথমে আরব ও পরে ইউরোপীয়দের মধ্যে প্রসারলাভ করে।

গ্রন্থনির্দেশ

১. পি. কে. হিট্টি ঃ *দি নিয়ার ইস্ট ইন হিস্ট্রি,* ভ্যান নস্ট্রাণ্ড কোম্পানি, ১৯৬০ খ্রিঃ।

২. ওয়াল ব্যাঙ্ক ও টেইলর ঃ *সিভিলাইজেশন—পাস্ট এন্ড প্রেজেন্ট,* ১ম খণ্ড, স্কট, ফোরসম্যান এণ্ড কোম্পানি, ১৯৪৯ খ্রিঃ।

৩. বার্নস্ এণ্ড রাল্ফ ঃ *ওয়ার্ল্ড সিভিলাইজেশন্স্,* অক্স্ফোর্ড ইউনিভার্সিটি প্রেস, পাকিস্তান ব্রাঞ্চ, ১৯৬১ খ্রিঃ।

৩

প্রাচ্য ও প্রতীচ্যের প্রথম সংযোগ

মধ্যপ্রাচ্যে ইউরোপীয় অধিকার

মাসিডনের বিশ্ববিশ্রুত বীর আলেকজাণ্ডার একটি বিরাট সৈন্যবাহিনী নিয়ে খ্রিঃ পূঃ ৩৩৪ সালে দার্দানেলিস প্রণালী পার হয়ে ইউরোপ হতে এশিয়ায় পদার্পণ করেন। পারস্য সম্রাট দারায়ুসের সুবিশাল সৈন্যবাহিনীর সাথে খ্রিঃ পূঃ ৩৩৩ সালে তাঁর যুদ্ধ হয়। এশীয় বাহিনী সংখ্যায় তিনগুণ অধিক হলেও ইউরোপীয় বাহিনীর উন্নততর যুদ্ধকৌশল ও নিয়মানুবর্তিতার সাথে তারা পেরে উঠল না। পারসিকগণ পরাজিত হয়, সমগ্র সিরিয়া গ্রীকদের পদানত হয়। বর্তমান আলেকজান্দ্রেটা (ইস্কান্দারুন) উক্ত বিজয়ের স্মৃতি বহন করছে। সিরিয়া বিজয়ের পর এ দিগ্বিজয়ী বীর মিসর জয়ের পরিকল্পনা গ্রহণ করেন। মিসরের উত্তরাঞ্চল দখল করার পর আলেকজাণ্ডার আলেকজান্দ্রিয়া (আল-ইস্কান্দারিয়া) শহরের পত্তন করেন। মিসর জয় সমাপ্ত করে তিনি আবার পারস্য সম্রাটের বিরুদ্ধে অস্ত্রধারণ করেন এবং পারসিক রাজধানী পার্সিপলিস জ্বালিয়ে দেন। অতঃপর অক্ষু (Oxus) নদী অতিক্রম করে তিনি সোগদিয়ানা (বুখারা) দখল করেন। তারপর আফগানিস্তানের ভেতর দিয়ে অগ্রসর হয়ে পাক-ভারতের উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত দখল করেন। খ্রিঃ পূঃ ৩২৩ সালে ব্যাবিলনে এ দিগ্বিজয়ী বীরের মৃত্যু হয়। আলেকজাণ্ডারের মধ্যপ্রাচ্য আক্রমণের ফলে গ্রীক ও মধ্যপ্রাচ্যদেশীয় ভাবধারা ও রীতি-নীতির সংমিশ্রণের সুযোগ হয়। পশ্চিম এশিয়া ও মিসরে এক সহস্র বছরের জন্য ধারাবাহিকভাবে ইউরোপীয় প্রভাব অনুভূত হতে থাকে। একাধিক্রমে মাসিডনীয়, গ্রীক, রোমান ও বাইজান্টাইন শাসন ও সংস্কৃতি এ অঞ্চলে স্থায়ী প্রভাব রেখে যায়। আলেকজাণ্ডারের মৃত্যুর পর তাঁর চারজন সেনাপতি, সেলিউকাস ব্যাবিলনিয়ায়, টলেমী (Tolemy) মিসরে, এন্টিগোনাস এশিয়া-মাইনরে ও এন্টিপেটার মাসিডনিয়ায় শাসন করতে থাকে।

হেলেনিস্টিক সভ্যতা

আলেকজাণ্ডারের মধ্যপ্রাচ্য অধিকারের পর গ্রীক ও প্রাচ্যদেশীয় সংস্কৃতির সংমিশ্রণের ফলে একটি নতুন সভ্যতার উদ্ভব হয়, এর নাম হেলেনিস্টিক সভ্যতা।

বিশুদ্ধ গ্রীক বা হেলেনিক সভ্যতা হতে এটা পৃথক। এ সভ্যতার বাহন গ্রীক ভাষা হলেও, এটা ছিল একটি আন্তর্জাতিক সভ্যতা এবং এর উপর প্রাচ্যের প্রভাব অত্যন্ত পরিস্ফুট। সিরিয়া, মিসর ও ইরানে এ সভ্যতা বিশিষ্ট রূপ পরিগ্রহ করে। জিনো নামক একজন ফিনিসীয় স্টয়িক দার্শনিক মতবাদ প্রবর্তন করেন। এপিকিউরিয়ান মতবাদের উপরেও ফিনিসীয় প্রভাব রয়েছে। হেলেনিস্টিক সভ্যতার সর্বপ্রধান কেন্দ্রগুলি ছিল উত্তর সিরিয়ায় এন্টিয়কে ও মিসরে আলেকজান্দ্রিয়ায়। শেষোক্ত স্থানে গ্রীক শাসকদের পৃষ্ঠপোষকতায় জ্ঞান-বিজ্ঞানের একটি বিখ্যাত কেন্দ্র গড়ে ওঠে। 'আলেকজান্দ্রিয়ার পাঠাগার বিশ্ববিশ্রুত। এখানকার অধ্যক্ষ এরাটস্থিনিস্ ভূগোল বিজ্ঞানে সুদক্ষ ছিলেন। তাঁর লেখা হতে পৃথিবীর গোলত্ব ও বিভিন্ন ভৌগোলিক অঞ্চলের নামকরণ সম্পর্কে জানা যায়। তিনিই সর্বপ্রথম অক্ষরেখা ও দ্রাঘিমা বিশিষ্ট মানচিত্র অঙ্কন করেন। এরিস্টফিনিস নামক আর একজন পাঠাগারের অধ্যক্ষ সাহিত্যে সুখ্যাতি লাভ করেন। ইউক্লিডের জ্যামিতি আজও পৃথিবীর সর্বত্র স্কুলপাঠ্য হিসেবে পঠিত হচ্ছে। হিপারকাস (Hipparchus) নামক বৈজ্ঞানিক সর্বপ্রথম বিজ্ঞানসম্মত জ্যোতির্বিদ্যার প্রবর্তন করেন। তিনি নক্ষত্রাদির উচ্চতা নির্ণয়ের জন্য Astrolabe আবিষ্কার করেন। রোমানদের বিজয়ের পরেও আলেকজান্দ্রিয়ার জ্ঞান-বিজ্ঞানের অনুশীলন বিন্দুমাত্র হ্রাস পায়নি। খ্রিস্টীয় দ্বিতীয় শতাব্দীতে আলেকজান্দ্রিয়ার বৈজ্ঞানিকগণের মধ্যে সর্বশেষ টলেমী জ্যোতির্বিজ্ঞান সম্বন্ধে *Almagest* নামক একটি গ্রন্থ রচনা করেন। এরিস্টার্কাসের মতবাদ উপেক্ষা করে তিনি "ভূকেন্দ্রিক মতবাদ" (অর্থাৎ পৃথিবী স্থির এবং সূর্য এর চারদিকে ঘুরছে) প্রচার করেন। তাঁরই প্রভাবে ষোড়শ শতাব্দীতে কোপার্নিকাসের সময় পর্যন্ত এ ভ্রান্ত মতবাদ ইউরোপে প্রচলিত থাকে। টলেমী অনেকগুলি মানচিত্র অঙ্কন করেন। দীর্ঘকাল পর্যন্ত পর্যটক ও অভিযাত্রীদল তাঁর মানচিত্রের ব্যবহার অপরিহার্য বলে মনে করত।

মধ্যপ্রাচ্যে রোমান শাসন

রোমানগণ খ্রিঃ পূঃ ৬৪ সালে সিরিয়া ও ৩০ সালে মিসর জয় করে। এর পূর্বে এশিয়া-মাইনরও রোমক সাম্রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত হয়েছিল। রোমান শাসনের ফলে এ সব অঞ্চল ব্যবসা-বাণিজ্যে বিশেষ উন্নতি লাভ করে। সর্বাপেক্ষা অধিক সমৃদ্ধি লাভ করে সিরিয়া। এন্টিয়ক শহর সিরিয়ার রাজধানী হিসেবে আলেকজান্দ্রিয়ার সমপর্যায়ভুক্ত হয়ে ওঠে। এখানে রোমানদের যাবতীয় আনন্দোৎসব যেমন ক্রীড়া-প্রতিযোগিতা, নৃত্য, কুস্তীযুদ্ধ ইত্যাদি অনুষ্ঠিত হত। গ্রীক হেলিওপলিস শহরটি রোমানদের সময় এর ধর্মমন্দিরের জন্য বিশেষ খ্যাতি

অর্জন করে। বেরিটাস (Berytus ঃ অধুনা বাইরুত) শহর জ্ঞান-সাধনার কেন্দ্র হিসেবে প্রসিদ্ধি লাভ করে। এখানে রোমান আইন অধ্যয়নের একটি কেন্দ্র গড়ে ওঠে। রোমানদের প্রভাবে প্রভাবান্বিত হয়ে উত্তর-আরবে ও সিরিয়ার মরু অঞ্চলে পর পর দুটি নগর-রাষ্ট্র গড়ে ওঠে। এর একটি পেট্রা, অপরটি পামীরা। এদের বিষয় পরে আলোচনা করা হবে। রোমানদের আমলে প্যালেস্টাইনে জুদাইয়া নামে একটি রাজ্য গড়ে ওঠে। হিরড (Herod) নামক একজন রাজার শাসনকালে এ রাজ্যের সীমানা বহুদূর পর্যন্ত বিস্তৃত হয়। সম্রাট টিটাসের সময় রোমানগণ ৭০ খ্রিস্টাব্দে জেরুজালেম নগরীর ধ্বংস সাধন করে।

রোমান শাসনকালে মিসরও সমৃদ্ধির উচ্চ সোপানে উন্নীত হয়। রাজধানী আলেকজান্দ্রিয়াকে পৃথিবীর অন্যতম বিখ্যাত নগরী হিসেবে গণ্য করা হত। নগরীর এক চতুর্থাংশ নানা সুরম্য অট্টালিকা ও মন্দিরে শোভিত ছিল। এখানে বহুসংখ্যক ইহুদি বসবাস করত। এ যুগে উন্নত সেচ-ব্যবস্থার ফলে মিসরের কৃষিকার্যে বিশেষ উন্নতি পরিলক্ষিত হয়। দেশ শিল্পায়িত হয়। বয়নশিল্পে, কাঁচ ও ধাতব শিল্পে মিসর আগেকার মতই তার সুনাম ও সুখ্যাতি বজায় রাখে। রোমান সভ্যতা নগরভিত্তিক ছিল; সেজন্য দেশের অভ্যন্তরে গতানুগতিক জীবনধারা অপরিবর্তিতই থেকে যায়।

রোমান শাসনামলের সর্বাপেক্ষা উল্লেখযোগ্য ঘটনা খ্রিস্টান ধর্মের উৎপত্তি ও বিকাশ। খ্রিস্টান ধর্ম মূলত একটি সেমিটিক ধর্ম। স্রষ্টার ভালবাসা ও মানুষের ভালবাসা এর মূল বিষয়বস্তু। রোমান সম্রাটগণ প্রথমে এ ধর্মাবলম্বিগণকে নির্যাতন করতেন। কিন্তু রোমান সাম্রাজ্যের বিশালতা ও ঐক্য খ্রিস্টধর্মের সার্বজনীনতা ও উদারতার পথ প্রশস্ত করে, সমগ্র রোমান সাম্রাজ্য খ্রিস্টধর্মের প্রচার ক্ষেত্রে পরিণত হয়। বলা বাহুল্য, গ্রীক-দর্শন, রোমান রাজনৈতিক সংস্থা, প্রাচ্যের ধর্মপ্রবণতা, হিব্রু ন্যায়নিষ্ঠা ও খ্রিস্টীয় ভালবাসা প্রভৃতির সমন্বয়ে খ্রিস্টধর্ম পরিপূর্ণতা লাভ করে। গ্রীক-প্রভাবিত হেলেনিস্টিক দর্শন ও জ্ঞান-বিজ্ঞানের সাধনা রোমান আমলেও মধ্যপ্রাচ্যে অব্যাহত থাকে। দ্বিতীয় শতাব্দীতে গ্যালেন তাঁর বিখ্যাত চিকিৎসাবিজ্ঞান বিষয়ক গ্রন্থ রচনা করেন। আলেকজান্দ্রিয়ার টলেমী গাণিতিক জ্যোতির্বিদ্যায় বিশিষ্টতা অর্জন করেন। স্ট্রাবো ভৌগোলিক বিশ্বকোষ প্রণয়ন করেন। নও-আফলাতুনবাদ মধ্যপ্রাচ্যীয়গণেরই সৃষ্টি। এর প্রধান উদ্দেশ্য ছিল প্ল্যাটো ও এরিস্টটলের দর্শন ও প্রাচ্যদেশীয় ভাবধারার সমন্বয় সাধন। আলেকজান্দ্রিয়া এ নতুন দার্শনিক মতবাদের কেন্দ্রস্থল ছিল। এটা ছাড়া এখানে নতুন খ্রিস্টান দর্শনেরও উৎপত্তি হয়। খ্রিস্টধর্মের এ্যারিয়ান ও এর বিরোধী এথেনেসিয়ান শাখা একত্ববাদ ও ত্রিত্ববাদের বিতর্ক নিয়ে প্রথম আলেকজান্দ্রিয়ায়

উদ্ভূত হয়। এন্থনী নামক একজন সংসারবিরাগী সন্ন্যাসীও এই সময় আলেকজান্দ্রিয়ার নিকটে বসবাস করতেন। সন্ন্যাসবাদেরও প্রথম উৎপত্তি মিসরেই হয়েছিল। সিরিয়া ও পারস্যে এ সময় কয়েকটি মিস্টিক মতবাদ গড়ে ওঠে।

বাইজান্টাইন আমলে মধ্যপ্রাচ্য

রোমান সাম্রাজ্যের পতনের পর মধ্যপ্রাচ্যে বাইজান্টাইন অধিকার প্রাচ্য ও প্রতীচ্যের সভ্যতার ইতিহাসে এক গুরুত্বপূর্ণ অধ্যায়। তাই মধ্যপ্রাচ্যে বাইজান্টাইন শাসনের সংক্ষিপ্ত আলোচনা প্রয়োজন। রোমান সম্রাট কনস্টান্টাইন ৩২৭ খ্রিস্টাব্দে ইউরোপ ও এশিয়ার সংযোগস্থলে পুরাতন গ্রীক শহর বাইজান্টাইনে একটি নতুন রাজধানীর পত্তন করেন। নতুন রোম (Nova Roma) নামক এ নগরী তাঁর নামানুসারে শীঘ্রই কনস্টান্টিনোপল নামে অভিহিত হয়। ৩৯৫ সালে সম্রাট থিওডোসিয়াসের মৃত্যুর পর তাঁর দুই পুত্র সাম্রাজ্যের পূর্ব ও পশ্চিমাংশে স্বাধীনভাবে রাজত্ব করতে থাকেন। এভাবে স্বতন্ত্র পূর্ব রোমান সাম্রাজ্য বা বাইজান্টাইন সাম্রাজ্যের উৎপত্তি হয়। ৪৭৬ সালে বর্বর জার্মান সম্প্রদায়সমূহের প্রচণ্ড আক্রমণে রোমের পতন হয়, পশ্চিম রোমান সাম্রাজ্য ধ্বংস প্রাপ্ত হয়। কিন্তু পূর্ব রোমান সাম্রাজ্য শুধু জার্মান আক্রমণ হতেই রক্ষা পায়নি বরং পরবর্তীকালে মুসলমান আক্রমণ প্রতিহত করে বহুকাল যাবৎ খ্রিস্টধর্ম ও সভ্যতার প্রধান ঘাঁটি হিসেবে বেঁচে থাকে। বাইজান্টাইন সাম্রাজ্য একদিকে যেমন রোম-গ্রীক সভ্যতার উত্তরাধিকারী হয়ে পড়ে, অন্যদিকে মধ্যপ্রাচ্যের একাধিক ভাবধারা কন্স্টান্টিনোপলকে প্রভাবিত করে।

তাই রোমান, গ্রীক ও প্রাচ্যদেশীয় উপকরণের সমন্বয়ে গড়ে উঠল বাইজান্টাইন সভ্যতা। কালক্রমে রোমের খ্রিস্টধর্ম ও কন্স্টান্টাইনের খ্রিস্টধর্মের মধ্যে মতবিরোধ ও মতানৈক্যের সৃষ্টি হয়। কনস্টান্টিনোপলের ধর্ম 'গ্রীক সনাতনধর্ম' (Greek Orthodox Church) নামে পরিচিত হয়।

বাইজান্টাইন শাসনামলে সিরিয়া ও মিসরে সর্বপ্রথম বিজাতীয় শাসনের বিরুদ্ধে অসন্তোষ ও বিক্ষোভ দানা বেঁধে ওঠে। বাইজান্টাইন শাসকগণ রোমানদের তুলনায় অপেক্ষাকৃত স্বৈরাচারী, অত্যাচারী ও পরধর্মের প্রতি অসহিষ্ণু ছিলেন। বাইজান্টাইন শাসনের বিরুদ্ধে সেমিটিক ও হেমিটিক জাতির রাজনৈতিক অসন্তোষ স্বতন্ত্র জাতীয়তাবোধের সৃষ্টি করে। এ স্বাতন্ত্র্যবোধ সিরিয়া ও মিসরে ধর্মের ক্ষেত্রেও বিভিন্নতার সৃষ্টি করে। কন্স্টান্টিনোপলের সরকার ও ধর্মীয় কর্তৃপক্ষ এ সব স্বতন্ত্রবাদকে স্বীকৃতি না দেয়ায় এ বিরোধ ক্রমশ গুরুতর আকার ধারণ করে। সিরিয়ায় পঞ্চম শতাব্দীতে স্বতন্ত্র ধর্মমত গড়ে ওঠে। সিরিয়ার ধর্মের ভাষা হল আরামীয়। এখানে দুটি মতবাদ পর পর প্রাধান্য লাভ

করে। এদের নাম নেস্টোরীয় ও মনোফিসীয়। প্রথমোক্ত মতানুসারে যীশুখ্রিস্ট দুটি ব্যক্তিত্বের অধিকারী, একটি স্বর্গীয় অপরটি মানবীয়। দ্বিতীয় মতে যীশুখ্রিস্টের স্বর্গীয় ও মানবীয় সত্তা একই ব্যক্তিত্বে সম্মিলিত হয়েছে। মিসরেও খ্রিস্টধর্মে অনুরূপ স্বতন্ত্রমতবাদের সৃষ্টি হয়। রোমান আমলে এরিয়ান ও এথেনেসিয়ান মতবাদের দ্বন্দ্বের কথা আগেই বলা হয়েছে। বাইজান্টাইন আমলে সিরিয়ার অনুকরণে মিসরে মনোফিসীয় মতবাদ গড়ে ওঠে। মিসরের গীর্জার ভাষা হল কপ্টিক। এভাবে সিরিয়া ও মিসরে স্বতন্ত্র ধর্মীয় মতবাদের মাধ্যমে কনস্টান্টিনোপল সরকারের বিরুদ্ধে অসন্তোষ প্রকাশ পায়।

ইসলামের অভ্যুদয়ের প্রাক্কালে মধ্যপ্রাচ্য

বাইজান্টাইন ও সাসানীয় প্রতিদ্বন্দ্বিতা

মধ্যপ্রাচ্যে ন্যূনাধিক সহস্র বছরের বিদেশী শাসনের উল্লেখ করা হয়েছে। কিন্তু মধ্যপ্রাচ্যের একটি অংশে এই বিদেশী শাসন দীর্ঘদিন স্থায়ী হয়নি। পারস্য আলেকজাণ্ডারের আক্রমণের ফলে গ্রীকদের পদানত হলেও এক শত বছরের অধিককাল পারস্যে গ্রীক শাসন টিকে থাকতে পারল না। প্রাচীন যুগে পারসিকগণ তাদের দেশে এক অতি উন্নত সভ্যতার সৃষ্টি করেছিল। সর্বপ্রাচীন পারসিক সাম্রাজ্যের নাম একিমেনীয় সাম্রাজ্য। খ্রিস্টপূর্ব ৫৫০ সাল হতে আলেকজাণ্ডারের আক্রমণ পর্যন্ত এই সাম্রাজ্য স্থায়ী হয়েছিল। একিমেনীয় নেতা সাইরাস (Cyrus) পশ্চিম এশিয়ার বহু অংশ জুড়ে একটি বিরাট সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠা করেন। তাঁর পুত্র ক্যাম্বিসেস মিসর জয় করেন। সর্বশ্রেষ্ঠ পারসিক সম্রাট দারায়ুস মাসিডনিয়া ও থ্রেস পর্যন্ত নিজের সাম্রাজ্যভুক্ত করেন। দারায়ুস পাক-ভারতের উত্তর-পশ্চিম সীমান্তে ক্ষমতা প্রতিষ্ঠিত করেন। সমগ্র পারস্য সাম্রাজ্য ২১টি সাত্রাপী বা প্রদেশে বিভক্ত ছিল। একিমেনীয় সম্রাটগণের আমলে পারস্যে এক সুষ্ঠু শাসন-ব্যবস্থা গড়ে ওঠে। রাস্তা-ঘাটের উন্নতি হয়। সুসা, একবাটানা, ব্যাবিলন ও পার্সপলিস নামে চারটি রাজধানী শহর নির্মিত হয়। সাম্রাজ্যের সর্বত্র আইন ও শৃঙ্খলা প্রতিষ্ঠিত হয়। পারসিকদের ধর্ম জোরোএস্টার নামক অতি প্রাচীন ধর্ম প্রচারক কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল। এই ধর্মের মূলকথা ছিল, ভাল ও মন্দ, ন্যায় ও অন্যায় এবং সত্য ও অসত্যের সংঘাত। 'আহুর মাযদা' সত্যের প্রতীক, 'আহরিমান' অসত্যের প্রতীক। পৃথিবীতে প্রতিনিয়ত এ দুই বিপরীত শক্তি সংগ্রাম করছে। অন্তিমে ন্যায় ও সত্যের জয় প্রতিষ্ঠিত হবে। এ ধর্মে একটি শেষ বিচারের দিনের কথা বলা হয়েছে। এর ফলে মন্দলোকদের জন্য নরক ও ভাল লোকদের জন্য ফিরদউস বা স্বর্গ নির্ধারিত হবে। জোরোএস্টারের বাণী জেন্দাবেস্তা নামক গ্রন্থে সঙ্কলিত হয়েছে।

পারস্যে গ্রীক শাসনের এক শতাব্দী অতিবাহিত হতে না হতেই আরদাশীর নামক একজন সামন্ত রাজা গ্রীক রাজাকে পরাজিত ও নিহত করে ২২৬ খ্রিস্টাব্দে পারস্যে সাসানীয় বংশের রাজত্ব স্থাপন করেন। এ বংশে মোট চল্লিশজন শাসক রাজত্ব করেন। সাসানীয়গণের শাসনাধীনে পারস্যে এক নবজাগরণের সূচনা হয়।

সাসানীয় রাজবংশ (২২৬—৬৫ খ্রিঃ)

প্রাচীন জোরোএস্ট্রীয় ধর্ম পারসিকগণের এ পুনর্জাগরণের সহায়তা করেছিল। আরদাশীর এ ধর্মের পুরোহিত ও মন্দিরগুলিকে নিজের বশে আনয়ন করে একে জাতীয় জাগরণের কাজে ব্যবহার করেছিলেন। সাসানীয়গণ ও বাইজান্টাইনগণ পশ্চিম এশিয়ার অধিকার নিয়ে তিন শতাব্দী যাবৎ এক মারাত্মক সংগ্রামে লিপ্ত হয়। পরিশেষে যখন এ দু শক্তি ক্ষমতার দ্বন্দ্বে নিঃশেষিত প্রায়, তখন নব-চেতনায় উদ্বুদ্ধ ও নতুন ধর্মে অনুপ্রাণিত মুসলমান জাতি মধ্যপ্রাচ্যে নিজেদের প্রাধান্য প্রতিষ্ঠিত করে। সম্রাট প্রথম খসরু (কিসরা আন-নওশিরওয়াঁ, ৫৩১—৫৭৯ খ্রিঃ) সাসানীয় বংশের সর্বশ্রেষ্ঠ সম্রাট। তিনি ন্যায়বিচারক বলে প্রজাসাধারণের মধ্যে অশেষ খ্যাতি অর্জন করেন। তাঁর ন্যায়বিচারের কাহিনী ইসলামী সাহিত্যকেও প্রভাবিত করেছে। তাঁর বাইজান্টাইন সমসাময়িক ছিলেন সম্রাট জাস্টিনিয়ান। খসরুর সেনাবাহিনী সিরিয়ায় প্রবেশ করে এন্টিয়ক (আন্তাকিয়া) লুঠ করে এবং ভূমধ্যসাগরের তীর পর্যন্ত অধিকার করে। জাস্টিনিয়ান বহু অর্থের বিনিময়ে তাঁর সাথে শান্তি প্রতিষ্ঠা করেন। খসরুর বাহিনী ৫৭৫ খ্রিস্টাব্দে ইয়ামনের আবিসিনীয় বাহিনীকে পরাজিত করে সেখানে পারসিক আধিপত্য স্থাপন করে। এই ঘটনা হযরত রসুলুল্লার জন্মের চার-পাঁচ বছরের মধ্যে ঘটেছিল। আন-নওশিরওয়াঁর পৌত্র খসরু ফিরোজ (৫৮৯-৬২৮ খ্রিঃ) পুনরায় বাইজান্টাইন সাম্রাজ্য আক্রমণ করে দামিস্ক ও জেরুজালেম দখল করে "সত্যক্রুশ" বহন করে টেসিফোনে তাঁর রাজধানীতে নিয়ে আসেন। তিনি মিসরও দখল করেন। কিন্তু ৬১০ খ্রিস্টাব্দে হিরাক্লিয়াস নামক এক বীর সেনাপতি ও সুদক্ষ রাজনীতিবিদ কনস্টান্টিনোপলের সিংহাসনে আরোহণ করেন। তিনি সিরিয়া, প্যালেস্টাইন ও মিসরে বাইজান্টাইন অধিকার পুনঃপ্রতিষ্ঠিত করেন। ইসলামের অভ্যুদয়ের প্রাক্কালে মধ্যপ্রাচ্যের এ দু প্রধান রাজশক্তি পরস্পর ক্ষমতার দ্বন্দ্ব ব্যতীত অন্যান্য অভ্যন্তরীণ কারণেও দুর্বল ও পতনোন্মুখ হয়ে পড়ে। এরা আপন আপন রাজ্যে ভিন্ন মতাবলম্বী ধর্মীয় সম্প্রদায়ের উপর নির্যাতন চালাত। এরূপ আন্তর্জাতিক পরিস্থিতিতে ইসলামের আবির্ভাব হয়।

৪

আরবের প্রাচীন ইতিহাস

গ্রীক ও রোমান লেখকগণের প্রাসঙ্গিক উল্লেখ, প্রাথমিক যুগের মুসলিম ঐতিহাসিকগণের ঐতিহাসিক কিংবদন্তী এবং বিভিন্ন শিলা ও ধাতব লিপি হতে আরবদেশের প্রাচীন ইতিহাস সম্বন্ধে মোটামুটি ধারণা করা যায়। যদিও আরবদেশে প্রত্নতাত্ত্বিক অনুসন্ধান ও খননকার্য যথাযথভাবে চালান হয়নি, তথাপি শেষোক্ত উপকরণই প্রাচীন ইতিহাসের একমাত্র গুরুত্বপূর্ণ উপকরণ। প্রত্নতাত্ত্বিকগণ এ পর্যন্ত ইয়ামনে ৩০০০ লিপি আবিষ্কার করেছেন। এ লিপিগুলির পাঠোদ্ধারের ফলে জানা যায় যে, দক্ষিণ-আরবে একটি পূর্ণাঙ্গ বর্ণমালা ও ভাষা প্রচলিত ছিল। পরবর্তীকালে উত্তর-আরবের ভাষা ও বর্ণমালা উক্ত ভাষা ও বর্ণমালার স্থান দখল করে।

দক্ষিণ আরবের সভ্যতা

প্রাচীন যুগে দক্ষিণ আরবে পর পর কয়েকটি রাজবংশ রাজত্ব করে। ঐ সময় দক্ষিণ আরবে একটি উন্নত সভ্যতা গড়ে ওঠে। সর্বপ্রথম যে রাজবংশ রাজত্ব

মিনায়ী সভ্যতা

করে তার নাম মিনায়ী রাজবংশ। এ বংশের রাজারা খ্রিঃ পূঃ ১২০০ সাল হতে ৬৫০ সাল পর্যন্ত রাজত্ব করেন। জাওফ-ই-ইয়ামনে এ রাজ্য প্রতিষ্ঠিত হয় এবং সমগ্র দক্ষিণ আরবে এর প্রাধান্য বিস্তৃত হয়।

সাবায়ী সভ্যতা

মিনায়ী বংশের পতনের পর দক্ষিণ আরবে সাবায়ী বংশ শক্তিশালী হয়ে ওঠে। তাঁদের রাজত্বকাল খ্রিঃ পূঃ ৯৫০ সাল হতে ১১৫ সাল পর্যন্ত। এ বংশের প্রথম দিকের শাসকগণ প্রায় তিন শতাব্দী পর্যন্ত মিনায়ীদের সমসাময়িক ছিলেন। এরপর সমগ্র দক্ষিণ আরবের্র সাবায়ী প্রাধান্য প্রতিষ্ঠিত হয়। প্রথম যুগে খ্রিঃ পূঃ ৯৫০ সাল হতে ৬৫০ সাল পর্যন্ত এ বংশের মোট সতেরজন শাসক "পুরোহিত রাজা" নামে অভিহিত হতেন। মারীবের অনতিদূরে 'সিরওয়া' দুর্গে তাদের প্রথম রাজধানী স্থাপিত হয়। বিখ্যাত 'মারীবের বাঁধ' এ যুগের রাজাগণের অন্যতম প্রধান কীর্তি। এ বাঁধ তৎকালীন প্রকৌশল দক্ষতার পরিচয় দেয়। দ্বিতীয় যুগে (খ্রিঃ পূঃ ৬৫০—১১৫) শাসকগণ 'সাবারাজ' উপাধি ধারণ করেন। মারীবেই এখন এদের রাজধানী স্থাপিত হয়। এ যুগই দক্ষিণ-আরবের প্রাচীন ইতিহাসের স্বর্ণযুগ।

হিময়ার বংশ

সাবায়ী বংশের পতনের পর হিময়ার বংশের রাজত্ব প্রতিষ্ঠিত হয়। হিময়ারগণ সাবায়িগণেরই স্বগোত্রীয় ছিলেন। এদের রাজত্বকাল খ্রিষ্টপূর্ব ১১৫ সালে আরম্ভ হয়ে খ্রিস্টীয় ৫২৫ সালে শেষ হয়। তাঁদের রাজধানী ছিল জাফর নামক শহরে। পরবর্তীকালে সানায় রাজধানী স্থাপিত হয়। এ বংশের রাজাগণ সুরক্ষিত দুর্গে বাস করতেন। সানায় গুমদান নামক দুর্গনগরী বিংশতিতল বিশিষ্ট ছিল। এটাই বোধহয় পৃথিবীর লিখিত ইতিহাসে প্রথম গগনচুম্বী প্রাসাদ। পূর্ববর্তী মিনায়ী ও সাবায়ী রাজ্যের মত হিময়ার রাজ্যের অর্থনৈতিক ভিত্তি ছিল আন্তর্জাতিক ব্যবসা। লোহিত সাগরে হিময়ারগণের একচেটিয়া বাণিজ্যাধিকার ছিল। পরবর্তীকালে রোমানগণ এ বাণিজ্যে তাদের প্রতিদ্বন্দ্বী হয়ে দাঁড়ায়। হিময়ার যুগের শেষের দিকে আরব দেশে ক্রমশ খ্রিস্টান ধর্ম ও ইহুদি ধর্ম প্রবেশ লাভ করে। রোমান সম্রাট কনস্টান্টিয়াস খ্রিস্টীয় ৩৫৬ সালে দক্ষিণ-আরবে একজন খ্রিস্টান দূত প্রেরণ করেন। খ্রিস্টান দূত থিওফিলাস আদনে ও হিময়ার রাজ্যে কয়েকটি গীর্জা নির্মাণ করেন। এ যুগে ইহুদি ধর্ম আরবে প্রসার লাভ করে। বিশেষত শেষ হিময়ার সম্রাট জুনওয়াস নিজেই ইহুদি ধর্ম গ্রহণ করেন।

তিনি কালক্রমে খ্রিস্টান নির্যাতক বলে পরিগণিত হন। তিনি ৫২৩ খ্রিস্টাব্দে নাজরানের খ্রিস্টানগণকে নৃশংসভাবে হত্যা করেন। কথিত আছে, একটিমাত্র লোক কোনক্রমে বেঁচে যায় এবং পালিয়ে বাইজান্টাইন সম্রাটের নিকট সাহায্য প্রার্থনা করে। সম্রাট আবিসিনিয়ার খ্রিস্টান রাজা নাজ্জাশীকে * খ্রিস্টানদের পক্ষ অবলম্বন করতে আহ্বান করেন। নাজ্জাশী আরবে পর পর দুবার, ৫২৩ ও ৫২৫ খ্রিস্টাব্দে, দুটি অভিযান প্রেরণ করেন। পরবর্তী অভিযানের সেনাপতি ছিল আবরাহা। যুদ্ধে জুনওয়াস নিহত হন এবং হিময়ার বংশের পরিসমাপ্তি ঘটে। এভাবে দক্ষিণ আরবে হাবশী আধিপত্য স্থাপিত হয়। আবরাহা ইয়ামনের রাজ-প্রতিনিধি নিযুক্ত হয়। ৫২৫ সাল হতে ৫৭৫ সাল পর্যন্ত অর্ধ-শতাব্দী কাল ইয়ামনে হাবশী অধিকার অক্ষুণ্ন থাকে। আবরাহা সানায় একটি গীর্জা নির্মাণ করে। আরবদের নিকট এটি আল-কালিস (গ্রীক *Ekklesia*) নামে পরিচিত হয়। এ গীর্জাটি কাবার প্রতিদ্বন্দ্বী বলে পরিগণিত হয়। কথিত আছে, কাবার দুজন পূজারী সানার গীর্জার পবিত্রতা নষ্ট করে এবং আবরাহা সসৈন্যে মক্কা আক্রমণ করে। এ ঘটনা হযরত মুহম্মদ (স)-এর জন্মের বছর (৫৭০ খ্রিঃ) সংঘটিত হয়েছিল। আবরাহার বাহিনীতে একটি হস্তী ছিল বলে আরবগণ ঐ বছরকে 'হস্তীর বছর' (আম-উল-ফীল) নামে অভিহিত করে। কারণ, ইতিপূর্বে তারা কখনও হাতী দেখেনি। আবরাহার সৈন্যবাহিনীতে মড়ক আরম্ভ হওয়ায় তার অভিযান ব্যর্থ হয়।

---

* আবিসিনিয়ার রাজার উপাধি ছিল নাজ্জাশী (Negus)।

আরব দেশ

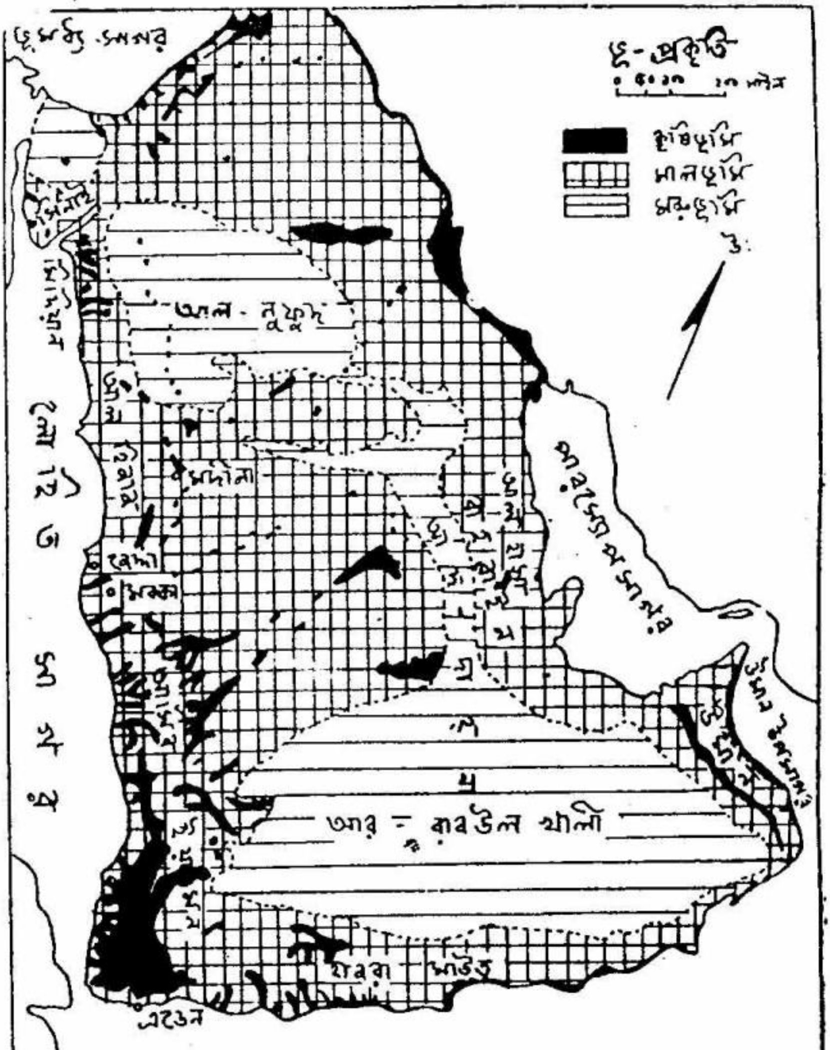
ভূ-প্রকৃতি
কৃষিভূমি
মালভূমি
মরুভূমি
উঃ
আল-নুফুদ
মদীনা
মক্কা
আর-রুব-উল খালী
এডেন
আদন উপসাগর
আফ্রিকা

আরব দেশ

ইয়ামনে হাবশী শাসনের বিরুদ্ধে শীঘ্রই আরবদের মধ্যে চরম অসন্তোষ দেখা দেয়। তারা প্রাচীন হিময়ার বংশের একজন যুবরাজের নেতৃত্বে হাবশী অধিকারের বিরুদ্ধে আন্দোলন আরম্ভ করে। পারস্য সম্রাট তাদের আবেদনক্রমে ৫৭৫ খ্রিস্টাব্দে ইয়ামনে একটি সৈন্যবাহিনী প্রেরণ করেন। আবিসিনীয় সৈন্যবাহিনী পরাজিত হয় এবং ইয়ামনে পারস্য অধিকার স্থাপিত হয়। ইয়ামন পারস্য সাম্রাজ্যের একটি প্রদেশে পরিণত হয়। হিজরী ষষ্ঠ সালে (৬২৮ খ্রিঃ) ইয়ামনের পারসিক শাসনকর্তা ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করেন।

উত্তর ও মধ্য-আরবের সভ্যতা

পেট্রা

দক্ষিণ-আরবের মত উত্তর ও মধ্য-আরবেও কয়েকটি সমৃদ্ধিশালী নগর-সভ্যতা গড়ে ওঠে। এদেরও প্রধান উপজীবিকা ছিল ব্যবসা-বাণিজ্য। আরবের উত্তরে বর্তমান জর্ডান রাজ্যে ওয়াদি মুসা নামক স্থানে নাবাতী জাতির লোক একটি রাজ্য স্থাপন করে। পেট্রা নামক শহরে এর রাজধানী ছিল। আনুমানিক খ্রিঃ পূঃ ৩০০ সাল হতে খ্রিস্টীয় ১০৫ সাল পর্যন্ত পেট্রায় নাবাতিগণ ক্ষমতাশালী ছিল। পাহাড় কেটে এদের সুরক্ষিত দুর্গ-নগরী পেট্রা নির্মিত হয়েছিল। দক্ষিণ আরব ও ভূমধ্যসাগরের মধ্যবর্তী বাণিজ্যপথে অবস্থিত ছিল বলে পেট্রার গুরুত্ব ও প্রাধান্য সমধিক ছিল। ক্রমশ মধ্যপ্রাচ্যে রোমান অধিকার স্থাপিত হয়। খ্রিস্টীয় ১০৬ সালে পেট্রা রাজ্য রোমান সাম্রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত হয়।

পামীরা

পেট্রার পতনের পর সিরিয়ার মরুভূমিতে একটি মরুদ্যানকে কেন্দ্র করে পামীরা শহর গড়ে ওঠে। দ্বিতীয় ও তৃতীয় শতাব্দীতে এ শহর মধ্যপ্রাচ্যের অন্যতম সমৃদ্ধ শহর বলে পরিগণিত হয়। এটি রোমান সাম্রাজ্যের একটি স্বায়ত্তশাসিত রাজ্য ছিল। পামীরার আন্তর্জাতিক বাণিজ্য পূর্বে চীনদেশ পর্যন্ত বিস্তৃত ছিল। পূর্বোল্লিখিত পেট্রা শহরের মত পামীরার সমৃদ্ধিও এ বাণিজ্যের উপর নির্ভরশীল ছিল। খ্রিস্টীয় তৃতীয় শতকে পামীরা উন্নতির উচ্চ শিখরে আরোহণ করে। পামীরার শাসনকর্তা ওদায়না রোমান সম্রাট কর্তৃক প্রাচ্যের উপ-সম্রাট পদে নিযুক্ত হন। তাঁর আমলে পামীরা 'পশ্চিম এশিয়ার রাণী' বলে স্বীকৃত হয়। কিন্তু ২৬৬—৬৭ খ্রিস্টাব্দে ওদায়না গুপ্তঘাতকের হস্তে নিহত হন। তাঁর সুন্দরী ও উচ্চাভিলাষিণী স্ত্রী জয়নব (Zenobia) 'প্রাচ্যের রানী' উপাধি গ্রহণ করে স্বাধীনতা ঘোষণা করেন। তিনি স্বীয় রাজ্যের সীমানা বর্ধিত করেন এবং

এশিয়া-মাইনরের বৃহদাংশ ও মিসর দখল করেন। ২৭০ খ্রিস্টাব্দে তাঁর বিজয়ী সেনাবাহিনী আলেকজান্দ্রিয়া অধিকার করে। কিন্তু তাঁর এ বিজয়-গৌরব ক্ষণস্থায়ী হয়েছিল। ২৭২ খ্রিস্টাব্দে রোমান সম্রাট অরেলিয়ান তাঁর সেনাপতিকে পরাজিত করে পামীরা অধিকার করেন। রানী জয়নব পলায়নপর হলেন কিন্তু অবশেষে ধৃত ও বন্দিনী হলেন। সম্রাট পামীরাকে ধ্বংস স্তূপে পরিণত করেন। পামীরার গৌরব-সূর্য চিরতরে অস্তমিত হয়। পামীরার সভ্যতা গ্রীক, সিরীয় ও পারসিক উপাদানের সংমিশ্রণে গঠিত হয়। সময়, সুযোগ ও উপযুক্ত পরিবেশে মরুভূমির বেদুঈনগণও যে উচ্চস্তরের সভ্যতার জন্ম দিতে পারে, পেট্রা ও পামীরার প্রাচীন সভ্যতা এর জ্বলন্ত প্রমাণ। ইসলামের অভ্যুদয়ের প্রাক্কালে আরবের প্রান্তঃসীমায় দুটি ও আরবের মধ্যবর্তী অঞ্চলে একটি রাজ্য গড়ে ওঠে। আরবের উত্তরে সিরিয়ায় গাস্‌সান বংশের প্রাধান্য প্রতিষ্ঠিত হয়। এ বংশের শাসকগণ খ্রিস্ট ধর্মে দীক্ষিত হয় এবং খ্রিস্টীয় পঞ্চম শতকে এ রাজ্য বাইজান্টাইন সাম্রাজ্যের প্রভাবাধীন হয়ে পড়ে। আরবের উত্তর-পূর্ব সীমান্তে ফোরাতের পশ্চিম উপকূলে প্রাচীন ব্যাবিলনের অনতিদূরে হিরা নামক স্থানে আরেকটি আরব রাজ্য গড়ে ওঠে। লখমী বংশের রাজারা হিরায় রাজত্ব করতেন। এরাও খ্রিস্টান ছিলেন। এ বংশের শেষ রাজা তৃতীয় নুমান খ্রিস্টান ছিলেন। গাসসান বংশ ও লখমী বংশের রাজারা ইয়ামনী ছিলেন। কিন্তু শেষোক্ত বংশের রাজারা পারসিক প্রভাবান্বিত ছিলেন। এজন্য উভয় রাজ্যের মধ্যে প্রতিদ্বন্দ্বিতা ও রেষারেষি ছিল। মধ্য-আরবে শেষে হিময়ারগণের প্রভাবাধীন যে রাজ্যটি গড়ে ওঠে, এর নাম ছিল কিন্দা রাজ্য। হাজরা-মাউতের পশ্চিমাঞ্চলে এদের আদি নিবাস ছিল। ক্রমান্বয়ে এঁরা মধ্য-আরবে নিজেদের অধিকার প্রতিষ্ঠিত করে। আরবের অভ্যন্তরে বেদুঈন সম্প্রদায়সমূহকে কেন্দ্রীয় সরকারের অধীনে আনয়ন করে একটি রাজ্য প্রতিষ্ঠার প্রচেষ্টা আরবে এই প্রথম। এ রাজ্য বেশিদিন স্থায়ী হয়নি। জাহিলিয়ার বিখ্যাত কবি ইমরুল কয়স এ কিন্দা রাজবংশের বংশধর ছিলেন।

গ্রন্থনির্দেশ

১. পি. কে. হিট্টি : *হিস্ট্রি, অব দি এরাব্‌স,* ম্যাকমিলান এণ্ড কোঃ, লণ্ডন, ১৯৫১।

২. নবিহ আমীন ফারিস : *দি এরাব হেরিটেজ,* নিউ জারসি, *১৯৪৬।*

৫
জাহিলিয়া যুগ

আরবের প্রাচীন যুগের সভ্যতার কথা আগেই বলা হয়েছে। এ সভ্যতা আরবের প্রান্তসীমায় বিকাশ লাভ করে লয়প্রাপ্ত হয়। ইসলামের অভ্যুদয়ের প্রাক্কালে অর্থাৎ খ্রিস্টীয় ষষ্ঠ শতকে আরবের প্রায় সর্বত্র বিভিন্ন পরিবার ও সম্প্রদায়ের মধ্যে ঝগড়া-বিবাদ লেগেই ছিল। এ শতাব্দীকে আরবের ইতিহাসে জাহিলিয়া যুগ বা অন্ধকার যুগ বলা হয়ে থাকে। সচরাচর আরবের প্রাক্-ইসলামী যুগকে জাহিলিয়া বলে অভিহিত করা হয়। আমরা এ যুগের রাজনৈতিক, সামাজিক, অর্থনৈতিক, সাংস্কৃতিক ও ধর্মনৈতিক অবস্থা সম্বন্ধে বিশদ আলোচনা করব।

জাহিলিয়া যুগে আরবদেশে বিশেষ করে উত্তর আরবে লেখার প্রচলন ছিল না বললেই চলে। ঐ সময় নানা রকম কিংবদন্তী, জনশ্রুতি, প্রবাদ ও কবিতা আরবদের মুখে মুখে প্রচলিত ছিল। এসব কাহিনী ও কবিতা হিজরী দ্বিতীয় ও তৃতীয় শতাব্দীর পূর্বে পুস্তকাকারে লিপিবদ্ধ হয়নি। এ কাহিনীগুলি অলীক ও কাল্পনিক হলেও এদের সাহায্যে জাহিলিয়া যুগের অবস্থা সম্বন্ধে মোটামুটি ধারণা করা যায়। উত্তর আরবে এ যুগের মাত্র তিনটি লিপি আবিষ্কৃত হয়েছে।

জাহিলিয়া যুগে আরবের বিভিন্ন গোত্র ও সম্প্রদায়ের লোকের মধ্যে সামান্য ঘটনা হতে বচসা, ঝগড়াঝাটি ও শেষ পর্যন্ত খুনাখুনি হয়ে যেত। এভাবে দু

রাজনৈতিক অবস্থা

গোত্রের মধ্যে একবার ঝগড়া বেধে গেলে পুরুষানুক্রমে তার জের চলতে থাকত। অন্যান্য গোত্রের লোকেরা নিজেদের সুযোগ ও সুবিধামত কোন না কোন দলে যোগদান করত। এভাবে যুদ্ধ বিরাট আকার ধারণ করত। ঝগড়ার সূত্রপাত সামান্য কারণেই হত। যেমন গবাদি পশু নিয়ে, চারণ ভূমি অথবা পানির কূপের অধিকার নিয়ে দু গোত্রের মধ্যে ঝগড়া বাধত। কোন কোন সময় ব্যক্তিগত মান অপমানের প্রশ্ন নিয়ে গোত্রীয় ঝগড়া শুরু হত। ঝগড়া ও যুদ্ধ-বিগ্রহ বহুদিন চলার পর উভয় পক্ষ যখন ক্লান্তি বোধ করত, তখন তৃতীয় পক্ষের মধ্যস্থতায় শান্তি স্থাপিত হত। যে পক্ষে অধিক লোক ক্ষয় হত, তারা প্রতিপক্ষ হতে ক্ষতিপূরণ স্বরূপ খুন-খেসারত লাভ করত। সাধারণ্যে প্রচলিত গীতি-গাঁথা ও উপকথায় এ সব যুদ্ধের কথা পুরুষানুক্রমে রক্ষিত হত। গোত্রের কবিরা এর কাব্যরূপ দান করত। নিজ নিজ গোত্রের প্রাচীন ইতিহাস, যুদ্ধবিগ্রহ ও বীর পুরুষগণের বিজয়-কাহিনী ইত্যাদি বিষয় নিয়ে তারা

উস্কানীমূলক কবিতা রচনা করত। এর ফলে আবার নতুন করে ঝগড়া-বিবাদের সূত্রপাত হত।

মদীনার বনু-আওস ও বনু খজ্‌রজের মধ্যে হিজরতের পূর্বে এরূপ যুদ্ধ-বিগ্রহ লেগেই ছিল। হিজরতের দু-এক বছর পূর্বে এদের মধ্যে বু-আসের যুদ্ধ সংঘটিত হয়। মদীনার ইহুদিগণ এবং বেদুঈন আরবগণ তাদের ব্যক্তিগত স্বার্থ অথবা খেয়াল খুশীমত উভয়পক্ষে যোগদান করেছিল। নবীজির বয়স যখন ১৫ হতে ২০ বছর ছিল, তখন নবীজির পরিবার ও বনু-হাওয়াজিনের মধ্যেও এরূপ যুদ্ধ ঘটে; এ যুদ্ধ নিষিদ্ধ মাসে ঘটেছিল বলে এটিকে ফিজারের যুদ্ধ বলা হয়। দক্ষিণ-পূর্ব আরবে পঞ্চম শতাব্দীতে বনু-বকর ও বনু-তগলিবের মধ্যে বসুসের যুদ্ধ ঘটে। বসুস ছিল বনু-বকরের এক বৃদ্ধার একটি উটনী। বনু-তগলিবের এক সর্দারের হাতে এ উটনীটি আহত হয়। এর ফলে এ দু গোত্রের মধ্যে রণ-দামামা বেজে ওঠে এবং এ যুদ্ধ চল্লিশ বছর কাল স্থায়ী হয়। অবশেষে হিরার শাসনকর্তা মুনজিরের মধ্যস্থতায় এ যুদ্ধের পরিসমাপ্তি ঘটে। মধ্য-আরবের বনু-আবাস ও বনু-জুবিয়ানের মধ্যেও এরূপ একটি যুদ্ধ ঘটে। এ যুদ্ধ ষষ্ঠ শতাব্দীর দ্বিতীয়ার্ধে আরম্ভ হয়ে ইসলাম ধর্ম প্রচারের পরেও চলতে থাকে। উক্ত দু সম্প্রদায়ের দুটি ঘোড়ার মধ্যে দৌড় প্রতিযোগিতাকে কেন্দ্র করে এ যুদ্ধ বাধে। আনতারা ইবন শাদ্দাদ নামক এক কবি ও বীরপুরুষ বনু-আবাসের পক্ষে এ যুদ্ধে যোগদান করেছিল। এভাবে রক্ত-ভিত্তিক পরিবার ও গোত্রগুলি পরস্পর কলহে লিপ্ত ছিল। আমরা পূর্বে দেখেছি, আরবের উত্তরে গাস্‌সান বংশ ও পূর্বে হিরার লখ্‌মী বংশের রাজাগণ যথাক্রমে বাইজান্টাইন ও পারসিক সাম্রাজ্যের প্রভাবাধীন ছিল। দক্ষিণে ইয়ামনে প্রথমে হাবশী শাসন ও পরে পারসিক শাসন প্রতিষ্ঠিত হয়। বিদেশীরা ইচ্ছে করলেই সমগ্র আরবদেশকেই দখল করে নিতে পারত কিন্তু আরবের মরুভূমি, এর অনুর্বরতা ও ভয়াবহতা যুগে যুগে বেদুঈনকে তার স্বাধীনতা রক্ষার্থে সাহায্য করেছিল।

সামাজিক অবস্থা

আগেই বলা হয়েছে, আরবের সমাজ ছিল রক্তভিত্তিক। কাল্পনিক অথবা প্রকৃত রক্ত-সম্পর্কের উপর প্রতিষ্ঠিত এ সমাজ-ব্যবস্থায় প্রত্যেক পরিবার, কওম ও কবীলার লোকেরা নিজেদেরকে অভিজাত বলে মনে করত। অপর পরিবার, কওম বা কবীলার লোককে তারা হীন বলে ভাবত। গোত্রীয় আভিজাত্য ও শ্রেষ্ঠত্ব প্রতিপন্ন করার জন্য তারা পুরুষানুক্রমে আপন আপন বংশ তালিকা সযত্নে রক্ষা করত। প্রাগ-ইসলামী যুগে আরবের পরিবারগুলো মাতৃপ্রধান ছিল। মাতাকে কেন্দ্র করে পরিবার গড়ে উঠত। কিন্তু হযরত মুহম্মদ (স)-এর জন্মের সময় মক্কায় ও পরে মদীনায় এ প্রথার পরিবর্তন হতে থাকে। সমাজের এ ভাঙ্গাগড়ার সময় পারিবারিক বন্ধন শিথিল হতে থাকে।

সমাজে স্ত্রীলোকের মর্যাদা হ্রাস পেতে থাকে। বহুবিবাহ প্রচলিত হয়। এক স্ত্রীলোকের একাধিক স্বামী থাকার দৃষ্টান্তও বিরল নয়। মেয়ে সন্তান জন্মানোকে আরবের লোকেরা অপমানজনক মনে করত। তাই তাদের মধ্যে মেয়ে সন্তান হত্যার প্রথা প্রচলিত হয়। মেয়েদের অবাধ চলাফেরার স্বাধীনতা থাকলেও সমাজে তাদের অধিকার সুরক্ষিত ছিল না। মেয়েকে বিবাহ দিয়ে আত্মীয়-স্বজনগণ যৌতুক আত্মসাৎ করত। * বিধবা ও এতিমদের সম্পত্তি আত্মসাতের কথাও কুরআনে বর্ণিত হয়েছে। পৃথিবীর অন্যান্য দেশের মত আরব দেশেও ঐযুগে দাসপ্রথা প্রচলিত ছিল। মনীবগণ দাসদাসীদের প্রতি অমানুষিক অত্যাচার করত। এটি ছাড়া মদ্যপান, জুয়াখেলা প্রভৃতি কুপ্রথাও আরবদেশে প্রচলিত ছিল।

আরবের অধিকাংশ লোক বেদুঈন ছিল। তারা মেষ, ছাগ, উট, অশ্ব প্রভৃতি পশু পালন করে জীবিকা নির্বাহ করত। এ সকল পশুর জন্য চারণভূমির অনুসন্ধানে তারা এক স্থান হতে অন্যস্থানে ঘুরে বেড়াত। দুর্দিনে অন্ন সংস্থানের অন্য উপায় না থাকলে তারা পণ্যবাহী উটের কাফেলার উপর আক্রমণ চালাত। কোন কোন বেদুঈন গোত্র সওদাবাহী উটের মালিকের নিকট হতে রক্ষা-কর আদায় করে তবে তার পথ ছেড়ে দিত। এছাড়া সমৃদ্ধিশালী জনপদ ও শহরের উপর বেদুঈনদের আক্রমণ ও লুণ্ঠন আরবের নিত্যনৈমিত্তিক ব্যাপার ছিল। আরবের মক্কা, মদীনা ও অন্যান্য শহরের জীবনযাত্রা বেদুঈনদের জীবনযাত্রা হতে পৃথক ছিল। বিশেষ করে মক্কায় তখন একটি ব্যবসায়ী সম্প্রদায় গড়ে ওঠে। মরুভূমির মধ্যস্থলে অবস্থিত হলেও মক্কার দুটি বিশেষ সুবিধা ছিল। দক্ষিণ আরব হতে সিরিয়া পর্যন্ত যে বাণিজ্যপথ চলে গিয়েছিল, মক্কা এর মধ্যস্থলে অবস্থিত ছিল। তাছাড়া প্রাচীনকাল হতে মক্কা নগরীতে কাবা নামক ধর্মমন্দির বিরাজিত ছিল। এ মন্দির সংলগ্ন অঞ্চলে যুদ্ধ বিগ্রহ ও মারামারি নিষিদ্ধ ছিল। লোকেরা নির্ভয়ে এখানে যাতায়াত করত। হযরতের চাচা আবু তালিব ও হযরতের প্রথমা পত্নী খাদিজা, বনু উমাইয়ার নেতা আবু সুফিয়ান ও মক্কার আরো অনেকে সিরিয়ায় পণ্যদ্রব্য পাঠিয়ে ব্যবসা-বাণিজ্য করতেন। ব্যবসা-বাণিজ্যের ফলে মক্কায় বিভিন্ন বণিক ও ব্যবসায়ীদের মধ্যে বিশেষ প্রতিযোগিতা আরম্ভ হয়। অনেকে বহু অর্থ-সম্পত্তির মালিক হয়। এ ব্যবসায়ী সম্প্রদায়ের মধ্যে তখন অর্থলিপ্সা বৃদ্ধি পায়। অল্পসংখ্যক লোকের হাতে

অর্থনৈতিক অবস্থা

---

* ছেলে-মেয়ের বিয়েতে টাকা-পয়সা ও বিভিন্ন মূল্যবান মালা-মাল অন্যায়ভাবে গ্রহণ করা হত।—গ্রন্থকার।

বহু অর্থ জমা হয়। এ নতুন সমৃদ্ধিশালী সম্প্রদায় পুরনো গোত্রীয় সহযোগিতা ও সহায়তার কথা বিস্মৃত হয়। তারা সমাজের অপেক্ষাকৃত দরিদ্র বা নিঃস্ব লোকদের প্রতি ঔদাসীন্য প্রদর্শন করে। অর্থ-সংগ্রহ ও জমা করে রাখা এদের জীবনের পরম ও চরম কাম্য বলে বিবেচিত হয়। কুরআনে তীব্র ভাষায় এরূপ অর্থগৃধ্নুতার নিন্দা করা হয়েছে। মদীনায় ইহুদিদের মধ্যেও সাধারণভাবে আরবের বণিক সম্প্রদায়ের মধ্যে কুসীদ প্রথা প্রচলিত ছিল।

সাংস্কৃতিক জীবন

আরবের তখনকার অবস্থা সংস্কৃতি চর্চার পরিপন্থী ছিল। অধিকাংশ লোক লেখাপড়া জানত না। কিন্তু গোত্রীয় চেতনা, যুদ্ধ-বিগ্রহ, আত্মম্ভরিতা ও আত্মশ্লাঘা এদেরকে কাব্য ও কবিতায় উদ্বুদ্ধ করেছিল। এরা মুখে মুখে কবিতা রচনা করত। প্রধান কবিদের কবিতা পুরুষানুক্রমে প্রচলিত ছিল। প্রাচীন আরবদের প্রতিভা এ কাব্যের ভাষায় বিকশিত হয়ে ওঠেছিল। জাহিলিয়া যুগের এসব কবিতার মাধ্যমে আরব-জীবনের বিভিন্ন দিক সম্বন্ধে বিশদভাবে জানা যায়। প্রবাদ আছে, "কবিতা আরবদের জীবন-আলেখ্য বিশেষ।" জাহিলিয়া যুগে যে সকল কবি বিশেষ প্রসিদ্ধি লাভ করেছিলেন, তাঁদের মধ্যে 'সবঅ'মুয়াল্লকাত' বা সাতটি সম্মানিত কবিতার লেখক সাতজন কবিই প্রসিদ্ধ। কথিত আছে, আরবের উকাজ নামক স্থানে অনুষ্ঠিত বাৎসরিক কাব্য প্রতি যোগিতায় পর পর শীর্ষস্থান অধিকারী সাতটি কবিতা কাবার প্রাচীর গাত্রে স্বর্ণাক্ষরে খোদিত করে দেয়া হয়েছিল। এ কবিতা রচয়িতাদের নাম ইমরুল কয়স, তরফা, আমর, হারিস, আনতারা, জুহায়র ও লবীদ। এদের মধ্যে ইমরুল কয়স সর্বশ্রেষ্ঠ বলে খ্যাত। তিনি মধ্য আরবের কিন্দা রাজপরিবারের অন্তর্ভুক্ত ছিলেন। বেদুঈন আরবদের বিভিন্ন গুণাবলি যথা, বীরত্ব, সৌজন্য, আতিথেয়তা, এসব কবিতায় প্রতিফলিত হয়েছে। তাছাড়া এদের অবাধ ও মুক্ত জীবনযাত্রা, যুদ্ধ, মদ্য ও নারীর প্রতি আসক্তি নিখুঁৎ ভাষায় কবিতায় চিত্রিত হয়েছে। যুদ্ধের সময় কবিদের কেউ কেউ অস্ত্রধারণেও সিদ্ধহস্ত ছিলেন। তবে এদের প্রধান কাজ ছিল স্বাজাত্যবোধকে জীবিত রাখা, যোদ্ধাদেরকে যুদ্ধে উৎসাহিত করা, নিজ নিজ গোত্রের সম্মান, প্রতিপত্তি ও আভিজাত্য প্রতিষ্ঠিত করা এবং প্রাচীন বীর পুরুষদের শৌর্যবীর্যের কাহিনী কাব্যে রূপ দান করা। মোটকথা জাহিলিয়া যুগের কবিতা ছিল আরবদের তৎকালীন জীবনযাত্রার একটি অনবদ্য ও নিখুঁৎ-আলেখ্য।

আরবগণ বছরের মধ্যে চার মাস অর্থাৎ মুহররম, রজব, জুলকাদা ও জুলহিজ্জা শান্তির মাস হিসেবে পালন করত। এ সময় তারা শাণিত অসি কোষবদ্ধ করে বিভিন্ন খেলাধুলা ও হাসিতামাশায় লিপ্ত হত। বিভিন্ন জায়গায় মেলা বসত। উকাজের মেলার কথা পূর্বে উল্লেখ করা হয়েছে। এসব মেলায় কাব্য-প্রতিযোগিতা, মল্লযুদ্ধ ইত্যাদি অনুষ্ঠিত হত। এছাড়া বিভিন্ন দেশী

পণ্যসামগ্রী বেচাকেনা হত। উকাজের মেলায় হযরত একবার ধর্মপ্রচারে প্রয়াসী হয়েছিলেন।

ইসলামের অভ্যুদয়ের বহু পূর্বে খ্রিস্ট ধর্ম ও ইহুদিধর্ম উভয়ই আরবদেশে প্রবেশ লাভ করে। ৩৫৬ খ্রিস্টাব্দে সম্রাট কনস্টান্টিয়াস দক্ষিণ-আরবে একজন ধর্মীয় খ্রিস্টান দূত প্রেরণ করেন। উক্ত দূত আদনে ও অন্যান্য স্থানে জীবনে কয়েকটি গীর্জা স্থাপন করেন। ইসলামের অভ্যুদয়ের সময় নাজরানে অনেক খ্রিস্টান বাস করত। ইহুদিধর্ম সম্ভবত খ্রিস্ট ধর্মের আগেই আরবে প্রবেশ লাভ করে। খ্রিস্টীয় ষষ্ঠ শতাব্দীতে ইয়ামনে ইহুদি ধর্মের বহুল প্রচার ঘটে, ফলে হিময়ার রাজবংশের শেষ রাজা জুনওয়াস ইহুদি ধর্মে দীক্ষিত হন। শুধু তাই নয় তিনি খ্রিস্ট ধর্মাবলম্বীদের উপর নির্যাতন আরম্ভ করেন। কিভাবে এ নির্যাতনের ফলে আরবে হাবশী শাসন প্রতিষ্ঠিত হয় তা পূর্বে বর্ণিত হয়েছে। নবীজির জন্মের সময় ইয়াস্রেবে (মদীনায়) অনেকগুলি ইহুদি সম্প্রদায় বাস করত। কিন্তু সমগ্র আরবের জনসংখ্যার তুলনায় ইহুদি ও খ্রিস্টানদের সংখ্যা নিতান্ত নগণ্য ছিল এবং বস্তুতান্ত্রিক বেদুঈনদের জীবনে এ দুটি ধর্মের প্রভাব নিতান্ত অকিঞ্চিৎকর ছিল।

বেদুঈনের ধর্ম ছিল মূলত প্রেতাত্মায় বিশ্বাসের ধর্ম। মরুভূমি ও মরুদ্যানের বৈপরীত্য তাকে প্রাচীনকাল হতে অনিষ্টকারী ও কল্যাণকামী দেবতার অস্তিত্বে আস্থাবান হতে শিক্ষা দেয়। বাল নামক দেবতা কূপ বা ফোয়ারার দেবতা ছিল। চন্দ্র ও নক্ষত্ররাজির পূজাও আরবদেশে প্রচলিত ছিল। পশুচারণ যাদের জীবিকা, তারা রাত্রিতে দলবল নিয়ে এক স্থান হতে অন্যস্থানে রওয়ানা করে, এজন্য চন্দ্র ও নক্ষত্রের আলো এদের জন্য মঙ্গলজনক। দক্ষিণ-আরবে ও অন্যান্য যে সব স্থানে কৃষিজীবী সম্প্রদায় বাস করত, তাদের মধ্যে সূর্যের পূজাও প্রচলিত ছিল। এছাড়া বৃক্ষ, প্রস্তর, পর্বতগুহা ইত্যাদির পূজাও আরবে প্রচলিত ছিল। ক্রমে আরবদের মধ্যে বিভিন্ন দেব-দেবীর মূর্তি পূজার প্রচলন হয়। হুবাল নামক দেবতা কাবার মন্দিরে প্রতিষ্ঠিত ছিল। এ দেবতার নিকট হতে তীর টেনে আরবগণ ভবিষ্যৎ কর্মপন্থা নির্ধারণ করত।

মক্কার প্রাচীনতম ও প্রধানতম উপাস্য ছিল আল্লাহ। দক্ষিণ আরবের দুটি লিপিতে আল্লাহ নামের উল্লেখ পাওয়া যায়। সিরিয়ার দুটি লিপিতে এ নামের উল্লেখ রয়েছে। কুরাইশ বংশের লোকদের কাছে আল্লাহ সৃষ্টিকর্তা ও পালনকর্তা নামে পরিচিত ছিল। হযরত মুহম্মদ (স)-এর পিতার নাম ছিল আবদুল্লাহ্। হিজাযের লোকেরা আল্-লাত, উজ্জা ও মানাত নামক তিনটি দেবীর পূজা করত। এদেরকে তারা আল্লার কন্যা বলে অভিহিত করত। তায়েফের দেবী ছিলেন আল-লাত। মক্কার লোকেরা ও অন্য লোকেরা সেখানে গিয়ে এ দেবীর নামে পূজা ও উৎসর্গাদি করত। মক্কার পূর্বে নাখলা নামক স্থানে প্রবল প্রতাপান্বিতা উজ্জা দেবীর মন্দির ছিল। এ দেবীর নামে মনুষ্য বলি দেয়া হত। বিখ্যাত কুরাইশ নেতা কুসাইয়ের একপুত্রের নাম ছিল 'আবদুল-উজ্জা'। মানাত ছিল ভাগ্যদেবী। মক্কা ও মদীনার মধ্যবর্তী কুদায়দ নামক স্থানে এ দেবীর মন্দির

ছিল। মদীনার আওস ও খজরজ বংশের লোকদের নিকট এ দেবী অতি প্রিয় ছিল।

আগেই বলা হয়েছে যে, আরব দেশে মক্কানগরীর প্রাধান্য দুটি কারণে স্বীকৃত হয়েছিল। প্রথমত, এর কাবা মন্দির ও দ্বিতীয়ত, ইয়ামন ও সিরিয়ার বাণিজ্য পথে এর অবস্থিতি। এ মক্কায় হযরত মুহম্মদ (স)-এর বংশ কুরাইশ ছিল অতীব প্রতিপত্তিশালী। হযরতের পঞ্চম উর্ধ্বতন পুরুষ কুসাইয়ের সময় কাবা মন্দিরের কর্তৃত্ব কুরাইশদের হাতে চলে আসে। কুসাই প্রকৃতপক্ষে মক্কা নগরীর প্রতিষ্ঠাতা। এ সময় মালা নামক একটি মন্ত্রণা সভার সাহায্যে মক্কা নগরীর শাসন পরিচালিত হত। বিভিন্ন গোত্রের প্রধানদের নিয়ে এ মন্ত্রণা-পরিষদ গঠিত হয়েছিল। কুসাইয়ের মৃত্যুর পর কাবার কর্তৃত্ব নিয়ে কুরাইশদের মধ্যে ঝগড়া-বিবাদ শুরু হয়। কুরাইশদের হাশিম গোত্রের সঙ্গে আবদ শাম্‌স্ (উমাইয়া) গোত্রের লোকদের তীব্র প্রতিদ্বন্দ্বিতা বিরাজিত ছিল। নবীজির দাদা আবদুল মুত্তালিব (হাশিমের পুত্র) কাবার রক্ষণাবেক্ষণের ভার প্রাপ্ত হয়ে জমজম কূপ পুনঃ খনন করেন।

মক্কা ও কাবার কর্তৃত্ব

নবীজির জীবন চরিত রচয়িতা ইব্‌ন ইস্‌হাক তৎকালীন চারজন ব্যক্তির নাম উল্লেখ করে বলেছেন যে, এরা প্রচলিত পৌত্তলিকতার ঘোরতর বিরোধী ছিলেন। এদের নাম ওয়ারাকা ইব্‌ন নওফল (খাদিজার পিতৃব্য পুত্র), উবায়দুল্লাহ ইবন জাহ্‌স্, উসমান ইবন হুওয়াইরিস, এবং জায়দ ইবন আমর। এঁদেরকে হানীফ নামে অভিহিত করা হয়েছে। ইবন ইসহাক আরও বলেন যে, এঁরা হযরত ইব্রাহীম (আঃ)-এর স্বভাবর্ধম হানীফিয়ার অনুসরণ করতে চেয়েছিলেন। এঁদের মতবাদ, ভাবধারা অথবা ধর্মমত সম্বন্ধে বিশেষ কিছুই জানা যায়নি। এঁদের মধ্যে কেউ কেউ পরে খ্রিস্টধর্মে দীক্ষিত হয়েছিলেন। এরা সংঘবদ্ধভাবে কোন মত প্রচারের চেষ্টা করেননি। তবে হানীফদের অস্তিত্ব প্রচলিত পৌত্তলিকতার বিরুদ্ধে বুদ্ধিজীবী সচেতন মনের বিদ্রোহ সূচিত করে। তাঁরা স্বাধীনভাবে আপন আপন বুদ্ধিদীপ্তির সাহায্যে স্রষ্টার একত্ব ও মহিমা উপলব্ধি করার প্রয়াস পেয়েছিলেন। জাহিলিয়ার নিরন্ধ্র অন্ধকারে এঁরা তাওহীদের ক্ষীণ প্রদীপ শিখা জ্বালাবার চেষ্টা করেছিলেন। আরবের এ আবহাওয়ায় পৃথিবীর অন্যতম ক্ষণজন্মা মহাপুরুষ ইসলামের নবী হযরত মুহম্মদ (স)-এর জন্ম হয়।

হানিফগণ

গ্রন্থনির্দেশ

১. পি. কে. হিট্টি ঃ *হিস্ট্রি অব দি এরাব্‌স্।*

২. নিকল্‌সন ঃ *লিটারারি হিস্ট্রি অব দি এরাব্‌স্।*

৩. খুদা বক্‌স্ ঃ *কন্ট্রিবিউশন টু ইসলামিক সিভিলাইজেশন,* প্রথম খণ্ড,কলিকাতা, ১৯২৭।

মধ্যপ্রাচ্য
ইসলামের অভ্যুদয়

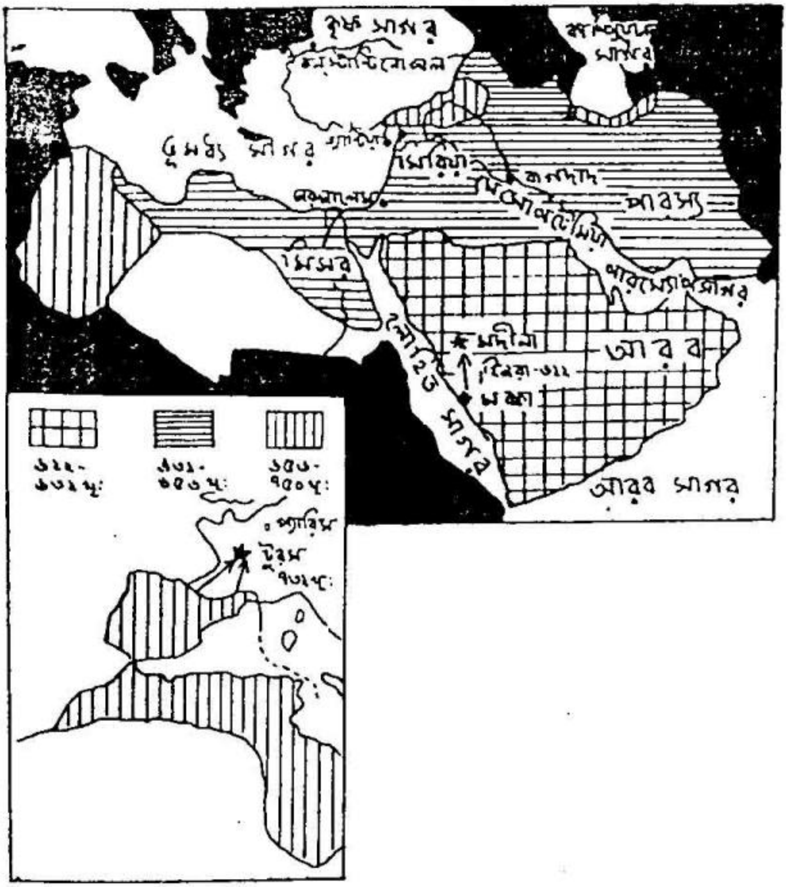

মধ্যপ্রাচ্য (ইসলামের অভ্যুদয়)

হযরত মুহম্মদ (স) ঃ মক্কায়

হযরত মুহম্মদ (স) ৫৭০ খ্রিস্টাব্দে মক্কার বিখ্যাত কুরাইশ বংশে জন্মগ্রহণ করেন। আরবের ইতিহাসে ঐ বছর 'হস্তীর বছর' নামে খ্যাত, কারণ ইয়ামনের

বাল্য ও যৌবন

হাবশী শাসক আবরাহা ঐ বছর একটি হস্তীসহ বিরাট সৈন্যবাহিনী নিয়ে মক্কা আক্রমণ করে। হযরতের পিতার নাম আবদুল্লাহ ও মাতার নাম আমিনা। তাঁর জন্মের কিছুকাল আগে তাঁর পিতা আবদুল্লাহ বাণিজ্যব্যপদেশে মদীনার নিকট ইন্তিকাল করেন। মক্কার অভিজাত সম্প্রদায়সমূহের তৎকালীন প্রচলিত প্রথা অনুসারে শিশুকালে হযরত মুহম্মদ (স)-কে মরুভূমির আবহাওয়ায় প্রতিপালিত হওয়ার জন্য হালিমা নাম্নী একজন ধাত্রীর তত্ত্বাবধানে সমর্পণ করা হয়। আনুমানিক দু বছর যাবৎ শিশু মুহম্মদ (স) হালিমার গৃহে তাঁরই স্তন্যে লালিত-পালিত হন। হযরতের বয়স যখন ছয় বছর তখন তাঁর মাতা আমিনা মৃত্যুমুখে পতিত হন। হযরতের দাদা আবদুল মুত্তালিব তাঁর প্রতিপালনের ভার গ্রহণ করেন। কিন্তু দু বছর পর তাঁর দাদাও পরলোকগমন করেন। তখন হযরতের পিতৃব্য আবু তালিব তাঁর তত্ত্বাবধানের ভার নিলেন। আবু তালিব মহান ও দয়ালু প্রকৃতির ছিলেন এবং মৃত্যু পর্যন্ত ভ্রাতুষ্পুত্রকে সুখে-দুঃখে সর্বতোভাবে সাহায্য করতে থাকেন।

মক্কার অপরাপর লোকের মত আবু তালিবও সিরিয়ায় পণ্যাদি নিয়ে ব্যবসা করতে যেতেন। হযরতের বয়স যখন বার বছর, তখন আবু তালিব একবার তাঁকে সিরিয়ায় নিয়ে গিয়েছিলেন। বালক মুহম্মদ (স) এ সর্বপ্রথম আরবের বাইরে পদার্পণ করেন। কথিত আছে, সিরিয়ায় বহিরা নামক একজন খ্রিস্টান সন্ন্যাসী হযরত মুহম্মদ (স)-কে দেখে তাঁর মধ্যে ভাবী শ্রেষ্ঠত্বের নিদর্শনসমূহ লক্ষ্য করেন এবং তাঁর প্রতি বিশেষ যত্নবান হতে আবু তালিবকে উপদেশ দেন।

পিতৃব্য আবু তালিবের গৃহে হযরতের জীবন অতিবাহিত হতে থাকে। আবু তালিবের আর্থিক অবস্থা খুব সচ্ছল ছিল না, সেজন্য কখনও ব্যবসায়ে অংশ গ্রহণ করে কখনও মেষাদি চরিয়ে তিনি পিতৃব্যকে সংসারযাত্রা নির্বাহ করতে সাহায্য করতেন। হযরতের বয়স যখন পনর হতে বিশ বছরের মধ্যে তখন কুরাইশদের সঙ্গে বনু-হাওয়াজিনের এক যুদ্ধ হয়। নিষিদ্ধ মাসে এ যুদ্ধ সংঘটিত হয়েছিল বলে এটিকে ফিজারের যুদ্ধ বলা হয়। এ সময় মক্কায় হিলফুল-ফুজুল অর্থাৎ পুণ্য-সংঘ নামে একটি সংঘ গঠিত হয়। দুর্বলকে সবলের বিরুদ্ধে সাহায্য করা,

বিধবা, এতিম অথবা বিপদগ্রস্ত আগন্তুককে সাহায্য করা ও যুদ্ধাদি প্রতিরোধ করা এ সংঘের উদ্দেশ্য ছিল। হযরত মুহম্মদ (স) এ সংঘ গঠনে বিশেষ উল্লেখযোগ্য ভূমিকা গ্রহণ করেন। পরবর্তী জীবনে তাঁর ধর্মীয় আদর্শ ও রীতিনীতির সাথে এ সংঘের নীতির বিশেষ মিল দেখতে পাওয়া যায়।

বিবাহ ও নবুয়ত লাভ

বাল্যকাল হতে হযরত মুহম্মদ (স)-এর বিশ্বস্ততা ও সততা সর্বজনবিদিত ছিল। খাদিজা নাম্নী মক্কার এক সদ্বংশজাতা ও ধনাঢ্যা বিধবা রমণী হযরতকে সিরিয়ায় তাঁর বাণিজ্য কাফেলা নিয়ে যাবার জন্য কর্মচারী নিযুক্ত করেন। পরিণত বয়সে হযরত পুনরায় সিরিয়ায় যাত্রা করেন। এতে তাঁর অনেক অভিজ্ঞতা লাভ ঘটে। তাছাড়া এ বাণিজ্যযাত্রায় খাদিজার অনেক অর্থাগম হওয়ায় তিনি হযরতের উপর বিশেষ সন্তুষ্ট হন। খাদিজা হযরতের চাচা আবু তালিবের নিকট হযরতের সাথে তাঁর বিবাহের প্রস্তাব উপস্থাপন করেন। এ সময় হযরতের বয়স ২৫ বছর ও খাদিজার বয়স আনুমানিক চল্লিশ বছর ছিল। যথারীতি তাঁদের বিবাহ সম্পন্ন হয়।

খাদিজার সাথে বিবাহ হযরতের জীবনে এক নতুন অধ্যায়ের সূচনা করে। বাল্যকাল হতে তাঁর জীবন নানা বিপর্যয় ও দুঃখ-দুর্দশার ভেতর দিয়ে অতিবাহিত হয়। জীবনে এই সর্বপ্রথম তিনি আর্থিক চিন্তা হতে মুক্তি লাভ করেন। কারণ মহিয়সী খাদিজা তাঁর সমুদয় সম্পত্তি হযরতের সুখ-স্বাচ্ছন্দ্যের জন্য উৎসর্গ করলেন। এ বিবাহ হযরতকে শুধু অর্থোপার্জনের দুশ্চিন্তা হতে নিষ্কৃতি দেয়নি বরং তাঁকে আপন স্বাভাবিক মনোবৃত্তি চরিতার্থ করতে সাহায্য করছিল। কারণ হযরত মুহম্মদ (স) বাল্যকাল হতে চিন্তাশীল ও ভাবুক প্রকৃতির ছিলেন। সুযোগ পেলেই তিনি নির্জনে বসে ধ্যান করতে ভালবাসতেন। বিবাহের পর তাঁর এ মনোভাব আরও বৃদ্ধি পেতে থাকে। তিনি মক্কার অদূরে হিরা নামক পর্বতের গুহায় ধ্যান করতে থাকেন।

বিবাহের পর পিতৃব্য আবু তালিবের প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশের জন্য হযরত মুহম্মদ (স) তাঁর পিতৃব্য পুত্র হযরত আলীকে আপন গৃহে রেখে প্রতিপালন করার ভার গ্রহণ করলেন। এ সময় হযরত আলীর বয়স ছিল ছয় বছর। খাদিজার জায়দ নামক একজন ক্রীতদাস ছিল। খাদিজা এ ক্রীতদাসকে হযরতের সেবার জন্য নিযুক্ত করলেন। হযরত জায়দকে দাসত্ব হতে মুক্তিদান করে তাকেও আপন পুত্রের মতো প্রতিপালন করতে লাগলেন। এভাবে দু পোষ্যকে নিয়ে তাঁদের সুখের দাম্পত্য-জীবন আরম্ভ হল। কালক্রমে তাঁদের দু-পুত্র ও চার কন্যা জন্মগ্রহণ করে। পুত্র দুটি তইয়ব ও তাহির শিশুকালেই মারা যায়। কন্যাগণের নাম জয়নব, রুকাইয়া, ফাতিমা ও উম্মে কুলসুম। এঁরা পিতার জীবনের মহৎ

ঘটনাবলি দেখবার সুযোগ পেয়েছিলেন। ফাতিমার সাথে হযরত আলীর বিবাহ হয়েছিল।

বিবাহের পরে ও নবুয়ত প্রাপ্তির আগে হযরত মুহম্মদ (স)-এর জীবনের একটি উল্লেখযোগ্য ঘটনা কাবার 'হাজরে আসওয়াদ' বা কৃষ্ণ-প্রস্তর সম্পর্কিত ঘটনা। হযরতের বয়স তখন পঁয়ত্রিশ বছর। কুরাইশ বংশের লোকেরা ঐ বছর কাবা ঘরের পুনঃনির্মাণ কার্যে ব্যাপৃত হল। বহুদিনের সংস্কারের অভাবে কাবা ঘরের অবস্থা জীর্ণ ও শোচনীয় হয়ে পড়ল। যথারীতি মেরামত কার্য সম্পন্ন হল। কিন্তু সবশেষে গোলমাল বাধল কৃষ্ণ-প্রস্তর যথাস্থানে সংস্থাপনের প্রশ্নটি নিয়ে। বিভিন্ন দলের দলপতিরা প্রত্যেকে চাইলেন পাথরটি সংস্থাপন করে সম্মানের অধিকারী হতে। এ সম্মান অর্জনে কেউই পশ্চাৎপদ হতে চাইল না। এ প্রশ্নে তাদের মধ্যে বচসা ও বিতর্ক আরম্ভ হয়ে যুদ্ধ-বিগ্রহ বাধবার উপক্রম হল। বহু বিতর্কের পর তাদের একজন বয়োজ্যেষ্ঠ ব্যক্তির পরামর্শে সাব্যস্ত হল যে, পরদিন প্রত্যুষে যে ব্যক্তি সর্বাগ্রে কাবাঘরে প্রবেশ করবে তার উপরই বিবাদ মীমাংসার ভার ন্যস্ত হবে। পরদিন ভোরে দেখা গেল, সর্বাগ্রে কাবাঘরে ঢুকলেন হযরত 'মুহম্মদ' (স)। "সততা ও বিশ্বস্ততার জন্য কুরাইশদের কাছে হযরত মুহম্মদ (স) ইতিপূর্বে 'আল-আমীন' (বিশ্বাসী) বলে পরিচিত হয়েছিলেন। তাঁকে দেখে তারা সমস্বরে চিৎকার করে বলে উঠল, "এ যে আল-আমীন, আমরা সন্তুষ্ট, এ যে 'মুহম্মদ'!" হযরত ব্যাপারটি শুনে তাঁদেরকে একটি চাদর আনতে বললেন। তিনি চাদর বিছিয়ে কৃষ্ণ-প্রস্তরটিকে নিজ হাতে তার ওপর রাখলেন আর বিভিন্ন যুযুধান গোত্রের লোকদেরকে চাদরের চারদিক ধরতে বললেন। পাথরটি যখন যথাস্থানে নীত হল তখন হযরত পুনরায় নিজহাতে পাথরটি সঠিক স্থানে বসিয়ে দিলেন। এ ভাবে হযরতের প্রত্যুৎপন্নমতিত্বের জন্য কুরাইশগণ আসন্ন যুদ্ধের কবল হতে পরিত্রাণ পেল।

হযরত মুহম্মদ (স)-এর বয়স যখন চল্লিশ বছর তখন তিনি নবুয়তের সম্মানে ভূষিত হলেন। কিছুকাল হতে হযরত মুহম্মদ (স) মক্কার অদূরবর্তী হেরা গিরি-গুহায় নির্জনে ধ্যান করে আসছিলেন। বিশেষ করে প্রতি বছর রমজান মাস তিনি এ ভাবে সম্পূর্ণ ধ্যান্-ধারণা ও প্রার্থনা-আরাধনায় যাপন করতেন এবং দীন-দুঃখীদের মধ্যে দান-খয়রাত করতেন। এভাবে যখন তাঁর বয়স চল্লিশ বছর পূর্ণ হল, তখন রমজান মাসের এক পবিত্র রাত্রিতে তিনি আল্লার বাণী লাভ করলেন। কুরআনের নিম্নলিখিত আয়াতগুলি তাঁর উপর অবতীর্ণ হল ঃ

"পড় তোমার প্রভুর নামে যিনি সৃষ্টি করেছেন,
যিনি জমাট রক্ত থেকে মানুষ সৃষ্টি করেছেন;

পড়, যেহেতু তোমার প্রভু মহানুভব,
যিনি কলম দিয়ে (জ্ঞান) শিখিয়েছেন,
মানুষ যা জান্ত না তাই তাকে শিখিয়েছেন।"

আধ্যাত্মিক অভিজ্ঞতার অভিনবত্বে হযরত মুহম্মদ (স) একাধারে অভিভূত ও আতঙ্কিত বোধ করলেন। তিনি গৃহে প্রত্যাবর্তন করে স্বীয় অভিজ্ঞতার কথা খাদিজার কাছে বিবৃত করলেন। খাদিজা তাঁকে অভয় দিয়ে বললেন যে, তিনি নবুয়তের সম্মান লাভ করেছেন। খাদিজা এটি করে ক্ষান্ত হলেন না। তিনি তাঁর এক পিতৃব্য-পুত্র ওয়ারাকা ইবন নওফলের কাছে গমন করলেন। প্রাচীন ধর্মশাস্ত্রে ওয়ারাকার বিশেষ ব্যুৎপত্তি ছিল। হযরতের অভিজ্ঞতার কথা শুনে ওয়ারাকা মহানন্দে চিৎকার করে বললেন, "পূর্ববর্তী পয়গম্বরদের মত মুহম্মদের নিকটও নামুস (জিব্রাইল) ফিরিশতা স্রষ্টার বাণী নিয়ে এসেছেন। মুহম্মদ তাঁর সম্প্রদায়ের নবী।" স্বল্পকাল বিরতির পর আবার হযরত আল্লার বাণী লাভ করলেন ঃ "হে মুজাম্মিল, ওঠ এবং ভয় প্রদর্শন কর" (সূরা মুদ্দাচ্ছির–৭৪ ঃ ১)। প্রথম ওহী লাভের তিন বছর পর (৬১৩ খ্রিঃ) তিনি এ বাণী লাভ করেন। তখন হতে তিনি সত্য প্রচার আরম্ভ করলেন।

ধর্মপ্রচার

হযরত মুহম্মদ (স) যে ধর্ম প্রচার করলেন, তার নাম ইসলাম। বহু দেবদেবীর প্রচলিত পূজার বিরুদ্ধে জেহাদ ঘোষণা করে তিনি লোকদেরকে স্রষ্টার একত্বে বিশ্বাস করবার জন্য উদাত্তকণ্ঠে আহ্বান জানালেন। মানব-সৃষ্টির মূলে সর্বশক্তিমান আল্লাহতায়ালার অসীম নৈপুণ্যের কথা তিনি ঘোষণা করলেন। আল্লাহ্ কিভাবে বিশ্ব প্রকৃতি সৃষ্টি করেছেন, এবং আকাশ ও পৃথিবীর সবকিছুই মানুষের খেদমতে নিয়োজিত করেছেন, তাও হযরত প্রচার করলেন। অসহায় মানুষের প্রতি আল্লাহতায়ালার অপার করুণার কথা তিনি বিশদভাবে বুঝিয়ে বললেন। এমন করুণাময় ও মহানুভব যে স্রষ্টা তাঁর প্রতি মানুষের কি কর্তব্য তাও তিনি নির্ধারিত করলেন। কৃতজ্ঞতা প্রকাশের চিহ্ন স্বরূপ মানুষ আল্লার ইবাদত করবে। এ ইবাদত সালাত বা নামাজের রূপ পরিগ্রহ করে। জাতি, বর্ণ নির্বিশেষে বিশ্ববাসিগণ সকলে কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে একই পংক্তিতে দাঁড়িয়ে নামাজ পড়বে। বাদশা-ফকির বা আমীর-গরিবে কোন ভেদাভেদ থাকবে না। আধ্যাত্মিক মূল্য ছাড়াও নামাজের মাধ্যমে মুসলমানদের মধ্যে শুরু হতেই ইমামের প্রতি আনুগত্য, নিয়মানুবর্তিতা ও শৃঙ্খলা শিক্ষা দেয়া হয়। জার্মান লেখক জোসেফ হেল নামাজকে "ইসলামের প্রথম কুছকাওয়াজের ক্ষেত্র' বলে বর্ণনা করেছেন।*

একত্ববাদ

ইবাদত ঃ নামাজ

* জার্মান লেখক জোসেফ হেলের উক্তি। –গ্রন্থকার অনূদিত।

স্রষ্টার একত্বের সঙ্গে সঙ্গে হযরত সার্বজনীন ভ্রাতৃত্বের আদর্শও শিক্ষা দিলেন। পরবর্তীকালে মদীনায় এ ভ্রাতৃত্বের আদর্শ আরও পরিস্ফুটভাবে মুসলমানদের জীবনধারায় বিকাশ লাভ করেছিল। হযরত প্রচার করলেন, মুসলমান মাত্রই ভাই-ভাই, তা সে যে কোন গোত্র, বংশ বা দেশেরই হোক না কেন। বিশেষ গোত্র বা বংশের আভিজাত্যের দাবি অস্বীকার করা হল। যে ব্যক্তি সদাচরণ করবে সেই আল্লার কাছে উচ্চ মর্যাদার অধিকারী হবে। হযরত মুহম্মদ (স) এভাবে আরবদের আভিজাত্যের মূলে চরম আঘাত হানলেন। সার্বজনীন ভ্রাতৃত্বের আদর্শকে প্রকৃত প্রস্তাবে সমাজ-জীবনে রূপায়িত করার জন্য জাকাতের ব্যবস্থা করা হল। ইসলাম ধর্মে জাকাত ঐচ্ছিক দান-খয়রাত নয়। এটি একটি বাধ্যতামূলক ধর্মীয় কর্তব্য। তদানীন্তন মক্কার ব্যবসাভিত্তিক সমাজে ধনিক সম্প্রদায়ের মধ্যে যে অতিরিক্ত বস্তু তান্ত্রিকতা প্রবল আকার ধারণ করেছিল এবং ধনিক সম্প্রদায় যেভাবে সমাজের দরিদ্র ও নিঃস্ব মানুষের প্রতি কর্তব্য বিস্মৃত হয়ে আত্মকেন্দ্রিক ও ভোগ-সর্বস্ব জীবন যাপন করছিল, তার বিরুদ্ধে হযরত সতর্কবাণী উচ্চারণ করলেন। কুরআনে এ সম্প্রদায়ের কঠোর নিন্দাবাদ করা হয়েছে। অর্থ সম্পদ মানুষের প্রতি করুণাময় আল্লাহতায়ালার বিশেষ দান। এর প্রকৃত অধিকারী আল্লাহ। মানুষ কিছু দিনের জন্য এর তত্ত্বাবধায়কমাত্র। তাই এ সম্পদের কিয়দংশ যতক্ষণ পর্যন্ত দরিদ্র ও দুঃস্থ মানবের কল্যাণে ব্যয়িত না হবে, ততক্ষণ মানুষ আল্লাহর প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশে বিমুখ থাকবে। আর্থিক উৎসর্গ ছাড়া আধ্যাত্মিক মুক্তি সম্ভব নয়। এ ধর্মীয় কর্তব্যকে "জাকাত" নামে অভিহিত করা হয়েছে। স্তূপীকৃত স্বর্ণরৌপ্য ও পূঞ্জীভূত অর্থসম্পদ মানুষের আত্মাকে কলুষিত করে আর জাকাত তার মনকে উদার ও পবিত্র করে। কৃপণতা ও অর্থগৃধ্নুতা ইসলামের দৃষ্টিতে অতীব দোষণীয় অপরাধ।*

সার্বজনীন ভ্রাতৃত্ব

যাকাত

হযরত শেষ বিচারের সাবধান বাণী উচ্চারণ করে বললেন যে, মানুষকে তার কৃতকর্মের জন্য স্রষ্টার নিকট জবাবদিহী হতে হবে। প্রত্যেক পুরুষ ও নারী ন্যায়, অন্যায় বা পাপ-পুণ্যের জন্য পুরস্কৃত বা শাস্তিপ্রাপ্ত হবে। ইসলামের উপরোক্ত মূলনীতি ও বিধি-ব্যবস্থা আরবের তৎকালীন রাজনৈতিক, ধর্মীয় ও সামাজিক ব্যাধিসমূহ নিরসন করে আরববাসীদেরকে সম্পূর্ণ নিরাময় করে তুলতে পারে এতে কোন সন্দেহ ছিল না; কিন্তু হযরতের জন্মভূমি মক্কা তথা হিজাযের অধিবাসীরা নানা কারণে এ ধর্মকে মেনে নিতে অস্বীকার করল। মানুষের সহজাত রক্ষণশীলতা কোন পরিবর্তনকে সহজে মেনে নিতে পারে না।

বিচারের দিন

ইসলাম প্রচার

* ইসলামের মূলনীতি ও বিধি-ব্যবস্থা। —গ্রন্থকার।

হযরত মুহম্মদ (স) মক্কায় আশৈশব মক্কাবাসীদের মধ্যে বড় হয়েছেন। তাঁকে একজন নবী ও নেতা বলে স্বীকার করতে অনেকেই নারাজ ছিল। সত্যবাদিতা ও ন্যায়পরায়ণতার জন্য তাঁর খ্যাতি চারদিকে পরিব্যাপ্ত হওয়া সত্ত্বেও তাঁর কাছ থেকে পিতৃপিতামহের ধর্মীয় আচরণের পরিপন্থী কোন কথা শুনতেই মক্কাবাসীরা ঘোরতর আপত্তি তুলল। এছাড়া কুরাইশ নেতাগণ ভাবল যে, ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করলে কাবার দেবদেবীর প্রাধান্য অস্বীকার করতে হয়, সেইসাথে কাবার নেতৃত্ব ও পৌরোহিত্যের ফলে তারা যে সব আর্থিক সুযোগ-সুবিধা ভোগ করত, তারও অবসান ঘটে। আবার ইসলামের সাম্যের বাণী মেনে নিলে গোত্রীয় আভিজাত্যের মূলে কুঠারাঘাত করা হয়। উল্লিখিত কারণে অতি অল্পসংখ্যক লোক নতুন ধর্মের প্রতি আকৃষ্ট হয়। প্রথম দীক্ষিতদের মধ্যে খাদিজা, আলী, আবুবকর, জায়দ, উসমান, যুবাইর, তালহা ও আবদুর রহমানের নাম বিশেষ উল্লেখযোগ্য। প্রতিপত্তিশালী আরব গোত্রের যুবক সম্প্রদায়ের মধ্য হতেও কিছু সংখ্যক লোক ইসলাম ধর্মে দীক্ষিত হয়েছিলেন। কাজেই সংখ্যা নগণ্য হলেও প্রাথমিক মুসলমানগণ প্রভাব-প্রতিপত্তিতে কোন অংশে কম ছিলেন না। অবশ্য ক্রীতদাস ও দরিদ্র শ্রেণীর কিছু লোকও ইসলাম ধর্মের প্রতি আকৃষ্ট হয়ে নানা অসুবিধা ও নির্যাতন সহ্য করেও নতুন ধর্মকে আঁকড়িয়ে ধরেছিলেন, কারণ ইসলামের সার্বজনীন শিক্ষা সকল শ্রেণীর লোকদেরকে প্রথম হতেই অনুপ্রাণিত করেছিল।

হযরত মুহম্মদ (স) প্রথমে তাঁর আত্মীয়-স্বজনদের কাছে ধর্মের বাণী শুনাতে মনস্থ করলেন। এ উদ্দেশ্যে তিনি একবার তাঁর পিতৃব্যগণকে একত্রিত করলেন। কিন্তু তিনি তাঁদেরকে কিছু বলবার আগেই আবু লাহাব (আবদুল মুত্তালিবের অন্যতম পুত্র) তাঁকে যাদুকর আখ্যায়িত করল এবং তাঁর ভ্রাতাগণ সভাস্থল ত্যাগ করে চলে গেল। হযরত প্রকাশ্যে ধর্মপ্রচার আরম্ভ করলেন। মূর্তিপূজার অসারতা ঘোষণা করতে লাগলেন। কুরাইশদের নেতাগণ সমবেত হয়ে হযরতের পিতৃব্য আবু তালিবের কাছে গেল এবং হযরতকে তাদের হাতে ছেড়ে দিতে বলল। আবু তালিব হযরতকে ডাকিয়ে কুরাইশ সর্দারদের কথা বললেন। হযরত এর উত্তরে বললেন, 'পিতৃব্য, আল্লাহ্‌র কসম, যদি তারা আমার ডান হাতে সূর্য ও বাম হাতে চন্দ্র এনে দেয় এবং তারপরিবর্তে আমাকে আমার পন্থা পরিত্যাগ করতে বলে তবুও আমি এ পথ ছাড়ব না, যতক্ষণ না আল্লাহ আমাকে জয়যুক্ত করেন অথবা এ পথে আমার বিনাশ সাধন হয়।" বলতে বলতে হযরতের দু চোখ অশ্রুতে পরিপূর্ণ হয়ে উঠল। আবু তালিব তখন তাঁকে অভয় দিয়ে বললেন, "তোমার যা খুশী প্রচার করে বেড়াও, আমি কোন অবস্থাতেই তোমার পক্ষ ত্যাগ করব না।" আবু তালিব বনু হাশিম ও বনু মুত্তালিবের লোকদেরকে ডেকে বললেন, তারা যেন নবীকে কুরাইশদের অত্যাচার হতে রক্ষা করে। একমাত্র আবু লাহাব ছাড়া আর সবাই তাঁর কথায় রাজি হল।

কুরাইশদের বিরোধিতা ও নির্যাতন

কুরাইশগণ তখন নির্বোধ লোকদেরকে হযরতের বিরুদ্ধে লেলিয়ে দিতে লাগল। এরা হযরতকে মিথ্যাবাদী, কবি, যাদুকর ও ভূতাবিষ্ট বলে গালি-গালাজ করতে লাগল। কুরাইশ বংশের বিভিন্ন গোত্রের লোকেরা আপন আপন গোত্রের মুসলমানদেরকে নানাভাবে নির্যাতন করতে লাগল। হযরত বিলাল জুমাহ্ বংশের একজন ক্রীতদাস ছিলেন। তাঁর মনিব তাঁকে মরুভূমির মধ্যে শুইয়ে বুকে পাথর চাপা দিয়ে খররৌদ্রে ফেলে রাখত। এ অবস্থায় বিলাল "আহাদ" "আহাদ" ("এক্ম, এক্ম") বলে চিৎকার করতেন। হযরত আবু বকর তাঁর একটি ক্রীতদাসের বদলে বিলালকে মুক্ত করে নিলেন। হযরত আবু বকর এভাবে আরও কয়েকজন মুসলমান ক্রীতদাস ও ক্রীতদাসীকে তাঁদের মনিবের কবল হতে মুক্ত করেছিলেন।

হযরতের বিরুদ্ধাচারীদের মধ্যে মখজুম গোত্রের আবু জহল ছিল সর্বপ্রধান। সে সবসময় মক্কাবাসীদেরকে মুসলমানদের বিরুদ্ধে উস্কিয়ে দিত। সে যখন শুনত কোন লোক মুসলমান হয়েছে, তখন সে যদি দেখত যে, সমাজে তার প্রভাব-প্রতিপত্তি রয়েছে এবং তার আত্মীয়-স্বজনরা তাকে রক্ষা করতে প্রস্তুত, তখন সে তার নিন্দাবাদ করত এবং বলত, "তুমি তোমার পিতার ধর্ম ছেড়েছ, অথচ তোমার পিতা তোমার চেয়ে ভাল ছিল। আমরা তোমাকে অর্বাচীন বলে ঘোষণা করব এবং নির্বোধ নামে কলঙ্কিত করব; এতে তোমার সুনাম সুখ্যাতি নষ্ট হবে।" নও-মুসলিম যদি সওদাগর হত, তবে সে বলত, "আমরা তোমার পণ্য বর্জন করে তোমাকে ভিখারী বানিয়ে ছাড়ব।" নব-দীক্ষিত সমাজে কোন প্রতিষ্ঠাবান ব্যক্তি না হলে, সে তাকে মারধর করত ও অপরাপর ব্যক্তিকে তার বিরুদ্ধে লেলিয়ে দিত। আবদ-শামস (উমাইয়া) গোত্রের নেতা আবু সুফিয়ানও হযরতের ঘোরতর বিরোধিতা করেছিলেন।

হযরত যখন দেখলেন যে, অত্যাচারের মাত্রা ক্রমেই বেড়ে যাচ্ছে, তখন তিনি মুসলমানদেরকে আবিসিনিয়ায় হিজরতের অনুমতি দিলেন। ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র দলে বিভক্ত হয়ে মুসলমানগণ আবিসিনিয়ায় চলে যান। এদের কেউ কেউ আপন আপন পরিবারসহ, আবার কেউ একাকীও গমন করেন। হযরত উসমান ও তাঁর স্ত্রী রুকাইয়াও (হযরত মুহম্মদ (স)-এর কন্যা) তাঁদের সঙ্গে গিয়েছিলেন। এভাবে সর্বমোট তিরাশিটি পরিবার আবিসিনিয়ায় গমন করে। এদের কেউ কেউ মদীনায় হিজরতের আগেই আবিসিনিয়া হতে মক্কায় ফিরে আসেন, অন্যরা খায়বারের যুদ্ধের আগে মদীনায় হযরতের সঙ্গে মিলিত হন। আবিসিনিয়ার খ্রিস্টান রাজা নাজ্জাশী মুসলমানদেরকে তাঁর রাজ্যে আশ্রয় দেন। এটি দেখে মক্কাবাসীরা তাদের দুজন প্রতিনিধিকে আবিসিনিয়ায় প্রেরণ করলেন। তারা নাজ্জাশীকে নানা উপঢৌকনে

আবিসিনিয়ায় হিযরত ৬১৫ খ্রিঃ

সন্তুষ্ট করে দলত্যাগী মুসলমানদেরকে পরিহার করতে বলল। নাজ্জাশী মুসলমানদের নেতা জাফর ইবন আবু তালিবকে ডেকে পাঠালেন। আবু তালিব রাজার সম্মুখে তাঁদের ইসলাম ধর্ম গ্রহণ, মক্কাবাসীদের অত্যাচার ও নতুন ধর্মের মর্মবাণী এমন প্রাণস্পর্শী ভাষায় বর্ণনা করলেন যে, রাজা তাঁদের প্রতি সহৃদয়তা প্রদর্শন করলেন এবং তাঁর রাজ্যে তাঁদেরকে বসবাসের অনুমতি দান করলেন। মক্কার প্রতিনিধিরা বিফল মনোরথ হয়ে ফিরে আসল। এ সময় হযরত উমর ইসলাম ধর্ম কবুল করেন। কথিত আছে, একবার তিনি হযরত মুহম্মদ (স)-কে হত্যা করবার উদ্দেশ্যে যাত্রা করেন। পথিমধ্যে তিনি শুনতে পেলেন, তাঁর ভগ্নী ও ভগ্নীপতি ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করেছে। তিনি ভগ্নীপতির গৃহে উপস্থিত হয়ে তাঁদেরকে মারধর করলেন। কিন্তু সেখানে কুরআনের কিছু অংশ পাঠ শুনে তিনি

উমরের ইসলাম গ্রহণ

অভিভূত হলেন এবং তাঁর ভগ্নী ও ভগ্নীপতির প্রতি কঠোর আচরণের জন্য গভীর অনুশোচনা প্রকাশ করলেন। তারপর তিনি হযরত মুহম্মদ (স)-এর কাছে গিয়ে ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করলেন। আবদুল্লাহ্ ইবন মাসুদ বলেছেন, "উমরের ইসলাম গ্রহণ একটি বিজয় বিশেষ, তাঁর মদীনায় হিজরত পরম সাহায্য এবং তাঁর সরকার খোদায়ী অনুকম্পা। তাঁর মুসলমান না হওয়া পর্যন্ত আমরা কাবাঘরে নামাজ পড়তে পারতাম না। মুসলমান হওয়ার পর তিনি কুরাইশদের সাথে লড়াই করলেন এবং সেখানে নামাজ পড়লেন এবং আমরাও তাঁর সাথে শরীক হলাম।"

কুরাইশ নেতারা যখন দেখল যে, আবিসিনিয়ায় মুহাজির মুসলমানগণ শান্তি ও নিরাপদে বসবাস করছে এবং উমর ও হামজার সাহস ও শৌর্যবীর্যে মক্কার মুসলমানরাও নির্ভয়ে দিন যাপন করছে, তখন তারা চরমপন্থা হিসেবে বনু হাশিম ও বনু মুত্তালিবকে সমাজচ্যুত করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করল। তারা আবু জহলের নেতৃত্বে সমবেত হয়ে একটি অঙ্গীকারপত্রে স্বাক্ষর করল এবং একে কাবাঘরে

বনুহাশিমের সমাজচ্যুতি ৬১৬ খ্রিঃ

ঝুলিয়ে রাখল। এ অঙ্গীকারপত্র অনুসারে তারা বনু হাশিমের (ও বনু মুত্তালিবের) সাথে সব সম্পর্ক বর্জন করবে (৬১৬ খ্রিঃ)। তারা তাদের সাথে কোন বৈবাহিক সম্পর্ক স্থাপন করবে না এবং সব ক্রয়-বিক্রয় বন্ধ করে দেবে। এ পন্থায় ক্ষুধা তৃষ্ণায় কষ্ট দিয়ে তারা মুসলমানগণকে ধর্মত্যাগে বাধ্য করবে। বনু হাশিম ও বনু মুত্তালিবের লোকেরা আবু তালিবের গলিতে গিয়ে তাঁর সাথে বসবাস আরম্ভ করল। আবু লাহাব হাশিম গোত্র ত্যাগ করে চলে গেল। সে এবং তার স্ত্রী উভয়ে মুসলমানদের ঘোরতর বিরোধিতা করতে আরম্ভ করল। কুরআনে এদের উপর অভিসম্পাত বর্ষিত হয়েছে। দুই বা ততোধিক বছর এভাবে বনু হাশিমের লোকেরা একঘরে হয়ে থাকল। অধিকাংশ সময় খাদ্য ও পানীয়ের অভাবে তাদেরকে বহু কষ্টে দিনাতিপাত করতে হত। কালক্রমে কুরাইশ নেতাগণ তাদের বর্জন-নীতির

বর্বরতা ও অসারতা বুঝতে পারল। আবার তাদের মধ্যে অনেকেই বনু হাশিমের সাথে বৈবাহিকসূত্রে আবদ্ধ ছিল। এরা গোপনে গোপনে বনু হাশিমকে খাদ্যাদি যোগাত। পরিশেষে এদেরই কয়েজনের প্রচেষ্টায় এ ব্যবস্থা প্রত্যাহার করা হল।

কুরাইশদের বর্জন-নীতি পরিহারের অল্পকাল পরেই হযরতের পিতৃব্য আবু তালিব পরলোক গমন করেন। ঐ বছরই হযরতের প্রিয়তমা পত্নী খাদিজা (রা)-এর ইন্‌তিকাল হয়। এরা উভয়ে হযরতের কর্মজীবনে নানাভাবে সহায়তা করেছিলেন। আবু তালিব ছিলেন প্রথম জীবনে হযরতের প্রতিপালনকর্তা ও পরবর্তীকালে তাঁর রক্ষাকর্তা। আবু তালিবের খাতিরেই বনু হাশিম কুরাইশদের যাবতীয় অন্যায় অত্যাচারের বিরুদ্ধে হযরতের পক্ষাবলম্বন করেছিলেন। ধর্মপ্রচারে হযরতের স্বাধীনতা ও সুযোগের পশ্চাতে ছিল এ গোত্রীয় সমর্থন। আবু তালিবের ভয়েই কুরাইশ নেতৃবৃন্দ হযরত ও তাঁর অনুসারীদের বিরুদ্ধে কোন চরম পন্থা অবলম্বন করতে সাহস পায়নি। তাই আবু তালিবের মৃত্যু হযরতের জীবনে এক নতুন অধ্যায়ের সূচনা করে। খাদিজা ছিলেন প্রকৃতই হযরতের সহধর্মিণী। ওহীলাভের প্রথম অবস্থায় এ মহিয়সী মহিলা হযরতের মনে আত্মবিশ্বাস সুদৃঢ় করে তাঁর জীবনে এক উজ্জ্বল ভবিষ্যতের ভিত্তি সুদৃঢ় করে তুলেছিলেন। সুখে দুঃখে তিনি ছিলেন হযরতের নিত্যসহচরী ও উৎসাহদাত্রী। এ দুটি মৃত্যু হযরতকে নানাদিক হতে বিপর্যস্ত করে তুলল। তাঁর কর্মজীবনে এটি একটি নতুন পরীক্ষা। আল্লাহ্‌র অপার করুণায় এ পার্থিব বিয়োগের পর পরই হযরত এক নতুন আধ্যাত্মিক মর্যাদায় ভূষিত হলেন। এর নাম মি'রাজ। এ মি'রাজের মাধ্যমে তাঁর বিয়োগবিধুর আত্মা মহাপ্রভুর অতি সন্নিধানে আধ্যাত্মিক মহাশান্তি লাভ করলেন।

শোকের বছর ৬১৯ খ্রিঃ

আবু তালিবের মৃত্যুর পর আবু লাহাব বনু হাশিম গোত্রের সর্দার নিযুক্ত হল। আবু লাহাব ইসলাম ধর্মের ঘোরতর শত্রু ছিল। এ সময় হযরতের উপর কুরাইশদের নির্যাতন বেড়ে গেল। দুষ্টু লোকেরা নামাজরত অবস্থায় হযরতের শরীরে পশুর নাড়িভূঁড়ি ছুঁড়ে মারত। একবার এক দুষ্টু লোক হযরতের মাথায় ধুলা ছুঁড়ে মারল। হযরতের এক কন্যা তাঁর মস্তক ধৌত করতে করতে বিলাপ আরম্ভ করলেন। হযরত তাঁকে সান্ত্বনা দিয়ে বললেন যে, আল্লাহ্ তাঁকে রক্ষা করবেন। তিনি আরও বললেন, "আবু তালিবের জীবদ্দশায় কুরাইশরা আমার সাথে কখনও এরূপ ব্যবহার করেনি।" এসব কারণে হযরত ধর্মপ্রচারের নতুন ক্ষেত্র খুঁজতে প্রয়াসী হলেন। তিনি প্রথমে মক্কার ষাট মাইল দক্ষিণ-পূর্বে অবস্থিত তায়িফ নগরীতে ইসলাম ধর্ম প্রচার করতে মনস্থ করলেন। তায়িফ মক্কা হতে

অপেক্ষাকৃত উর্বর এলাকায় অবস্থিত একটি বাণিজ্যকেন্দ্র ছিল। অবস্থাপন্ন মক্কাবাসীরা একে গ্রীষ্মাবাস হিসেবে ব্যবহার করত। তায়িফের অধিবাসী বনু সাকিফ মক্কার বনু হাশিম ও বনু উমাইয়ার সাথে আত্মীয়তা সূত্রে আবদ্ধ ছিল। কাজেই ইসলাম প্রচারের নতুন ক্ষেত্র হিসেবে হযরত এ তায়িফ শহরকে বেছে নিয়েছিলেন। তায়িফে হযরত কয়েকজন নেতৃস্থানীয় লোককে ইসলাম ধর্ম গ্রহণের আহ্বান জানান। কিন্তু এরা সকলে তাঁর আহ্বান প্রত্যাখ্যান করে। তায়িফের নেতারা শুধু হযরতকে প্রত্যাখ্যান করেই ক্ষান্ত হল না, তারা দুষ্ট লোকদের তাঁর বিরুদ্ধে লেলিয়ে দিল। এরা পাথর মেরে হযরতের দেহ রক্তাক্ত করে ফেলল। তায়িফ হতে বিফল মনোরথ হয়ে ফিরবার সময় হযরত নাখলা নামক স্থানে গভীর রাত্রিতে প্রার্থনায় নিমগ্ন হলেন। জীবনের এ সঙ্কটজনক মুহূর্তে হযরত পরম শক্তিমান আল্লাহতায়ালার নিকট পূর্ণ আত্মসমর্পণ করলেন। তারপর তিনি মক্কার দিকে রওয়ানা করেন। তিনি বুঝতে পারলেন যে, এবার মক্কায় সরাসরি প্রত্যাবর্তন তাঁর পক্ষে নিরাপদ হবে না। তাই তিনি কয়েকজন নেতৃস্থানীয় লোকের নিকট আশ্রয় প্রার্থনা করলেন। পরিশেষে নওফল গোত্রের মুতিম নামক একজন সর্দার তাঁকে আশ্রয় দিতে রাজি হলে তিনি স্বগৃহে প্রত্যাবর্তন করলেন।

তায়িফে ধর্ম প্রচার

এর পর হযরত হজ্বের সময় মেলা উপলক্ষে কয়েকটি আরব গোত্রের মধ্যে ধর্মপ্রচারের চেষ্টা করেন। কিন্তু তাঁর এ প্রচেষ্টাও ফলপ্রসূ হয়নি। ৬২০ খ্রিস্টাব্দে তিনি যখন এভাবে আকাবা নামক স্থানে ইসলাম প্রচার করতে গেলেন তখন মদীনা হতে আগত খজরজ গোত্রের কয়েকজন লোকের সাথে তাঁর সাক্ষাৎ হয়। তিনি তাদেরকে কুরআনের বাণী শুনালেন। তারা ছয়জন লোক তখন ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করল। ৬২১ সালে হজ্বের মওসুমে এদের মধ্যে পাঁচজন লোক আরও সাতজন লোককে সঙ্গে নিয়ে হযরতের সাথে পুনরায় আকাবায় মিলিত হয়। এদের মধ্যে আওস বংশের তিনজন লোক ছিল। এরা সকলে ইসলাম ধর্ম কবুল করল এবং বিভিন্ন পাপকর্ম পরিহার করতে অঙ্গীকারাবদ্ধ হল। একে আকাবার প্রথম অঙ্গীকার বলা হয়।

মদীনাবাসীদের সাথে যোগাযোগ

পর বছর (৬২২ খ্রিঃ) তেয়াত্তরজন পুরুষ ও দুজন স্ত্রীলোক আকাবায় হযরতের সাথে সাক্ষাৎ করে। এরা সবাই হযরতকে আপদে-বিপদে রক্ষা করার সকল দায়িত্ব গ্রহণ করার প্রতিশ্রুতি দান করল। এটিকে আকাবার দ্বিতীয় অঙ্গীকার বলা হয়। এভাবে হযরতের মদীনায় হিজরতের পথ সুপ্রশস্ত হল। এর পর হযরতের সাহাবাগণ চুপি চুপি মদীনায় হিজরত আরম্ভ করলেন। পরিশেষে হযরত মুহম্মদ হযরত আবু

হিজরত, ২৪ সেপ্টেম্বর, (৬২২ খ্রিঃ)

বকরকে সঙ্গে নিয়ে মদীনার পথে রওয়ানা হলেন। এটিই ইতিহাসে "হিজরত" নামে খ্যাত। তাঁরা নবুয়তের ত্রয়োদশ বর্ষের ১২ই রবিউল আউয়াল* (মোতাবেক ২৪ সেপ্টেম্বর, ৬২২ খ্রিঃ) মদীনার উপকণ্ঠে কুবা নামক স্থানে পৌঁছলেন। হযরত আলী হযরত মুহম্মদ (সঃ)-এর নিকট গচ্ছিত আমানতের জিনিসপত্র ফিরিয়ে দেয়ার জন্য তিন দিন মক্কায় অবস্থানের পর কুবায় এসে হযরত মুহম্মদ (স)-এর সাথে মিলিত হন। কুবায় হযরত মুহম্মদ (স) পৃথিবীর প্রথম মসজিদ প্রতিষ্ঠা করেন। মদীনায় হযরতের অনুসারীদের অনেকেই নিজ নিজ বাসস্থানে হযরতকে আতিথেয়তা দানের সৌভাগ্য অর্জন করতে চাইলেন, কিন্তু হযরত তাঁর মেজবান নির্বাচনের ভার আপন উটের উপর ছেড়ে দেন। উটটি হযরত আবু আইয়ুবের বাসগৃহের সম্মুখে গিয়ে জানু গেঁড়ে বসল। মদীনায় মসজিদে-নববী প্রতিষ্ঠা না হওয়া পর্যন্ত হযরত মহম্মদ (স) আবু আইয়ুব আনসারীর গৃহে অবস্থান করেন। অতঃপর তিনি মসজিদে-নববীর সংলগ্ন কুঠরীতে গমন করেন।

এভাবে হযরতের জীবনের প্রথম অধ্যায় সমাপ্ত হল। মক্কাবাসীদের বিরোধিতা, ধর্মের জন্য নির্যাতন ভোগ, ধর্মপ্রচারের জন্য কঠোর পরিশ্রম ও অশেষ ত্যাগ স্বীকার এবং অবশেষে জন্মভূমি মক্কা ত্যাগ তাঁর এ জীবনকে বৈশিষ্ট্য দান করেছে। তিনি এক্ষণে জীবনের পরিপূর্ণতার প্রথম ধাপে অবতীর্ণ হলেন। পরবর্তী জীবনের অভাবনীয় সাফল্য ও শ্রেষ্ঠত্ব অর্জনের যাবতীয় প্রস্তুতি এ মক্কা-জীবনেই সংসাধিত হয়েছে। জন্মভূমিতে পরিত্যক্ত নবী জন্মভূমির বাইরে সম্মানের আসন লাভ করলেন। যাঁরা নতুন ধর্মের খাতিরে হযরতের সাথে জন্মভূমির মায়া কাটিয়ে মদীনায় হিজরত করলেন, তাঁদেরকে মুহাজির (বাস্তুত্যাগী) বলে আখ্যায়িত করা হল। আর ধর্মের খাতিরে যারা এদের পুনর্বাসনের দায়িত্ব গ্রহণ করল সেই সকল মদীনাবাসী মুসলমানদেরকে আনসার (সাহায্যকারী) নামে অভিহিত করা হল। ইসলামের ভ্রাতৃত্বের মহান আদর্শ নতুন আবাসভূমি মদীনায় আনসার ও মুহাজিরগণের ভ্রাতৃত্ব বন্ধনের মধ্যদিয়ে বাস্তবায়িত হয়ে উঠল।

---

* ঐ বছরের চান্দ্রমাসের পহেলা মুহররম মোতাবেক ৬২২ খ্রিস্টাব্দের ১৬ জুলাই হতে হিজরী বর্ষ গণনা করা হয়। হযরত উমর (রা) হিজরী সালের প্রবর্তন করেন।

হযরত মুহম্মদ (স) ঃ মদীনায়

হিজরতের প্রাক্কালে মদীনার অবস্থা

মদীনা শহরের পূর্ব নাম ইয়াস্রেব ছিল। এ শহরে হযরতের পদার্পণের পর এর নাম হল 'মদীনাতুন্নবী' বা নবীর শহর। সংক্ষেপে এটি মদীনা নামেই পরিচিত হতে থাকে। মদীনায় এ সময় আওস ও খজরজ নামক দুটি প্রধান গোত্রের লোক বাস করত। এরা প্রাচীনকালে ইয়ামন হতে ইয়াস্রেবে এসে বসবাস করতে থাকে। কালক্রমে এরা এ শহরে সংখ্যাধিক্য লাভ করে এবং স্থানীয় লোকদের উপর প্রাধান্য বিস্তার করতে সমর্থ হয়। হযরতের সময় মদীনায় বহু সংখ্যক ইহুদি বাস করত। এদের মধ্যে বনু কুরাইজা, বনু নাজির ও বনু কাইনুকা প্রধান ছিল। আওস ও খজরজ গোত্রের লোকেরা প্রায়ই পরস্পর কলহে লিপ্ত হত। হিজরতের কয়েক বছর পূর্বে এদের মধ্যে বু'আসের যুদ্ধ সংঘটিত হয়। মদীনার আশেপাশের খর্জুর বাগান ও কর্ষণোপযোগী ভূমি এদের জীবিকার প্রধান অবলম্বন ছিল। কিন্তু গোত্রীয় কলহের ফলে তাদের আর্থিক জীবনে অনিশ্চয়তা বিরাজ করত। মক্কায় যেমন একশ্রেণীর ধনিক সম্প্রদায়ের অভ্যুত্থানের ফলে বেদুঈন সমাজ ব্যবস্থা ভেঙ্গে পড়ছিল তেমনি গোত্রীয় কলহ-বিবাদ মদীনার কৃষি প্রধান জীবনযাত্রায়ও অনিশ্চয়তার সৃষ্টি করেছিল। মক্কার অধিবাসীরা অনুরূপ অবস্থায় ইসলামের একতা ও সাম্যের বাণী অস্বীকার করল। তবে কি কারণে মদীনার লোকেরা ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করল? বিভিন্ন ঐতিহাসিক এর জন্য বিভিন্ন কারণ দর্শিয়েছেন। হযরত মুহম্মদ (স) মক্কাবাসীদেরই একজন ছিলেন। তাঁর নিকট হতে নতুন ধর্মের বাণী শুনতে তারা নারাজ ছিল। তাদের রক্ষণশীলতা ও গোত্রীয় আভিজাত্য নতুন ধর্ম গ্রহণের পথে প্রধান অন্তরায় ছিল। হযরতের নতুন ধর্ম-ভিত্তিক সমাজ-ব্যবস্থা গ্রহণের পূর্বে মক্কার অভিজাত সম্প্রদায়সমূহ পুরাতন গোত্রভিত্তিক সমাজ-ব্যবস্থাকে বাঁচিয়ে রাখবার জন্য শেষ বারের মত আত্ম-সচেতন হয়ে উঠল। মদীনা অপেক্ষা মক্কার গোত্রীয় আভিজাত্য অতি প্রাচীন ও একান্ত বদ্ধমূল ছিল। গতানুগতিক গোত্রীয় কলহ ও বিবাদের সমাধানের চেয়ে গোত্রীয়-ব্যবস্থাকে বাঁচিয়ে রাখবার চিন্তাই তাদেরকে পেয়ে বসল। অন্যপক্ষে আওস ও খজরজ বংশের লোকেরা তাদের সাম্প্রতিক কলহে নিজেদের ভবিষ্যৎ জীবনের নিরাপত্তা সম্বন্ধে আতঙ্কিত হয়ে উঠল। যে সামাজিক ব্যাধি তাদের জীবনযাত্রাকে বিপর্যস্ত ও পঙ্গু করে তুলছিল তার সমাধানের জন্যই যেন তারা ব্যাকুল হয়ে উঠল। তাই হজ্বযাত্রার সময় যখন তারা হযরতের মুখ থেকে একতা ও সাম্যের বাণী শ্রবণ করল, তখন তারা তাতে নিজেদের যাবতীয় সমস্যার

সমাধান খুঁজে পেল। তারা ভাবল, ইসলাম ধর্ম যেমন তাদের উচ্ছৃঙ্খল জীবনকে নিয়ন্ত্রিত করতে পারে, তেমনি হযরত-নবীর নেতৃত্ব তাদের নগরীতে একটি শান্তির রাজ্য স্থাপন করতে পারে। মক্কাবাসীরা যে জীর্ণ সমাজ-ব্যবস্থাকে জিইয়ে রাখবার জন্য হযরতকে প্রত্যাখ্যান করল, মদীনাবসীরা সে জীর্ণ ব্যবস্থাকেই ভেঙ্গে গড়বার উদ্দেশ্যে তাঁকে সমাদরে গ্রহণ করল। কোন কোন লেখকের মতে মদীনায় ইহুদিদের সান্নিধ্যের ফলে তওহীদবাদ ও নবুয়তের ধারণা সম্বন্ধে তারা পূর্বাহ্নেই অবহিত ছিল। আল্লার একত্ব ও হযরত মুহম্মদ (স)-এর নবুয়ত গ্রহণের মাধ্যমে তারা এক উজ্জ্বল সম্ভাবনাময় ভবিষ্যতের কথা চিন্তা করে ইসলামের বাণী গ্রহণ করল।

মদীনার গঠনতন্ত্র

মদীনায় পৌঁছে হযরত মুহম্মদ (সঃ) তাঁর অসাধারণ সাংগঠনিক প্রতিভার পরিচয় দেন। মক্কায় মুসলমান সম্প্রদায় ছিল সংখ্যায় নগণ্য, সমাজে অবহেলিত ও জানমালের নিরাপত্তার ভয়ে সবসময় আতঙ্কিত। মদীনায় এ অবস্থার আমূল পরিবর্তন ঘটে। মক্কা হতে আগত মুহাজির ও মদীনার আনসারগণ একই আদর্শে অনুপ্রাণিত এবং একই ভাবধারায় উদ্বুদ্ধ হয়ে এক একক ধর্ম-সম্প্রদায়ের সৃষ্টি করে। তারা হযরত মুহম্মদ (স)-এর নবুয়তে আস্থাবান ছিল। মদীনায় পৌঁছে হযরত তাঁর সম্প্রদায়ের আধ্যাত্মিক প্রয়োজন মিটাবার জন্য মসজিদে-নববীর প্রতিষ্ঠা করেন। এখানে শুক্রবারে জুমআর নামাজ প্রতিষ্ঠিত হয়। কিন্তু মদীনায় হযরতের আগমনের পূর্বে সর্বজন স্বীকৃত কোন শাসন-ব্যবস্থা ছিল না। মদীনায় পৌঁছার পর জনসাধারণের মধ্যে শান্তি ও নিরাপত্তার ব্যবস্থা করার দায়িত্বও তাঁর স্কন্ধে অর্পিত হয়। মুহাজির ও আনসারগণ ব্যতীত মদীনার অন্য অধিবাসীরা ছিল ইহুদি। তারা হযরত মুসা (আ)-এর প্রচারিত ধর্ম ও তওরাত কিতাবের অনুসারী ছিল। তারাও তওহীদবাদী ছিল। দূরদর্শী রাজনীতিকের মত হযরত বুঝতে পারলেন যে, এ ইহুদি সম্প্রদায়কে বাদ দিয়ে মদীনায় কোন নিরাপত্তা-ব্যবস্থা কায়েম হতে পারে না। তাই তিনি মুসলমান ও ইহুদিদের সমানাধিকারের ভিত্তিতে মদীনায় এক সরকার প্রতিষ্ঠার কাজে মনোযোগী হলেন। তওহীদপন্থী মুসলমান ও তওহীদপন্থী ইহুদিদের একই রাষ্ট্রের নাগরিক হিসেবে একত্র বসবাসের এক আদর্শ পন্থা তিনি উদ্ভাবন করেন। কিন্তু তওহীদপন্থী হলেও মুসলমান ও ইহুদিদের ধর্মীয় আচার-নিষ্ঠায় পার্থক্য থাকা একান্ত স্বাভাবিক। তাই ধর্মের ব্যাপারে হযরত ইহুদিদেরকে পূর্ণ ধর্মীয় স্বাধীনতা দান করেন। এ মর্মে তিনি একটি গঠনতন্ত্র ঘোষণা করেন।

এ গঠনতন্ত্রকে ঐতিহাসিকগণ "মদীনার গঠনতন্ত্র" বলে অভিহিত করেছেন। এ গঠনতন্ত্রের প্রধান প্রধান ধারাগুলি নিম্নে উল্লেখ করা হল ঃ

ইবন ইসহাক বলেন, 'আল্লার নবী আনসার ও মুহাজিরদের মধ্যে একটি দলিল লিখলেন, এতে তিনি ইহুদিদের সাথেও একটি সন্ধি ও অঙ্গীকার করলেন, তাদেরকে ধর্ম ও সম্পত্তিতে প্রতিষ্ঠিত করলেন এবং অধিকার ও কর্তব্য দান করলেন ঃ

"রহমানুর রহীম আল্লাহ্‌র নামে,

কুরাইশ ও ইয়াস্রেবের মুসলমানগণ ও যারা তাদেরকে অনুসরণ করে ও তাদের সাথে সংশ্লিষ্ট থেকে একত্রে যুদ্ধ করে, তাদের মধ্যে এটি নবী মুহম্মদ (সঃ)-এর একটি দলিল।"

■ "তারা অন্যান্য লোক হতে একটি পৃথক সম্প্রদায় (উম্মাহ্)।"

■ .... "আল্লাহ্‌র স্বস্তি-ব্যবস্থা (জিম্মাহ) এক ও অভিন্ন, ... বিশ্বাসিগণ অপরাপর লোকদের চেয়ে পৃথক থেকে পরস্পরকে রক্ষা করবে।"

■ "ইহুদিদের মধ্যে যে আমাদেরকে অনুসরণ করে, তার জন্য অনুরূপ সাহায্য ও সমর্থন থাকবে, যতক্ষণ বিশ্বাসীরা তার দ্বারা ক্ষতিগ্রস্ত না হয় এবং সে তাদের বিরুদ্ধে অন্যদেরকে সাহায্য না করে।"

■ "যখন আল্লাহ্‌র রাস্তায় যুদ্ধ হতে থাকে, তখন মুমীনদের (বিশ্বাসীদের) মধ্যে শান্তি অবিভাজ্য হবে। কোন মুমীন অন্য মুমীন হতে পৃথকভাবে শান্তি স্থাপন করতে পারে না। শুধু তাদের (মুমীনদের) মধ্যে সমতা ও ন্যায়বিচার রক্ষার বেলায় এর ব্যতিক্রম হবে।"

■ ....

"যখনই কোন বিষয়ে তোমাদের মধ্যে মতদ্বৈধ হয়, তখনই এটা আল্লাহ ও আল্লাহ্‌র রসূলের কাছে মীমাংসার জন্য সোপর্দ করা হবে।"

■ "ইহুদিগণ যুদ্ধ চলাকালে মুমীনদের সাথে এক সহযোগে যুদ্ধের খরচ বহন করবে।"

■ "বনু আউফের ইহুদিগণ মুমীনদের সঙ্গে একই সম্প্রদায়ভুক্ত। ইহুদিদের জন্য তাদের ধর্ম (দীন) এবং মুসলমানদের জন্য তাদের ধর্ম! একথা তাদের নিজেদের বেলায় যেমন প্রযোজ্য তাদের আশ্রিতের (মাওলা) বেলায়ও তেমন প্রযোজ্য। শুধু যে অন্যায় করেছে অথবা বিশ্বাসঘাতকতা করেছে তার বেলায় এর ব্যতিক্রম ঘটবে। ঐরূপ লোক তার নিজের ও পরিবারের উপর অমঙ্গল টেনে আনবে।"

■ .. .. "এই দলিলের অনুসারী লোকদের জন্য ইয়াস্রেব উপত্যকা পবিত্রভূমি স্বরূপ।"

■ "যখনই এ দলীলের লোকদের মধ্যে এমন কোন ঘটনা বা বিবাদ ঘটে যাতে বিপর্যয়ের সম্ভাবনা থাকে, তখন তা আল্লাহ্ ও আল্লাহ্র রসূলের কাছে মীমাংসার জন্য নেয়া হবে। আল্লাহ্ এ দলীলের সঠিক ও বিশ্বস্ত প্রতিপালক।"

■ "কুরাইশ ও তাদের সাহায্যকারীদেরকে কোন প্রতিবেশীসুলভ আশ্রয় দেয়া হবে না।"

■ "হঠাৎ যারা ইয়াস্রেব আক্রমণ করবে, তাদের বিরুদ্ধে এরা (এই দলীলের লোকেরা) পরস্পরকে সাহায্য করবে।" ....

মদীনা-গঠনতন্ত্রের তারিখ নিয়ে বিশেষজ্ঞদের মধ্যে মতভেদ রয়েছে। তবে অধিকাংশ সমালোচকের মতে হযরতের মদীনা আগমনের পর বদরের যুদ্ধের আগে এটা প্রচারিত হয়। গঠনতন্ত্রের প্রধান প্রধান ধারাগুলি মনোযোগের সাথে অধ্যয়ন করলে এর উদ্দেশ্য ও গুরুত্ব সম্পর্কে যথাযথ ধারণা করা যায়। দলিলটির প্রথম ওপ্রধান উদ্দেশ্য মদীনায় মুসলমান ও অমুসলমান উভয় সম্প্রদায়ের লোকদের মধ্যে সহজ সাধারণ পরিবেশ সৃষ্টি করে একটি যৌথ স্বস্তি-ব্যবস্থা কায়েম করা। এ স্বস্তি-ব্যবস্থার তিনটি ধাপ বিশেষ প্রণিধানযোগ্য। প্রথমত, মক্কা হতে আগত মুসলমানগণ ছিল এ স্বস্তি-ব্যবস্থার অন্তঃকরণস্বরূপ; দ্বিতীয় ধাপে ইয়াস্রেবের মুসলমানগণ তাদের সাথে মিলিত হয়ে ধর্মের ভিত্তিতে এক শক্তিশালী রক্ষা-ব্যবস্থা গড়ে তুলল। বংশ ও গোত্রের সীমারেখা অতিক্রম করে মুসলমানগণ পরস্পরকে রক্ষার ভিত্তিতে আল্লাহ্র স্বস্তি-ব্যবস্থায় অংশীদার হল। এর পর আর এক ধাপ অগ্রসর হয়ে হযরত ইহুদিদেরকে এ রক্ষা-ব্যবস্থায় সামিল করে নিলেন। এভাবে মদীনা-গঠনতন্ত্রের অনুসারীরা একটি উম্মাহ্ (সম্প্রদায়) বলে পরিগণিত হল। শেষোক্ত ধাপে এ উম্মাহ্কে একটি রাজনৈতিক বা সামাজিক দল বলে বিবেচনা করা যায়; কারণ মুসলমান ও ইহুদিদেরকে স্ব-স্ব ধর্মের স্বাধীনতা দান পূর্বক এ দলিলে স্পষ্ট উল্লেখ করা হয়েছে যে, "ইহুদিদের জন্য তাদের ধর্ম (দীন) এবং মুসলমানদের জন্য তাদের ধর্ম।"

মদীনা গঠন-তন্ত্রের গুরুত্ব

দলিলের অনুসারীদের কর্তব্যের মধ্যে কুরাইশদেরকে আশ্রয় না দেয়া, ইয়াস্রেব আক্রমণকারীর বিরুদ্ধে পরস্পরকে সাহায্য করা ও যুদ্ধের খরচপত্র বহন করা প্রভৃতির উল্লেখ করা হয়েছে।

মক্কার কাবা এলাকা যেরূপ আবহমান কাল হতে একটি পবিত্র স্থান (হারাম) বলে বিবেচিত হত, এ দলিলের শর্ত অনুযায়ী মদীনাকেও একটি পবিত্র স্থান বলে ঘোষণা করা হল।

ইহুদিদেরকে এ রক্ষা-ব্যবস্থার অন্তর্ভুক্তির ব্যাপারে আরও বলা হয়েছে যে, তাদের জন্য অনুরূপ সাহায্য ও সমর্থন থাকবে-যতক্ষণ বিশ্বাসীরা তাদের দ্বারা কোনরূপ ক্ষতিগ্রস্ত না হবে।

পরিশেষে ইহুদি ও মুসলমানদের মধ্যে কোন বিবাদ বা মতদ্বৈধ উপস্থিত হলে, হযরত মুহম্মদ (স) মধ্যস্থ নিযুক্ত হবেন। এভাবে গোত্রীয় প্রধানদের ওপর তাঁর একটি বিশেষ ক্ষমতা প্রতিষ্ঠিত হল। তাঁর এ পদমর্যাদা ভবিষ্যৎকালে তাঁকে সমগ্র আরবের অবিসম্বাদিত শাসনকর্তা হিসেবে স্বীকৃতি লাভে সাহায্য করেছিল।

মদীনায় প্রতিষ্ঠিত হওয়ার অল্পকালের মধ্যে দুটি প্রধান ধর্মীয় বিধি ইসলাম ধর্মকে বিশিষ্টতা দান করে। এগুলি যথাক্রমে আজান বা নামাজের জন্য আহ্বান এবং কিবলা বা নির্দিষ্ট দিকে মুখ করে নামাজ পড়া। মক্কায় দলবদ্ধভাবে (জমাতে) প্রকাশ্যে নামাজ পড়া নানা কারণে সম্ভব ছিল না। মদীনায় আসার পর দলবদ্ধভাবে নির্দিষ্ট সময়ে নামাজ পড়ার প্রয়োজন বিশেষভাবে অনুভূত হয়। সেজন্য বিশিষ্ট পদ্ধতিতে নামাজের জন্য আহ্বান করা জরুরি হয়ে পড়ে। হযরত এ ব্যাপারে সাহাবাদের সাথে পরামর্শ করেন। অনেকে অনেক রকম পদ্ধতির সুপারিশ করেন। ইহুদি ও খ্রিস্টান-পদ্ধতির কথাও কেউ কেউ উল্লেখ করেন। অবশেষে হযরত মুহম্মদ (স) হযরত উমর (রা)-এর পরামর্শে আজান-পদ্ধতি প্রবর্তন করেন। হাবশী মুসলমান হযরত বিলাল মদীনার মসজিদের প্রথম মুয়াজ্জিন নিযুক্ত হলেন। এ পদ্ধতিতে উচুঁ স্থান হতে সুললিত কণ্ঠে উচ্চৈঃস্বরে আল্লাহ্র নাম নিয়ে নামাজের জন্য আহ্বান করা হয়।

আজান

মক্কার কাবা শরীফ আরবদের অতি প্রাচীন ধর্মীয় কেন্দ্র। হযরত যখন ইসলাম প্রচার আরম্ভ করেন তখন কাবা পৌত্তলিকতার কেন্দ্র হয়ে ওঠে। তাই নামাজের সময় হযরত তওহীদপন্থী ইহুদি ও খ্রিস্টানদের প্রাচীনতম ধর্মকেন্দ্র জেরুজালেমের দিকে মুখ করে নামাজ পড়তেন। ইসলাম ধর্ম যখন মদীনায় প্রতিষ্ঠা লাভ করে, তখন কাবার দিকে মুখ করে নামাজ পড়ার আদেশ হয়। ইসলাম ধর্মের স্বাতন্ত্র্য ও বৈশিষ্ট্য অর্জনের পথে এটি একটি বলিষ্ঠ পদক্ষেপ। অন্যপক্ষে মদীনার ইহুদি সম্প্রদায়ের লোকেরা মুসলমানদের কিবলা পরিবর্তন সম্বন্ধে বিরূপ সমালোচনা আরম্ভ করে। এ উপলক্ষে কুরআনের ভাষায় স্পষ্ট ঘোষণা করা হয় যে, প্রার্থনার ব্যাপারে কিবলা অতি গৌণ ব্যাপার—পূর্ব বা পশ্চিম দিকে মুখ ফিরানোর মধ্যে কোন ধার্মিকতা নিহিত নেই। প্রকৃত ধার্মিকতা বিশ্বাসের গভীরতায় ও মানবীয় কল্যাণ-বিধানে। * [সূরা বাক্বারাহ - ২ ঃ ২২]

কিবলা পরিবর্তন

আজান ও কিবলার মত আরও দুটি ধর্মীয় অনুষ্ঠান রোজা ও হজ্ব প্রাথমিক মদীনা-যুগে ইসলামকে বৈশিষ্ট্য দান করে। দ্বিতীয় হিজরীতে রমজানের রোজা

* কুরআনের মর্মার্থ ঃ সুরা বাক্বারাহ — আয়াত ২ ঃ ২২।

রোজা ও হজ্ব

ফরজ করা হয়। এ বছরই মুসলমানগণ দলবদ্ধ হয়ে ঈদগাহে ঈদের নামাজও আদায় করে। বদরের যুদ্ধের পূর্বে মক্কায় হজ্ব পালনের আদেশ হয়। এর আগেও ব্যক্তিগতভাবে মুসলমানদের হজপালনের কথা শোনা যায়। আরবদের প্রাচীন ধর্মকেন্দ্র কাবা ও হযরতের জন্মভূমি মক্কা এভাবে ইসলামের প্রাণকেন্দ্র হয়ে ওঠে। অবশ্য বদরের যুদ্ধের পর মক্কাবাসীদের সাথে শত্রুতার কারণে মুসলমানদের পক্ষে হজ্ব পালন একরকম অসম্ভব হয়ে ওঠে।

মদীনায় পৌঁছার পর হযরত মুহম্মদ (স) দূরদর্শী রাজনীতিজ্ঞের মত বহিঃশত্রুর আক্রমণের বিরুদ্ধে যথেষ্ট সতর্কতা অবলম্বন করলেন। তিনি ও মুসলমানগণ রাত্রি জেগে শহর পাহারা দেন। এ ছাড়া তিনি মদীনার আশে-পাশে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র বাহিনী পাঠিয়ে বিভিন্ন বেদুঈন সম্প্রদায়ের সাথে অনাক্রমণ চুক্তি সম্পাদন করলেন এবং মক্কা ও সিরিয়ার বাণিজ্যপথে মক্কাবাসীদের জন্য বাধা সৃষ্টির প্রয়াস পেলেন। ইতিমধ্যে একবার মক্কার একজন সর্দার দলবলসহ মদীনায় মুসলমানদের চারণভূমিতে তাদের উটের পাল আক্রমণ করে। হযরত তাকে বহুদূর পর্যন্ত অনুসরণ করে পলায়নে বাধ্য করে। দ্বিতীয় হিজরীর রজব মাসে হযরত আবদুল্লাহ্ ইবন জহশকে আটজন লোকসহ মক্কা ও তায়িফের মধ্যবর্তী নাখলা নামক স্থানে প্রেরণ করেন এবং "কুরাইশদের অবস্থা পর্যবেক্ষণ ও সংবাদ দানের" আদেশ দেন। ঘটনাক্রমে ঐ সময় কুরাইশদের কয়েকজন লোক সিরিয়া হতে পণ্যদ্রব্য নিয়ে ফিরছিল। আবদুল্লাহ এদেরকে আক্রমণ করে আমর ইবন হাজরামী নামক এক ব্যক্তিকে নিহত করে ও অপর দুজনকে বন্দী করে। তাদের পণ্যদ্রব্যও আব্দুল্লার হাতে আসে। আবদুল্লাহ্ মদীনায় এসে এ ঘটনা বিবৃত করলে হযরত তাদেরকে এ বলে ভর্ৎসনা করলেন, "তোমাদেরকে যা করতে আদেশ দেয়া হয়নি, তোমরা তা করেছ এবং নিষিদ্ধ মাসে তোমরা যুদ্ধ করেছ, যার জন্য তোমাদের কোন প্রত্যাদেশ ছিল না।" এমন কি হযরত প্রথমত, গনীমতের মাল গ্রহণ করতেও অস্বীকার করেন।

বদরের যুদ্ধ (মার্চ ৬২৪ খ্রিঃ)

কারণ

নাখলার এ ঘটনাকে কেন্দ্র করেই কুরাইশ ও মুসলমানদের মধ্যে ঘোরতর যুদ্ধ বেধে ওঠে। এ সময় মক্কাবাসীদের এ বিরাট বাণিজ্য-কাফেলা আবু সুফিয়ানের নেতৃত্বে বহু মূল্যবান পণ্যদ্রব্যসহ সিরিয়া হতে প্রত্যাবর্তন করছিল। আবু সুফিয়ান মক্কায় খবর পাঠিয়ে দিল যে, মুসলমানগণ তার কাফেলা লুণ্ঠন করবার জন্য অগ্রসর হচ্ছে। এ সংবাদে তাদের মধ্যে রণ-দামামা বেজে উঠল। এদিকে হযরতের কানেও এসব খবর পৌঁছলে তিনি মুসলমানদেরকে নিয়ে একটি বৈঠকে

মিলিত হন এবং বিশেষ করে আনসারদের মতামত শুনতে চাইলেন। তারা প্রয়োজন হলে মক্কাবাসীদের মুকাবিলার জন্য তাদের সঙ্কল্পের কথা এক বাক্যে জানাল। দ্বিতীয় হিজরীর রমজান মাসে (মার্চ, ৬২৪ খ্রিঃ) হযরত ৩০০ জন মুসলমানের সাথে মদীনা হতে বের হয়ে এলেন। এদিকে মক্কাবাসীরা আবু জহলের নেতৃত্বে এক হাজার লোকের একটি বাহিনী নিয়ে মদীনার দিকে অগ্রসর হল। তারা বদরের নিকট শুনতে পেল যে, আবু সুফিয়ানের কাফেলা নিরাপদে প্রত্যাবর্তন করেছে। তখন যুদ্ধবিগ্রহ ও রক্তপাত নিরর্থক মনে করে কুরাইশদের দুটি সম্প্রদায় (জুহরা ও আদী) ফিরে এল। নাখলার দুর্ঘটনায় নিহত লোকের খুন-খেসারত মিটিয়ে দিয়ে তাদেরকে যুদ্ধ হতে নিরস্ত করবার জন্য একজন কুরাইশ সর্দার এগিয়ে এলেন, কিন্তু আবু জহল কৌশলে তাঁকে বারণ করে যুদ্ধের কারণ জিইয়ে রাখল এবং সম্পূর্ণ বাহিনীকে অগ্রসর হতে আদেশ করল।

দ্বিতীয় হিজরীর রমজান মাসে (মার্চ, ৬২৪ খ্রিঃ) বদরের যুদ্ধ সংঘটিত হয়। যুদ্ধের পূর্বরাত্রে হযরত বদরের নিকটবর্তী প্রায় সব পানির কূপ দখল করে নিলেন। কুরাইশগণ হযরতের প্রকৃত অবস্থিতি সম্বন্ধে অবগত ছিল না। যুদ্ধের দিন প্রত্যুষে হযরতকে কূপসমূহের কাছে দেখতে পেয়ে তারা প্রমাদ গুণল। প্রথমে দ্বন্দ্ব-যুদ্ধ আরম্ভ হল, উভয়পক্ষে তীর বিনিময় হল এবং তারপর রীতিমত যুদ্ধ আরম্ভ হল। মুসলমানদের প্রচণ্ড আক্রমণের সম্মুখে কুরাইশগণ পিছু হটে চলল। হযরত মুহম্মদ (স) তখন এক মুঠি নুড়ি-পাথর নিয়ে শত্রুর প্রতি ছুঁড়ে মারলেন এবং তাদেরকে প্রচণ্ডভাবে আক্রমণ করবার জন্য মুসলমানদেরকে আদেশ করলেন। মুসলমানগণ অমিততেজে সর্বশক্তি নিয়োগ করে কুরাইশদেরকে আক্রমণ করল। তারা সম্পূর্ণরূপে পরাজিত হল। আবু জহল সমেত বহু কুরাইশ সর্দার নিহত হল এবং অনেকে বন্দী হল। হযরত বন্দীদের প্রতি সদ্ব্যবহারের আদেশ দিলেন। এদের মধ্যে যারা বিত্তবান ছিল, তাদেরকে অর্থের বিনিময়ে মুক্তি দেয়া হল। যারা টাকা-পয়সার অভাবে মুক্তিমূল্য দিতে অপারগ হল হযরত পরিশেষে তাদেরকে এমনিই ছেড়ে দিলেন। মক্কাবাসীদের হৃদয় জয়ের জন্য এটি অত্যন্ত কার্যকরী হয়েছিল।

বদরের যুদ্ধে মুসলমানদের জয়ের কারণ বিশ্লেষণ করতে হলে বলতে হয়, এটি ছিল অবিশ্বাসের ওপর বিশ্বাসের জয়; অনিয়ম ও বিশৃঙ্খলার ওপর নিয়ম-শৃঙ্খলার জয়। মুসলমানগণ যুদ্ধ করছিল তাদের ধর্ম রক্ষার জন্য, যে ধর্মের জন্য তারা স্বদেশ, আত্মীয়-স্বজন ও ধন-সম্পদ পরিত্যাগ করেছিল। ইসলামের জন্য যুদ্ধে প্রাণদান করে শহীদ হলে পরকালে তাদের সুনিশ্চিত স্বর্গলাভ ঘটবে। এক উত্তম ও উত্তুঙ্গ জীবনাদর্শে উদ্বুদ্ধ হয়ে তারা প্রাণপণ যুদ্ধে ঝাঁপিয়ে পড়েছিল।

অন্যপক্ষে মক্কাবাসীদের অনেকেই শুধু জেদের বশবর্তী হয়ে মুসলমানদের প্রতি প্রতিহিংসা প্রবৃত্তি চরিতার্থ করবার জন্য যুদ্ধে নেমেছিল। কিন্তু তাদের মধ্যে একতার অভাব ছিল। মুসলমানগণ তওহীদপন্থী ও সার্বজনীন ভ্রাতৃত্বে বিশ্বাসী। হযরতের অবিসম্বাদিত নেতৃত্ব ও ধর্মের পথে একত্রে কষ্ট ও নির্যাতন ভোগ মুসলমানদেরকে একক ও অবিভাজ্য গোষ্ঠীতে পরিণত করেছিল। কুরাইশদের মধ্যে যুদ্ধক্ষেত্রে নিয়ম-শৃঙ্খলার অভাব ছিল। মুসলমানগণ হযরতের নেতৃত্বাধীনে সর্বক্ষণ নিয়ম-শৃঙ্খলা মেনে চলেছিল। তাঁর রণনৈপুণ্য ও সৈনাপত্য মুসলমানদের জয়ের আর একটি কারণ। এ সব কারণে সংখ্যায় নিতান্ত নগণ্য হলেও মনোবল ও শৌর্যবীর্যের পরাকাষ্ঠা প্রদর্শন করে মুসলমানগণ তিনগুণেরও বেশি শত্রুসৈন্যকে পর্যুদস্ত করে দিয়েছিল। শুধু যে সংখ্যায় মুসলমানগণ নগণ্য ছিল তা নয়, তাদের অস্ত্রবল ও সমর-সরঞ্জামও কুরাইশদের তুলনায় অনেক কম ছিল। কুরাইশদের সংখ্যাধিক্য ও সমর-প্রস্তুতির প্রাচুর্য তাদেরকে অতিমাত্রায় দাম্ভিক করে তুলেছিল। সংখ্যাধিক্য হেতু সুনিশ্চিত জয় অবধারিত মনে করে তারা মুসলমানদের শক্তি সম্পর্কে ভুল ধারণা করেছিল। পরিশেষে ঈমান, একতা ও শৃঙ্খলারই জয় হল।

ইসলামের ইতিহাসে বদরের যুদ্ধ এক অতি গুরুত্বপূর্ণ স্থান দখল করে রয়েছে। বিপুল সমর-সজ্জায় সুসজ্জিত বিরাট কুরাইশ বাহিনীর ওপর স্বল্পসংখ্যক মুসলমানের বিজয়কাহিনী দিকে দিকে বিঘোষিত হল। আরবের লোকেরা এ বিজয়কে অলৌকিক বিজয় বলে মনে করল। তাদের প্রত্যয় হল যে, ইসলাম সত্য ধর্ম এবং হযরতের নবুয়তে তারা আস্থাবান হল। তাদের আরও বিশ্বাস হল যে, খোদায়ী সাহায্যের ফলেই মুসলমানদের এ বিস্ময়কর বিজয় সম্ভবপর হয়েছে। বদরের বিজয়ের ফলে ইসলামের ভবিষ্যৎ যেমন দৃঢ় ভিত্তির ওপর সুপ্রতিষ্ঠিত হল, তেমনি এ যুদ্ধে মুসলমানদের পরাজয় ঘটলে কি অবস্থা হত, তাও ভেবে দেখবার মত। এ যুদ্ধে পরাজিত হলে ইসলামের ইতিহাস হয়ত ভিন্নভাবে লিখিত হত, হয়ত ইসলাম ও মুসলমানদের নাম ও নিশানা পৃথিবীর বুক হতে মুছে যেত।

ফল

বদরের শোচনীয় পরাজয়ের কথা মক্কায় পৌঁছলে মক্কাবাসীদের নিকট প্রথমে এটি অবিশ্বাস্য মনে হল। পরে এর যথার্থতা হৃদয়ঙ্গম করে তারা একাধারে বিস্মিত ও হতোদ্যম হয়ে পড়ল। আবু সুফিয়ান দেখল মদীনার রাষ্ট্র মক্কাবাসীদের সিরিয়ার বাণিজ্যের পথে প্রধান অন্তরায় হয়ে দাঁড়িয়েছে। এ অবস্থা বেশিদিন চললে তাদের অর্থনৈতিক জীবনে বিপর্যয় ঘনিয়ে আসবে। তাই মক্কাবাসীদের

ওহুদের যুদ্ধ (২৩ মার্চ ৬২৫ খ্রিঃ)

প্রাতশোধ স্পৃহা জিইয়ে রাখবার জন্য সে সব সম্ভাব্য ব্যবস্থা অবলম্বন করল। সে প্রস্তাব করল যে, বদরের যুদ্ধের আগে যে বাণিজ্য কাফেলা নিরাপদে ফিরে এসেছে, তার সম্পূর্ণ মুনাফা যুদ্ধের প্রস্তুতির জন্য ব্যয় করতে হবে। সে নিজে প্রতিজ্ঞা করল যে, যতক্ষণ মুহম্মদের বিরুদ্ধে যুদ্ধাভিযান করতে না পারবে, ততক্ষণ সে তৈল-প্রসাধনী ও স্ত্রীলোক স্পর্শ করবে না। কা'ব-উল-আশরাফ নামক কবি তার কবিতায় যুদ্ধে নিহত মক্কাবাসীদের জন্য শোক প্রকাশ করে মক্কাবাসীদের প্রতিহিংসা জাগিয়ে রাখল। বদরের যুদ্ধের দশ সপ্তাহ পরে আবু সুফিয়ান তার প্রতিজ্ঞা রক্ষার্থে দু শত লোকসহ মদীনা আক্রমণ করল। ইহুদি নাজির গোত্রের একজন লোক আবু সুফিয়ানকে আশ্রয় ও সাহায্য দান করল। আবু সুফিয়ান দুটি ঘর পুড়িয়ে ও কয়েকটি শস্যক্ষেত্র নষ্ট করে মক্কায় ফিরে এল। পথিমধ্যে সে বোঝা হালকা করবার জন্য কিছু বার্লি ফেলে গিয়েছিল। তাই এ যুদ্ধকে 'বার্লির যুদ্ধ' বলা হয়।

অবশেষে মদীনা আক্রমণের জন্য একটি বিরাট বাহিনী গঠন করা হল। ৬২৫ খ্রিস্টাব্দের ১১ মার্চ মক্কাবাসীরা ৩০০০ সৈন্যের সুসজ্জিত বাহিনীসহ মদীনার দিকে যাত্রা করল। তাদের সঙ্গে ৭০০ বর্ম, ৩০০০ উট ও ২০০ অশ্ব ছিল। এ বিশাল বাহিনীর প্রধান সেনাপতি ছিল আবু সুফিয়ান। ২১ মার্চ তারা মদীনায় পৌছাল এবং ওহুদ পর্বতের নিকটে তাঁবু গাঁড়ল। তারা তাদের পশু চরিয়ে মদীনাবাসীদের শস্যক্ষেত্র নষ্ট করল। হযরত মুহম্মদ (স) একটি পরামর্শ সভা ডাকলেন। হযরত ও অন্যান্য প্রবীণ লোকেরা মদীনায় থেকে শত্রুদের আক্রমণ প্রতিহত করার পক্ষপাতী ছিলেন। আবদুল্লাহ্ ইবন উবাই নামক মদীনার নেতাও এ মতের পক্ষপাতী ছিলেন। কিন্তু যুবসম্প্রদায় শহর হতে বের হয়ে শত্রুদের মুকাবিলা করতে আগ্রহ প্রকাশ করল। হযরত পরিশেষে শেষোক্ত মতের পক্ষে রায় দিলেন। কিন্তু আবদুল্লাহ্ ইবন উবাই কিছুদূর অগ্রসর হওয়ার পর দলবলসহ হযরতের পক্ষ ত্যাগ করে মদীনায় ফিরে এল। হযরত ওহুদের পাদদেশে সৈন্য সমাবেশ করলেন। মুসলিম বাহনীর বাম পার্শ্ব আবদুল্লাহ ইবন জুবাইরের নেতৃত্বে পঞ্চাশজন তীরন্দাজ দ্বারা সুরক্ষিত ছিল। হযরতের পক্ষে সর্বমোট ৭০০ জন লোক যুদ্ধে যোগদান করেছিল। হযরত শুভ্র পোশাক পরিহিত ৫০ জন তীরন্দাজকে নির্দিষ্ট স্থানে দাঁড় করিয়ে নিম্নলিখিত উপদেশ দিলেন, "শত্রুর অশ্বারোহীকে তীর নিক্ষেপ করে দূরে রাখবে এবং যুদ্ধ আমাদের অনুকূলে বা প্রতিকূলে হউক, কোন অবস্থাতেই তোমরা শত্রু সৈন্যকে পশ্চাদ্দিক হতে আসতে দিও না। তোমরা যথাস্থানে অবস্থান করবে যেন তোমাদের দিক হতে শত্রু আমাদের নাগাল না পায়।"

তেইশে মার্চ যুদ্ধ আরম্ভ হল। মদীনাবাসীদের প্রচণ্ড আক্রমণে মক্কাবাসীরা পশ্চাদপসরণ করল। পরাজয় সুনিশ্চিত ভেবে মুসলমানগণ বেসামাল হয়ে পড়ল। এমন কি তীরন্দাজদের অনেকে গনীমতের আশায় স্থান ত্যাগ করে যুদ্ধে ঝাঁপিয়ে পড়ল। ইত্যবসরে মক্কাবাসীরা খালিদ ইবন ওয়ালিদের নেতৃত্বে মুসলমানদেরকে পার্শ্ব ও পশ্চাদ্দিক হতে প্রচণ্ড আক্রমণ করল। তখন মুসলমানদের মধ্যে ঘোর বিশৃঙ্খলা দেখা দিল। গুজব রটে গেল যে, হযরতের মৃত্যু হয়েছে। প্রকৃতপক্ষে তিনি আহত হলেন এবং তাঁর একটি দাঁত ভেঙ্গে গেল। মুসলমানদের একটি দল মূল বাহিনী হতে বিচ্যুত হয়ে প্রায় নিশ্চিহ্ন হয়ে গেল। হযরত বাকি লোকদেরকে ওহুদের পাদদেশে একত্রিত করে তাদের মধ্যে শৃঙ্খলা ফিরিয়ে আনলেন। মক্কাবাসীরা অবশেষে সৈন্যবাহিনী উঠিয়ে প্রস্থান করল। এ যুদ্ধে হযরত হাম্‌জা-সহ অনেক (৬৫জন) মুসলিম বীর পুরুষ শাহাদত বরণ করেন। আর কুরাইশদের বাইশজন লোক নিহত হয়।

ওহুদের যুদ্ধ মুসলমানদের জন্য একাধারে এক চরম পরীক্ষা ও বিষম বিপর্যয়। কিন্তু হযরতের বলিষ্ঠ নেতৃত্ব ও সমর কুশলতার গুণে তিনি শীঘ্রই মুসলমানদের মধ্যে শৃঙ্খলা ও মনোবল ফিরিয়ে আনলেন। অন্যপক্ষে মুসলমানদের এত ক্ষয়ক্ষতি সত্ত্বেও ওহুদের যুদ্ধকে মক্কাবাসীদের নিরঙ্কুশ বিজয় বলা যায় না। মদীনার মুসলমান সম্প্রদায়কে নির্মূল করবার জন্য তারা যে স্বপ্ন দেখছিল, তা বিন্দুমাত্রও সফল হল না। তাদের ক্ষয়ক্ষতিও কম হয়নি। এজন্য তাদের মনোবল নষ্ট হয়ে গিয়েছিল এবং মদীনা শহর আক্রমণ না করেই তারা মক্কায় প্রত্যাবর্তন করল।

বদরের যুদ্ধের পর বনু কাইনুকা নামক ইহুদি গোত্রের সঙ্গে মুসলমানদের বিবাদ ঘটে। কয়েকজন ইহুদি বাজারে একজন মুসলমান মহিলাকে অপমান করে। এতে উত্তেজিত হয়ে একজন মুসলমান একজন ইহুদিকে হত্যা করে। ইহুদিরাও প্রতিশোধ হিসেবে উক্ত মুসলমানকে হত্যা করে। এ কারণে ইহুদি ও

ইহুদিদের বিরুদ্ধে শাস্তিমূলক ব্যবস্থা

মুসলমানদের মধ্যে যুদ্ধ হয় এবং যুদ্ধে ইহুদিরা পরাজিত হয় এবং হযরত তাদেরকে মদীনা হতে নির্বাসিত করেন। ওহুদের যুদ্ধের কয়েক মাস পর ইহুদিদের বনু নাজির গোত্রের সাথেও মুসলমানদের যুদ্ধ বাধে। তারা হযরতকে হত্যা করার জন্য ষড়যন্ত্র ফাঁদছিল। এটি বুঝতে পেরে তিনি বনু নাজিরকে শান্তিপূর্ণভাবে দশদিনের মধ্যে মদীনা ত্যাগ করে চলে যেতে বললেন। কিন্তু তারা তাঁর কথা অমান্য করে মুসলমানদের সঙ্গে যুদ্ধে অবতীর্ণ হল। যুদ্ধে তাদের পরাজয় হল এবং তাদেরকে খাইবারে নির্বাসিত করা হল।

খন্দকের যুদ্ধ বা পারখার যুদ্ধ মদীনার মুসলিম রাষ্ট্র ধ্বংসের জন্য মক্কাবাসীদের চরম প্রচেষ্টার ফল। তারা সর্বশক্তি নিয়োগ করে বহু গোত্রের সমন্বয়ে এক বিরাট দল গঠন করল। খাইবারে নির্বাসিত বানু নাজির গোত্রের ইহুদিরাও এ দল গঠনে সক্রিয় অংশ গ্রহণ করল। তারা বনুগাতফানকে এ মর্মে প্ররোচিত করল যে, যদি বনুগাতফান মক্কাবাসীদের সঙ্গে মদীনা আক্রমণে যোগ দেয়, তা হলে খাইবারের খর্জুর ফসলের অর্ধেক তাদেরকে দেয়া হবে। আবু সুফিয়ানের নেতৃত্বে গঠিত মক্কাবাসীদের সম্মিলিত বাহিনীতে মোট ১০,০০০ সৈন্য সংগৃহীত হল। বনু গাতফান ছাড়া সুলাইম, আসাদ ও অন্যান্য গোত্রের লোকেরাও নিজ নিজ অস্ত্রশস্ত্র ও জনবলসহ কুরাইশদের সঙ্গে যোগদান করল। কুরাইশ ও গাতফান উভয় সম্প্রদায়ের ৩০০ করে অশ্ব ছিল। এ বিরাট বাহিনীর মুকাবিলা করার জন্য হযরত মুহম্মদ (স) ৩০০০ লোক সংগ্রহ করলেন। বস্তুত বনু কুরাইজার ইহুদিগণ ও মুনাফিকগণ ব্যতীত মদীনার প্রায় সব মুসলমানই এ যুদ্ধে শরীক হয়েছিলেন।

খন্দকের যুদ্ধ মার্চ ৬২৭ খ্রিঃ

মক্কাবাসীদের যুদ্ধযাত্রার সংবাদ পেয়েই হযরত বিশেষ সতর্কতামূলক ব্যবস্থা অবলম্বন করলেন। অশ্বারোহীদের আক্রমণ প্রতিহত করার জন্য তিনি মদীনার উত্তর দিকে একটি পরিখা (খন্দক) খনন করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করলেন। একজন পারসিক সাহাবী সালমান হযরতকে এ ব্যাপারে উপদেশ ও পরামর্শ দান করেছিলেন। হযরত মুসলমানদের সাহায্যে ছয়দিন ধরে অক্লান্ত পরিশ্রমের পর পরিখা খনন সমাপ্ত করলেন। অতঃপর তিন সহস্র মুসলমানকে নিয়ে তিনি সল পাহাড়ের পাদদেশে শিবির স্থাপন করলেন। তাঁদের ও শত্রুবাহিনীর মধ্যে ছিল নব-নির্মিত পরিখা। স্ত্রীলোক ও ছেলেমেয়েদেরকে শহরের নিরাপদ স্থানে রেখে দেয়া হল। মক্কাবাসীরা পরিখা অতিক্রম করার জন্য রাতে বহুবার চেষ্টা করল কিন্তু মুসলমানদের বিরামহীন অতন্দ্র প্রহরার জন্য কৃতকার্য হতে পারল না। তারা বনু কুরাইজার সঙ্গে ষড়যন্ত্র করে মুসলমানদেরকে পশ্চাদ্দিক হতে ব্যতিব্যস্ত রাখবার প্রয়াস পেল কিন্তু বনু কুরাইজা যুদ্ধের সময় সক্রিয় সহযোগিতা হতে বিরত রইল। পরিখার দিক হতে যতবার মক্কাবাসীরা আক্রমণ চালাল, ততবারই তারা প্রতিহত হয়ে ফিরে গেল। একপক্ষকাল এভাবে কাটিয়ে তারা পরিশ্রান্ত হয়ে পড়ল। কৃতকার্যতার আশু সম্ভাবনায় নিরাশ হয়ে ধীরে ধীরে বেদুঈন গোত্রসমূহ তাদের দল হতে খসে পড়তে লাগল তদুপরি ঝড় ও শীতে কাবু হয়ে তারা ছাউনী উঠিয়ে মক্কায় প্রত্যাবর্তন করল। তাদের অশ্বারোহী বাহিনী পরিখায় বাধাপ্রাপ্ত হয়ে অকর্মণ্য হয়ে পড়ল। হযরতের অপূর্ব রণ-কুশলতা, সংবাদ আদান-

প্রদানে তৎপরতা ও সর্বোপরি পরিখার বিশেষ সুবিধা মুসলমানদের যুদ্ধজয়ে সহায়তা করেছিল। মুসলমানদের সংহতি, নিয়ম-শৃঙ্খলা ও নবীর নেতৃত্বে পূর্ণ আস্থা তাদেরকে বিজয়ের পথে পরিচালিত করেছিল; অন্যপক্ষে বিরাট মক্কাবাহিনীর বিভিন্ন দল উপদলের মধ্যে একতা ও সংহতির নিতান্ত অভাব ছিল।

খন্দকের যুদ্ধে পরাজয় মক্কাবাসীদের চরম পরাজয় সূচিত করে। হযরত মুহম্মদ (স) ও তাঁর অনুগামী মুসলমানদেরকে মদীনা হতে উৎপাটিত করে ইসলামের নাম ও নিশানা মুছে ফেলবার জন্য দৃঢ়সংকল্প হয়ে মক্কাবাসীরা বার বার অস্ত্রধারণ করেছিল। খন্দকের পরাজয়ের পর তারা উপলব্ধি করতে পারল যে, মুহম্মদ (স) ও তাঁর সম্প্রদায় মদীনায় সসম্মানে প্রতিষ্ঠা লাভ করেছেন। আরবের কোন শক্তিই আর তাঁদের মুকাবিলা করতে পারবে না। অন্যপক্ষে মক্কাবাসীদের সম্মান-প্রতিপত্তি, তাদের আভিজাত্য ও শ্রেষ্ঠত্বের দাবি চিরতরে খর্ব ও পর্যুদস্ত হল। সিরিয়ার বাণিজ্য তাদের হাতছাড়া হয়ে গেল এবং তারা অর্থনৈতিক মন্দার স্বীকার হয়ে পড়ল।

কুরাইজার শাস্তি

মদীনা অবরোধের সময় বনু কুরাইজা মুসলমানদের বিরুদ্ধে মক্কাবাসীদের সঙ্গে ষড়যন্ত্রে লিপ্ত হয়। হযরতের সঙ্গে সন্ধির শর্ত অনুসারে তারা তাঁকে সাহায্যদানে প্রতিশ্রুত ছিল। কিন্তু মক্কাবাসীদের আড়ম্বর ও বিস্তারিত যুদ্ধ-প্রস্তুতি দেখে তারা ভেবেছিল যে, যুদ্ধে মুহম্মদ (স) ও তাঁর অনুসারীদের পরাজয় অবশ্যম্ভাবী। সেজন্য তারা মক্কাবাসীদের সঙ্গে গোপনে ষড়যন্ত্র করে তাদেরকে সাহায্যের প্রতিশ্রুতি দান করল। যুদ্ধের সময় অবশ্য তারা কুরাইশদেরকে সাহায্য দানে বিরত থাকে। এহেন শত্রুকে মদীনায় রাখা বিপজ্জনক ভেবে খন্দকের যুদ্ধের অব্যবহিত পরেই হযরত তাদেরকে আক্রমণ করে পরাজিত করলেন। বিশ্বাসঘাতকতার জন্য তাদের কি শাস্তি হওয়া উচিত, তা নির্ধারণ করার জন্য হযরত তাদেরই অনুরোধক্রমে তাদের বন্ধু ও মিত্র সম্প্রদায় বনু আওসের সা'দ ইবন মুয়াজকে বিচারক নিযুক্ত করলেন। সা'দ রায় দিলেন যে, বনু কুরাইজার সব প্রাপ্তবয়স্ক পুরুষকে মৃত্যুদণ্ডে দণ্ডিত করা হোক এবং তাদের স্ত্রী ও ছেলেমেয়েদেরকে বন্দী করা হোক। এ দণ্ডাজ্ঞা প্রদানের ব্যাপারে সা'দ প্রাচীন গোত্রীয় আনুগত্যের ওপর ইসলামের প্রতি আনুগত্যের প্রাধান্য দিয়েছিলেন। বনু কুরাইজার দণ্ডপ্রাপ্তির পর মদীনায় আরও কিছু সংখ্যক ইহুদি বসবাস করতে থাকে। তারা মোটামুটি মদীনা রাষ্ট্রের প্রতি অনুগত থাকে।

ষষ্ঠ হিজরীতে হযরত মুহম্মদ (স) ওমরা (ছোট হজ্ব) পালনের সিদ্ধান্ত করে আনসার, মুহাজির ও অন্যান্য বেদুঈন আরব সমভিব্যাহারে মক্কা অভিমুখে যাত্রা করলেন। সর্বমোট ১৪০০ লোক তার সঙ্গে রওয়ানা হল। হযরত ও তার সঙ্গীসাথীরা হাজীর পোশাক পরে কুরবানীর জানোয়ার সঙ্গে নিয়ে চললেন।

হুদায়বিয়ার সন্ধি (৬২৮ খ্রিঃ)

হযরত তাঁর শান্তিপূর্ণ মনোভাবের নিদর্শন স্বরূপ সঙ্গী সাথিগণকে যুদ্ধাস্ত্র পরিহার করতে বললেন। তাদেরকে শুধু খাপে বন্ধ তরবারি সঙ্গে নিতে অনুমতি দেয়া হল। বহুদিন হল মুহাজিরগণ ঘরবাড়ি, আত্মীয়-স্বজন ও বন্ধুবান্ধব ত্যাগ করে মদীনায় প্রবাসী জীবন-যাপন করে আসছে। স্বদেশে প্রত্যাবর্তন করবার জন্য অনেকের মন আকুল হয়ে ওঠল। ইতিমধ্যে মক্কা ও কাবা ইসলাম ধর্মের প্রাণকেন্দ্র বলে স্বীকৃত হয়েছে। আরবদের প্রাচীন ধর্মকেন্দ্র মুসলমানদের প্রাণকেন্দ্রে পরিণত হয়েছে। হজ্ব ও ওমরা ইসলাম ধর্মে বিধিবদ্ধ হয়েছে। এসব কারণে হযরত এক্ষণে ওমরা পালনের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন। খন্দকের যুদ্ধের পর মক্কাবাসীদের সঙ্গে আর কোন যুদ্ধ-বিগ্রহ হয়নি। শান্তিপূর্ণভাবে শুধু একটি ধর্মীয় কর্তব্য পালনের মাধ্যমে হযরত এটাও দেখাতে চেয়েছিলেন যে, মক্কাবাসীদের প্রতি তাঁর কোন শত্রুতামূলক মনোভাব নেই।

কিন্তু তথাপি মক্কাবাসীরা মুসলমানদের মনোভাব সম্বন্ধে সম্পূর্ণ নিশ্চিতবোধ করতে পারল না। হযরত তাঁর দলবলসহ হুদায়বিয়া নামক স্থানে শিবির সংস্থাপন করলেন। মক্কাবাসীরা মুসলমানদেরকে জানিয়ে দিল যে, কিছুতেই তাদেরকে মক্কায় প্রবেশ করতে দেয়া হবে না। উভয়পক্ষে বহুবার সংবাদ আদান-প্রদান হল কিন্তু মক্কাবাসীদের অনমনীয় মনোভাবের পরিবর্তন হল না। একবার হযরত উসমানকে আবুসুফিয়ান ও অন্যান্য কুরাইশ দলপতিদের কাছে পাঠান হল। তারা উসমানকে আটক করে রাখল। গুজব রটল যে, হযরত উসমানকে হত্যা করা হয়েছে। এটা শুনে হযরত তাঁর সঙ্গিগণকে প্রয়োজন হলে যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত থাকতে বললেন। মুসলমানগণ 'রিদওয়ানের চুক্তি' নামে একটি চুক্তিতে পরস্পর আবদ্ধ হল। শীঘ্রই খবর পাওয়া গেল যে, হযরত উসমান নিরাপদে আছেন। কুরাইশগণ তখন সুহাইল ইবন আমর নামক এক ব্যক্তিকে হযরতের কাছে পাঠাল। অনেক আলাপ-আলোচনার পর নিম্নলিখিত শর্তে সন্ধি স্থাপিত হল ঃ

"হে আল্লাহ, তোমার নামে এটা ঐ সন্ধি, যা মুহম্মদ (স) ইবন আবদুল্লাহ সুহাইল ইবন আমরের সাথে সম্পাদন করেছে। তারা দশ বছরের জন্য লোকজনের মধ্য হতে যুদ্ধ-বিগ্রহ দূর করতে অঙ্গীকৃত হল। এ সময়ে লোকেরা নিরাপদে থাকবে এবং কেউ কারও গায়ে হাত তুলবে না। কুরাইশদের মধ্য হতে

কোন লোক তার অভিভাবকের অনুমতি ব্যতীত মুহম্মদ (স)-এর কাছে চলে আসলে মুহম্মদ (স) তাকে তাদের কাছে প্রত্যর্পণ করবে। কিন্তু মুহম্মদ (স) এর কাছ থেকে যদি কেউ কুরাইশদের নিকট চলে যায়, তবে কুরাইশরা তাকে প্রত্যর্পণ করতে বাধ্য থাকবে না। আমাদের মধ্যে সব শত্রুতা পরিহার করতে হবে এবং কোন আক্রমণ ও লুটপাট হতে পারবে না। যে কেউ মুহম্মদ (স)-এর সাথে কোন চুক্তি বা মৈত্রী স্থাপন করতে চায়, সে তা করতে পারে আর যে কেউ কুরাইশদের সাথে কোন চুক্তি বা মৈত্রী সম্পাদন করতে চায়, সে তা করতে পারে। তোমাকে এ বছর আমাদের মধ্য থেকে চলে যেতে হবে এবং তুমি আমাদের ইচ্ছার বিরুদ্ধে মক্কায় প্রবেশ করতে পারবে না। আগামী বছর আমরা তোমার পথ ছেড়ে দেবো এবং তুমি তোমার সঙ্গী-সাথিদেরকে নিয়ে মক্কায় প্রবেশ করে তিনদিন অবস্থান করতে পারবে। তোমরা একজন অশ্বারোহীর অস্ত্র ও কোষবদ্ধ তরবারি বহন করতে পারবে। এটা ছাড়া অন্যকিছু নিয়ে তোমরা এতে প্রবেশ করতে পারবে না।"

হযরত আলী উপরোক্ত দলিলের লেখক ছিলেন। লেখা সমাপ্ত হওয়ার পর হযরত মুহম্মদ (স) মুসলমান ও মক্কাবাসীদের প্রতিনিধিদেরকে দলিলে সাক্ষ্য হিসেবে স্বাক্ষর করতে আহবান করেন। তারপর হযরত কুরবানী করলেন এবং মস্তক মুণ্ডন করলেন। সাহাবীরাও তাই করলেন।

হুদায়বিয়ার সন্ধি মুসলমানদের জন্য এক বিশেষ স্মরণীয় ঘটনা। কুরআনে একে সুস্পষ্ট বিজয় বলে অভিহিত করা হয়েছে। আপাত দৃষ্টিতে এর শর্তগুলি মুসলমানদের জন্য অসুবিধাজনক হলেও, এতে সর্বপ্রথম মক্কাবাসিগণ মদীনাবাসীদের সাথে সমতার ভিত্তিতে পরস্পরের সাথে সন্ধিসূত্রে আবদ্ধ হল। দশ বছরের জন্য যুদ্ধ-বিরতি একদিকে যেমন হযরতের শান্তিকামী মনের পরিচয় দিল, অন্যদিকে তেমনি শান্তিপূর্ণ উপায়ে বিভিন্ন আরব-গোত্রের মিত্রতা অর্জনে তাঁকে সাহায্য করল। এ সময় হযরত ইসলাম প্রচারেরও যথেষ্ট সুযোগ লাভ করলেন। বহু লোক ইসলামের শান্তির বাণী গ্রহণ করল। ইসলামের দুজন সুবিখ্যাত বীর-যোদ্ধা এ সময় ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করেন। এঁরা হলেন খালিদ-ইবন-ওয়ালিদ ও আমর ইবনুল-আস। হুদায়বিয়া হতে ফিরে হযরত কয়েকজন দূতকে বিভিন্ন প্রতিবেশী রাজা-বাদশার কাছে ইসলামের শান্তির বাণী নিয়ে প্রেরণ করেন। আরব দেশে হযরত বিভিন্ন আরব-গোত্রের সাথে মিত্রতাসূত্রে আবদ্ধ হলেন।

হজ্ব সমাধা না করে ফিরে যাওয়ায় কুরাইশদের জিদ রক্ষা পেল, অন্যপক্ষে শান্তিপূর্ণভাবে মদীনাবাসীদের মক্কায় হজ্বের অধিকার সুপ্রতিষ্ঠিত হল। শান্তি প্রতিষ্ঠার ফলে হযরতের ও মুসলমানদেরই লাভ হল সর্বাপেক্ষা বেশি। কিন্তু মক্কাবাসীরাও লাভবান হল সন্দেহ নেই কারণ তারা আবার সিরিয়ায় অবাধ বাণিজ্যের সুযোগ পেল। কুরাইশদের মনস্তুষ্টির জন্যই হযরত তাদের পলাতক ব্যক্তিদের প্রত্যর্পণের শর্ত মেনে নিয়েছিলেন। অন্যপক্ষে তিনি নিশ্চিত ছিলেন যে, মুসলমানদের জন্য এতে ক্ষতির বা আশঙ্কার কোন কারণই নেই। কারণ, হযরতের কাছ থেকে কোন লোক কুরাইশদের কাছে চলে যাবে না। হুদায়বিয়ার সন্ধির সব শর্ত সামগ্রিকভাবে বিচার করে দেখলে বোঝা যায় যে, হযরত মুসলমানদেরকে ভবিষ্যৎ বিজয়ের প্রস্তুতি হিসেবে অনেক অসুবিধাজনক শর্ত মেনে নিতে রাজি করিয়েছিলেন। বস্তুত মক্কাবাসীরা হুদায়বিয়ার সন্ধির ফলেই হযরতের ও মুসলমানদের শান্তিকামী মনোভাবের সম্যক পরিচয় পেয়ে মনেপ্রাণে ইসলাম কবুল করবার জন্য প্রস্তুত হতে আরম্ভ করল। কাজেই এ হুদায়বিয়ার সন্ধিই দু'বছর পরে মক্কা-বিজয়ের পথ-অন্যকথায় মক্কার কুরাইশদের আত্মসমর্পণের পথ সুপ্রশস্ত করে।

বনু কুরাইজার দণ্ডাজ্ঞার পর মদীনার ইহুদিরা শান্তিপূর্ণ জীবন-যাপন করতে থাকে। কিন্তু খাইবারের ইহুদিরা হযরতের বিরুদ্ধে শত্রুতামূলক আচরণ অব্যাহত রাখে। এদের মধ্যে নির্বাসিত বনু নাজীরের ইহুদিরাই ছিল প্রধান। তারা পার্শ্ববর্তী আরব সম্প্রদায়সমূহকে টাকা-পয়সা দিয়ে মুসলমানদের বিরুদ্ধে প্ররোচিত করতে থাকে। হযরত মুহম্মদ (স) তাদের এসব কার্যকলাপের বিষয় জানতে পেরে হুদায়বিয়া হতে প্রত্যাবর্তনের পর খাইবার আক্রমণ করেন। খাইবারের ইহুদিরা মুসলমানদের সঙ্গে প্রাণপণ যুদ্ধ করে। একে একে ইহুদিদের দুর্গগুলি মুসলমানদের দখলে আসে। খাইবারের ইহুদিরা বিক্ষিপ্তভাবে বিভিন্ন দুর্গে বাস করত। তারা মুসলমানদের শক্তি সম্পর্কে যথার্থ অনুমান করতে পারেনি এবং সংঘবদ্ধভাবে মুসলমানদের আক্রমণ প্রতিহত করতে চেষ্টা করেনি। অবরোধের আগে তারা যথেষ্ট পানীয় জলের ব্যবস্থা করে রাখেনি। মুসলমানেরা যোদ্ধা হিসেবে বিশেষ কৃতিত্বের পরিচয় দেয় এবং একে একে ইহুদি দুর্গগুলিকে আত্মসমর্পণ করতে বাধ্য করে। আত্মসমর্পণের পর ইহুদিদেরকে তাদের চাষের জমি ফিরিয়ে দেয়া হল। ইহুদিরা তাদের উৎপন্ন শস্যের অর্ধেক মুসলমানদেরকে দিতে অঙ্গীকারাবদ্ধ হল। খাইবারের ইহুদিদের কথা শুনে ফাদাকের ইহুদিরাও তাদের উৎপন্ন শস্যের অর্ধাংশ হযরতকে দেয়ার শর্তে তাঁর সঙ্গে শান্তি স্থাপন করল। তখন হতে ফাদাক হযরতের ব্যক্তিগত

খাইবারের যুদ্ধ (মে-জুন ৬২৮ খ্রিঃ)

সম্পত্তিতে পরিগণিত হয়। তায়মা নামক ইহুদি গোত্রকে হযরত জিয্য়া নামক কর দানের প্রতিশ্রুতিতে সন্ধিসূত্রে আবদ্ধ করেন। এর বিনিময়ে ইহুদিদের ধর্মীয় স্বাধীনতার নিশ্চয়তা বিধান করা হয়।

খাইবারের যুদ্ধের পর মক্কা বিজয়ের আগে পর্যন্ত সময়ে যে সব যুদ্ধ সংঘটিত হয়, তার মধ্যে মুতা অভিযান প্রধান। সিরিয়া-সীমান্তে অবস্থিত গাস্সানে হযরতের একজন শান্তিদূত নিহত হয়। হযরত মুহম্মদ (স) তাঁর পোষ্যপুত্র জায়দকে ৩০০০ সৈন্যসহ এর প্রতিশোধ নেয়ার জন্য গাস্সানে প্রেরণ করেন। মুতা নামক স্থানে একটি বাইজান্টাইন সৈন্যবাহিনীর সাথে মুসলমানদের সংঘর্ষ হয়। সংঘর্ষে সেনাপতি জায়দ ও অপর দুজন প্রধান সেনাপতি নিহত হন। তারপর খালিদ-ইবন-ওয়ালিদ মুসলিম সৈন্যবাহিনীকে নিরাপদে মদীনায় ফিরিয়ে আনেন।

মুতা অভিযান (সেপ্টেম্বর, ৬২৯ খ্রিঃ)

হুদায়বিয়ার সন্ধির পর বনু খুজা'আ হযরত মুহম্মদের (স) সাথে সন্ধি সূত্রে আবদ্ধ হয়। অনুরূপ বনু বকর কুরাইশদের সাথে মিত্রতায় আবদ্ধ হল। নওফল-ইবন-মু'আবিয়া নামক বনু বকরের এক দলপতি কুরাইশদের কাছ থেকে কিছু যুদ্ধাস্ত্র লাভ করে এবং রাত্রিতে অতর্কিতে খুজা'আ গোত্রকে আক্রমণ করে। রাত্রির অন্ধকারে কুরাইশগণ বনু বকরকে যুদ্ধে সাহায্যও করে। খুজা'আ গোত্রের নেতারা মদীনায় হযরতের কাছে বনু বকর ও তাদের মিত্র কুরাইশদের সম্বন্ধে অভিযোগ করে। কুরাইশগণ এই ঘটনার ফলে নিজেদের ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে অত্যন্ত ভীত ও শঙ্কিত বোধ করতে থাকে। তারা আবু সুফিয়ানকে হযরতের কাছে প্রেরণ করে। কুরাইশদের আগাগোড়া ব্যবহার হযরতের অজানা ছিল না, তাই তিনি এবার আবু সুফিয়ানের সঙ্গে কোন প্রকার আলাপ-আলোচনা করতে অস্বীকার করেন।

মক্কা-বিজয় (জানুয়ারি ৬৩০ খ্রিঃ)

৬৩০ খ্রিস্টাব্দের ১ জানুয়ারি হযরত মুহম্মদ (স) ১০,০০০ সঙ্গীসহ মদীনা হতে মক্কায় রওয়ানা হলেন। মক্কার অনতিদূরে তাঁরা শিবির সংস্থাপিত করলেন। সেখানে রাত্রিতে দশ সহস্র লোকের দশ সহস্র বাতি জ্বলে ওঠল। এ সংবাদ পেয়ে মক্কাবাসীরা ভীত ও আতঙ্কিত হয়ে পড়ল। আবু সুফিয়ান বুঝতে পারল যে, মক্কাবাসীদের পক্ষে হযরত ও মুসলমানদের বিরোধিতা সম্পূর্ণ নিরর্থক। তাই সে মুসলমানদের শিবিরে এসে হযরতের কাছে আত্মসমর্পণ করল ও ইসলামধর্ম গ্রহণ করল। হযরত তার সম্মানার্থে মক্কাবাসীদের জন্য সাধারণ ক্ষমা ঘোষণা করে বললেন, "যে কেউ আবু সুফিয়ানের গৃহে প্রবেশ করবে, সে নিরাপদ; যে নিজেকে গৃহে আবদ্ধ করে রাখে, সেও নিরাপদ এবং যে মসজিদে প্রবেশ করে,

সেও নিরাপদ।" পরদিন হযরতের বাহিনী চারভাগে বিভক্ত হয়ে চারদিক হতে মক্কায় প্রবেশ করে। যে বাহিনী খালিদের অধীনে অগ্রসর হচ্ছিল, কেবল তারাই সামান্য বাধাপ্রাপ্ত হয়। কুরাইশদের মাত্র চব্বিশজন লোক ও অন্য একগোত্রের চারজন লোক নিহত হয়। এ যুদ্ধে পথ ভুলে মাত্র দুজন মুসলমান শত্রুর হাতে নিহত হয়। ৬৩০ খ্রিস্টাব্দের ১১ জানুয়ারি হযরত মক্কায় প্রবেশ করেন। এ ঘটনাকে 'ফাত্‌হ্-মক্কা' বা মক্কা-বিজয় নামে অভিহিত করা হয়। সাধারণ-ক্ষমা ঘোষণার ফলে প্রায় একরূপ বিনা রক্তপাতেই মুসলমানগণ মক্কায় প্রবেশ লাভ করে। মাত্র গুটিকতক লোককে বিশেষ বিশেষ অপরাধের জন্য সাধারণ ক্ষমার আওতা হতে বাদ দেয়া হয়। আবু সুফিয়ানের স্ত্রী হিন্দা ওহুদের যুদ্ধে নিহত মুসলিম বীর হামজার পেট চিরে তাঁর হৃৎপিণ্ড চর্বণ করেছিল। সেও হযরতের নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করে ইসলাম গ্রহণ করল।

হযরত মুহম্মদ (স) পনর-বিশদিন মক্কায় অবস্থান করে কাবাগৃহ ও অন্যান্য স্থান হতে প্রতিমাসমূহ বিদূরিত করলেন। কাবাগৃহে প্রবেশ করে তিনি লাঠি হাতে কুরআনের নিম্নলিখিত আয়াত উচ্চারণ করলেন, "সত্য এসেছে, এবং অসত্য চলে গিয়েছে; অবশ্যই অসত্য চলে যাবেই।" তারপর তিনি একে একে মূর্তিগুলি ভেঙ্গে ফেললেন। নাখলায় উজ্জার মূর্তি ভেঙ্গে ফেলার জন্য খালিদ-ইবন-ওয়ালিদকে পাঠান হল। মক্কার আশে পাশে ইসলাম প্রচারের জন্য হযরত ধর্মপ্রচারক প্রেরণ করলেন।

মক্কা-বিজয় হযরত মুহম্মদ (স)-এর জীবনের চরম সাফল্য সূচিত করে। কুরাইশদের অত্যাচারে যাঁকে একদিন আত্মীয়-পরিজন ও ঘরবাড়ি ছেড়ে মদীনায় হিযরত করতে হয়েছিল, তিনিই আজ বিজয়ীর বেশে আবার নিজের জন্মভূমিতে প্রত্যাবর্তন করলেন। দীর্ঘ আট বছরের ব্যবধানে কিসে এ পরিবর্তন সম্ভব করল? সেদিনের গৃহত্যাগী নবী আজ কি করে জয়ের মুকুট মাথায় পরে পুনরায় মক্কায় প্রতিষ্ঠা লাভ করলেন? বস্তুত, দুটি কারণে তাঁর এত বড় বিজয় সম্ভব হয়েছিল। প্রথমত, ইসলামের শান্তির বাণী। আরবের তৎকালীন সামাজিক ও ধর্মীয় অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে ইসলামের বাণী ও সমাজ-ব্যবস্থা ক্রমে ক্রমে আরবদের মধ্যে প্রসার লাভ করতে থাকে। রক্ষণশীল ও স্বার্থান্ধ কুরাইশগণ যুগের এ দাবিকে কোনক্রমেই দাবিয়ে রাখতে পারল না। হুদায়বিয়ার সন্ধির পরই বহু লোক ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করতে থাকে। কাজেই মক্কা-বিজয়ের আগেই মক্কাবাসীরা হযরত ও মুসলমানগণকে বাধাদান নিষ্প্রয়োজন মনে করল। দ্বিতীয়ত, হযরতের উজ্জ্বল-চরিত্র, দূরদর্শিতা ও সহনশীলতা তাঁর এ বিজয়ের পথ সপ্রশস্ত করে। তিনি সময় বুঝে কাজ করতেন। হুদায়বিয়ার সন্ধির সময়

মুসলমানদের ঘোরতর আপত্তি সত্ত্বেও তিনি কুরাইশদের সঙ্গে অনেক অসুবিধাজনক শর্তে শান্তি স্থাপনে প্রয়াসী হন। এতে সংশ্লিষ্ট সবাই তার আন্তরিকতা ও শান্তিকামী মনোভাবের পরিচয় পেয়ে সন্তুষ্ট হয়। তিনি নিজের চরিত্র ও ব্যবহার গুণে এমন অবস্থার সৃষ্টি করলেন, যার ফলে একরকম বিনা যুদ্ধেই মক্কা-বিজয় সম্ভব হয়েছিল।

হুনায়নের যুদ্ধ

মক্কা-বিজয়ের বছরই হুনায়নের যুদ্ধ সংঘটিত হয়। হযরত মুহম্মদ (স:) যখন মক্কার ব্যাপারে ব্যাপৃত ছিলেন, তখন হাওয়াজিন ও সাকিফ গোত্রের লোকেরা যুদ্ধের প্রস্তুতি আরম্ভ করে। হযরত লোক পাঠিয়ে গোপনে তাদের সম্বন্ধে সংবাদ সংগ্রহ করলেন এবং যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত হলেন। সাফওয়ান-ইবন-উমাইয়া নামক কুরাইশ সর্দার, যিনি তখনও ইসলাম গ্রহণ করেননি, হযরতকে প্রয়োজনীয় অস্ত্রশস্ত্র ও যানবাহন দিয়ে সাহায্য করলেন। হযরতের মক্কা অভিযানে নিযুক্ত ১০,০০০ সৈন্যের সাথে ২০০০ মক্কাবাসী যুক্ত হল। এরা সবাই হুনায়ন অভিমুখে যাত্রা করল। ৬৩০ খ্রিস্টাব্দের ৩০শে জানুয়ারি হযরত হুনায়নের নিকট পৌঁছলেন। শত্রু সৈন্যের সংখ্যা ছিল ২০,০০০। মুসলমানগণ শত্রু সৈন্যের এত বড় সমাবেশ দেখে প্রথমে বিস্মিত হল। বনু হাওয়াজিন তাদের যাবতীয় গবাদি-পশু, স্ত্রীলোক ও ছেলেমেয়েদেরকে নিয়েই যুদ্ধ ক্ষেত্রে উপস্থিত হল। তাদের নেতা মালিক মনে করেছিল যে, এগুলির রক্ষার্থে হাওয়াজিনের পুরুষ যোদ্ধারা প্রাণপণ যুদ্ধ চালিয়ে যাবে। শত্রুদের প্রচণ্ড আক্রমণে প্রথমে মুসলমানরা পলায়নপর হল। কিন্তু হযরত মুহম্মদ (স) বিশিষ্ট আনসার ও মুহাজির নেতৃবৃন্দ অবিচলভাবে রণাঙ্গণে দাঁড়িয়ে রইলেন। কিছুক্ষণের মধ্যে তাঁরা সৈন্যবাহিনীতে শৃঙ্খলা ফিরিয়ে আনলেন এবং শত্রুরা পশ্চাদপসরণ করল। শত্রুদের অনেকে নিহত ও বন্দী হল। হুনায়নের যুদ্ধ ছিল মুসলমানদের সঙ্গে বেদুঈন-আরবদের এক সরাসরি শক্তি পরীক্ষা। এ পরীক্ষায় মুসলমানগণই অবশেষে জয়ী হল। এর পর বেদুঈন আবরগণ হযরতের সঙ্গে আর কখনও অস্ত্র ধারণ করেনি। পক্ষান্তরে নবম হিজরীতে (৬৩০-৩১ খ্রিঃ) আরবের বিভিন্ন স্থান হতে বেদুঈন গোত্রের দূতসমূহ হযরতের কাছে মদীনায় আগমন করে বিভিন্ন চুক্তি ও মৈত্রীতে আবদ্ধ হতে থাকে।

নবম হিজরীতে হযরত বাইজান্টাইনদের সঙ্গে যুদ্ধ করবার ইচ্ছে প্রকাশ করলেন। বাইজান্টাইনদের সঙ্গে মুতার যুদ্ধে জায়েদ ও অপর দুজন সেনাপতি নিহত হওয়ার পর সিরিয়ার দিক হতে যে কোন মুহূর্তে বাইজান্টাইন আক্রমণের

তবুক অভিযান (৬৩০-৩১ খ্রিঃ) আশঙ্কা বিদ্যমান ছিল। কিন্তু এ অভিযান মুসলমানদের জন্য এক কঠিন পরীক্ষার সামিল ছিল। হুনায়নের যুদ্ধের পর অনেকেই শান্তি ও আরামের জীবন-যাপন করতে চেয়েছিল। তারা একে ক্লান্ত হয়ে পড়েছিল, তার ওপর, গরম অত্যধিক ছিল, বহুদিন ধরে অনাবৃষ্টি চলছিল। মুনাফিকগণ আবদুল্লাহ্ ইবন উবাইয়ের নেতৃত্বে মুসলমানদের পক্ষ ত্যাগ করল। এছাড়া কয়েকজন মুসলমানও গড়িমসি করে এ যুদ্ধে যোগদান করেনি। কিন্তু নানাবিধ কষ্ট ও অসুবিধা সত্ত্বেও সাধারণ মুসলমানদের মধ্যে এ যুদ্ধের আহবান অভূতপূর্ব সাড়া জাগিয়েছিল। হযরত আবু বকর এ উপলক্ষে তার যথাসর্বস্ব দান করেন। হযরত উসমানও প্রভূত অর্থ দান করেন। মহিলাগণ তাদের অলঙ্কার ও গহনাপত্র যুদ্ধের জন্য দান করল। তারপর আলীকে মদীনায় তাঁর স্থলাভিষিক্ত করে হযরত যুদ্ধযাত্রা করলেন এবং মদীনা ও দামিস্কের মধ্যবর্তী তবুক নামক স্থানে ছাউনী ফেললেন। তবুকে হযরত দশদিন অবস্থান করলেন। সেখানে কোন বাইজান্টাইন সৈন্যবাহিনী না দেখে মুসলমানরা স্বস্তির নিশ্বাস ফেলল এবং মদীনায় ফিরে এল। তবুকে অবস্থানকালে হযরত সিরিয়ার দক্ষিণাঞ্চলে অবস্থিত অনেকগুলি ইহুদি ও খ্রিস্টান সম্প্রদায়ের সঙ্গে সন্ধিসূত্রে আবদ্ধ হন। এদের মধ্যে আকাবা উপসাগরের মুখে অবস্থিত খ্রিস্টধর্মাবলম্বী আয়লা সম্প্রদায় প্রধান। আয়লার শাসনকর্তা য়ুহান্না-ইবন-রুবা স্বয়ং হযরতের কাছে এসে তাঁর সঙ্গে সন্ধিসূত্রে আবদ্ধ হন। আয়লার বাৎসরিক জিযয়া ৩০০ দীনার ধার্য হল।* য়ুহান্নাকে হযরত নিম্নলিখিত দলিল লিখে দিয়েছিলেন ঃ

"দয়ালু ও করুণাময় আল্লাহতায়ালার নামে। এটা আল্লাহ ও আল্লাহর রসূল মুহম্মদ (স)-এর তরফ হতে য়ুহান্না-ইবন-রুবা ও আয়লার লোকদের কাছে স্থলপথে ও জলপথে তাদের বাণিজ্য কাফেলা ও জাহাজের জন্য একটি রক্ষা-কবচ। তারা সবাই এবং তাদের সঙ্গী সিরিয়া ও ইয়ামনের সব লোক ও নাবিক আল্লাহ ও আল্লাহর রসূল মুহম্মদ (স)-এর রক্ষণাধীন। তাদের মধ্যে কেউ যদি কোন নতুন কথা তুলে সন্ধিভঙ্গ করে, তখন তার ধন-সম্পদ তাকে রক্ষা করতে পারবে না। সেই অর্থ যে দখল করে নিতে পারবে, তা তার ন্যায্য পাওনা হবে। তাদেরকে তাদের কূপে নামতে কিংবা তাদের জলপথ বা স্থলপথ ব্যবহার করতে বাধা দান নিষিদ্ধ করা হল।"

আয়লার নিকট মাকনা নামক ইহুদি অধ্যুষিত একটি ক্ষুদ্র মৎস্যজীবী শহর ছিল। তারা তাদের উৎপন্ন দ্রব্যের এক চতুর্থাংশ করদান করার প্রতিশ্রুতিতে হযরতের সঙ্গে সন্ধি স্থাপন করল। আম্মানের নিকটবর্তী আজরু ও জারবা নামক ইহুদি অধ্যুষিত শহর দুটিও জিযয়া আদায়ের অঙ্গীকারে হযরতের সঙ্গে সন্ধি স্থাপন করল।

অপর একজন খ্রিস্টান নরপতি উকায়দিরের সঙ্গে মুসলমানরা যুদ্ধ করল। খালিদ-ইবন-ওয়ালিদ তাঁকে যুদ্ধে পরাজিত করে বন্দী করলেন। পরিশেষে তিনিও জিযয়া আদায়ে সম্মত হয়ে সন্ধি সূত্রে আবদ্ধ হন।

এ প্রসঙ্গে প্রতিনিধি প্রেরণের বছর নাজরানের খ্রিস্টানদের সঙ্গে হযরত যে সন্ধিসূত্রে আবদ্ধ হয়েছিলেন, তাও বিশেষ উল্লেখযোগ্য। নাজরানের খ্রিস্টানদের পক্ষ হতে তিনজন নেতা হযরতের সঙ্গে সাক্ষাৎ করেন। সন্ধির শর্ত অনুযায়ী ২০০০ জামা তাদের কর ধার্য হল। যুদ্ধের সময় তারা মুসলমানদেরকে ৩০টি বর্ম, ৩০টি অশ্ব ও ৩০টি উট ধার দিবে। যুদ্ধের সময় এর মধ্য হতে যা কিছু নষ্ট হবে, তার মূল্য দেয়া হবে। এর বিনিময়ে নাজরানের খ্রিস্টান সম্প্রদায়, তাদের জমিজমা, অর্থ-সম্পদ ও গীর্জা আল্লাহ ও আল্লাহর রসূল কর্তৃক রক্ষিত হবে। কোন পুরোহিত তার গীর্জা হতে বহিষ্কৃত হবে না, কোন সন্ন্যাসীকে তার মঠ হতে সরান হবে না। জাহিলিয়া-যুগের কুসীদ প্রথা ও রক্তের প্রতিশোধ রহিত করা হল। এ চুক্তির পর যদি কেউ সুদ গ্রহণ করে, তবে তার জন্য আমার রক্ষা প্রযোজ্য হবে না। যদি কোন খ্রিস্টান মহিলা কোন মুসলমানকে বিবাহ করে, তবে তার স্বামী তাকে তার ধর্মকর্মে বাধা প্রদান করবে না।

নবম হিজরীকে মুসলমান ঐতিহাসিকগণ প্রতিনিধি প্রেরণের বছর বলে অভিহিত করেছেন। ঐ বছর আরবের বিভিন্ন স্থান হতে বিভিন্ন সম্প্রদায়ের প্রতিনিধিগণ মদীনায় এসে হযরতের সাথে সাক্ষাৎ করে এবং মদীনা রাষ্ট্রের অধীনতা স্বীকার করে নেয়। এ উপলক্ষে বহু গোত্রের লোক ইসলাম ধর্ম কবুল করে। হযরত মুহম্মদ (স) ইসলাম ধর্মের মূলনীতিগুলি শিক্ষা দেয়ার জন্য প্রতিনিধিদলের সঙ্গে ধর্মোপদেষ্টা প্রেরণ করেন। কোন কোন গোত্রের প্রতিনিধিরা নিজেরাই শুধু মুসলমান হলেন—আবার কেউ কেউ তাদের গোত্রের পক্ষ হতে শুধু রাজনৈতিক আনুগত্য প্রকাশ করতে এসেছিলেন। সুদূর উমান, হাজরা-মাউত ও ইয়ামন হতেও প্রতিনিধি দল মদীনায় আগমন করেছিল। বস্তুত, নবম ও দশম হিজরীতে হযরত কৃতকার্যতার সর্বোচ্চ সোপানে উন্নীত হয়েছিলেন। মক্কা-বিজয় ও হুনায়নের যুদ্ধের পর ইসলাম ধর্ম গ্রহণের জন্য লোকদের মধ্যে হিড়িক পড়ে যায়। মদীনার চারপার্শ্ব হতে বিভিন্ন গোত্রের লোকেরা মদীনার রাষ্ট্রীয় শৃঙ্খলা ও নিরাপত্তা ব্যবস্থায় আস্থাশীল হয়ে দলে দলে হযরতকে তাদের সর্বোচ্চ অধিনায়ক বলে স্বীকার করতে এগিয়ে এল। সত্য ও বিশ্বাসের প্রদীপ্ত শিখায় অসত্য ও অধর্মের অন্ধকার দূরীভূত হল এবং সমগ্র আরব ভূমি ইসলামের নবারুণ স্পর্শে এক নতুন উষায় জেগে ওঠল।

সানাতুল উফুদ (৬৩০-৩১ খ্রিঃ)

দশম হিজরীর জিলকাদ মাসে হযরত মক্কায় হজ্ব করতে যাওয়ার ইচ্ছা প্রকাশ করলেন এবং লোকজনকে প্রস্তুত হতে বললেন। এ হজ্ব তাঁর জীবনের শেষ হজ্ব ছিল বলে একে বিদায়-হজ্ব বলা হয়।

বিদায় হজ্ব (২২ ফেব্রুয়ারি ৬৩২ খ্রিঃ)

অগণিত মুসলমানদের এক বিরাট যাত্রীদলসহ হযরত মক্কায় এসে পৌঁছলেন। হযরত হজ্বের বিভিন্ন রীতি-নিয়ম লোকজনকে বুঝিয়ে দিলেন। আরাফাতের ময়দানে তিনি সমবেত জনতাকে সম্বোধন করে বক্তৃতা করেন। তিনি কতগুলি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় নিয়ে বক্তৃতা করেন এবং আল্লাহকে সাক্ষী করে তাঁর নবুয়তের দায়িত্বের পরিসমাপ্তি ঘোষণা করেন। তিনি বলেন ঃ

"হে মানুষ সকল, আমার কথা অবধান কর। আমি জানি না, এ বছরের পর তোমাদের সঙ্গে আমার আর দেখা হবে কিনা, আজকের এ দিন এ মাস যেমন পবিত্র,—তোমাদের রক্ত ও তোমাদের সম্পত্তি তোমাদের প্রভুর সঙ্গে সাক্ষাৎকারের সময় পর্যন্ত পরস্পরের জন্য তেমন পবিত্র। তোমরা নিশ্চয়ই তোমাদের প্রভুর সঙ্গে সাক্ষাৎ করবে এবং তিনি তোমাদেরকে তোমাদের কার্যাবলি সম্বন্ধে জিজ্ঞেস করবেন। আমি তোমাদেরকে বলেছি। কারও কাছে যদি কোন আমানত থাকে, তবে সে যেন তা আমানতদাতাকে ফিরিয়ে দেয়। সব কুসীদ রহিত হল কিন্তু তোমরা তোমাদের মূলধন পাবে। কারও প্রতি অন্যায় করো না এবং কেউ তোমাদের প্রতি অন্যায় করবে না। আল্লাহ্ এরূপ বিধান করেছেন যে, সুদপ্রথা থাকবে না। আব্বাস-ইবন-আব্দুল মুত্তালিবের সুদ সমস্তই রদ করা হল। জাহিলিয়া-যুগের সব রক্তপাত অপরিশোধ্য থাকবে। আমি প্রথম যে রক্তমূল্য রহিত বলে ঘোষণা করছি, তা হল রবীয়া ইবন হারিসের রক্তমূল্য।"

"তোমাদের স্ত্রীদের ওপর তোমাদের হক আছে এবং তোমাদের ওপরও তাদের হক আছে। আমি তোমাদের কাছে যা রেখে গেলাম, যদি তোমরা তা মজবুত করে ধর, তবে তোমরা কখনও বিপথে চালিত হবে না। তা হল আল্লার কিতাব ও রসূলের সুন্নত। সুতরাং আমি যা বলি, তা মনোযোগ সহকারে শ্রবণ কর।"

"জেনে রাখ যে, প্রতি মুসলমান প্রতি মুসলমানের ভাই এবং মুসলমানেরা পরস্পর ভাই ভাই। ভাই স্বেচ্ছায় তোমাকে যা দেয় শুধু তা গ্রহণ করাই আইন-সম্মত। কাজেই তোমরা পরস্পরের ওপর জুলুম করো না। হে আল্লাহ আমি কি পৌঁছাই নি?" লোকেরা বলল, "হ্যাঁ, আল্লাহ্।" রসূল বললেন, "হে আল্লাহ, তুমি সাক্ষী থাক।"

হযরত মুহম্মদ (স) এ উপলক্ষে ক্রীতদাস-দাসীদের সম্বন্ধেও মুসলমানগণকে উপদেশ দান করেন। তিনি বলেন, "তোমরা যা খাও, দাস-দাসীদেরকে তাই খেতে দেবে, তোমরা যা পর, তাদেরকে তাই পরতে দেবে। যদি তারা এমন অপরাধ করে, যা তোমরা ক্ষমা করতে না পার, তবে তাদেরকে বর্জন কর। তারা আল্লার বান্দা এবং তাদের সঙ্গে নিষ্ঠুর ব্যবহার করা সমীচীন নয়।

"তোমরা যারা উপস্থিত তারা অনুপস্থিত লোকদেরকে এটা বলবে। যারা এটা শুনল, হয়ত তাদের চেয়ে যাদেরকে এটা বলা যাবে তারাই এটা ভাল মনে রাখবে।"

বিদায়-হজ্ব হতে মদীনায় প্রত্যাবর্তনের পর হযরত জায়দের পুত্র উসামার নেতৃত্বে সিরিয়ায় একটি অভিযান প্রেরণ করেন।

হযরত মুহম্মদ (স) হুদায়বিয়ার সন্ধির পর হতে তাঁর ইনতিকালের সময় পর্যন্ত আরব ও অনারব রাজা-বাদশাহ্দের কাছে ইসলাম ধর্ম গ্রহণের আহবান জানিয়ে শান্তিদূত প্রেরণ করেন। আরব রাজা বাদশাহদের মধ্যে ইয়ামামা, বাহরাইন, ওমান ও ইয়ামনের বাদশাহদের নাম উল্লেখযোগ্য। অনারব বাদশাহ্দের মধ্যে আবিসিনিয়ার নাজ্জাশী, রোমের হিরাক্লিয়াস ও পারস্য সম্রাট খুসরুর নাম ঐতিহাসিকগণ কর্তৃক উল্লিখিত হয়েছে। একাদশ হিজরীর সফর মাসে হযরত পীড়িত হয়ে পড়েন। একদা মধ্যরাত্রিতে তিনি 'বাকি'উল গারকদ্দ' নামক কবরস্থানে গমন করেন এবং মৃত-আত্মার জন্য কান্নাকাটি ও প্রার্থনা করেন। অতঃপর তিনি তাঁর পত্নী হযরত আয়িশা (রা)-এর গৃহে অবস্থান করার সিদ্ধান্ত করেন। সেখান হতে তিনি মসজিদে নববীতে নামাজ পড়াতে যেতেন। মৃত্যুর তিনদিন পূর্ব পর্যন্ত তিনি নামাজ পড়াতে সক্ষম হয়েছিলেন। তারপর তাঁর শরীর দুর্বল ও অবসন্ন হয়ে পড়ল। একাদশ হিজরীর ১২ই রবিউল আওয়াল সোমবার (মোতাবেক ৮ জুন, ৬৩২ খ্রিঃ) তিনি মহিমান্বিত প্রভুর সান্নিধ্য লাভ করেন। (ইন্না লিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলাইহি রাজিউন)। তাঁর মৃত্যু এত আকস্মিক ও অপ্রত্যাশিত ছিল যে, সাধারণ মুসলমানগণ এটা বিশ্বাসই করতে পারল না। হযরত উমরও মনে করলেন যে, এটা একটি গুজব ব্যতীত আর কিছুই নয়। মুসলমানদের শত্রুরা তাদের উদ্দেশ্য সিদ্ধির জন্য এরূপ গুজব ছড়িয়েছে। হযরত আবু বকর নীরবে আয়িশার গৃহে প্রবেশ করলেন এবং হযরতের মুখমণ্ডল হতে আবরণ উন্মোচন করলেন। তারপর তিনি হযরতের মৃত্যু সম্বন্ধে নিশ্চিত হয়ে বাইরে আসলেন। তিনি লোকজনকে সম্বোধন করে কুরআনের এ আয়াত আবৃতি করলেন ঃ মুহম্মদ (স) রসূল বইত

দূত প্রেরণ

নন, তাঁর পূর্বে রসূলগণ গত হয়েছেন। তিনি যদি মৃত্যুমুখে পতিত হন বা নিহত হন তবে কি তোমরা পৃষ্ঠ প্রদর্শন করবে? যে পৃষ্ঠপ্রদর্শন করে সে আল্লার কোন ক্ষতি করতে পারে না। আল্লাহ্ কৃতজ্ঞদেরকে পুরস্কৃত করবেন।" ততক্ষণে হযরত উমরের ও অন্যান্য সবার প্রতীতি জন্মাল যে হযরত মুহম্মদ (স)-এর মৃত্যু হয়েছে।

চরিত্র ও কৃতিত্ব ঃ মুসলমানদের কাছে হযরত মুহম্মদ (স) আখিরী বা শেষ নবী। তাদের মতে তিনি আদর্শ ও সর্বশ্রেষ্ঠ মানব হিসেবে সব অনুকরণীয় মানবীয় গুণের অধিকারী। ঐতিহাসিকদের কাছে তিনি একজন বিখ্যাত ধর্মপ্রবর্তক, সমাজ-সংস্কারক, সার্থক-শাসক ও রাজনীতিজ্ঞ হিসেবে পৃথিবীর ইতিহাসে গৌরবোজ্জ্বল আসনে সমাসীন থাকবেন। তিনি অসাধারণ ব্যক্তিত্ব ও চরিত্র মাধুর্য দিয়ে তাঁর সমসাময়িকদের হৃদয় জয় করতে সক্ষম হয়েছিলেন। নবুয়তপ্রাপ্তির আগেই সততা ও বিশ্বস্ততার জন্য তাঁর দেশবাসিগণ তাঁকে আল্-আমীন (বিশ্বাসী) আখ্যায় আখ্যায়িত করেছিল। ঘটনাবহুল জীবনের বিচিত্র অভিজ্ঞতা একদিকে যেমন তাঁর মনোবলকে সুদৃঢ় করেছিল, অন্যদিকে তেমনি দুঃস্থ মানবতার জন্য তাঁর মমত্ববোধকে বাড়িয়ে তুলেছিল। বদান্যতা ও ক্ষমাশীলতা তাঁর চরিত্রের বৈশিষ্ট্য ছিল। তিনি ইয়াতিম ছিলেন বলে ইয়াতিম, দীন-দুঃখী ও দরিদ্রের দুঃখ-দুর্দশা লাঘব করবার জন্য তাঁর চেষ্টার অন্ত ছিল না। তিনি উদার ও দয়াবান ছিলেন। আনাস ইবন মালিক দশ বছর যাবৎ হযরতের খিদমত করেছিলেন কিন্তু কখনও হযরতের মুখ হতে কোন কঠোর বাক্য শোনেন নি। মক্কা-বিজয়ের পর মক্কাবাসীদের প্রতি তাঁর উদার ও ক্ষমাসুন্দর ব্যবহার তাঁর মহানুভবত্বের জ্বলন্ত দৃষ্টান্ত। যারা তাঁকে মাতৃভূমি ত্যাগ করতে বাধ্য করেছিল এবং নানা অত্যাচার ও নির্যাতনে অতীষ্ঠ করে তুলেছিল, তাদেরকে নিজের হাতের মুঠার মধ্যে পেয়েও তিনি ক্ষমা করে দিয়েছিলেন। বিপদাপদে স্থিরচিত্ততা, ধর্মে ও কর্মে অবিচল নিষ্ঠা এবং মানব-কল্যাণে অকপট আন্তরিকতা তাঁকে শ্রেষ্ঠত্ব অর্জনে সহায়তা করেছিল। পশুপাখির প্রতি তাঁর দয়া তাঁর মহানুভব চরিত্রের আর একটি দিক সূচিত করে। ছোট ছোট ছেলেমেয়েদের প্রতি তিনি ছিলেন অত্যন্ত স্নেহশীল। তাদের মনস্তুষ্টি বিধানের জন্য তিনি তাদের সঙ্গে মনোজ্ঞ ক্রীড়া কৌতুকে লিপ্ত হতেন। তাঁর গায়ের রং সুন্দর ও দেহ-সৌষ্ঠব সুঠাম ছিল। পায়ে হাঁটবার সময় তিনি এত দ্রুত চলতেন যে, কম লোকই তাঁর সঙ্গে তাল রেখে চলতে পারত। তিনি স্বল্পভাষী কিন্তু সদালাপী ছিলেন। তিনি উচ্চহাস্য করতেন না কিন্তু তার মৃদুহাসিতে অন্তরের পবিত্রতা পরিস্ফুট হয়ে উঠত। সমগ্র

আরব দেশের মুকুটবিহীন সম্রাটের উচ্চ আসনে সমাসীন হয়েও তিনি সাদাসিদা জীবন যাপন করতেন। নিজের জুতা, কাপড় নিজ হাতে মেরামত করে, মেষাদি দোহন করে ও সাধারণ গৃহস্থালীর কাজকর্ম করে তিনি অনাড়ম্বর জীবনযাত্রার এক অত্যুজ্জ্বল আদর্শ স্থাপন করে গিয়েছেন।

হযরতের প্রচারিত ধর্ম ঃ হযরত মুহম্মদ (স) মূলত ও প্রধানত একজন নবী বা ধর্মপ্রবর্তক ছিলেন। তাঁর প্রচারিত ধর্মের নাম ইসলাম। এর আক্ষরিক অর্থ আত্মসমর্পণ। আল্লার ইচ্ছায় আত্মসমর্পণের নাম ইসলাম। আরবের তৎকালীন রাজনৈতিক, সামাজিক, অর্থনৈতিক ও ধর্মীয় সমস্যাদির সুষ্ঠু সমাধান এ নবধর্মে নিহিত ছিল এবং সেই জন্যই আরববাসিগণ ক্রমে ক্রমে যাবতীয় সংস্কার ত্যাগ করে এ ধর্মের প্রতি আকৃষ্ট হয়েছিল। অন্যপক্ষে নতুন ধর্ম অবলম্বনের ফলে তাদের ধর্মীয় ও সামাজিক জীবনে অভাবনীয় পরিবর্তন দেখা দিল। তারা নতুন আদর্শে অনুপ্রাণিত ও নতুন প্রেরণায় উদ্বুদ্ধ হয়ে এক শক্তিশালী জাতিতে পরিণত হল এবং সমগ্র মধ্যপ্রাচ্যে এক নতুন আলোড়নের সৃষ্টি করল। হযরতের জীবনী আলোচনা প্রসঙ্গে ইতিপূর্বে ইসলাম ধর্মের কয়েকটি অনুষ্ঠান সম্পর্কে আমরা আলোচনা করেছি। নিম্নে ইসলামের প্রধান অনুষ্ঠানাদির সংক্ষিপ্ত পরিচয় দেয়া হল।

শাহাদাৎ

ইসলামের পাঁচটি মূল স্তম্ভের মধ্যে শাহাদত বা আল্লাহর একত্বের স্বীকারোক্তি প্রথম। "আল্লাহ ব্যতীত কোন উপাস্য নেই, মুহম্মদ (স) তার রসূল" এ স্বীকারোক্তি ইসলামের জন্য মৌলিক। এ স্বীকারোক্তি অনুসারে এক আল্লাহর ওপর বিশ্বাস ও হযরত মুহম্মদের নবুয়তে বিশ্বাস মুসলিম ঈমানের অঙ্গ। বিচারের দিনে বিশ্বাস স্থাপন ঈমানের আর একটি প্রধান অঙ্গ। স্রষ্টার একত্বে বিশ্বাস আরবে প্রচলিত বহু দেবদেবীর উপাসনার বিরুদ্ধে প্রতিবাদ সূচক। এজন্য ইসলামে শির্‌ক বা আল্লাহর সাথে দেবতা উপদেবতার অংশীদার কল্পনা নাস্তিকতার শামিল।

শাহাদত বা ঈমানের স্বীকারোক্তির পর অপর চারটি স্তম্ভ কর্মের পর্যায়ে পড়ে। এদের মধ্যে প্রথম ও প্রধানটির নাম সালাত বা নামাজ। সর্বশক্তিমান আল্লাহতাআলার প্রতি কৃতজ্ঞতা স্বীকার ও তার গুণকীর্তন এর উদ্দেশ্য। দৈনিক পাঁচবার কাবামুখী হয়ে ইমামের (নেতার) পিছনে দলবদ্ধ অবস্থায় অথবা একাকী নামাজ পড়তে হয়। দৈনিক নামাজ পড়ার জন্য মসজিদে যাওয়া একান্ত প্রয়োজন নয়। সময় ও নিয়ম মত নামাজ যেখানে সেখানে পড়তে পারা যায়। শুক্রবারে জুমার নামাজের জন্য মসজিদে যেতে হয়। নামাজের প্রথম ও প্রধান উদ্দেশ্য আধ্যাত্মিক। এটা অন্যভাবেও মুসলমানদের জন্য বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ। জমা'আতে

(দলবদ্ধ) নামাজ পড়বার সময় ধনী, দরিদ্র, মনিব-ভৃত্য, রাজা প্রজা নির্বিশেষে সবাই কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে নামাজ আদায় করে। ভ্রাতৃত্বের আদর্শ রূপায়ণ, নেতার প্রতি আনুগত্য, একতা, নিয়মানুবর্তিতা ও শৃঙ্খলা প্রভৃতি নামাজের আনুষঙ্গিক ফল বলে ধরা যেতে পারে। [১]

জাকাত ইসলামের তৃতীয় স্তম্ভ। এর গুরুত্ব তাৎপর্য আগেই ব্যাখ্যা করা হয়েছে।[২] জাকাত একই সঙ্গে ধর্মীয়, সামাজিক ও রাজনৈতিক কর্তব্য। শুধু বদান্যতা বললে এর তাৎপর্য পূর্ণভাবে প্রকাশিত হয় না। ইসলামের আবির্ভাবের আগে মক্কায় নতুন বণিক-শ্রেণীর মধ্যে যে বস্তুতান্ত্রিকতা ও অর্থগৃধ্নুতা দেখা দিয়েছিল, জাকাত একাধারে এর প্রতিবাদ ও সমাধান স্বরূপ। মুসলমানদের ধর্মীয় ভাষায় নামাজ শারীরিক ইবাদত (উপাসনা) আর জাকাত আর্থিক ইবাদত।

জাকাত

ইসলামের চতুর্থ স্তম্ভ রোজা (সওম)। নামাজ ও জাকাতের প্রত্যাদেশ মক্কাতেই কার্যকরী হয়। রোজা ও হজ্ব প্রাথমিক মদীনা যুগে বিধিবদ্ধ করা হয়। হযরত মুহম্মদ (স) যখন মদীনায় আসেন, তখন তিনি ইহুদিদেরকে আশুরায় (দশম মুহররমের) রোজা পালন করতে দেখেন। তিনিও ঐ দিনে রোজা রাখতেন। পরে রমজান মাসের রোজা মুসলমানদের জন্য ফরজ বলে নির্ধারিত হয়।

রোজা

হজ্ব ইসলামের পঞ্চম স্তম্ভ। কাবায় হজ্ব করা এক অতি প্রাচীন আরবীয় প্রথা। প্রাথমিক মদীনা-যুগে হজ্বের বিধান করা হয়। মদীনার মুসলমানদের জন্য মক্কায় হজ্ব পালন তাদের দীর্ঘ প্রবাসের পরিপ্রেক্ষিতে বিশেষ তাৎপর্যপূর্ণ ছিল। আরবের প্রাচীন ধর্মকেন্দ্রে কাবা ও হযরতের জন্মভূমি মক্কা এ হজ্বের মাধ্যমে ইসলামের প্রাণকেন্দ্রে পরিণত হল। হজ্বের সাহায্যে পৃথিবীর সব দেশ হতে সব জাতি ও বর্ণের মুসলমানগণ বছরে একবার পরস্পর সাক্ষাতের সুযোগ পায়। শুধু সম্পন্ন মুসলমানদের জন্য জীবনে অন্তত একবার হজ্ব পালন করা অবশ্য কর্তব্য। ইসলামের ঐক্য ও বিশ্বভ্রাতৃত্বের বাস্তব রূপায়ণে হজ্বের ভূমিকা অনস্বীকার্য। এ উপলক্ষে হাজিগণ আল্লাহর নামে যে গবাদি পশুউৎসর্গ করে থাকেন, বিশ্বের যাবতীয় মুসলমান ঈদুল-আজহা উপলক্ষে তারই প্রতিধ্বনি করে বিশ্বস্রষ্টার উদ্দেশ্যে প্রতীক উৎসর্গে যোগদান করে তাদের যাবতীয় উপাসনা, ধর্মকর্ম ও জীবন মরণ বিশ্বস্রষ্টার হাতে সঁপে দেয়।

হজ্ব

---

১. পূর্বে হযরত মুহম্মদ (স)-এর মক্কা জীবন অধ্যায়ের ধর্ম প্রচার পরিচ্ছেদ দ্রষ্টব্য পৃঃ ৫২।

২. পূর্বে হযরত মুহম্মদ (স)-এর মক্কা জীবন অধ্যায়ের ধর্ম প্রচার পরিচ্ছেদ দ্রষ্টব্য পৃঃ ৫৩।

হযরতের সমাজ সংস্কার ঃ আগেই বলা হয়েছে যে, হযরত মুহম্মদ (স) ছিলেন মূলত ও প্রধানত একজন নবী ও ধর্ম-প্রচারক। কিন্তু তিনি যে ধর্মপ্রচার করলেন, তার বিধি-নিয়ম আরবের সামাজিক, রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক জীবনে সুদূর প্রসারী প্রভাব বিস্তার করে তাদের সামগ্রিক জীবনে আমূল পরিবর্তন সাধন করে। বস্তুত তাঁর ধর্মে তৎকালীন আরবদেশের রাজনৈতিক ও সামাজিক জীবনের যাবতীয় অনাচার ও ব্যাধির সুষ্ঠু সমাধান নিহিত ছিল। তাই আমরা তাঁকে সমাজ-সংস্কারক ও রাজনীতিকের ভূমিকায়ও দেখতে পাই। তাঁর এ বিভিন্ন ভূমিকা এক ও অভিন্ন। এদেরকে আলাদা করে দেখা যায় না। কারণ ধর্ম, সমাজ ও রাজনীতি তাঁর একক ভূমিকারই বিভিন্ন প্রকাশ মাত্র। এখানেই অন্য ধর্মপ্রচারকদের সাথে তাঁর পার্থক্য।

তাঁর প্রচারের ফলে আরবদের সমাজ-জীবনে যে সব অভাবনীয় পরিবর্তন ঘটেছিল, আমরা সে বিষয় কিছু আলোচনা করব। রক্ত সম্পর্ক ভিত্তিক, আরব-সমাজে ধনী-নির্ধন, আশরাফ-আতরাফ, মনীব-গোলাম ও অভিজাত-অনভিজাত শ্রেণীর মধ্যে ব্যবধান ছিল দূরতিক্রমণীয়। হযরত মুহম্মদ (স) মুসলমানদের মধ্যে সাম্য ও ভ্রাতৃত্ব স্থাপন করলেন। শ্রেষ্ঠত্বের মাপকাঠি ছিল তাকওয়া বা আল্লার ভয়। বংশ-মর্যাদা বা অর্থের প্রাচুর্য শ্রেষ্ঠত্বের বিচারে অগৌণ প্রতিপন্ন হল। প্রত্যেক ধর্মই মোটামুটি সাম্য ও ভ্রাতৃত্বের আদর্শের ওপর প্রতিষ্ঠিত। কিন্তু এ ব্যাপারে ইসলাম ধর্মের কয়েকটি বৈশিষ্ট্য পরিলক্ষিত হয়। যারা ইসলাম ধর্মে দীক্ষিত হল, তারা যে গোত্র বা সম্প্রদায়েরই হোক না কেন আল্লাহর চোখে তারা সবাই সমান। প্রথম হতেই এ সাম্য আরব ছাড়া অনারব লোকদের প্রতিও সমানভাবে প্রযোজ্য হয়েছিল। হাবশী ক্রীতদাস বিলাল ইসলাম ধর্মে দীক্ষিত হয়ে হযরতের মসজিদের মুয়াজ্জিনের মর্যাদা লাভ করেছিলেন। সালমান ফারসী হযরতের একজন সম্মানী ও নেতৃস্থানীয় সাহাবী ছিলেন। ধর্মীয় সাম্য সমাজের ক্ষেত্রেও সমভাবে প্রযোজ্য ছিল। আইনের চোখে সাধারণ লোক ও রাজা-বাদশার মধ্যে কোন তারতম্য ছিল না। হযরত ওমরের খিলাফত সময়ে সংঘটিত একটি ঘটনা এ প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য। জাবালা নামক একজন গাস্সান যুবরাজ মুসলমান হয়ে হজ্ব করতে মক্কায় এসেছিল। একজন সাধারণ মুসলমান জাবালার কাপড় মাড়িয়ে দেয়ায়, সে তাকে চপেটাঘাত করেছিল। হযরত উমর (রা)-এর নিকট এর অভিযোগ পৌঁছলে জাবালা মনে করেছিল যে, সে রাজ-রাজড়া লোক কাজেই যে লোকটি তার কাপড় মাড়িয়ে দিয়েছিল, তারই শাস্তি হবে। কিন্তু হযরত উমর (রা) চপেটাঘাত প্রাপ্ত লোকটিকে জাবালার গালে অনুরূপ চড় মারবার অনুমতি দেয়ায় জাবালা এমন কঠোর সাম্যবাদী ধর্মের অনুশাসন এড়াবার জন্য নিজের দেশে পালিয়ে ইসলাম ধর্ম ত্যাগ করল। বস্তুত যারা ইসলামের সাম্যনীতি মেনে নিতে পারত না—ইসলাম ধর্মে তাঁদের স্থান ছিল না। আনসার ও মুহাজিরগণ

পরস্পরকে এমনভাবে বিপদাপদে সাহায্য সহায়তা করত, যে তারা যেন একে অপরের মাতৃগর্ভজাত ভাই। এ ভ্রাতৃত্বের ভিত্তিমূল সুদৃঢ় করবার জন্য হযরত ধনী ও সম্পন্ন মুসলমানদের জন্য জাকাত বাধ্যতামূলক করে দিয়েছিলেন। এর ফলে মুসলমানদের মধ্যে কেউ অযথা অন্নাভাবে বা অর্থাভাবে কখনও কষ্ট পেত না। এছাড়া মুসলমানদের মধ্যে তিনি সুদে ঋণ দেয়া (রিবা) নিষিদ্ধ করে দিয়েছিলেন। যেহেতু মুসলমানরা পরস্পর ভাই ভাই, সেহেতু পরস্পরের আর্থিক অনটনের সুযোগে একে অপরকে শোষণ বা নির্যাতন করা নিতান্ত গর্হিত ও অন্যায়। মুসলমানগণ পরস্পরকে বিনা লাভে বা সুদে কর্জ দান করবে, এটাই ছিল তাঁর উদ্দেশ্য। অন্যপক্ষে সৎ বা সাধু উপায়ে ব্যবসা-বাণিজ্যের মাধ্যমে অর্থোপার্জনকে তিনি সব সময় উৎসাহিত করতেন। এভাবে তিনি সাম্য ও ভ্রাতৃত্বের ধর্মীয় আদর্শকে সুদৃঢ় সামাজিক ও অর্থনৈতিক ভিত্তির ওপর প্রতিষ্ঠিত করে গিয়েছেন।

হযরতের সামাজিক সংস্কারের মধ্যে তাঁর বিবাহ ও পারিবারিক আইনসমূহ বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ। জাহিলিয়া যুগে পারিবারিক বন্ধন শিথিল হয়ে পড়েছিল।[৩] হযরত মুহম্মদ (স) পারিবারিক বন্ধন সুদৃঢ় করার জন্য নিয়ম-কানুন প্রবর্তন করেন। বহু বিবাহ প্রথা নিয়ন্ত্রিত করা হল। ধর্মে যেমন পুরুষ এবং নারীকে সমান দায়িত্বশীল ব্যক্তি হিসেবে গণ্য করা হয়েছে সমাজেও নারীদেরকে সুনির্দিষ্ট অধিকার ও সুযোগ-সুবিধা দান করা হল। সৎমাকে বিবাহ করা অথবা কোন দু-ভগ্নীকে এক সঙ্গে বিবাহ করা কিংবা দুগ্ধ-সম্পর্কের আত্মীয়-স্বজনদের মধ্যে বিবাহ নিষিদ্ধ ঘোষণা করা হল। পিতা ও স্বামীর সম্পত্তিতে মেয়েদের অধিকার সুপ্রতিষ্ঠিত হল। জাহিলিয়া যুগে পিতা বা অভিভাবকগণ মেয়েদেরকে বিবাহ দিয়ে তাদের মোহর (যৌতুক) আত্মসাৎ করত। কিন্তু নতুন আইনে তারা নিজেরাই নিজেদের মোহরের মালিক হল। বর্বর যুগের তালাক প্রথা আইনানুগ ও মার্জিত করা হল। মেয়ে-সন্তান হত্যা নিষিদ্ধ ঘোষণা করা হল। জাহিলিয়া যুগে মেয়েরা যেভাবে অবাধে চলাফেরা ও মেলামেশা করত, তাকে নিয়ন্ত্রিত করে তাদের জীবনে শ্লীলতা ও শালীনতা আনয়ন করা হল। পারিবারিক জীবনে শান্তি ও শৃঙ্খলা বিধান করাই ছিল তাঁর সংস্কারের উদ্দেশ্য। প্রাচীন আরবে পৃথিবীর অন্যান্য দেশের মত দাসপ্রথা প্রচলিত ছিল। মনিবগণ ক্রীতদাসকে তাদের ক্ষেত-খামারে, ব্যবসা-বাণিজ্যে, পশুচারণে ও গৃহকর্মে নিয়োগ করত। তারাই ছিল সমাজের প্রকৃত অর্থকরী শ্রমিক সম্প্রদায়। কিন্তু পণ্যদ্রব্যের মত তারা অর্থের বিনিময়ে বিক্রীত হত। সমাজে তাদের কোন সুনির্দিষ্ট অধিকার ছিল না। তাদের

---

৩. পূর্বে জাহিলিয়া যুগ অধ্যায়ের পার্শ্ব টীকা 'সামাজিক অবস্থা' দ্রষ্টব্য পৃঃ (৪৩–৪৪)।

ভাগ্য মনিবের খেয়াল খুশীর ওপর নির্ভরশীল ছিল। হযরতের দরদী মন এদের শোচনীয় অবস্থা দেখে ব্যথায় আকুল হয়ে উঠেছিল। ইসলামের প্রাথমিক যুগে যে সব ক্রীতদাস ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করেছিল, হযরত নিজে এবং তাঁর সাহাবিগণ নিজেদের অর্থ ব্যয় করে ঐ সব ক্রীতদাসের মুক্তির ব্যবস্থা করেছিলেন। তা ছাড়া তিনি ক্রীতদাসের প্রতি ভাল ব্যবহারের জন্য সকলকে উপদেশ দিতেন। তাদের উত্তম খোরপোষের ব্যবস্থার জন্য তিনি তাগিদ দিতেন। বিদায় হজ্ব উপলক্ষে তিনি মুসলমানগণকে লক্ষ্য করে বলেছিলেন যে, তারা যেন নিজেরা যা পরে, ক্রীতদাসগণকেও তা পরতে দেয় এবং নিজেরা যা খায়, তাদেরকে তাই খেতে দেয়। ক্রীতদাসকে মুক্তিদান পুণ্যের কাজ বলে ঘোষণা করা হয়।

হযরতের অন্যান্য সমাজ-সংস্কারের মধ্যে জুয়াখেলা ও মদ্যপান নিষিদ্ধকরণ বিশেষ উল্লেখযোগ্য। জাহিলিয়া যুগে এ দুটি অসামাজিক প্রথা আরব-সমাজে সচরাচর প্রচলিত ছিল।

হযরত মুহম্মদ (স) ধর্মপ্রচারের মাধ্যমে আরববাসীদের সমাজ ও রাজনীতিতে অভাবনীয় পরিবর্তন সাধন করেছিলেন, এটা আগেই আমরা উল্লেখ করেছি। তাঁর জন্মভূমি মক্কায় তিনি তাঁর নববিধান সামগ্রিকভাবে কার্যকরী করার সুযোগ পাননি। মদীনায় হিযরত তাঁর সম্মুখে এক নবদিগন্ত ও উজ্জ্বল সম্ভাবনাময় ভবিষ্যতের সিংহদ্বার উন্মোচিত করে দিল। এখানে আমরা তাঁকে দেখতে পাই, ধর্মপ্রবর্তক ও রাজনীতিকের যুগ্ম ভূমিকায়। বনু-আওস ও খজরজের আহ্বানে মদীনায় হিযরত করার সঙ্গে সঙ্গে তিনি মদীনায় একটি স্বস্তি-ব্যবস্থা স্থাপন করার দায়িত্ব গ্রহণ করলেন। মদীনা গঠনতন্ত্রের সাহায্যে তিনি প্রথমে আনসার ও মুহাজিরগণকে একটি 'উম্মা' (সম্প্রদায়) বলে অভিহিত করলেন। মক্কার ও মদীনার মুসলমানগণ ধর্মের ভিত্তিতে একটি সম্প্রদায় ভুক্ত হয়ে পরস্পরের রক্ষার জন্য ব্যক্তিগত ও ব্যষ্টিগতভাবে দায়ী হল। গোত্রীয় আনুগত্য, যার ভিত্তি ছিল রক্ত-সম্পর্ক, এ রক্ষা-ব্যবস্থায় নিতান্ত গৌণস্থান অধিকার করল। মুসলমানগণ মুখ্যত একে অপরের ও সামগ্রিকভাবে সব মুসলমানের রক্ষার জন্য পরস্পর অঙ্গীকারাবদ্ধ হল। মুসলমানেরাই মদীনার স্বস্তি ব্যবস্থার প্রাণস্বরূপ ছিল। কিন্তু দূরদর্শী রাজনীতিকের মত হযরত দেখতে পেলেন যে, মদীনা শহর ও এর আশে-পাশে বহু ছোট বড় ইহুদি সম্প্রদায়ও বসবাস করত। মদীনার রাষ্ট্রপ্রধান হিসেবে তিনি বুঝতে পেরেছিলেন যে, মদীনার ইহুদি সম্প্রদায়সমূহকে বাদ দিয়ে মদীনায় কোন স্বস্তি-ব্যবস্থা কায়েম করা যাবে না। তাই তিনি ইহুদিদেরকে তাঁর রক্ষা ব্যবস্থায় শামিল করে নিলেন এবং মদীনা-গঠনতন্ত্র অনুসারে ইহুদিগণকেও উম্মার অন্তর্ভুক্ত করা হল। এখানে উম্মার তাৎপর্য রাজনৈতিক, ধর্মের সঙ্গে এর কোন যোগাযোগ ছিল না। তাই মদীনা গঠনতন্ত্রে স্পষ্ট উল্লেখ করা হল, "মুসলমানদের জন্য তাদের ধর্ম এবং ইহুদিদের জন্য তাদের ধর্ম।" যে সব ইহুদি

সম্প্রদায় মদীনা গঠনতন্ত্রের শর্তাবলি মেনে নিয়ে মদীনার বৃহত্তর স্বাস্ত-ব্যবস্থার অন্তর্ভুক্ত হয়েছিল, তাদের নাম এ গঠনতন্ত্রে উল্লেখ করা হয়েছে। কিছুকাল পরে যখন ইহুদিগণ নানা রকম গোপন ষড়যন্ত্রে ও ধ্বংসাত্মক কার্যকলাপে লিপ্ত হল, তখন তাদেরকে মদীনা হতে নির্বাসিত করা হল। তখন হতে মুসলমানরাই শুধু উম্মার অন্তর্ভুক্ত রইল। এভাবে উম্মার মধ্যে অমুসলমানের অন্তর্ভুক্তির অবসান হল। এখন প্রশ্ন উঠতে পারে, ইসলামী সামাজিক ও রাষ্ট্রীয় সংস্থায় গোত্রের অবস্থা কেমন হল? গোত্র কি সম্পূর্ণরূপে অন্তর্হিত হল? আরবের গোত্র-সম্প্রদায়সমূহের সঙ্গে মুসলিম সম্প্রদায়ের তুলনা করলে এরূপ মনে হত যে, মুসলমানগণ বিভিন্ন গোত্র সম্প্রদায় হতে বিচ্ছিন্ন হয়ে নিজেরাই একটি গোত্র-সম্প্রদায়ের সৃষ্টি করেছে। তবে এ দু সমাজ-ব্যবস্থায় প্রথম ও প্রধান পার্থক্য এই ছিল যে, গোত্র-সম্প্রদায়গুলির ভিত্তি ছিল রক্ত-সম্পর্ক, আর এর সদস্যরা পরিচালিত হত গোত্রীয় আদর্শ ও নীতির দ্বারা। অন্যপক্ষে মুসলমানেরা একসূত্রে গ্রথিত হত ধর্মের দ্বারা এবং নতুন ধর্মের ধর্মীয়, সামাজিক, আদর্শ ও নীতি দ্বারা তারা পরিচালিত হত। কাজেই এ দু সমাজ ব্যবস্থার মৌলিক ভিত্তিই সম্পূর্ণ পৃথক ছিল। কিন্তু ইসলামে গোত্রীয় ব্যবস্থাকে গুরুত্ব না দিলেও পরিচয়ের সূত্র হিসেবে গোত্রাদির নাম ব্যবহার নিষিদ্ধ করা হয়নি। কুরআনে উল্লেখ রয়েছে যে, আল্লাহ মানুষদেরকে পরস্পর পরিচয়ের সুবিধার জন্য গোত্র ও সম্প্রদায়ে বিভক্ত করেছেন। কিন্তু কোন গোত্রের লোক বলে মুসলমান হিসেবে কাউকেই শ্রেষ্ঠত্বের মর্যাদা দেয়া হয়নি। অন্যপক্ষে বদান্যতা প্রদর্শনের ব্যাপারে আপন নিকটাত্মীয় ও গোত্রভুক্ত দরিদ্র লোকজনকে ইসলামে প্রাধান্য দেয়া হয়েছে। কারণ আপন লোকজনের প্রতি কর্তব্য বিস্মৃত হলে, সমাজের স্বাভাবিক বন্ধন শিথিল হয়ে যায়। মুসলিম উত্তরাধিকার আইনে বংশ ও পরিবারকে স্বীকার করে নেয়া হয়েছে। পরবর্তী যুগে আরব-মুসলমানগণ ইসলামের প্রকৃত শিক্ষা বিস্মৃত হয়ে পুনরায় গোত্রীয় পরিচয়কে যথাসর্বস্ব মনে করে নিয়েছিল এবং গোত্রীয় ভিত্তিতে আভিজাত্যের দাবি পুনঃপ্রতিষ্ঠিত করার প্রয়াস পেয়েছিল।

মদীনায় শাসক হিসেবে প্রতিষ্ঠিত হবার পর ধীরে ধীরে হযরতের রাজনৈতিক

রাষ্ট্রীয় সংস্থা

ক্ষমতা বৃদ্ধি পেতে থাকে। পর পর কয়েকটি পর্যায়ে এ ক্ষমতার প্রসার ঘটে। বদরের যুদ্ধে মুসলমানদের বিজয় সন্দেহাতীতভাবে হযরতের প্রতিপত্তি বৃদ্ধির সহায়ক হয়েছিল। অতঃপর খন্দকের যুদ্ধে মক্কাবাসীদের সব দম্ভ চূর্ণ বিচূর্ণ হয়ে যাওয়ার পর, আরবের গোত্র সম্প্রদায়গুলি স্পষ্ট বুঝতে পারল যে, মদীনা-রাষ্ট্রের বিরোধিতা তাদের জন্য অমঙ্গলই টেনে আনবে। হুদায়বিয়ার চুক্তিতে হযরতের শান্তিকামী মনের পরিচয় পেয়ে বহু আরব গোত্র হযরতের সঙ্গে তথা মদীনা-রাষ্ট্রের সঙ্গে সন্ধিসূত্রে আবদ্ধ হতে থাকে। হুদায়বিয়ার চুক্তির ফলে ক্রমশ মুসলমানের সংখ্যাও বেড়ে যেতে লাগল। এর ফলে ৬৩০ খ্রিস্টাব্দের জানুয়ারি মাসে হযরত দশ হাজার মুসলমানের বিরাট

বাহিনী নিয়ে মক্কার কাছে শিবির সংস্থাপন করেন। কুরাইশ নেতা আবু সুফিয়ান হযরতের বিরোধিতা নিরর্থক মনে করে তাঁর কাছে আত্মসমর্পণ করে। বহুকাল বিরোধিতার পর জন্মভূমি মক্কা হযরতের আনুগত্য স্বীকার করে। এর অব্যবহিত পরেই হুনায়নের যুদ্ধে বনু হাওয়াজিন ও বনু সাকিফ গোত্রের লোকেরা বিশ সহস্র আরবদের এক বিরাট বাহিনী নিয়ে শেষবারের মত হযরতের সঙ্গে শক্তি পরীক্ষায় অবতীর্ণ হয়। এ যুদ্ধে তাদের শোচনীয় পরাজয়ের পর প্রকৃত প্রস্তাবে সমগ্র আরব উপদ্বীপে হযরতের অবিসম্বাদিত নেতৃত্ব প্রতিষ্ঠার পথে সব বাধা-বিপত্তির নিরসন হয়। দূত প্রেরণের মাধ্যমে আরব সম্প্রদায়গুলি একে একে হযরতের বশ্যতা স্বীকার করে নেয়। এ জন্য নবম হিজরীকে (৬৩০-৩১ খ্রিঃ) ইসলামের ইতিহাসে দূত-প্রেরণের বছর (সানাতুল উফুদ) বলে অভিহিত করা হয়। আমরা আগে উল্লেখ করেছি যে, এ সময় সুদূর উমান, হাজরামাউত ও ইয়ামন হতে দূতগণ মদীনায় এসে হযরতের কাছে স্ব-স্ব গোত্রের আনুগত্য প্রকাশ করে। হযরত দূরদর্শী রাজনীতিকের মত এদের সঙ্গে ব্যবহার করেছিলেন। কোন কোন গোত্রের সর্দারগণ রাজনৈতিক আনুগত্য প্রকাশের সাথে সাথে ইসলাম ধর্মও গ্রহণ করেছিল। আবার কেউ কেউ রাজনৈতিক আনুগত্য প্রকাশ ও মৈত্রী স্থাপন করেই সন্তুষ্ট ছিল। এভাবে সমগ্র আরবে হযরতের তথা মদীনা-রাষ্ট্রের আধিপত্য স্থাপিত হল। ভিন্ন ভিন্ন সম্প্রদায়ের সাথে চুক্তি ও মৈত্রীর শর্তও বিভিন্ন ছিল। কেউ কেউ হযরতকে শত্রুর বিরুদ্ধে সামরিক সাহায্যদানে প্রতিশ্রুত হল। আবার কেউ মদীনা-রাষ্ট্রে রাজস্ব দানে অঙ্গীকৃত হল। বহু গোত্রের সঙ্গে হযরত তাদের নিজ নিজ সর্দারের মাধ্যমে সম্পর্ক রক্ষা করতেন। আবার কোন কোন এলাকায় আইন-শৃঙ্খলা রক্ষা ও রাজস্ব আদায়ের জন্য হযরত মক্কা ও মদীনাবাসী মুসলমানগণকে কর্মচারী নিযুক্ত করেছিলেন। মুয়াজ ইবন জাবালকে হযরত সমগ্র ইয়ামন ও হাজরামাউতে ধর্ম বিষয়ে উপদেশ দান ও রাজস্ব আদায়ের জন্য নিযুক্ত করেছিলেন। মক্কায় তিনি আবদুশ শাম্‌স্ গোত্রের একজন যুবককে প্রতিনিধি নিযুক্ত করেছিলেন।

এতদ্ব্যতীত বিভিন্ন ইহুদি ও খ্রিস্টান সম্প্রদায়ের সাথে হযরত বিভিন্ন সময়ে সন্ধিসূত্রে আবদ্ধ হয়েছিলেন। এ সব সন্ধিতে মদীনা-রাষ্ট্রের সঙ্গে তাদের সম্পর্ক, রাষ্ট্রের প্রতি তাদের কর্তব্য ও তার বিনিময়ে তাদের সুযোগ-সুবিধা সুস্পষ্ট ভাষায় বিবৃত করা হয়েছিল। এ বিষয়ে পরে আমরা বিস্তারিত আলোচনা করব।

মদীনা-রাষ্ট্রের প্রধান হিসেবে হযরত মুহম্মদ (স) রাষ্ট্রীয় তহবিলেরও ব্যবস্থা করেছিলেন। অবশ্য প্রথম অবস্থায় নিয়মিত কোন রাষ্ট্রীয় তহবিল গড়ে ওঠেনি।

রাজস্ব ব্যবস্থা

ইসলামের সাম্য ও ভ্রাতৃত্বের আদর্শ অনুযায়ী মুসলমানগণ পরস্পর পরস্পরকে স্বেচ্ছা প্রণোদিত হয়েই সাহায্য করত। জনসাধারণের বা রাষ্ট্রের কোন সাময়িক বিপর্যয় বা অভাব উপস্থিত হলে, হযরতের অনুরোধে অথবা ইঙ্গিত মাত্র সম্পন্ন মুসলমানেরা তাদের ধন সম্পদ

রাষ্ট্রীয় কল্যাণে অকাতরে দান করত। দৃষ্টান্তস্বরূপ তবুকের যুদ্ধের কথা উল্লেখ করা যেতে পারে। ধনী প্রবর হযরত উসমান এ উপলক্ষে অনেক অর্থ দিয়ে সাহায্য করেছিলেন। হযরত আবু বকর (রা) যুদ্ধ-তহবিলে তাঁর যথাসর্বস্ব দান করেছিলেন। হযরত মুহম্মদের মদীনা-জীবনের শেষ কয়েক বছর হতে রাষ্ট্রীয় তহবিলে কয়েকটি নিয়মিত উপায়ে রাজস্ব সংগৃহীত হতে থাকে। মুসলমানগণ কর্তৃক জাকাত ও সদকা দেয়া হত। প্রথমটি সম্পন্ন মুসলমানদের জন্য বাধ্যতামূলক বলে বিবেচিত হয়। আর সদকা বিশেষ বিশেষ ঘটনা উপলক্ষে প্রদত্ত ঐচ্ছিক দান। অমুসলমানদের কাছ থেকেও কর আদায় করা হত। ইহুদি ও খ্রিস্টানদের সঙ্গে হযরত যে সব চুক্তি বা সন্ধি স্থাপন করেছিলেন তাতে জিয্‌য়া শব্দের উল্লেখ রয়েছে। অমুসলমানগণকে মুসলিম রাষ্ট্রের রক্ষা-ব্যবস্থায় শামিল করার ফলে তাদের জান মাল রক্ষার জন্য এ কর গ্রহণ করা হত। 'উশর নামক এক প্রকার করও সময় সময় আদায় করা হত। যুদ্ধবন্দিগণ নিজেদেরকে মুক্ত করবার জন্য যে অর্থ প্রদান করত তার নাম ছিল সি'আয়া। অমুসলমানদের সঙ্গে যুদ্ধ বিগ্রহের সময় যুদ্ধ ক্ষেত্রে যে অর্থ সামগ্রী মুসলমানদের হাতে আসত, তার নাম ছিল গনীমা (গনীমাত)। হযরত গনীমা হতে এক পঞ্চমাংশ রাষ্ট্রের জন্য রাখতেন, বাকি অংশ যুদ্ধে যোগদানকারী সৈনিকদের মধ্যে বিতরণ করে দেয়া হত। অশ্বারোহী সৈনিক নিজের অংশের সঙ্গে অশ্বের জন্যও বিশেষ ভাগ পেত। এভাবে হযরতের জীবদ্দশায়ই ইসলামী রাষ্ট্রের অর্থনৈতিক কাঠামো প্রায় সুনির্দিষ্ট রূপ পরিগ্রহ করে।

ইহুদি ও খ্রিস্টানদের সাথে সম্পর্ক

শাসক হিসেবে হযরতকে মুসলমান ও পৌত্তলিক আরবগণ ব্যতীত ইহুদি ও খ্রিস্টানদের সংস্পর্শেও আসতে হয়েছিল। এরা আহল-ই-কিতাব বা স্বর্গীয় গ্রন্থের অনুসারী নামে পরিচিত হত। হযরত উভয় সম্প্রদায়ের সঙ্গে স্বাভাবিক বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্ক বজায় রাখতে চেয়েছিলেন। মদীনায় রাষ্ট্র গঠন, মক্কাবাসীদের সাথে যুদ্ধ-বিগ্রহ ও সন্ধি, মক্কা বিজয়, ইহুদি ও খ্রিস্টানদের সঙ্গে সম্পর্ক ও সমগ্র আরব উপদ্বীপ ব্যাপী সার্বভৌম ক্ষমতা সম্পন্ন একটি শাসন-ব্যবস্থা স্থাপনের মধ্যে তাঁর রাজনৈতিক দূরদর্শিতা ও শাসন-ক্ষমতার পরিচয় পাওয়া যায়। তিনি প্রথমেই পূর্ববর্তী সব নবীকে স্বীকার করে নিয়েছিলেন। মুসলমানদের কাছে ইহুদিদের নবী হযরত মূসা (আ) ও খ্রিস্টান ধর্মের প্রবর্তক হযরত ঈসা (আ) বিশেষ মর্যাদার অধিকারী। মদীনায় পদার্পণ করেই হযরত মুহম্মদ (স) ইহুদিদের সঙ্গে বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্ক স্থাপনে প্রয়াসী হন।

মদীনায় পৌঁছে হযরত দেখলেন যে, মদীনা ও এর আশে-পাশে বহু ইহুদি বসবাস করছে। তিনি মদীনা গঠনতন্ত্রের মাধ্যমে ইহুদি ও মুসলমানদের মধ্যে রাজনৈতিক সহযোগিতা স্থাপন করেন। তিনি ইহুদিদেরকে ধর্মীয় স্বাধীনতা দান করেন। নবী হিসেবে তিনি ইসলাম ও ইহুদি ধর্মের সাদৃশ্যে আনন্দ প্রকাশ করেছিলেন। ইহুদিদেরকে ইসলাম ধর্মে বিশ্বাস করতে কোনভাবে বাধ্য করেননি। কিন্তু তিনি একথাও মনে করেছিলেন যে, উভয় ধর্মের লোকেরা প্রতিবেশী হিসেবে ও একই রাষ্ট্রের নাগরিক হিসেবে সুখে-শান্তিতে বসবাস করতে পারবে। কিন্তু ইহুদিরা হযরতের নবুয়তের দাবি ও ইসলামের কৃতকার্যতায় ঈর্ষান্বিত হয়ে অচিরেই হযরতের ও ইসলামের বিরূপ সমালোচনা আরম্ভ করল। তারা মনে করত যে, তারা আল্লাহর একমাত্র মনোনীত সম্প্রদায় এবং আল্লার ওহী তাদের ওপরই অবতীর্ণ হয়েছে। আর কোন জাতি আল্লাহর মনোনীত হতে পারে না। তারা হযরত মুহম্মদ (স)-এর নবুয়ত অস্বীকার করেই ক্ষান্ত হয়নি, ইসলাম ধর্মের বিভিন্ন আচার অনুষ্ঠান সম্বন্ধে প্রকাশ্যে বিভিন্ন বিরূপ মন্তব্য করতে আরম্ভ করল। এভাবে ইহুদিদের সঙ্গে হযরতের বিরোধের সূচনা হয়। ইহুদিদের কবি কা'বউল-আশরাফ মুসলিম বিদ্বেষী কবিতা রচনা করে জনসাধারণ্যে প্রচার করতে থাকে। মুসলিম কবি হাস্‌সান ইবন সাবিত এর প্রত্যুত্তর প্রদান করেন। হযরত মুহম্মদ (স) যখন জেরুজালেম হতে মক্কার দিকে কিবলা পরিবর্তন করেন, তখন ইহুদিগণ অনেক ঠাট্টা-বিদ্রূপ করতে থাকে। মৌখিক বিরোধ ও শত্রুতা হতে অচিরেই ইহুদিগণ নানা রকম ষড়যন্ত্রে লিপ্ত হতে আরম্ভ করে। তাই হযরত পর্যায়ক্রমে তিনটি প্রধান ইহুদি সম্প্রদায় বনু কায়নুকা, বনু নাজির ও বনু কুরায়জার বিরুদ্ধে বিশেষ বিশেষ কারণে শাস্তিমূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করেন। এ বিষয় আগে আলোচনা করা হয়েছে। ৪

ইহুদিদের সাথে সম্পর্ক

মদীনা হতে এ তিনটি সম্প্রদায়ের ইহুদিগণের অপসারণের পর আরও কিছুসংখ্যক ইহুদি মদীনায় বসবাস করতে থাকে। তারা মোটামুটি হযরতের অনুগত থেকেই শান্তিপূর্ণভাবে বসবাস করতে থাকে।

মদীনা হতে নির্বাসনের পর বনু নাজির নামক ইহুদি সম্প্রদায় খাইবারে বসবাস করতে থাকে। কিন্তু তারা সুযোগ পেলেই মুসলমানদের বিরুদ্ধে অস্ত্রধারণ করত। প্রথম সুযোগ এল খন্দকের যুদ্ধের সময় (৬২৭ খ্রিঃ)। তারা গাতফান গোত্রের আরবগণকে খাইবারের খর্জুর ফসলের অর্ধেক পুরস্কার স্বরূপ প্রদানের প্রতিশ্রুতি দিয়ে তাদেরকে মুসলমানদের বিরুদ্ধে যুদ্ধে যোগদানে প্ররোচিত করে। হুদায়বিয়ার সন্ধির বছর (৬২৮ খ্রিঃ) হযরত যখন মুসলমানগণকে নিয়ে মক্কায় ওমরাপালনের জন্য মদীনা ত্যাগ করেন, তখন খাইবারের ইহুদিরা পার্শ্ববর্তী আরব সম্প্রদায়সমূহকে আবার

ওয়াদি-উল কুরা

৪. সপ্তম অধ্যায় ঃ 'হযরত মুহম্মদ (স)-এর মদীনা জীবন' পার্শ্ব টীকা ইহুদিদের শাস্তিমূলক ব্যবস্থা দ্রষ্টব্য পৃঃ নং ৬৯-৭১।

মুসলমানদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ-বিগ্রহে লিপ্ত হওয়ার জন্য প্ররোচিত করে। হুদায়বিয়া হতে প্রত্যাবর্তনের পর হযরত খাইবার আক্রমণ করেন এবং ইহুদিদের শেষ বারের মত পরাজিত করেন। খাইবারের যুদ্ধের পর নতুন করে ইহুদিদের সঙ্গে সন্ধি স্থাপিত হয়। এ সন্ধির শর্ত অনুসারে খাইবারের ইহুদিরা তাদের জমি ফিরে পেল এবং মুসলমানদেরকে উৎপন্ন শস্যের অর্ধাংশ দিতে প্রতিশ্রুত হল। এ ব্যবস্থা দেখে ফাদাক ও ওয়াদিউল-কুরা অঞ্চলের ইহুদিরা বিনাযুদ্ধে অনুরূপ শর্তে হযরতের সঙ্গে শান্তি স্থাপন করে। তায়মা নামক স্থানের ইহুদিদের সঙ্গে যে সন্ধি স্থাপিত হয়, তদনুসারে তারা জিয্য়া কর দানে প্রতিশ্রুত হয়। পূর্বে উল্লেখিত হয়েছে যে,[৫] আকাবা উপসাগরের মুখে অবস্থিত মাকনা নামক ইহুদি অধ্যুষিত ক্ষুদ্র মৎস্যজীবী শহরের অধিবাসীদের সাথে তাদের উৎপন্ন শস্য, ধৃত মৎস্য ও তৈরি কাপড়ের এক চতুর্থাংশ কর হিসেবে প্রদানের প্রতিশ্রুতিতে তাদেরকে আল্লাহ ও রসূলের রক্ষা ব্যবস্থার শামিল করে নেয়া হয়। মদীনা-গঠনতন্ত্রে প্রদত্ত ইহুদিদের সুযোগ ও অধিকারের সাথে বর্তমান সন্ধির শর্তসমূহ তুলনা করলে স্পষ্টই বুঝা যায় যে, ইহুদিগণ প্রথমত সমতার ভিত্তিতে স্বাধীন ও স্বায়ত্তশাসিত সম্প্রদায় হিসেবে মদীনা-রাষ্ট্রের অন্তর্ভুক্ত হয়েছিল। কিন্তু তাদের সেই সামাজিক ও রাজনৈতিক মর্যাদা তারা রক্ষা করতে পারল না। কিন্তু দূরদর্শী রাজনীতিকের মত হযরত ইহুদিদেরকে পুনরায় সুনির্দিষ্ট ও সুনির্ধারিত অধিকারের ভিত্তিতে মুসলিম রাষ্ট্রের করদ প্রজা হিসেবে গ্রহণ করেন। এ সব সন্ধিতে ইহুদিদের ধর্মীয়-স্বাধীনতা আগের মতই অক্ষুণ্ন থাকে এবং মুসলিম রাষ্ট্র তাদের জানমালের নিরাপত্তার দায়িত্ব গ্রহণ করে।

খ্রিষ্টানদের সাথে সম্পর্ক

আমরা ইতিপূর্বে বিভিন্ন খ্রিস্টান সম্প্রদায়ের সঙ্গে হযরতের সন্ধির কথা উল্লেখ করেছি। হযরতের প্রচারিত ধর্মের সঙ্গে যেমন ইহুদি ধর্মের সাদৃশ্য ছিল, খ্রিস্টান ধর্মের সঙ্গেও তেমনি সাদৃশ্য ছিল। তবে ইহুদিদের সাথে যেমন দু পর্যায়ে তাঁর সম্পর্কের কথা আমরা আলোচনা করেছি খ্রিস্টানদের সঙ্গে তাঁর সম্পর্ক দ্বিতীয় পর্যায়ের অন্তর্ভুক্ত। মক্কা-বিজয়ের পরবর্তী যুগে যখন সমগ্র আরব উপদ্বীপের আরব সম্প্রদায়সমূহ হযরতের সঙ্গে সন্ধিসূত্রে আবদ্ধ হয়ে মদীনা রাষ্ট্রের প্রতি আনুগত্য প্রকাশ করতে থাকে, তখন উত্তর ও দক্ষিণ আরবের খ্রিস্টানসমূহও হযরতের সঙ্গে সন্ধি স্থাপন করে। ইহুদিরা চূড়ান্তভাবে পরাজিত হওয়ার পূর্ব পর্যন্ত মুসলমানদের সঙ্গে নানা শত্রুতামূলক

---

৫. সপ্তম অধ্যায় ঃ 'হযরত মুহম্মদ (স)-এর মদীনা জীবন' 'পার্শ্ব টীকা তবুক অভিযান' দ্রষ্টব্য পৃ. নং ৭৮।

আচরণ ও যুদ্ধ-বিগ্রহে লিপ্ত হয়। অবশেষে খাইবারের যুদ্ধের পর হযরত তাদেরকে সন্ধিসূত্রে আবদ্ধ করেন। খ্রিস্টানদের সঙ্গে কোনকালেই ঐরকম অপ্রীতিকর বা তিক্ত সম্পর্ক গড়ে ওঠেনি। অন্যপক্ষে হযরতের মক্কায় অবস্থানকালে কুরাইশদের নির্যাতন হতে অব্যাহতি পাওয়ার জন্য ৬১৫ খ্রিস্টাব্দে মক্কার বহু মুসলমান আবিসিনিয়ায় হিযরত করলে আবিসিনিয়ার খ্রিস্টান রাজা নাজ্জাশী মুসলমানদেরকে আশ্রয় দিয়েছিলেন। এমন কি মুসলমানদের বিরুদ্ধে প্রেরিত কুরাইশদের একটি প্রতিনিধি দলের চক্রান্তকেও তিনি ব্যর্থতায় পর্যবসিত করেছিলেন। তাঁর এ বন্ধুত্বপূর্ণ আচরণ মুসলমানগণ কৃতজ্ঞতার সঙ্গে স্মরণ করে থাকে। আকাবা উপসাগরের মুখে অবস্থিত আয়ালার খ্রিস্টানদের সঙ্গে হযরত যে সন্ধি স্থাপন করেছিলেন, তা আগে উল্লেখ করা হয়েছে। বাৎসরিক ৩০০ দীনার জিয্য়া প্রদানের বিনিময়ে এদেরকে নিরাপত্তা ও রক্ষণাবেক্ষণের প্রতিশ্রুতি দেয়া হয়। নাজরানের খ্রিস্টানদের সঙ্গে হযরতের সন্ধির কথাও উল্লেখ করা হয়েছে। এ সন্ধি অনুসারে দু হাজার জামা তাদের কর ধার্য হল। তারা যুদ্ধের সময় মুসলমানদেরকে সাজসরঞ্জাম ও উট-ঘোড়া ধার দিতে অঙ্গীকারবদ্ধ হল। তাদের জান-মাল ও ধর্মকর্মের নিরাপত্তা সুনিশ্চিত করা হল। এ ছাড়া বিভিন্ন খ্রিস্টান সম্প্রদায়ের কাছে হযরত ইসলাম গ্রহণ, অন্যথায় জিয্য়া প্রদানের জন্য আহ্বান করে বহু চিঠিপত্র প্রেরণ করেন। সিরিয়ায় প্রেরিত হযরতের দূতের হত্যার ফলে বাই জান্টাইনদের বিরুদ্ধে প্রেরিত মুতা অভিযান (৬২৯ খ্রিঃ) ও পরে তবুক অভিযান (৬৩১ খ্রিঃ) আরবের অভ্যন্তরে বসবাসকারী খ্রিস্টানদের সঙ্গে হযরতের সম্পর্কের কোন ব্যত্যয় ঘটায়নি।

হযরতের জীবনের ঘটনাবলির আলোচনা হতে তাঁর বহুমুখী প্রতিভার পরিচয় পাওয়া যায়। তিনি ছিলেন একাধারে নবী, সমাজ সংস্কারক, রাজনীতিবিদ ও মানবের কল্যাণকামী মহাপুরুষ। নবী হিসেবেই তিনি সমধিক খ্যাত। বিশ্বমানবের এক-ষষ্ঠাংশ তার প্রচারিত ধর্মের অনুসারী হিসেবে দৈনিক পাঁচবার মিনারে মিনারে আল্লাহ্‌র মহিমা ঘোষণা করে তাঁর মহানবী জীবনের চরম সার্থকতার কথা প্রচার করছে। তাঁর প্রচারিত ধর্মের কল্যাণ এক যাদুর স্পর্শে আরবের শতধা-বিচ্ছিন্ন ও যুযুধান সম্প্রদায়সমূহ এক ধর্ম, এক আদর্শ ও এক নেতার পতাকাতলে এক নতুন মানবগোষ্ঠী হিসেবে জমায়েত হয়েছিল। অচিরেই তারা পারসিক ও বাইজান্টাইন সাম্রাজ্যদ্বয়কে পর্যুদস্ত করে সমগ্র মধ্যপ্রাচ্যের নেতৃত্ব গ্রহণ করে এবং বিশ্বের ইতিহাসে অপূর্ব শৌর্যবীর্য, মানবতাবোধ ও জ্ঞান-সাধনার অত্যুজ্জ্বল দৃষ্টান্ত স্থাপন করে।

গ্রন্থনির্দেশ

[৬ষ্ঠ ও ৭ম অধ্যায়ের জন্য]

১. Guillaume, A. : *Life of Muhammad* (ইবন হিশামের সিরাতের ইংরেজি তর্জমা) অক্সফোর্ড ইউনিভার্সিটি প্রেস, ১৯৫৫।

২. William Muir : *Life of Muhammad*, এডিনবার্গ, ১৯২৩।

৩. Montgomery Watt : *Muhammad at Mecca*. অক্সফোর্ড ইউনিভার্সিটি প্রেস, ১৯৬০।

৪. Montgomery Watt : *Muhammad at Medina* অক্সফোর্ড ১৯৫৬.

খুলাফা-ই-রাশিদীন

আবু বকর সিদ্দিক (রা) (৬৩২—৬৩৪ খ্রিঃ)
উমর ফারুক (রা) (৬৩৪—৬৪৪ খ্রিঃ)
উসমান গনী (রা) (৬৪৪—৬৫৬ খ্রিঃ)
আলী মুর্তজা (রা) (৬৫৬—৬৬১ খ্রিঃ)

আবুবকর সিদ্দিক (রা)

(৬৩২–৬৩৪ খ্রিঃ)

মদীনায় দশ বছর কর্মবহুল জীবন-যাপনের পর ৬৩২ খ্রিস্টাব্দের ৮ জুন হযরত মুহম্মদ (স) মহা প্রভুর সন্নিধানে মহাপ্রয়াণ করলেন। তাঁর আকস্মিক মৃত্যু তাঁর অনুরক্ত ও গুণমুগ্ধ ভক্তবৃন্দকে বিস্ময়াভিভূত ও বিমূঢ় করে তুলল। নেতার এ অপ্রত্যাশিত তিরোধানে হতবাক ও শোকাকুল জনতা মসজিদ-ই-নববীর প্রাঙ্গনে এসে সমবেত হতে আরম্ভ করল। হযরত উমর (রা) মনে করেছিলেন যে, হযরত (স)-এর মৃত্যু হয়নি; তিনি মূর্ছিত হয়েছেন মাত্র। উত্তেজিত কণ্ঠে তিনি ঘোষণা করলেন,–শীঘ্রই হযরতের মূর্ছার অবসান ঘটবে। হযরত আবু বকর (রা) সেই মুহূর্তে ঘটনাস্থলে উপস্থিত হয়ে আয়িশা (রা)-এর প্রকোষ্ঠে প্রবেশ করলেন এবং হযরতের মৃত্যু নিশ্চিত জেনে জনতাকে উদ্দেশ্য করে ঘোষণা করলেন, "যে মুহম্মদ (স)-এর উপাসনা করে তার জানা উচিত যে, মুহম্মদ মৃত্যুমুখে পতিত হয়েছে ঃ আর যে আল্লার উপাসনা করে তার জানা উচিত যে, আল্লাহ চিরঞ্জীব, তাঁর মৃত্যু নেই।" তারপর কুরআনের একটি আয়াত পাঠ করে তিনি সবাইকে বুঝিয়ে দিলেন যে, হযরত মুহম্মদ (স) একজন নবী ছিলেন এবং তাঁর আগে বহু নবী মৃত্যুমুখে পতিত হয়েছেন। মসজিদ-ই-নববীর প্রাঙ্গনে সমবেত জনতা শান্ত ও অবিচলভাবে এ নিষ্ঠুর মহাসত্য স্বীকার করে নিল।

হযরতের মৃত্যু

হযরত মুহম্মদ (স)-এর মৃত্যুর পর মুসলমানদের প্রথম ও প্রধান সমস্যা হল মদীনা রাষ্ট্রের জন্য কাউকে তাঁর স্থলাভিষিক্ত মনোনীত করা। এ বিষয়ে হযরত মুহম্মদ (স) কোন সুস্পষ্ট নির্দেশ দান করে যান নি। আরবের প্রথানুযায়ী গোত্রীয় প্রধানের পদ বংশানুক্রমিক ছিল না। কাজেই হযরত মুহম্মদ (স)-এর কোন পুত্রসন্তান বেঁচে থাকলে কি হত তা চিন্তা করা অপ্রাসঙ্গিক। হযরত মুহম্মদ (স)-এর মৃত্যুর অব্যবহিত পরেই সংবাদ পাওয়া গেল, আনসারগণ তাদের মধ্য হতে একজনকে নেতা নির্বাচন করবার জন্য এক জায়গায় সমবেত হয়েছে। হযরত আবু বকর (রা) ও হযরত উমর (রা) এ সংবাদে বিচলিত হয়ে পড়লেন এবং মুসলমানদের ঐক্য ও সংহতি রক্ষার জন্য উৎকণ্ঠিত হয়ে প্রধান সাহাবা হযরত আবু উবায়দাকে সঙ্গে নিয়ে আনসারদের সভাস্থলে উপস্থিত হলেন। আনসারগণ দাবি করল যে, তারাই হযরত মুহম্মদ (স)-কে আশ্রয় দান করেছে, মুহাজিরগণকে প্রতিপালন করেছে

আবুবকর (রা) খলিফা নির্বাচিত

এবং ইসলাম ধর্মকে সুপ্রতিষ্ঠিত করেছে। কাজেই মদীনার শাসনকর্তা তাদের মধ্য হতেই নির্বাচিত হবে। এমন কি সা'দ ইবন উবায়দা নামক একজন খজরজ নেতাকে তারা নেতা নির্বাচনের জন্য পছন্দ করেও নিয়েছে। হযরত আবু বকর (রা) ধীর অথচ দৃঢ় কণ্ঠে আনসারদের কথায় সায় দিয়ে বললেন যে, তাদের প্রতিটি দাবিই সত্যি কিন্তু নেতৃত্বের ব্যাপারে কুরাইশদের দাবি অগ্রগণ্য। কারণ যিনি হযরত মুহম্মদ (স)-এর স্থলাভিষিক্ত হবেন, তিনি শুধু মদীনার শাসকই হবেন না, সমগ্র আরব দেশের তিনি হবেন সর্বাধিনায়ক, আর সমগ্র আরব দেশের নেতৃত্বের জন্য একমাত্র কুরাইশগণই সর্বাপেক্ষা উপযুক্ত। আনসারদের কেউ কেউ প্রস্তাব করলেন যে, আনসার ও মুহাজিরদের মধ্য হতে দুজন নেতা নির্বাচিত হোক। নব প্রতিষ্ঠিত মুসলিম রাষ্ট্র ও মুসলিম সম্প্রদায় এতে দ্বিধাবিভক্ত হয়ে পড়বে এবং মহানবী মুহম্মদ (স)-এর সারা জীবনের সাধনাকে ব্যর্থতায় পর্যবসিত করবে এ আশংকায় প্রবীণ সাহাবাগণ প্রমাদ গুণলেন। বহুক্ষণ উভয় পক্ষে কথা কাটাকাটি হল। বিপদ দেখে হযরত আবু বকর (রা) এগিয়ে গেলেন এবং উমর ও আবু উবায়দার প্রতি নির্দেশ করে বলে উঠলেন যে, আনসার ও মুহাজিরগণ যেন এদের মধ্যে একজনকে নেতা বলে স্বীকার করে নেয়। কিন্তু তাঁরা উভয়েই এ কথার প্রতিবাদ করে হযরত আবু বকর (রা)-কেই নেতা বলে স্বীকার করে নিলেন এবং তাঁর হাত ধরে আনুগত্যের শপথ গ্রহণ করলেন। এটা দেখে বনু আওস আবু বকর (রা)-এর হাত ধরে বায়আৎ (আনুগত্যের শপথ) করল। এর পর খজরজ ও পরে মুহাজিরগণ অন্যান্য লোক একে একে হযরত আবু বকর (রা)-কে খলিফা (নবীর প্রতিনিধি) বলে স্বীকার করে নিল। হযরত মুহম্মদ (স) কাউকেই উত্তরাধিকারী মনোনয়ন করে যাননি বটে তবে তিনি যখন পীড়িত অবস্থায় মসজিদে নামাজের ইমামতী করতে অপারগ হলেন, তখন তিনি হযরত আবু বকরকে তাঁর পরিবর্তে নামাজ পড়াতে অনুমতি দিয়েছিলেন। তাই তাঁকে খলিফা বলে মেনে নিতে কারও কোন সঙ্কোচ বা দ্বিধা হয়নি। এভাবে হযরত আবু বকর (রা) মুসলিম রাষ্ট্রের প্রথম খলিফা নির্বাচিত হলেন।

পরদিন হযরত মুহম্মদ (স)-এর কাফন দাফন সম্পন্ন হল। হযরত আয়িশার প্রকোষ্ঠেই তাঁকে দাফন করা হল। অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া সমাপনান্তে হযরত আবু বকর (রা) মদীনার মসজিদের মিম্বরে উপবেশন করলেন এবং সমবেত জনতা তাঁকে খলিফা বলে স্বীকার করে নিল। তারপর তিনি দাঁড়ালেন এবং জনতাকে উদ্দেশ্য করে একটি সংক্ষিপ্ত ভাষণ দান করলেন।

আবুবকরের প্রথম ভাষণ

তিনি বললেন, "ওহে জনগণ, আমি তোমাদের শাসক নিযুক্ত হয়েছি কিন্তু আমি তোমাদের মধ্যে শ্রেষ্ঠ নই। যদি আমি ভাল করি, তোমরা আমার সহায়তা করো, যদি মন্দ চলি, আমাকে শুধরিয়ে দিও। তোমরা সত্যানুরাগী হবে, কারণ সত্যানুরাগ আনুগত্যের শামিল; মিথ্যাকে পরিহার করবে, কারণ মিথ্যাবাদিতা বিদ্রোহের শামিল। তোমাদের মধ্যে যে দুর্বল, সে আমার কাছে শক্তিশালী—

যতক্ষণ পর্যন্ত আমি তার অধিকার সুপ্রতিষ্ঠিত না করব আর শক্তিশালী ব্যক্তি আমার বিবেচনায় দুর্বল বলে প্রতীয়মান হবে,—যতক্ষণ না খোদার ইচ্ছায় আমি তার কাছ থেকে (দুর্বলের) অধিকার আদায় করব। আল্লাহর রাস্তায় জিহাদ হতে বিরত থেকো না, কারণ যে জিহাদ হতে বিরত থাকবে আল্লাহ্ তাঁকে অপমানিত করবেন। .... যতক্ষণ আমি আল্লাহ্ ও আল্লাহর রসূলের অনুগত থাকি, ততক্ষণ তোমরাও আমার অনুগত থাকবে, যখন আমি তাঁদের অবাধ্য হই, তখন তোমাদের আনুগত্যের কোন অধিকার আমার নেই। এখন নামাজের জন্য দণ্ডায়মান হও। খোদা তোমাদের মঙ্গল করুন।" জনতা নামাজের জন্য দণ্ডায়মান হল এবং হযরত আবু বকর (রা) খলিফা হিসেবে সর্বপ্রথম নামাজের ইমামতী করলেন।

খুলাফা-ই রাশিদীন

হযরত আবু বকর (রা) ইসলামের ইতিহাসে খুলাফা-ই-রাশিদীনের (সত্য পথে পরিচালিত খলিফাগণ) সর্বপ্রথম খলিফা। তাঁর ও তাঁর পরবর্তী তিনজন খলিফার শাসনকালকে খুলাফা-ই-রাশিদীনের যুগ বলা হয়। এরা সবাই হযরত মুহম্মদ (স)-এর নিকটতম ও প্রিয়তম সাহাবা ছিলেন এবং তাঁরই শিক্ষা ও আদর্শ এঁদেরকে সরাসরিভাবে প্রভাবিত করেছিল এবং তাঁরই প্রদর্শিত পথে এঁরা শাসনকার্য পরিচালনা করেছিলেন। সেই জন্যই এঁদেরকে খুলিফা-ই-রাশিদীন বা সত্য পথে পরিচালিত খলিফা বলা হয়।

উসামার অভিযান

খলিফা হয়েই হযরত আবু বকর (রা)-এর প্রথম কর্তব্য হল হযরত মুহম্মদ (স)-এর অন্তিম ইচ্ছেকে কার্যে পরিণত করা। মুতার অভিযানে নিহত জায়দ ও অন্যান্য শহীদানের হত্যার প্রতিশোধের উদ্দেশ্যে হযরত মুহম্মদ (স) তাঁর শেষ পীড়ার আগে জায়দের পুত্র উসামাকে সিরিয়া সীমান্তে প্রেরণের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছিলেন। হযরতের অসুস্থতা ও মৃত্যুর জন্য এ অভিযান কার্যকরী করা সম্ভব হয়নি। হযরত আবু বকর (রা) খলিফা পদে অধিষ্ঠিত হওয়ার পরবর্তী দিবসে উসামাকে সৈন্য সমাবেশের আদেশ দান করলেন। হযরত মুহম্মদ (স)-এর মৃত্যু সংবাদ চর্তুদিকে ছড়িয়ে পড়বার সঙ্গে সঙ্গে আরব সম্প্রদায়সমূহ মদীনার আনুগত্য অস্বীকার করে দিকে দিকে বিদ্রোহের পতাকা উড়িয়ে দিল। চতুর্দিক হতে এ সব দুঃসংবাদ রাজধানী মদীনায় এসে পৌঁছতে লাগল। খলিফাকে রাজধানী শহরে অরক্ষিত অবস্থায় ফেলে উত্তরাঞ্চলে অভিযান প্রেরণ অনেকের বিবেচনায় অদূরদর্শিতা ও হঠকারিতা ব্যতীত আর কিছুই ছিল না। হযরত উমর (রা) খলিফার কাছে বিনীতভাবে নিবেদন করলেন যে, এ অভিযান মদীনার জন্য ও খলিফার জন্য বিপজ্জনক হতে পারে। আর যদি নিতান্তই এ অভিযান প্রেরণ করতে হয়, তবে উসামার চেয়ে বয়স্ক ও অভিজ্ঞ কারও নেতৃত্বে যেন পাঠান হয়। প্রথম দাবির জওয়াবে আবু বকর

(রা) বললেন, "যদি চতুর্দিক হতে নেকড়ে বাঘের দল মদীনার উপর ঝাঁপিয়ে পড়ে আর আমি নির্জন ও একা পড়ে থাকি তবুও অভিযান যাবেই। প্রভু মুহম্মদ (স)-এর মুখ-নিঃসৃত একটি বাক্যও অযথা যেতে পারে না।" দ্বিতীয় দাবির উত্তরে আবু বকর (রা) বললেন যে, যাঁকে হযরত নিজে সেনাপতি নিযুক্ত করেছেন, তাঁকে পদচ্যুত করে অন্য কাউকেই নিযুক্ত করার ধৃষ্টতা তাঁর নেই। আসন্ন বিপদের মুখে সিরিয়ায় অভিযান প্রেরণ মদীনা রাষ্ট্রের শত্রুদের মনে এ প্রতীতি জন্মাল যে, আবু বকর (রা) মদীনার রক্ষা ব্যবস্থা অসম্পূর্ণ রেখে দূরে এ অভিযান প্রেরণ করেন নি।

রিদ্দার যুদ্ধ বা ধর্মত্যাগীদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ

হযরত মুহম্মদ (স)-এর মৃত্যুর পর বহুলোক মদীনা রাষ্ট্রের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ঘোষণা করল। আবু বকর (রা) খিলাফত কালের অধিকাংশ সময় এ বিদ্রোহীদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ-বিগ্রহে কেটে যায়। এ যুদ্ধকে রিদ্দার যুদ্ধ বা ধর্ম ত্যাগীদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ বলা হয়। হযরতের জীবদ্দশায় আরবের বিভিন্ন স্থানে ভণ্ডনবীদের আবির্ভাব হয়। চতুর্দিক হতে এ সময় বিদ্রোহের সংবাদ মদীনায় পৌঁছতে লাগল। হযরত মুহম্মদ (স)-এর কর্মচারী ও শাসনকর্তাগণ নিজ নিজ স্থান হতে বিতাড়িত হলেন। মুসলমানগণ শত্রুদের হাতে নিহত হতে লাগল। দেখতে দেখতে বিদ্রোহের দাবানল সমগ্র আরব উপদ্বীপে ছড়িয়ে পড়ল। হযরত আয়িশা (রা) বলেন, "যখন নবীজি মৃত্যুমুখে পতিত হলেন, তখন আরবগণ ধর্মত্যাগ করল, ইহুদি ও খ্রিস্টানগণ মাথা চাড়া দিয়ে উঠল এবং বিদ্রোহ দেখা দিল। মুসলমানগণ নবীর মৃত্যুতে শীত শর্বরীতে বর্ষণসিক্ত মেষপালের মত হয়ে পড়ল। অবশেষে আল্লাহ্ তাদেরকে আবু বকর (রা)-এর নেতৃত্বাধীনে একত্রিত করলেন।" প্রকৃতপক্ষে হযরতের জন্মভূমি হিজায ও এর পার্শ্ববর্তী এলাকাসমূহ ছাড়া আরবের অন্যান্য অঞ্চলে ইসলাম ধর্ম ব্যাপকভাবে প্রচারিত হয়নি। স্থানে স্থানে বেদুঈনগণ শুধু নামমাত্রই ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করেছিল। কোন কোন অঞ্চলে নেতৃস্থানীয় দুই একজন লোক ইসলাম গ্রহণ করেছিল। দূরাঞ্চলে ইয়ামন, ইয়ামামা ও উমানে গোত্রের সর্দারগণই ইসলাম ধর্মে দীক্ষিত হয়েছিল, জনসাধারণের মধ্যে ইসলামের মর্মবাণী পৌঁছাবার জন্য অধিক সংখ্যায় ধর্মপ্রচারক প্রেরণ অল্পসময়ের মধ্যে সম্ভব হয়ে ওঠেনি। হযরতের মৃত্যুর মাত্র দুই তিন বছর আগে সমগ্র আরব উপদ্বীপের আরব গোত্রসমূহ হযরতের ও মদীনা রাষ্ট্রের আনুগত্য স্বীকার করে নিয়ে ছিল। এ আনুগত্য বহুক্ষেত্রে মূলত রাজনৈতিক আনুগত্য। এরা কালক্রমে হয়ত ধর্মীয় শিক্ষা লাভ করে মুসলমান হতে পারত কিন্তু হযরতের মৃত্যুর

সুযোগে বিভিন্ন দলপতিগণ মদীনা রাষ্ট্রের আনুগত্য অস্বীকার করে বসল। যারা মাত্র কিছু দিন আগে হযরতের রাজ শক্তির ভয়ে অথবা মদীনা রাষ্ট্রে সুযোগ-সুবিধা লাভের আশায় ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করেছিল, তারা তাদের পূর্ব ধর্মে ফিরে যেতে লাগল। এ ভাবে ধর্মত্যাগীদের যুদ্ধ প্রকৃতপক্ষে এক বিরাট বিদ্রোহ আন্দোলনের রূপ পরিগ্রহ করল। নানা কারণে এ বিদ্রোহ

কারণ সংঘটিত হয়। এর মধ্যে হযরত মুহম্মদ (স)-এর মৃত্যুই বিদ্রোহের প্রথম ও প্রধান কারণ। হযরতের অসাধারণ ব্যক্তিত্ব ও অপূর্ব সাংগঠনিক ক্ষমতা তাঁর মৃত্যুর আগে সমগ্র আরব উপদ্বীপকে তাঁর কর্তৃত্বাধীনে একত্রিত করেছিল। তাঁর মৃত্যুতে আরব সর্দারগণ মনে করল যে হযরত

হযরতের মৃত্যু মুহম্মদ (স)-এর সাথে সন্ধি বা চুক্তি ছিল ব্যক্তিগত। তাঁর মৃত্যুতে সেই সব চুক্তি বা সন্ধির অবসান ঘটেছে। এতদ্ব্যতীত আরও নানাবিধ রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক ও ধর্মীয় কারণে আরবদের মধ্যে বিদ্রোহ দেখা দেয়। বিভিন্ন লোক বিভিন্ন কারণে ও বিভিন্ন উদ্দেশ্য প্রণোদিত হয়ে মদীনা রাষ্ট্রের বিরুদ্ধে বিদ্রোহের পতাকা তুলে ধরলো।

আরব দেশে হযরতের পূর্বে কোনকালেই সমগ্র উপদ্বীপের উপর একটি কেন্দ্রীয় সরকার স্থাপিত হয়নি। আরবের গোত্রসমূহ যুগ যুগ ধরে নিজেদের

রাজনৈতিক কারণ আবাস ভূমিতে শতধা বিচ্ছিন্ন অবস্থায় বসবাস করত। গোত্রীয় যুদ্ধ বিগ্রহ আরবের নিত্য নৈমিত্তিক ব্যাপার ছিল। তাই হযরতের মৃত্যুর পর গোত্রগুলি আবার কেন্দ্রীয় সরকারের আনুগত্য অস্বীকার করে আগের অবস্থায় ফিরে যেতে চাইল। আবার গোত্রীয় ও স্থানীয় আনুগত্য প্রাধান্য লাভ করল। মদীনার প্রাধান্য, কুরাইশ ও আনসারদের কর্তৃত্ব আরবগণ মানতে চাইল না। অথচ মুসলমান হলেই তাকে মদীনা রাষ্ট্রের আনুগত্যও স্বীকার করে

অর্থনৈতিক কারণ নিতে হত। আরববাসীরা আবহমান কাল হতে শুধু যে কোন সরকারের কর্তৃত্ব স্বীকার করেনি তা নয় বরং তারা কাউকেই কোন প্রকার করদানেও অভ্যস্ত ছিল না। হযরতের মৃত্যুর সাথে সাথে ও অন্যান্য কর বন্ধ করে দেয়া হল। জাকাতের সামাজিক মূল্য ও উপকারিতা তাঁরা উপলব্ধি করতে না পেরে জাকাত প্রদানকে এক বিরাট বোঝার শামিল মনে করতে লাগল। তুলায়হা নামক একজন ভণ্ড নবীর সমর্থকগণ হযরত আবু বকর (রা)-এর নিকট এ মর্মে এক প্রস্তাব পাঠাল যে, তারা ইসলাম ধর্মের রীতিনীতি মেনে চলতে রাজি থাকবে যদি শুধু তাদেরকে জাকাত হতে অব্যাহতি দেয়া হয়। মদীনার কোন কোন নেতা বিপদের ভয়াবহতার কথা বিচার করে এদের সাথে সমঝোতায় পৌঁছতে আগ্রহ প্রকাশ করলেন কিন্তু হযরত আবু বকর (রা) এদের প্রস্তাবকে ঘৃণা-ভরে প্রত্যাখ্যান করে বললেন, "যদি তোমরা জাকাতের উটের

একটি খুঁটাও ধরে রাখ, তথাপি এর জন্য আমি তোমাদের সাথে যুদ্ধ করব।" আবু বকর (রা) সত্যিই উপলব্ধি করতে পেরেছিলেন যে, একটি ব্যাপারে একবার নিষ্পত্তি হলে আরও অনেক ব্যাপারেই এমন করতে হবে এবং অবশেষে আপোষ-রফা হতে হতে ইসলাম ধর্ম সমূলে লোপ পাবে।

ধর্মীয় কারণ

ধর্মীয় ব্যাপারে আরবগণ ছিল অতিমাত্রায় বস্তুতান্ত্রিক। মরুভূমির মুক্ত ও স্বাধীন আবহাওয়ায় প্রতিপালিত হয়ে তারা উচ্ছৃঙ্খল জীবন যাপনে অভ্যস্ত ছিল। ইসলামের বিধি-নিষেধ গুলি তাদের ঐহিক ও পারত্রিক কল্যাণ সাধনে নিতান্ত সুফলপ্রদ হলেও এটা পরখ করে দেখবার মত তাদের সুযোগ ও অবকাশ কোথায়? অজু, নামাজ, রোজা প্রভৃতি ধর্মীয় বিধান তাদের স্বাধীন জীবনে অগণিত প্রতিবন্ধকের মত বোধ হতে লাগল। তাই হযরতের মৃত্যুতে সুযোগ পেয়ে তারা বিদ্রোহ ঘোষণা করল। আবার কোন কোন লোক নবী হিসেবে হযরত মুহম্মদ (স)-এর বিরাট সাফল্যে ঈর্ষাপরাপয়ণ হয়ে উঠল। তারা দেখল হাশিম গোত্রের নবী মুহম্মদ (স) একটি নতুন ধর্ম প্রচারের মাধ্যমে সমগ্র আরব উপদ্বীপে নিজের প্রাধান্য বিস্তারে সক্ষম হয়েছে। তারা আপন আপন গোত্রে নবী সেজে অনুরূপ সাফল্য অর্জন করতে বদ্ধপরিকর হল। আরবের বিভিন্ন স্থানে বহু ভণ্ড নবীর আবির্ভাব হল। এদের কেউ কেউ হযরতের জীবদ্দশায়ও আত্মপ্রকাশ করেছিল। আরব উপদ্বীপের মধ্যবর্তী অঞ্চলে ইয়ামামা নামক স্থানে বনু হানীফা গোত্রের মুসায়লামা এদের অন্যতম। কথিত আছে, মুসায়লামা হযরতের (স)-এর নিকট এই মর্মে এক চিঠি লিখেছিল, "পৃথিবীর একার্ধ তোমার হোক, অপরার্ধ আমার হোক।" উত্তরে হযরত মুহম্মদ (স) লিখেছিলেন, "আল্লার নবী মুহম্মদ (স)-এর কাছ থেকে মিথ্যুক মুসায়লামার কাছ, পৃথিবীর মালিক আল্লাহ্, তিনি যাকে খুশি এর উত্তরাধিকার দান করেন।" মুসায়লামা বনু-তমীমের সাজা নাম্নী খ্রিস্টান মহিলার পাণি গ্রহণ করে ইসলামের বিরুদ্ধে অসি ধারণ করল। সাজাও নবুয়ত দাবি করেছিল। অপর ভণ্ড নবীর নাম ছিল তুলায়হা। সে বনু আসাদ ও বনু গাতাফানের নবী ছিল। যতদূর জানা যায়, এরা ইসলামের কয়েকটি আচার ও রীতিনীতি নিজের মনগড়া ভাষায় লোকদের সম্মুখে উপস্থাপিত করেছিল। এ গুলির মধ্যে এমন কোন মাহাত্ম্য ছিল না বা জনসাধারণ এ সমস্তের প্রতি কোন আকর্ষণ বোধ করেনি। তাদের সাময়িক সাফল্য আপন আপন গোত্রীয় আনুগত্যের ফলেই সম্ভবপর হয়েছিল।

রিদ্দার যুদ্ধ

হযরত আবু বকর (রা)-এর দূরদর্শিতা ও অনমনীয় মনোভাব ইসলামকে চরম বিপদের হাত থেকে রক্ষা করল। জাকাত অস্বীকারকারীদের প্রতি আবু বকর (রা)-এর মনোভাবের কথা আগেই উল্লেখ করা হয়েছে। ধর্মত্যাগী ও

বিদ্রোহীদের প্রতি আবু বকর (রা)-এর নীতি উক্ত ঘটনা থেকেই বোঝা যায়। তিনি দাবি করলেন, বিদ্রোহীরা হয় আত্মসমর্পণ করবে আর না হয় তাদের বিরুদ্ধে অবিরাম যুদ্ধ চালিয়ে তাদেরকে নিশ্চিহ্ন করে দেয়া হবে। এ বিরাট বিপদের মুখে হযরত আবু বকর (রা) বিন্দুমাত্র বিচলিত হলেন না। উসামার যুদ্ধ যাত্রার পর বনু আবস ও বনু জুবয়ানের লোকেরা মদীনা আক্রমণ করতে উদ্যত হল। তারা দু দলে বিভক্ত হয়ে একদল রাবাজায় ও অন্য দল জুল-কাস্‌সায় সমবেত হল। হযরত আবু বকর (রা) মদীনা রক্ষার আশু ব্যবস্থা করলেন। পার্শ্ববর্তী অনুগত সম্প্রদায়ের লোকদেরকে ডেকে পাঠান হল এবং মদীনার বিভিন্ন প্রবেশ পথে প্রহরী নিযুক্ত করা হল।

জুল কাস্‌সা থেকে শত্রুদল মদীনার উপর আক্রমণ চালাল কিন্তু মুসলমানদের সচকিত প্রহরা ও রক্ষা ব্যবস্থার ফলে শহরের কিছু ক্ষতি করতে পারল না। আবু বকর (রা) স্বয়ং মদীনা থেকে অগ্রসর হয়ে একটি সুসজ্জিত ক্ষুদ্র বাহিনীর সাহায্যে একদিন প্রত্যূষে শত্রুদের শিবির আক্রমণ করে তাদেরকে জুল-কাস্‌সা থেকে বিতাড়িত করলেন। এ সামান্য ঘটনায় মদীনার সম্মান পুনঃপ্রতিষ্ঠিত হল। সৈন্য সামন্ত ছাড়া শত্রু সৈন্যের এ শোচনীয় পরাজয়ের কথা দিকে দিকে ছড়িয়ে পড়ল। কিছু কিছু সম্প্রদায়ের সর্দারগণ জাকাত নিয়ে আসতে শুরু করল। বনু তমীম ও বনু তায়ীর লোকেরাই সর্ব প্রথম জাকাত দিতে আসল। হযরত আবু বকর (রা) বললেন, "এরা শুভ-সন্দেশ বাহী, এরাই প্রকৃত মানুষ ও ধর্মের রক্ষক।" ইতিমধ্যে উসামা তাঁর সফল অভিযান সমাপনান্তে মদীনায় প্রত্যাবর্তন করলেন। শত্রুরা জুলকাস্‌সা থেকে বিতাড়িত হয়ে রাবাজায় সমবেত হল এবং কয়েকজন মুসলমানকে হত্যা করে তাদের প্রতিশোধ স্পৃহা চরিতার্থ করল। হযরত আবু বকর (রা) এবার উসামাকে মদীনা রক্ষার ভার দিয়ে একটি ক্ষুদ্র বাহিনী নিয়ে রাবাজা অভিমুখে রওয়ানা হলেন। খলিফার জীবনাশঙ্কায় ভীত ও অনুরক্ত ভক্তগণ বারংবার তাকে স্বয়ং যুদ্ধ পরিচালনার দায়িত্ব গ্রহণ করতে নিষেধ করল। কিন্তু তিনি সব অনুরোধ উপেক্ষা করে শত্রু সৈন্যের ওপর আপতিত হলেন। তারা সম্পূর্ণভাবে পরাজিত হল, কিছু লোক নিহত ও কিছু বন্দী হল। আবস ও জুবয়ান গোত্রের লোকেরা পালিয়ে বুজাখায় তুলায়হার সৈন্যদলে যোগ দান করল। খলিফা মুসলমানদের প্রাথমিক বিজয়ে সন্তুষ্ট হয়ে মদীনায় ফিরে আসলেন। মদীনা সর্বপ্রকারের বিপদ হতে মুক্ত হল। পার্শ্ববর্তী অঞ্চলের গোত্রসমূহ আবার জাকাত পাঠিয়ে মদীনার বশ্যতা স্বীকার করে নিল। কিন্তু খলিফার সামনে তখনও অথৈ

মদীনা আক্রান্ত

মদীনা বিপদ মুক্ত

পাথার। দূর দূরান্তে বিদ্রোহীরা তখনও ইসলামের নাম নিশানা মুছে ফেলতে বদ্ধ পরিকর। সমগ্র আরব উপদ্বীপে ইসলাম ধর্মকে সুপ্রতিষ্ঠিত করতে হবে। হযরতের অন্তিম ইচ্ছা—"আরব দেশে দ্বিতীয় আর কোন ধর্ম থাকতে পারবে না।" ভণ্ড নবীদেরকে দমন করতে হবে। ধর্মত্যাগীদেরকে ইসলাম ধর্মে ফিরিয়ে আনতে হবে কিংবা তাদেরকে নির্মূল করতে হবে। বিদ্রোহের মূল্যোৎপাটন করে আরব উপদ্বীপে ইসলামের বিজয় বৈজয়ন্তী উড্ডীন করতে হবে।

বিদ্রোহীদের বিরুদ্ধে অভিযান

হযরত আবু বকর (রা) জুল-কাস্‌সায় সব সৈন্য সমাবেশ করলেন। অনুগত গোত্রগুলিকে সেখানে ডেকে পাঠালেন এবং সমগ্র মুসলিম সৈন্য বাহিনীকে একাদশটি পৃথক দলে বিভক্ত করে প্রতি দলের জন্য একজন সেনাপতি নিযুক্ত করলেন। এদের প্রত্যেককে তিনি একটি একটি পতাকা দান করলেন এবং বিশিষ্ট এলাকায় ধর্মীয়ত্যাগীদের দমন করতে আদেশ দিলেন। রিদ্দার যুদ্ধে আল্লার অসি খালিদ ইবন ওয়ালীদ বিশেষ প্রশংসনীয় ভূমিকা গ্রহণ করেছিলেন। তিনি প্রথমত, তুলায়হাকে দমন করার ভারপ্রাপ্ত হলেন। ইকরিমা এবং সুরাহবিল মুসায়লামার বিরুদ্ধে প্রেরিত হলেন। মুহাজিরকে ইয়ামনে, আল-আলাকে বাহরাইনে, হুজায়ফাকে মাহরায় এবং আমরকে বনু কুজাআর বিরুদ্ধে প্রেরণ করা হল। এভাবে মদীনা রক্ষার জন্য সামান্য সৈন্য রেখে হযরত আবু বকর (রা) যুগপৎ বিভিন্ন অঞ্চলে অভিযান প্রেরণ করলেন। হযরত আবু বকর (রা) মদীনায় প্রত্যাবর্তন করে ধর্ম-ত্যাগীদের প্রতি এক পরোয়ানা জারি করলেন। যারা তওবা (অনুশোচনা) করে আত্মসমর্পণ করবে তাদেরকে ক্ষমা করে ইসলাম ধর্মে ফিরিয়ে নেয়া হবে। যারা অস্বীকার করবে, তাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ চালিয়ে যাওয়া হবে এবং তাদের যোদ্ধাগণকে হত্যা করা হবে। মেয়ে লোক ও শিশুদেরকে বন্দী করা হবে (অক্টোবর, ৬৩২ খ্রিঃ)।

'আল্লার অসি' খালিদ প্রথমে বনু তায়ীর লোকদেরকে বশে আনলেন। তারপর তিনি তুলায়হাকে বুজাখার যুদ্ধে পরাজিত করেন। তুলায়হা সস্ত্রীক সিরিয়ায় পলায়ন করল। তুলায়হার সম্প্রদায় বনু আসাদ খালিদের কাছে আত্মসমর্পণ করল এবং ইসলাম ধর্মে ফিরে আসল। পার্শ্ববর্তী অন্যান্য গোত্রের লোকেরাও আত্মসমর্পণ করল। এর পর খালিদ বনু তমীমের বিরুদ্ধে অগ্রসর হলেন। স্ত্রী নবী সাজা মেসোপোটেমিয়া হতে তগলিব ও অন্যান্য খ্রিস্টান গোত্রের লোকজনকে নিয়ে বনু তমীমের আবাস ভূমিতে এসে পৌছল। সেখানে তমীমের লোকেরা তাকে নবী বলে স্বীকার না করায় সাজা ইয়ামামায় পলায়ন করে মুসায়লামার সাথে যোগদান করল। ইয়ামামার হানীফা গোত্রের ৪০,০০০ লোক মুসায়লামার নেতৃত্বে বিদ্রোহ ঘোষণা করেছিল। মুসায়লামা ইতিমধ্যে সাজাকে উপযুক্ত আড়ম্বর আয়োজনের সাথে বিবাহ করে ইয়ামামার অর্ধেক রাজস্ব মোহর

হিসেবে দিতে অঙ্গীকারাবদ্ধ হল। ইকরিমা ও সুরাহবিল ইয়ামামার বিদ্রোহ দমন করতে গিয়ে মুসায়লামার হাতে পরাজিত হলেন। তখন খলিফা হযরত আবু বকর (রা) খালিদকে মুসায়লামার বিরুদ্ধে প্রেরণ করলেন।

রিদ্দার যুদ্ধের সর্বাপেক্ষা উল্লেখযোগ্য ও গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা ইয়ামামার যুদ্ধ। বনু হানীফার লোকেরা মুসলমানদের সাথে বীর বিক্রমে যুদ্ধ করল। মুসলমানগণও সর্বশক্তি নিয়োগ করে শত্রুর আক্রমণ প্রতিরোধ করল। মুসায়লামা ও তার সঙ্গীরা যুদ্ধক্ষেত্র হতে পলায়ন করে প্রাচীর পরিবৃত্ত উদ্যান-নগরীতে আশ্রয় গ্রহণ করল এবং মুসলমানদের সম্মুখে নগরদ্বার বন্ধ করে দিল। মুসলমানগণ তাদের একজন দুর্ধর্ষ বীর পুরুষকে প্রাচীরের উপর উঠিয়ে দিল। তিনি অতর্কিতে নিচে লাফিয়ে পড়ে ডানে ও বামে তরবারী চালনা করলেন এবং নগরদ্বার খুলে দিলেন। মুসলমানগণ উত্তাল তরঙ্গের মত নগরীর অভ্যন্তরে প্রবেশ করে হত্যাকাণ্ড আরম্ভ করল। স্বল্প পরিসর স্থানে বহু-লোকের ভিড়াভিড়িতে বনু হানীফার লোকেরা অগণিত সংখ্যায় মৃত্যুবরণ করল। মুসায়লামা দশ সহস্র অনুচর সহ নিহত হল। মুসলমানদের প্রায় বার শত লোক মৃত্যু বরণ করল। এ যুদ্ধে বহু কুরআনের হাফিজ শহীদ হয়েছিলেন। মদীনার ঘরে ঘরে শোকের কালো ছায়া নেমে আসল। আনসার ও মুহাজিরদের কোন গৃহ বাকি ছিল না যেখানে কারও মৃত্যুতে বিলাপ ধ্বনি শ্রুতিগোচর হয়নি। বনু হানিফার লোকেরা এর পর আত্মসমর্পণ করে ইসলাম ধর্মে ফিরে আসল।

ইয়ামামার যুদ্ধ
৬৩৩ খ্রিঃ

অন্যান্য সেনাপতিগণ আরব উপদ্বীপের বিভিন্ন স্থানে ধর্মত্যাগীদের সাথে ঘোরতর যুদ্ধে ব্যাপৃত হলেন। সেনাপতি আলা বাহরাইনের বিদ্রোহীদেরকে পরাজিত করলেন। এ যুদ্ধে মুসান্না নামক একজন স্থানীয় যোদ্ধা বিশেষ প্রশংসনীয় ভূমিকা গ্রহণ করেছিলেন। হুজায়ফা ও ইকরিমা সম্মিলিতভাবে উমাল দখল করলেন। অতঃপর সেনাপতি ইকরিমা সেনাপতি মুহাজিরকে ইয়ামন ও হাজরামাউত অভিযানে সাহায্য করবার জন্য রওয়ানা হলেন। ইতিমধ্যে ইয়ামনের ভণ্ডনবী আসওয়াদের মৃত্যু হয়েছে। কিন্তু বিদ্রোহিগণ মদীনা সরকারের আনুগত্য অস্বীকার করেই চলল। অবশেষে এদের মধ্যে এক গৃহ-বিবাদের ফলে কয়স ও আমর নামক দুইজন প্রতিদ্বন্দ্বী দলপতি মুহাজিরের হাতে বন্দী হল। ইয়ামন মুসলমানদের দখলে আসল। হাজারামাউতের লোকেরা প্রাচীন কিন্দা বংশের যুবরাজ আশ'আশের নেতৃত্বে মুসলমানদের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ঘোষণা করল। কিন্তু মুহাজির ও ইকরিমার সম্মিলিত বাহিনীর কাছে তারা সম্পূর্ণভাবে পরাজিত হল এবং আশ্‌আশ বন্দী হয়ে হযরত আবু বকর (রা)-এর কাছে মদীনায় নীত হল। এভাবে সমগ্র আরব উপদ্বীপে বিদ্রোহ প্রশমিত হল। হযরত আবু বকর (রা)-এর খিলাফতের প্রথম বছর এভাবে অতিবাহিত হল।

রিদ্দার যুদ্ধে মুসলমানদের বিজয়ের ফলে সমগ্র আরব উপদ্বীপ ইসলাম ধর্মে ফিরে আসল এবং সর্বত্র মদীনা রাষ্ট্রের প্রাধান্য প্রতিষ্ঠিত হল। হযরত মুহম্মদ

ফল (স)-এর সময় একবার মোটামুটিভাবে এ অধিকার প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল। তাঁর মৃত্যুর সুযোগে আরব গোত্রসমূহ আবার নিজ নিজ গোত্রীয় আধিপত্য ও প্রাধান্য পুনঃ প্রতিষ্ঠিত করতে প্রয়াসী হল। তাদের এ প্রচেষ্টা শুধু যে কেবল ব্যর্থতায় পর্যবসিত হল তা নয় সমগ্র আরব উপদ্বীপ পুনরায় ইসলামের পতাকাতলে একতাবদ্ধ হল। অন্যপক্ষে এ যুদ্ধে মুসলমানদের পরাজয় ঘটলে হয়ত ইসলামের নাম-নিশানা পৃথিবীর বুক হতে চিরতরে মুছে যেত। এ যুদ্ধ বিজয়ের কৃতিত্ব দুঃসাহসী ও অমিত বিক্রম আরব বীর পুরুষদের কিন্তু প্রধান কৃতিত্ব হযরত আবু বকর (রা)-এর যিনি ধর্মে স্থির, কর্মে নিরলস ও সঙ্কটে অবিচল ছিলেন। বিদ্রোহীদের প্রতি তার কঠোর আপোষবিহীন মনোভাবের ফলেই ইসলাম সুনিশ্চিত ধ্বংসের হাত থেকে রক্ষা পেল। "তিনি না হলে ইসলাম বেদুঈন গোত্রসমূহের সঙ্গে আপোষ রফা করে মিলিয়ে যেত অথবা খুব সম্ভব আঁতুড় ঘরেই ধ্বংস প্রাপ্ত হত।"১* রিদ্দার যুদ্ধের সুদূর প্রসারী ফল সমগ্র মধ্যপ্রাচ্যে আরবদের অধিকার প্রতিষ্ঠা ও সাম্রাজ্য বিস্তার। আরব উপদ্বীপে বিদ্রোহ দমনে যে যে যুদ্ধকৌশল, শৌর্যবীর্য ও নেতৃত্ব প্রদর্শিত হয়েছিল বাইজান্টাইন ও সাসানীয় সাম্রাজ্যের সাথে যুদ্ধে তা-ই তাদেরকে নিশ্চিত বিজয়ের পথে পরিচালিত করেছিল।

বাইজান্টাইন ও সাসানীয় সাম্রাজ্যের সাথে যুদ্ধ

রিদ্দার যুদ্ধের পরিসমাপ্তির পর উত্তরে বাইজান্টাইন সাম্রাজ্য ও পূর্বে পারসিক সাম্রাজ্যের সাথে মুসলমানদের সংঘর্ষ অনিবার্য হয়ে ওঠে। নানা কারণে এ যুদ্ধ সংঘটিত হয়। বাইজান্টাইন ও সাসানীয় সাম্রাজ্যদ্বয় বহুকাল যাবৎ পরস্পর যুদ্ধে লিপ্ত থেকে নিজেদের শক্তি ক্ষয় করেছিল। উভয় সাম্রাজ্যই বিলাসিতা, দুর্নীতি, অত্যাচার ও ধর্মীয় কোন্দলের ফলে অবনতির প্রায় শেষ সীমায় পৌছেছিল। যুদ্ধের ব্যয়ভার বহনের উদ্দেশ্যে উভয় সাম্রাজ্যে প্রজাদের ওপর ক্রমবর্ধমান করের বোঝা চাপিয়ে দেয়া হয়েছিল। এতে সরকারের প্রতি তাদের আনুগত্য ক্রমান্বয়ে শিথিল হতে থাকে। আরবের উত্তরাঞ্চলে বাইজান্টাইন সম্রাটগণ বহু আরব গোত্রকে ভাতা ইত্যাদি প্রদান করে তাদেরকে বশে রেখেছিল কিন্তু সাম্প্রতিক কালে এ বৃত্তি-ভাতা বন্ধ করে দেয়া হয়। বাইজান্টাইন ও সাসানীয় সাম্রাজ্যের এ সব দুর্বলতার ফলে মধ্যপ্রাচ্যে যে রাজনৈতিক শূন্যতার সৃষ্টি হয়েছিল যে কোন শক্তিশালী জাতি বা গোষ্ঠী দ্বারা তখন ঐ শূন্যতা পূর্ণ হত। ঠিক এ সময়ই আরববাসীরা প্রথমে হযরত মুহম্মদ (স)-এর নেতৃত্বে ও পরে হযরত আবু বকর (রা)-এর নেতৃত্বে ইসলাম ধর্মের মাধ্যমে একত্রিত ও

---

*১. উইলিয়াম ম্যুরঃ *কেলিফেট*, ১৪।

সংঘবদ্ধ হয়ে একটি নতুন শক্তিশালী জাতিতে পরিণত হয়। প্রকৃতির স্বাভাবিক নিয়মেই তারা দুর্বল ও পতনোন্মুখ সাম্রাজ্যদ্বয়ের স্থান দখল করবে এতে কোন সন্দেহ নেই।

কিন্তু আরবদের বহিরাভিযান ও সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠা পূর্ব পরিকল্পিত কোন নীতির ফল নয়। হযরত আবু বকর (রা) বা হযরত উমর (রা) কখনও বিশাল সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠার স্বপ্ন দেখেননি। দ্বিতীয় খলিফা হযরত উমর (রা) মুসলমানদেরকে রাজধানী হতে বিচ্ছিন্ন হয়ে যাওয়ার ভয়ে দূরে অভিযান পরিচালনা করতে নিষেধ করতেন। উত্তরে বাইজান্টাইন ও পূর্বে সাসানীয় সাম্রাজ্যের সাথে প্রথমে আরবদের ছোটখাট সংঘর্ষ উপস্থিত হয় এবং তা-ই ধীরে ধীরে দীর্ঘস্থায়ী বিশাল যুদ্ধে পরিণত হয়। এর পরবর্তী পর্যায়ে পরিকল্পিত ও নিয়মিত যুদ্ধ-বিগ্রহ আরম্ভ হয়। সুতরাং আরবদের সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠা কোন পরিকল্পনার ফল নয়, বিভিন্ন পারিপার্শ্বিক অবস্থা এর অনুকূলে কাজ করেছিল।

কোন কোন লেখকের মতে আরবদের সাম্রাজ্য বিস্তার রিদ্দা যুদ্ধের অবশ্যম্ভাবী ফল। এঁরা মনে করেন যে, রিদ্দার যুদ্ধের পর আরবগণ সমগ্র উপদ্বীপকে একত্রিত করেছিল বটে কিন্তু যুদ্ধ-বিগ্রহে তাদের অর্থ সম্পদ, গো-মেষাদি বিনষ্ট হয়, তারা সম্পূর্ণ নিঃস্ব ও নিঃসম্বল হয়ে পড়ে। ক্ষুধার্ত বেদুঈনগণ তখন বাইজান্টাইন ও সাসানীয় সাম্রাজ্যের উর্বর এলাকাসমূহের উপর ঝাঁপিয়ে পড়ে। এ মতবাদ সম্পূর্ণ অনুমানের উপর প্রতিষ্ঠিত। রিদ্দার যুদ্ধের পরে আরবের অবস্থা পূর্ব বা পরের চেয়ে ভাল বা খারাপ ছিল এমন কোন প্রমাণ পাওয়া যায় না। অন্যপক্ষে সিরিয়া ও ইরাকের আরব গোত্রসমূহ আরবগণকে নিকটাত্মীয় মনে করে তাদের শাসনকে অভিনন্দিত করেছিল এবং হিট্টির মতে "মুসলিম বিজয় প্রাচীন মধ্যপ্রাচ্য কর্তৃক এর পূর্ববর্তী প্রাধান্যের পুনঃ প্রতিষ্ঠা বলে ধরে নেয়া যেতে পারে।"

আরবগণকে ধর্মীয় উন্মাদনা যুদ্ধ-বিগ্রহে কতখানি উৎসাহিত করেছিল আর অর্থলিপ্সা তাদের বিজয় স্পৃহাকে কতখানি উদ্দীপিত করেছিল, এ বিষয় নিয়ে ঐতিহাসিকদের মধ্যে অনেক বিতর্ক রয়েছে। প্রাথমিক যুগে মুসলমানদের যুদ্ধ যাত্রার প্রধান উদ্দেশ্য ছিল ইসলাম ধর্মের প্রাধান্য প্রতিষ্ঠা। ধর্মই আরবগণকে নতুন অনুপ্রেরণা ও নতুন আদর্শে উদ্বুদ্ধ করে একই পতাকাতলে সমবেত করেছিল। ধর্মের নাম করেই তারা যুদ্ধ করেছিল। আল্লাহু আকবর ছিল মুসলিম বাহিনীর যুদ্ধ ধ্বনি। আরবের লোকেরা শতাব্দীর পর শতাব্দী ধরে তাদের মরু ভূমির আবাসস্থলে অজ্ঞাত জীবন যাপন করছিল। ইসলাম ধর্মে দীক্ষিত হওয়ার পরেই তারা বিশ্ব মানবের দৃষ্টি আকর্ষণ করে। কাজেই মূলত এ আন্দোলনকে ধর্মীয় আন্দোলন আখ্যা দিলে ভুল হবে না। কিন্তু এটা অনুদার, উন্মাদনা প্রসূত

ধর্মীয় আন্দোলন ছিল না, কারণ যারা ইসলাম ধর্মে দীক্ষিত হতে অনিচ্ছা প্রকাশ করত, করদানের বিনিময়ে তাদের জানমাল ও ধর্মের নিরাপত্তা বিধান করা হত। মুসলমানদের মধ্যে সাধারণ সৈনিকদের মনে অর্থ ও গনীমত (যুদ্ধে লব্ধ বস্তু) লাভের বাসনা যুদ্ধের অপর আকর্ষণ ছিল। যে কোন বিজেতা বাহিনীর পক্ষে এ কথা সমভাবে প্রযোজ্য। এ কথা বলে প্রাথমিক মুসলমানদেরকে দোষারোপ করার মধ্যে কোন বিশেষ যুক্তি নেই। তারা কেবল অর্থের লালসায় দিগ্বিজয় করেছিল এমন কথা নিতান্তই হাস্যকর। মহান আদর্শে উদ্দীপিত ও সৎগুণের অধিকারী না হলে আরব সৈন্য বাহিনী বিপক্ষ দলের বহু বড় সৈন্যদলকে অবলীলাক্রমে পরাজিত করতে পারত না। অন্যপক্ষে যে সৈন্যবাহিনী তাদের হাতে পরাজিত হয়েছিল তারাই ছিল বেতনভুক, এবং আদর্শ ও সদুদ্দেশ্য বিবর্জিত।

পারসিকদের সাথে যুদ্ধ

রিদ্দার যুদ্ধের অবসানের পর। খালিদ ১০,০০০ সৈন্যের এক বিরাট বাহিনী সহ উত্তরে ফোরাত নদীর অববাহিকা অঞ্চলের দিকে যাত্রা করলেন। অপর সেনাপতি মুসান্না ৮০০০ সৈন্যের এক দল নিয়ে খালিদের সাথে যোগদান করেন। খালিদ আল-হিরা (ইরাক) নামক প্রদেশের রাজধানী, আল-হিরার
পশ্চিম ইরাক দিকে সৈন্য পরিচালনা করলেন। ঐ প্রদেশ পারস্য সাম্রাজ্যের
দখল ৬৩৩ খ্রিঃ অন্তর্ভুক্ত ছিল। প্রদেশের সত্রপ (শাসনকর্তা) হরমুজ তাঁর আরব প্রজাগণের উপর নানারকম অত্যাচার করে তাদের বিরাগ ভাজন হয়ে পড়েছিলেন। তিনি খালিদকে বাধা দিতে আসলেন। খালিদ তাঁকে হয় ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করতে না হয় কর দিতে আহ্বান করে একটি পত্র প্রেরণ করেন ঃ "ইসলাম ধর্ম গ্রহণ কর, তা হলে তোমরা নিরাপদ। অন্যথায় তুমি ও তোমার লোকেরা কর দান কর। যদি কর দান করতে অস্বীকার কর তবে তোমরা শাস্তিপ্রাপ্ত হবে। এমন একটি সম্প্রদায় তোমাদের উপর আপতিত হয়েছে, যারা মৃত্যুকে ঐ রকম ভালবাসে যেরকম তোমরা জীবনকে ভালবাস।" হরমুজ যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত হলেন। তিনি খালিদের সাথে দ্বন্দ্বযুদ্ধে নিহত হলেন। তাঁর সৈন্য বাহিনী "শৃঙ্খলের যুদ্ধে" (জাতুস-সালাসিল) পরাজিত হয়ে পলায়ন করে। হরমুজের মৃত্যু সংবাদ রাজধানী মাদায়িনে পৌছলে পারস্য সম্রাট আর একটি সৈন্য বাহিনী পাঠিয়ে খালিদের গতিরোধ করতে চেষ্টা করলেন কিন্তু এবারেও তারা পরাজিত হল। সম্রাট এবার অভিজ্ঞ সেনাপতি বাহমনকে মুসলমানদের বিরুদ্ধে প্রেরণ করলেন। ওয়ালাজা ও আল্লিসের যুদ্ধে পারসিকগণ পরপর

পরাজিত হল। এর পর খালিদ আমগিসিয়া নামক একটি সমৃদ্ধিশালী নগর অতর্কিতে আক্রমণ করে অধিকার করেন। যখন গনীমতের মাল হতে রাষ্ট্রের প্রাপ্য এক পঞ্চমাংশ মদীনায় পৌঁছল তখন আবু বকর (রা) এটা দেখে খালিদের কৃতিত্বে এত উৎফুল্ল হয়েছিলেন যে, তিনি আনন্দের আতিশয্যে বলে উঠলেন "ওহে কুরাইশ তোমাদের শার্দুল-তথা ইসলামের শার্দুল পারস্যের শার্দুলের উপর লাফিয়ে পড়েছে এবং তার শিকার হতে তাকে বঞ্চিত করেছে। নিশ্চয়ই মাতৃগর্ভ নিঃশেষ হয়েছে। কোন নারীই আর দ্বিতীয় খালিদকে জন্ম দিবে না।"

এর পর খালিদ আল-হিরা নগরীর বিরুদ্ধে যুদ্ধ যাত্রা করেন। নগরীর অধিবাসীদের অধিকাংশই ছিল খ্রিস্টান। নগরীর সত্রপ পলায়ন করলেন। ঘোরতর যুদ্ধের পর হিরা নগরীর লোকেরা আত্মসমর্পণ করল। আল-হিরার অধিবাসিগণ কর দিতে স্বীকার করে খালিদের সাথে সন্ধিসূত্রে আবদ্ধ হল। সন্ন্যাসিগণকে এ কর হতে অব্যাহতি দেয়া হল। মুসলমানগণ তাদের নগর রক্ষার দায়িত্ব গ্রহণ করল। হিরা নগরী ও প্রদেশের অধিকার আরবদের বহিরাভিযানের ইতিহাসে বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ। আরব উপদ্বীপের সীমানার বাইরে এটাই সর্বপ্রথম আরব অধিকার। নগরের শাসনভার নেতৃস্থানীয় লোকদের উপর অর্পিত হয়। প্রদেশের জমিদার শ্রেণীর লোকেরা খালিদের কাছে আত্মসমর্পণ করে কর দানে অঙ্গীকারাবদ্ধ হয়। হযরত আবু বকর (রা) সাধারণ কৃষকগণকে তাদের জমি হতে বেদখল করতে নিষেধ করে দিয়েছিলেন। জমিতে তাদের মালিকানা সুপ্রতিষ্ঠিত হল। মুসলিম রাষ্ট্র তাদেরকে জিম্মী বা রক্ষা প্রাপ্ত লোক হিসেবে বহিঃশত্রুর আক্রমণ হতে রক্ষার দায়িত্ব গ্রহণ করল।

বাইজান্টাইন সাম্রাজ্যের সাথে যুদ্ধ

হযরত মুহম্মদ (স)-এর জীবদ্দশায় মুতার অভিযান হতেই বাইজান্টাইন সাম্রাজ্যের সাথে মুসলমানদের যুদ্ধ আরম্ভ হয়েছিল। হযরতের অন্তিম ইচ্ছা কার্যকরী করবার উদ্দেশ্যে আবু বকর (রা) খলিফা হয়েই জায়দের পুত্র উসামার নেতৃত্বে সিরিয়ায় অভিযান প্রেরণ করেন—এ কথা আগেই উল্লেখ করা হয়েছে। রিদ্দার যুদ্ধের পর হযরত আবু বকর (রা) তিনজন সেনাপতির নেতৃত্বে সিরিয়ায় অভিযান প্রেরণের সিদ্ধান্ত করেন (৬৩৩ খ্রিঃ)। প্রায় ৩০০০ (মতান্তরে ৫০০০) লোকের এক একটি বাহিনী আমর ইবনুল-আস, ইয়াজিদ-ইবন-আবু সুফিয়ান ও শুরাহবিল ইবন হাসানার নেতৃত্বে সিরিয়া অভিমুখে যাত্রা করল। আবু সুফিয়ানের অপর পুত্র মু'আবিয়া তাঁর ভ্রাতা ইয়াজিদের পতাকাবাহী হিসেবে সিরিয়ায় গমন করেন। আমর পশ্চিমদিকের সমুদ্র তীরবর্তী পথ ধরে অগ্রসর হলেন এবং অপর

দুজন সেনাপতি পূর্বাঞ্চলের পথে রওয়ানা হলেন। কিছুদিনের মধ্যে মদীনা হতে সেনাপতি আবু উবায়দার নেতৃত্বে আরও অতিরিক্ত সৈন্যদল এসে পৌঁছল এবং পূর্ববর্তী তিনবাহিনীর সাথে যোগদান করে তাদেরকে শক্তিশালী করে তুলল। প্রতিটি বাহিনী যখন যুদ্ধ যাত্রার জন্য প্রস্তুত হত, তখন হযরত আবু বকর (রা) পদব্রজে অশ্বারোহী নেতার পার্শ্ব ধরে চলতে চলতে নিম্ন লিখিত উপদেশ দিতেনঃ

"হে লোকগণ আমি তোমাদেরকে দশটি আদেশ দিচ্ছি, 'এটা তোমরা অবশ্যই অনুগতভাবে পালন করবে। কাউকেই প্রতারিত করো না এবং কারও কাছ থেকে চুরি করো না, কারও সাথে বিশ্বাসঘাতকতা করো না এবং কারও অঙ্গ ব্যবচ্ছেদ করো না, কোন শিশু, স্ত্রীলোক বা বৃদ্ধকে হত্যা করো না, খেজুর গাছের ছাল তুলো না অথবা খেজুর গাছ পুড়িও না, ফলবান বৃক্ষ কেটো না বা শস্য বিনষ্ট করো না। খাদ্যের প্রয়োজন ব্যতীত গবাদি পশু হত্যা করো না।"

সিরিয়ার ওয়াদি আরাবা নামক স্থানে বাইজান্টাইনদের সাথে আরবদের প্রথম যুদ্ধ সংঘটিত হয়। এখানে ৬৩৪ খ্রিস্টাব্দের ফেব্রুয়ারি মাসে ইয়াজিদ প্যালেস্টাইনের শাসনকর্তা সারজিয়াসকে পরাজিত করলেন। ইতিমধ্যে আল্লার অসি খালিদ ইবন ওয়ালিদ ইরাক থেকে সিরিয়ায় উপস্থিত হলেন। সেনাপতি মুসান্নাকে ইরাকে রেখে আঠার দিন ক্রমাগত মরুভূমির পথে চলে তিনি বাইজান্টাইন সেনাদলের ঠিক পিছনে উপস্থিত হলেন। মারজ রাহিত নামক স্থানে তিনি গাসসান সেনাদলকে পরাজিত করেন। অতঃপর তিনি অন্যান্য মুসলমান সৈন্যদের সাথে মিলিত হয়ে প্রধান সেনাপতির পদ গ্রহণ করেন। এবার সিরিয়ার

আজনাদায়নের যুদ্ধ, ৩১ জুলাই ৬৩৪ খ্রিঃ

রণাঙ্গনের সর্বপ্রথম বিখ্যাত যুদ্ধ সংঘটিত হয়। এ যুদ্ধ আজনাদায়নের যুদ্ধ নামে খ্যাত। বাইজান্টাইন সম্রাট হিরাক্লিয়াসের ভ্রাতা থিওডোরের নেতৃত্বাধীনে এক লক্ষ সৈন্য চল্লিশ হাজার মুসলমানের বিরুদ্ধে আজনাদায়নে অস্ত্রধারণ করে। যদিও বাইজান্টাইন-সৈন্য সংখ্যা ও সমরায়োজন প্রচুর ছিল, তথাপি সাহস ও মনোবলে তারা মুসলমানদের সমকক্ষ ছিল না। খ্রিস্টানদের মধ্যে একতার অভাব ছিল। একদল পুরোহিত ও সন্ন্যাসী যুদ্ধক্ষেত্রে থেকে সুবর্ণ ক্রুশ দুলিয়ে 'ধর্ম বিপন্ন' ধুয়া তুলে সৈন্যদেরকে উত্তেজিত করবার প্রয়াস পেল কিন্তু এতেও বিশেষ কোন ফল হল না। একতা, মনোবল ও ধর্মবিশ্বাস মুসলমানদেরকে অজেয় করে তুলল। একজন মুসলমান একাই দশজনের মুকাবিলা করতে পশ্চাৎপদ হত না। থিওডোর যুদ্ধক্ষেত্র থেকে পলায়ন করল। হিরাক্লিয়াস ক্ষোভে ও দুঃখে এন্টিয়কে চলে গেলেন। সিরিয়ার যুদ্ধ ক্ষেত্রে আজনাদায়নের বিজয় মুসলমানদের সর্বপ্রথম বিখ্যাত বিজয়।

আবুবকের মৃত্যু

৬৩৪ খ্রিস্টাব্দের হেমন্তকালে হযরত আবু বকর (রা) অসুস্থ হয়ে পড়েন। তিনি নামাজের ইমামতির ভার হযরত উমর (রা)-এর উপর অর্পণ করেন। লোকেরা চিকিৎসক ডাকতে চাইলে তিনি অসম্মতি জ্ঞাপন করলেন। হযরত উমর (রাঃ)-কে খলিফা মনোনীত করার সিদ্ধান্ত করে তিনি সাহাবাদের মতামত জিজ্ঞেস করলেন। অতঃপর তিনি উসমানকে ডেকে এ মর্মে এক নির্দেশ নামা লিখালেন। মসজিদ-ই-নববীর অঙ্গনে সমবেত জনসাধারণের অবগতির জন্য তা পড়ে শোনানো হল। খলিফার স্ত্রী আসমা তাঁকে জানালার দিকে উঠিয়ে ধরলেন এবং তিনি ক্ষীণ কণ্ঠে বহু কষ্টে জনতাকে সম্বোধন করে বললেন, "আমি যাকে তোমাদের উপর নিযুক্ত করেছি তাঁর প্রতি তোমরা সন্তুষ্ট কিনা? সে আমার কোন আত্মীয় নয়, সে খাত্তাবের পুত্র উমর। সর্বাপেক্ষা উপযুক্ত লোক নির্বাচনে আমি যথাসাধ্য চেষ্টা করেছি। সুতরাং তোমরা অনুগত হিসেবে তার কথামত চলবে। লোকেরা সমস্বরে উত্তর করল, "আমরা শুনব।" মৃত্যুর পূর্বে তিনি হযরত উমর (রা)-কে শয্যাপার্শ্বে ডেকে উপদেশ দান করলেন এবং কোমলতা ও কঠোরতার মধ্যে সমন্বয় সাধন করতে বললেন। ৬৩৪ খ্রিস্টাব্দের ২৩শে আগস্ট তাঁর মহান আত্মা স্বর্গীয় প্রভুর সন্নিধানে মহাপ্রয়াণ করল। তাঁর খিলাফত দু বছর তিন মাস কাল স্থায়ী হয়েছিল।

হযরত আবু বকর (রা)-এর খিলাফত স্বল্পকাল স্থায়ী হলেও ইসলামের ইতিহাসে এটা বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ। তাঁর খিলাফতের প্রধান ঘটনা ধর্মত্যাগীদের দমন। মহানবীর সুযোগ্য উত্তরাধিকারী হিসেবে ইসলাম ধর্মে তাঁর অবিচলিত আস্থা ও সত্য রক্ষার্থে আমরণ সংগ্রামের বজ্রকঠোর সংকল্প ইসলাম ধর্ম ও মুসলমান সম্প্রদায়কে চরম বিপর্যয়ের হাত থেকে রক্ষা করেছিল।

চরিত্র ও কৃতিত্ব

দয়া, ক্ষমা ও কোমলতা তাঁর চরিত্রের ভূষণ ছিল। কিন্তু ধর্মত্যাগীদের প্রতি তিনি দৃঢ়তা ও কঠোরতার পরিচয় দিয়েছিলেন। তাঁর দৈনন্দিন জীবনযাত্রা অনাড়ম্বর ছিল। খলিফা হবার আগে তিনি কাপড়ের ব্যবসায় করতেন। খলিফা হওয়ার পরও জীবিকা নির্বাহের জন্য তিনি নিজের ব্যবসা চালিয়ে যেতে চাইলেন। কিন্তু এতে রাষ্ট্রের কাজকর্মে ব্যাঘাত হবার সম্ভাবনা দেখে সাহাবারা তাঁকে বাৎসরিক ৬০০০ দিরহাম ভাতা হিসেবে গ্রহণ করে ব্যবসা ছেড়ে দিতে অনুরোধ করলেন। তিনি এতে সম্মত হলেন। কিন্তু এ অর্থকে তিনি কর্জ বলে মনে করতেন এবং মৃত্যুর পূর্বে অছিয়ত করে গিয়েছিলেন যে, তাঁর কিছু জমি বিক্রী করে সরকারি তহবিলে সেই সমুদয় অর্থ যেন প্রত্যর্পণ করা হয়। খিলাফতের প্রথম ছয় মাস তিনি মদীনার উপকণ্ঠে অবস্থিত তাঁর বাসগৃহ হতে দৈনিক পদব্রজে ও অশ্বারোহণে মদীনার মসজিদে এসে শাসন কার্য পরিচালনা

করতেন। পরে শাসনকার্যের সুবিধার জন্য তিনি মসজিদের পাশে বাসস্থান স্থানান্তরিত করেন। হযরত মুহম্মদ (স)-এর মতই তাঁর শাসনকার্য ও বিচার-আচার অতি সাদাসিধাভাবে সম্পন্ন হত। খলিফার কোন দেহরক্ষী বা দাসদাসী ছিল না। তিনি রাষ্ট্রের খুঁটিনাটি সমস্ত বিষয় নিজে দেখাশুনা করতেন। দরিদ্র ও অভাবগ্রস্তদের অবস্থা স্বচক্ষে দেখবার জন্য তিনি রাতে বের হতেন। বিশ্বস্ত সাহাবাগণকে তিনি বিশেষ বিশেষ কার্যের ভার দিয়েছিলেন। তিনি শাসনকর্তা ও কর্মচারী নিয়োগের ব্যাপারে উপযুক্ত লোক খুঁজে বের করতেন। হযরত উমর (রা) ছিলেন তাঁর বিশিষ্ট সহচর ও প্রধান উপদেষ্টা। বিচার বিভাগের ভার হযরত উমর (রা)-এর উপর ন্যস্ত ছিল। হযরত আলী (রা) ছিলেন প্রধান কর্মসচিব। জায়দ ও উসমানও মাঝে মাঝে লেখক হিসেবে কাজ করতেন। সাধুতা ও সততার সাথে বিনয় যুক্ত হয়ে হযরত আবু বকর (রা)-কে মহিমামণ্ডিত করেছিল। লোকেরা তাকে আল্লাহর খলিফা বলে সম্বোধন করলে তিনি বলতেন, "আমি আল্লার-রসূলের খলিফা।" হযরতের কথা ও কাজের নির্ভুল অনুসরণ ও তাঁর যাবতীয় ইচ্ছা বাস্তবায়নের সব দায়িত্ব তিনি গ্রহণ করেছিলেন এবং মদীনার শিশু রাষ্ট্র ও নব প্রতিষ্ঠিত ইসলাম ধর্মকে আসন্ন বিপদের হাত থেকে রক্ষা করেছিলেন। ইসলামের দিগ্বিজয়ের প্রথম যুগ তাঁর খিলাফতের সময় আরম্ভ হয়েছিল। তাঁরই দূরদর্শিতা, বলিষ্ঠ নেতৃত্ব ও সুযোগ্য পরিচালনায় মুসলিম সেনাবাহিনী এক সুনিশ্চিত বিজয়ের পথে মহাযাত্রা আরম্ভ করেছিল।

গ্রন্থনির্দেশ

১. পি. কে. হিট্টি : *হিস্ট্রি অব্ দি এরাব্‌স্।*

২. উইলিয়াম ম্যুর : *কলিফেট, ইট্‌স্ রাইজ ডিক্লাইন এণ্ড ফল।*

সিরিয়ার সামরিক বিভাগ

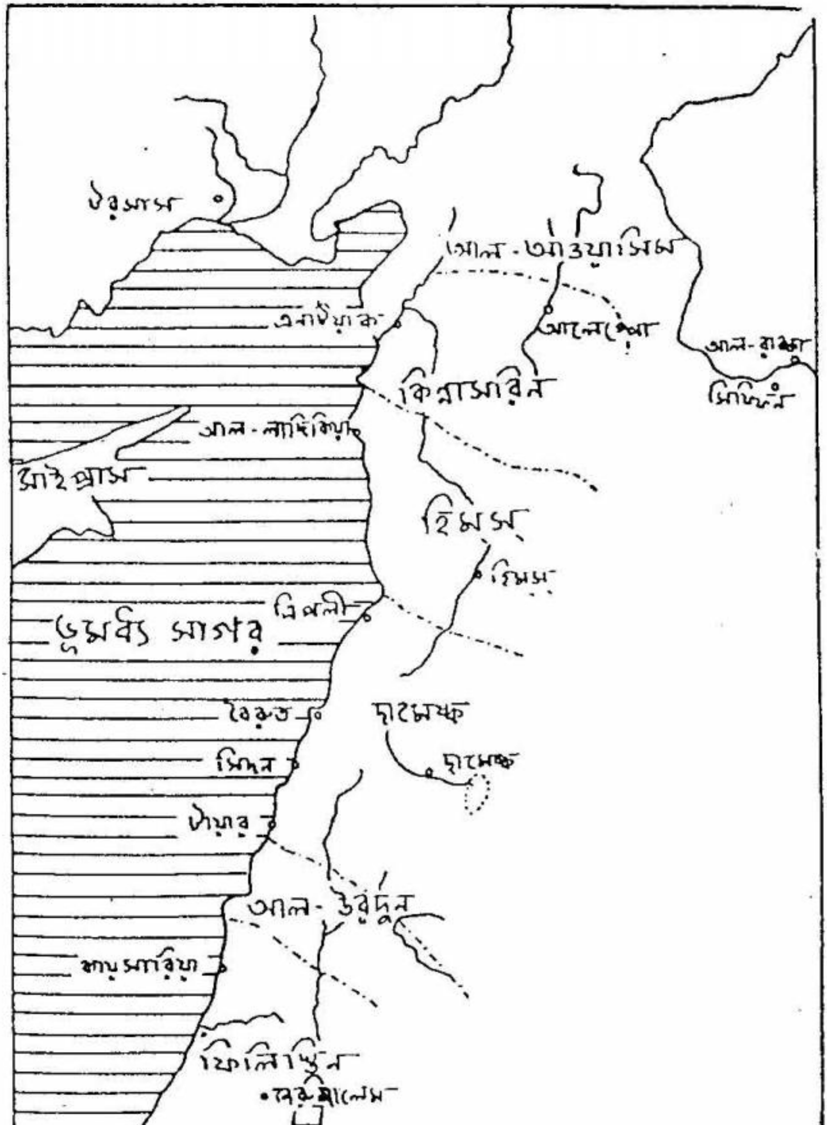

সিরিয়ার সামরিক বিভাগ

৯

উমর ফারুক (রা)

(৬৩৪ খ্রিঃ–৬৪৪ খ্রিঃ)

হযরত আবু বকর (রা)-এর মৃত্যুর পরদিন হযরত ওমর (রা) মদীনার মসজিদ-ই-নববীর মিম্বরে দাঁড়িয়ে খলিফা হিসেবে জনতাকে উদ্দেশ্য করে বক্তৃতা করলেন। তিনি বললেন, "আরবগণ বিদ্রোহী উষ্ট্রের সদৃশ, চালকের কর্তব্য তাদেরকে ঠিক পথে পরিচালিত করা। আমি কাবার প্রভুর শপথ করে বলছি, তোমাদের যে পথে চলা উচিত আমি তোমাদেরকে সেই পথেই পরিচালিত করব।" অতঃপর লোকেরা হযরত উমর (রা)-এর হাত ধরে বয়াৎ (আনুগত্যের শপথ গ্রহণ) করল। ইরাকের ভারপ্রাপ্ত সেনাপতি মুসান্নার আবেদনক্রমে পারস্য সীমান্তে নতুন সৈন্যবাহিনী প্রেরণ করা হল।

সিরিয়ার যুদ্ধ

আজনাদায়নের যুদ্ধের পর থেকে সিরিয়া বিজয়ের জন্য নিয়মিত যুদ্ধ বিগ্রহ আরম্ভ হল। সমগ্র প্যালেস্টাইন এ যুদ্ধের ফলে মুসলমানদের দখলে আসল। মুসলমানগণ গাসসান রাজ্যে. রাজধানী বুসরা অধিকার করল। এর পর জর্ডান নদীর পূর্ব তীরবর্তী ফিহ্ল নগরীও তাদের দখলে আসল। ৬৩৫ খ্রিস্টাব্দের ২৫শে ফেব্রুয়ারি মারজুস্-সুফ্ফার নামক স্থানে রোমানদের পরাজয়ের ফলে সিরিয়ার রাজধানী দামিস্ক বিজয়ের পথ সুপ্রশস্ত হল। পৃথিবীর সর্বপ্রাচীন নগরী দামিস্ক 'নগরীসমূহের মহিষী' নামে সুবিখ্যাত ছিল। প্রাচীনকাল হতে প্রধান বাণিজ্যকেন্দ্র হিসেবে এ নগরী বিশেষ সমৃদ্ধ ছিল। বিশ ফুট উঁচু ও পনর ফুট পুরু প্রাচীর দিয়ে এটা পরিবেষ্টিত ছিল। এ সময় এটা খ্রিষ্টান ধর্মের প্রধান কেন্দ্র ছিল। সেন্ট জনের গির্জাসহ নগরী ও এর আশে পাশে পনরটি গির্জা অবস্থিত ছিল। ৬৩৫ খ্রিস্টাব্দের ১৩ই মার্চ খালিদ ইবন ওয়ালিদ দামিস্ক অবরোধ করলেন। সিরিয়া সীমান্তের অপরাপর প্রধান সেনাপতিগণ খালিদের সাথে নগর অবরোধে সহায়তা করেছিল। আবু উবায়দা, ইয়াজিদ, আমর ও শুরাহ্বিল বিভিন্নদিকের নগরদ্বারগুলি সতর্কতার সাথে পাহারা দিয়ে রাখলেন। ছয়মাস অবরোধের পর দামিস্কবাসিগণ নিম্নলিখিত শর্তে খালিদ ইবন ওয়ালিদের নিকট আত্মসমর্পণ করল ঃ

দামিস্ক বিজয়

"মহানুভব ও দয়ালু আল্লাহতায়ালার নামে; খালিদ ইবন ওয়ালিদ নগরে প্রবেশ লাভ করে দামিস্কবাসীদের সাথে এ মর্মে চুক্তিবদ্ধ হবেন ঃ তিনি তাদের জান, মাল ও ধর্মের নিরাপত্তা বিধান করবেন। তাদের নগর-প্রাচীর ধ্বংস করা হবে না। কোন মুসলমানকে তাদের গৃহে চাপিয়ে দেয়া হবে না। এ মর্মে আমরা তাদেরকে আল্লাহ্তায়ালার রসূল, খলিফা ও মুসলমানদের রক্ষা ব্যবস্থার প্রতিশ্রুতি দিচ্ছি। যতক্ষণ তারা জিয্য়া প্রদান করবে ততক্ষণ তাদের মঙ্গল বই অমঙ্গল হবে না।"

এর পর খালিদ ইবন ওয়ালিদ আবু উবায়দার সাথে মিলিত হয়ে সিরিয়ার উত্তরাঞ্চলের দিকে অগ্রসর হলেন। এ অঞ্চলের বা'লবাক, হিম্‌স্, হামা ও অন্যান্য নগর একে একে বিনা বাধায় মুসলমানদের কাছে আত্মসমর্পণ করে। সিরিয়াবাসীদের এ স্বতঃস্ফূর্ত ও স্বেচ্ছা প্রণোদিত আত্মসমর্পণের মূলে রয়েছে মুসলমানদের উদার ও সহৃদয় ব্যবহার। সিরিয়াবাসীদের প্রতি তাদের ব্যবহার পরমত সহিষ্ণুতার উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত স্বরূপ। রোমান শাসনাধীনে তারা নানা প্রকার করভারে জর্জরিত ছিল। এতদঞ্চলের খ্রিস্টানগণ তাদের ধর্মমতের জন্য বাইজান্টাইন গির্জাধিপতিগণ কর্তৃক নানাভাবে নিপীড়িত হত। মুসলমানগণ তাদেরকে পূর্ণ ধর্মীয় স্বাধীনতা প্রদান করে। রোমানগণের তুলনায় মুসলমানদের আর্থিক দাবি-দাওয়া অত্যন্ত সীমিত ছিল। এজন্য সিরিয়াবাসিগণ মুসলমান শাসনকে অভিনন্দিত করেছিল। নতুন শাসকদের প্রতি তাদের মনোভাবের পরিচয় নিচের ঘটনা হতে সম্যক উপলব্ধি করা যায়। শায়জার নামক নগরের অধিবাসিগণ বিজেতা মুসলমানদেরকে সম্বর্ধনা করবার উদ্দেশ্যে তাদের নগর হতে বের হয়ে গায়ক ও বাদক সমভিব্যবহারে বিজেতাদের সাথে সাক্ষাৎ করে এবং তাদের নিকট আত্মসমর্পণ করে। একজন নেষ্টরীয় খ্রিস্টান পুরোহিত ১৫ হিজরীতে (৬৩৬—৩৭ খ্রিঃ) মুসলমানদের সম্বন্ধে নিম্নরূপ উক্তি করেছেন ঃ যে আরবগণকে আল্লাহ আমাদের যুগে রাজত্ব দান করেছেন তাঁরা আমাদের প্রভু হয়েছেন; তাঁরা আমাদের ধর্মকে রক্ষা করেন, তাঁরা আমাদের পুরোহিত ও সাধু সন্ন্যাসিগণকে সম্মান করেন এবং আমাদের গির্জা ও ধর্মাশ্রমের জন্য অর্থ সাহায্য দান করেন।"

সম্রাট হিরাক্লিয়াস মুসলমানদেরকে সিরিয়া হতে বিতাড়িত করবার উদ্দেশ্যে সর্বশক্তি নিয়োগ করলেন। এতদুদ্দেশ্যে এক বিশাল সৈন্যবাহিনী সমাবিষ্ট হল। এ সৈন্যবাহিনীর সংখ্যা কারও মতে এক লক্ষ আবার কারও মতে ৫০,০০০ ছিল।

ইয়ারমুকের যুদ্ধ ২০ আগস্ট ৬৩৬ খ্রিঃ

হিরাক্লিয়াসের ভ্রাতা থিওডোর এ বিশাল বাহিনীর সৈন্যাধ্যক্ষ নিযুক্ত হলেন। বিশাল বাইজান্টাইন সেনাবাহিনীর সম্মুখে খালিদ হিম্‌স্‌, দামিস্ক ও অন্যান্য অধিকৃত শহরসমূহ একেএকে পরিত্যাগ করে ২৫০০০ লোকের এক বাহিনীসহ জর্ডান নদীর পূর্বদিকের শাখা ইয়ারমুকের অববাহিকায় শিবির সংস্থাপন করলেন। হিমস্‌ শহর হতে সৈন্যাপসরণের সময় মুসলমানগণ অধিবাসীদের নিকট হতে আদায়কৃত সমুদয় রাজস্ব প্রত্যর্পণ করে কারণ তারা আপাতত হিম্‌স্‌বাসিগণকে বাইজান্টাইন আক্রমণ হতে রক্ষার প্রতিশ্রুতি পালনে অক্ষমতা প্রকাশ করে। মুসলমানদের সততা হিম্‌স্‌বাসিগণকে মুগ্ধ করেছিল। তারা গ্রীকবাহিনীর সম্মুখে নগর দ্বার রুদ্ধ করে দিয়ে মুসলমানদের সাথে গ্রীকদের শক্তি পরীক্ষার চূড়ান্ত ফলাফলের জন্য অপেক্ষা করতে লাগল। ৬৩৬ সালের ২৩ জুলাই গ্রীক ও মুসলিম বাহিনী পরস্পর মোকাবেলা করল। এ যুদ্ধ ইতিহাসে ইয়ারমুকের যুদ্ধ নামে খ্যাত। প্রথম দিনেই যুযুধান বাহিনীর মধ্যে অস্ত্র বিনিময় হল; এতে মুসলমানেরা কৃতকার্যতা লাভ করল। এর পর এক মাস ধরে উভয় পক্ষ নিষ্ক্রিয়ভাবে পরস্পরের মুখামুখি দাঁড়িয়ে রইল। এ সময় গ্রীকবাহিনীতে অসন্তোষ ও দলাদলির উদ্ভব হয়। অবশেষে ৬৩৬ সালের ২০ আগস্ট এক প্রবল ধুলি-ঝড়ের দিনে আরবগণ প্রচণ্ড আক্রমণ চালায়। তাদের সংঘবদ্ধ আক্রমণের সম্মুখে গ্রীকবাহিনী বিপর্যস্ত হয়ে পড়ে। গ্রীকদের অশ্বারোহী সৈন্যগণ পার্শ্ববর্তী ময়দানে পলায়নপর হল। পদাতিক বাহিনীকে তারা দলে দলে রজ্জুবদ্ধ অবস্থায় যুদ্ধক্ষেত্রে উপস্থাপিত করেছিল। এখন এরা আরবদের বর্শাফলকে বিদ্ধ হতে লাগল অথবা নদীগর্ভে নিক্ষিপ্ত হল। আরবদের সংঘবদ্ধ ও সুনিয়ন্ত্রিত ক্ষুদ্র বাহিনী গ্রীকদের বিশাল অথচ বিশৃঙ্খল সৈন্য দলকে সম্পূর্ণরূপে পর্যুদস্ত ও নিশ্চিহ্ন করে ফেলল। সৈন্যাধ্যক্ষ থিওডোর যুদ্ধক্ষেত্রে নিহত হলেন। হিরাক্লিয়াস তখন এন্টিয়কে অবস্থান করছিলেন। এ বিপর্যয়ের সংবাদ তাঁর কাছে পৌঁছলে তিনি শেষবারের মত সিরিয়ার প্রতি নিম্নরূপ বিদায় বাণী উচ্চারণ করে এন্টিয়ক ত্যাগ করে কনস্টান্টিনোপলে প্রত্যাবর্তন করেন ঃ "সিরিয়া, তোমাকে বিদায়; শত্রুর জন্য কত উত্তম না এ দেশ!" এ যুদ্ধে মুসলমানগণকেও বহু ক্ষয়ক্ষতি স্বীকার করতে হয়েছিল। হযরতের অনেক সাহাবা এ যুদ্ধে সাহাদত বরণ করেন। কিন্তু এ যুদ্ধ চূড়ান্তভাবে সিরিয়ার ভাগ্য মীমাংসা করে দেয় এবং সিরিয়া প্রকৃতপক্ষে মুসলমানদের দখলে আসে।

ইয়ারমুকের আগে মুসলমানগণ যে সব অঞ্চল হতে পশ্চাদপসরণ করেছিল এখন তার পুনরাধিকার আরম্ভ হল। দামিস্কসহ অপরাপর সব শহর অনায়াসে ও অতি অল্প সময়ে অধিকৃত হয়। এ সময় দ্বিতীয় খলিফা হযরত উমর (রা)-এর আদেশে সেনাপতি খালিদের পরিবর্তে আবু উবায়দা প্রধান সৈন্যাধ্যক্ষ নিযুক্ত হন।

খলিফা আবু বকর (রা)-এর জীবদ্দশায়ই উমর খালিদের কোন কোন কার্যকলাপে তাঁর প্রতি অসন্তুষ্ট হন। তাঁর মতে খালিদ শত্রুদের প্রতি অযথা কঠোর আচরণ করেছিলেন এবং অনেক কবিকে রাষ্ট্রীয় তহবিল হতে বহু অর্থ এনাম দিয়েছিলেন। খালিদ কিন্তু ঐ অর্থ তাঁর নিজস্ব তহবিল হতে দিয়েছিলেন বলে দাবি করেন। খালিদের এ ব্যাখ্যা হযরত উমর (রা)-এর মনঃপুত হয়েছিল কিনা বলা যায় না, তবে তিনি খালিদকে প্রধান সেনাপতির পদ হতে অপসারণের সিদ্ধান্তে অটল থাকেন এবং সরকারি ঘোষণায় খালিদের কোন অসদাচরণের উল্লেখ না করে তাঁর পদচ্যুতির জন্য এ মর্মে কারণ দর্শিয়েছিলেন যে খালিদের বিজয়াভিযানে জনসাধারণ তাঁর বীরত্বের উপর এত বেশি আস্থা স্থাপন করতে আরম্ভ করেছিল যে, তারা সব বিজয়ের উৎস সর্বশক্তিমানের উপর নির্ভরশীলতা পরিহার করে বসে ছিল।

খালিদ পদচ্যুত

সৈন্যাধ্যক্ষের পদ হতে অপসারিত হয়ে খালিদ কিছুকাল আবু উবায়দার সাথে সিরিয়ায় অবস্থান করলেন। তিনি হযরত উমর (রা)-এর আদেশ শিরোধার্য করে আবু উবায়দার সাথে সিরিয়ার উত্তরাঞ্চলের নগরসমূহ পুনরুদ্ধারে তাঁকে সাহায্য করেন। এন্টিয়ক, আলেপ্পো ও অন্যান্য নগর একে একে মুসলমানদের নিকট আত্মসমর্পণ করল।

জেরুজালেম নানা কারণে মুসলমানদের জন্য অতি পবিত্র। ইহুদি ও খ্রিস্টধর্মের প্রাণকেন্দ্র এবং মুসলমানদের প্রথম কিবলা হিসেবে মুসলমানদের কাছে এর গুরুত্ব অপরিসীম। মুসলিম সেনাপতি আমর ইবনুল-আস জেরুজালেমের দিকে অগ্রসর হলেন। নগরের ধর্মাধ্যক্ষ মুসলমান বাহিনীর আগমনে আত্মসমর্পণে ইচ্ছা প্রকাশ করেন। কিন্তু তিনি এ শর্তে আত্মসমর্পণ করতে রাজি হলেন যে, স্বয়ং খলিফা হযরত উমর (রা) জেরুজালেমে এসে নগর রক্ষার দায়িত্ব স্বহস্তে গ্রহণ করবেন। জেরুজালেমের ধর্মাধ্যক্ষের এ ডাকে হযরত উমর (রা) সাড়া দিলেন। বহু নবী-পয়গম্বরের পবিত্র স্মৃতি বিজড়িত এবং ইহুদি, খ্রিস্টান ও ইসলাম ধর্মের পুণ্যভূমি জেরুজালেম দর্শনের জন্য তিনি মদীনা হতে উটের পিঠে একটি ভৃত্য সমভিব্যাহারে যাত্রা করলেন। ভৃত্যের সাথে পালাক্রমে একবার উটের পিঠে চড়ে আর একবার উটের দড়ি ধরে নিতান্ত নিরাড়ম্বরভাবে একটি জীর্ণ পিরহান পরিধান করে তিনি জেরুজালেম পৌছলেন। তাঁর সরলতা, ধর্মপরায়ণতা ও নিরাড়ম্বর জীবন যাত্রা জেরুজালেমের ধর্মাধ্যক্ষকে ও খ্রিস্টানদেরকে মুগ্ধ ও চমৎকৃত করেছিল। হযরত উমর (রা) ধর্মাধ্যক্ষের সাথে নগরীর বিভিন্ন তীর্থস্থান পরিদর্শন করলেন। নামাজের সময় উপস্থিত হলে ধর্মাধ্যক্ষ হযরত উমর (রা)-কে সেখানকার গির্জায় (Churceh of the Resunection) নামাজ পড়তে

জেরুজালেম বিজয় জানুয়ারি ৬৩৭ খ্রিঃ

অনুরোধ করলেন। কিন্তু হযরত উমর (রা) নিতান্ত বিনীতভাবে অস্বীকার করে বললেন যে তিনি যদি সেখানে নামাজ পড়েন তবে তাঁর অনুসারী মুসলমানগণ পরবর্তীকালে এ অজুহাতে গির্জাটি দখল করে নেবার দাবি জানাবে। হযরত উমর (রা) যীশুখ্রিষ্টের জন্মস্থান বেথলেহেম ও হযরত সুলায়মান কর্তৃক নির্মিত বিখ্যাত ইহুদি উপাসনালয় পরিদর্শন করেন।

জেরুজালেমের অধিবাসীদের সাথে নিম্নলিখিত শর্তে এক সন্ধিচুক্তি স্বাক্ষরিত হয় ঃ

তাদের জানমাল, গির্জা ও ক্রুশ নিরাপদ বলে ঘোষণা করা হল। তাদের গির্জা ধ্বংস করা হবে না বা আবাসগৃহে পরিণত করা হবে না। ধর্মের ব্যাপারে কোন প্রতিবন্ধকতার সৃষ্টি করা হবে না। ইহুদি, খ্রিস্টান ও অন্যান্য যারা জেরুজালেমে বসবাস করবে তারা অন্যান্য শহরের অধিবাসীদের মত জিযয়া প্রদান করবে। গ্রীক অধিবাসিগণকে নগর পরিত্যাগ করে যেতে অথবা স্থায়ীভাবে বসবাস করতে স্বাধীনতা দেয়া হবে। সিরিয়ার অধিকৃত অঞ্চলের শাসন শৃঙ্খলা ও রাজস্ব আদায় সংক্রান্ত ব্যবস্থাদি সমাধা করে হযরত উমর (রা) মদীনায় প্রত্যাবর্তন করেন।

হযরত উমর (রা)-এর খিলাফতের পঞ্চম বছর সিরিয়ার দক্ষিণাঞ্চলের সিজারিয়া নামক শহর অধিকৃত হয় (৬৩৮ খ্রিঃ)।

শীঘ্রই সিরিয়ায় এক ভয়াবহ মহামারী আরম্ভ হল। সেনাপতি আবু উবায়দা ও তাঁর সৈন্যবাহিনীর এক বিরাট অংশ এ মহামারীর কবলে প্রাণ হারাল। তাঁর মৃত্যুর পরে ইয়াজিদ ও ইয়াজিদের মৃত্যুর পরে মু'আবিয়া সিরিয়ার শাসনকর্তা নিযুক্ত হলেন।

তিন বছর সময়ের মধ্যেই (৬৩৪–৬৩৬ খ্রিঃ) প্রায় সমগ্র সিরিয়া মুসলমানদের বশ্যতা স্বীকার করে। বাইজান্টাইন সাম্রাজ্যের সামরিক ও নৌ-শক্তির দুর্বলতা মুসলমানদের বিজয়ে সাহায্য করেছিল। অন্য পক্ষে মুসলমানদের শৌর্যবীর্য ও সামরিক কলা-কৌশল উন্নততর ছিল। এ ছাড়া স্থানীয় অধিবাসীরা আরবদের মতই সেমিটিক জাতির অন্তর্ভুক্ত ছিল। তাই তারা বাইজান্টাইন শাসকগণকে ঘৃণার চোখে দেখত। আরবগণকে তারা জ্ঞাতি ও স্বজাতি মনে করে বিনা দ্বিধায় তাদের শাসন মেনে নিয়েছিল। আবার সিরিয়াবাসীদের মধ্যে অনেকেই ছিল মনোফিসাইট খ্রিস্টান সম্প্রদায় ভুক্ত। গ্রীক ধর্মনেতারা এঁদেরকে নানা প্রকারে নির্যাতন করত। সিরিয়াবাসিগণ বাইজান্টাইন শাসনামলে নানা প্রকার গুরু করভারে নিপীড়িত হত। এ সব কারণে মুসলমানদের সিরিয়া বিজয় এত সহজ সাধ্য হয়েছিল। নতুন শাসকগণ ধর্মের ব্যাপারে তাদেরকে পূর্ণ স্বাধীনতা দান করেছিল।

ইরাক ও পারস্য বিজয়

আগেই উল্লেখ করা হয়েছে যে, আল-হিরা বিজয়ের পর খালিদ সিরিয়া বিজয়ে অন্যান্য আরব সেনাপতিগণকে সাহায্য করবার জন্য চলে যান। তিনি বেদুঈন দলপতি মুসান্নাকে ইরাকের সৈন্যাধ্যক্ষ নিযুক্ত করে যান। খালিদের প্রস্থানের পর হতে মুসান্না পারসিকদের সাথে যুদ্ধে কখনও পরাজিত আবার কখনও বা বিজয়ী হন। সেতুর যুদ্ধে (নভেম্বর ৬৩৪ খ্রিঃ) তাঁর পরাজয় ঘটে। কিন্তু শীঘ্রই বুওয়াইবের যুদ্ধে তিনি পারসিক সেনাপতি মিহ্‌রানকে পরাজিত করে ইরাকে মুসলমানদের বিজয়ের পথ সুপ্রশস্ত করেন। তিনি নিম্ন মোসোপটেমিয়া অঞ্চল অধিকার করে উত্তরে বাগদাদ (তৎকালে দজলা নদীর তীরে অবস্থিত একটি গ্রাম) ও তাকরীত পর্যন্ত মুসলমান অধিকার প্রতিষ্ঠিত করেন। পারস্য বিজয়ে মুসান্নার দান অপরিসীম। তিনি খলিফা হযরত উমর (রা)-এর কাছে নতুন সৈন্যবাহিনী চেয়ে পাঠালেন। খলিফা সা'দ ইবন আবি ওয়াক্কাসকে সৈন্যাধ্যক্ষ নিযুক্ত করে বিরাট সেনাবাহিনীসহ ইরাকের রণক্ষেত্রে প্রেরণ করলেন। সিরিয়া থেকে আগত সৈন্যদলসহ সাদ' ৩০,০০০ সৈন্য নিয়ে ইরাকে পৌছলেন। ইতিপূর্বে সেনাপতি মুসান্নার মৃত্যু হয়েছে। মৃত্যুকালে আরব সৈন্যদলকে তিনি উপদেশ দিয়ে গিয়েছিলেন যে তারা যেন মরুভূমির কাছাকাছি থেকে যুদ্ধ করে; কারণ বিপদাপদ ঘটলে মরুভূমি তাদের নিরাপদ আশ্রয়স্থল হবে। অপর পক্ষে পারসিকগণ মরুভূমিতে প্রবেশ করতে পারবে না।

কাদিসিয়ার যুদ্ধ, জুন ৬৩৬ খ্রিঃ

সৈন্যাধ্যক্ষ সা'দ নতুন করে সৈন্যদলকে সুবিন্যস্ত করলেন। হযরতের সময়ের অভিজ্ঞ বীর যোদ্ধাদেরকে সেনাপতির পদ প্রদান করা হল। সর্বমোট ১৪০০ সাহাবা এ যুদ্ধে শরীক হয়েছিলেন;এদের মধ্যে ৯৯ জন বদরের যুদ্ধে যোগদিয়েছিলেন। মুসান্নার উপদেশ মত সা'দ মরুভূমির প্রান্ত সীমায় থেকে কাদিসিয়ার প্রান্তরে উপস্থিত হলেন। খলিফা উমর (রা)-এর নির্দেশ ক্রমে সা'দ পারস্য সম্রাটকে ইসলাম ধর্ম গ্রহণের আহ্বান জানিয়ে অন্যথায় কর দানে স্বীকৃত হওয়ার জন্য বিশজন যোদ্ধার এক প্রতিনিধিদল প্রেরণ করলেন। সম্রাট প্রতিনিধিদলকে অপমান করবার জন্য মাটির একটি ভারী বোঝা তাদের একজনকে মাথায় করে নগর দ্বার দিয়ে বের হয়ে যেতে বললেন। প্রতিনিধিদল মাটির বোঝা মাথায় করে নিয়ে কাদিসিয়ায় সেনাপতি সা'দের সম্মুখে ফেললেন এবং আনন্দের আতিশয্যে বলে উঠলেন ঃ "সা'দ, আনন্দ করুন, আল্লাহ আপনাকে পারস্যের মাটি দান করেছেন।"

এ সময় পারস্যে এক অন্তর্বিপ্লব ঘটে; এর ফলে ইয়াজদজির্দ নামক একুশ বছর বয়স্ক এক যুবক সিংহাসনে আরোহণ করেন। সেনাপতি রুস্তম বহু হস্তীসমেত এক লক্ষ বিশ হাজার সৈন্য নিয়ে যুদ্ধের জন্য অগ্রসর হলেন। তিনি ব্যাবিলনের নিকট ফোরাত নদী পার হলেন এবং মুসলমান বাহিনীর মুখোমুখি শিবির সংস্থাপন করলেন। প্রথমদিন মুসলমানদের তকবীর ধ্বনির মধ্য দিয়ে যুদ্ধ আরম্ভ হল। উভয়পক্ষের প্রধান প্রধান বীর পুরুষ দ্বন্দ্বযুদ্ধে অবতীর্ণ হলেন। মুসলমানগণ বদরের যুদ্ধের বীরত্বপূর্ণ ঘটনাবলির পুনরাভিনয় করলেন এবং প্রতিপক্ষের প্রধান যোদ্ধাগণকে পরাজিত করে কয়েকজনকে বন্দী করলেন। হরমুজ নামক একজন পারসিক সেনাপতি বন্দী হলেন। পরবর্তী পর্যায়ে শত্রুপক্ষের হস্তী বাহিনী বেদুঈনদের ব্যূহ ভেদ করে ত্রাসের সৃষ্টি করল। বেগতিক দেখে সৈন্যাধ্যক্ষ সা'দ একদল তীরন্দাজকে হস্তীর আরোহিগণকে লক্ষ্য করে তীর নিক্ষেপ করতে আদেশ করলেন। এদের অব্যর্থ তীর নিক্ষেপে আরোহিগণ হস্তীর পৃষ্ঠ হতে ভূতলে পতিত হল এবং চালকবিহীন হস্তসমূহ যুদ্ধক্ষেত্র হতে পলায়ন করল। যুদ্ধের দ্বিতীয় দিনে সেনাপতি কাকার অধীনে একদল সৈন্য সিরিয়া হতে এসে পৌছল। আরবগণ বিপুল বিক্রমে পারসিকগণকে আক্রমণ করল। ঐদিন পারসিকদের হস্তীবাহিনী যুদ্ধক্ষেত্রে আসতে পারেনি। তাদের সেনাপতি রুস্তম প্রায় মরে বাঁচলেন। দু সহস্র মুসলমান ও দশ সহস্র পারসিক হতাহত হল। এদিনেও যুদ্ধ অমীমাংসিত রইল। তৃতীয় দিনে পারসিকদের হস্তীগুলি পুনরায় যুদ্ধক্ষেত্রে অবতীর্ণ হয়ে আরবদের সৈন্যবাহিনীকে বিপর্যস্ত করে তুলল। সেনাপতি কাকা এদের চক্ষু ও দন্ত লক্ষ্য করে তীর নিক্ষেপ করলেন এবং এরা পুনরায় আরোহিগণকে ফেলে দিয়ে যুদ্ধক্ষেত্র হতে প্রস্থান করল। চতুর্থদিনে মুসলমানগণ মরিয়া হয়ে শেষবারের মত শত্রুর ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ল। সহসা ঘূর্ণিঝড় উঠল এবং পারসিকদের তাঁবু উপড়িয়ে নদীতে নিক্ষেপ করল। সেনাপতি রুস্তম পলায়নপর হলেন কিন্তু ধৃত হয়ে মুসলমানদের হাতে নিহত হলেন। নেতার মৃত্যুতে সৈন্যবাহিনী আতঙ্কিত ও বিশৃঙ্খল হয়ে পশ্চাদপসরণ আরম্ভ করল। মুসলমানগণ তাদেরকে দ্রুত অনুসরণ করল। তাদের অনেকে নিহত হল আবার অনেকে পার্শ্ববর্তী নদীগর্ভে নিমজ্জিত হল। ইয়ারমুকের যুদ্ধে যেমন সিরিয়ার ভাগ্য নির্ধারিত হল, তেমনি কাদিসিয়ার যুদ্ধে পারস্যের ভাগ্য চূড়ান্তভাবে মীমাংসিত হল। আরবগণ আগাগোড়া অমিততেজ ও অসীম ধৈর্য সহকারে যুদ্ধ চালিয়ে জয়ী হল। মুসলমানগণ বহু গণীমতের মাল অর্জন করল। এ পরাজয়ের পর পারস্যবাহিনী পুনরায় একত্রিত ও সংঘবদ্ধ হতে পারল না। পারস্যের দিক

দিগন্তে মুসলমানদের বিজয় বৈজয়ন্তী বজ্র-নির্ঘোষে ঘোষিত হত। একদা প্রত্যূষে হযরত ওমর (রা) ছদ্মবেশে মদীনার উপকণ্ঠে টহল দিয়ে ফিরছিলেন। এমন সময় এক উষ্ট্রারোহী কাদিসিয়ার বিজয় সংবাদ নিয়ে আসল। খলিফা পদব্রজে তার উটের পিছনে পিছনে মদীনায় এসে পৌছলেন। ততক্ষণে খলিফার চতুর্দিকে বহুলোকের ভিড় জমে উঠেছে। দূত অবাক বিস্ময়ে খলিফার প্রতি লক্ষ্য করে তার পূর্ববর্তী আচরণের জন্য লজ্জিত বোধ করল। রোমের কাইসার ও পারস্যের খসরুর চেয়ে প্রবল প্রতাপান্বিত খলিফা এভাবে একজন সাধারণ লোকের মত সর্বাগ্রে মুসলমানদের এক মহা বিজয়ের সুসংবাদ শ্রবণ করেছিলেন।

কাদিসিয়ার বিজয়ের ফলে দজলার পশ্চিমে অবস্থিত ইরাকের নিম্নাঞ্চল আরবদের দখলে আসল। ইরাকের অধিবাসিগণ জাতিতে আরব ও সেমিটিক ছিল তাই তারাও সিরিয়াবাসীদের মতই আরব বিজেতাগণকে নিজেদের মধ্যে বরণ করে নিয়েছিল। ইরাকের খ্রিস্টান অধিবাসিগণ পারসিক শাসনাধীনে নানাভাবে নির্যাতিত হত। আরবগণ সবাইকে ধর্মীয় স্বাধীনতা দান করেছিল। এ সব কারণে সিরিয়ার মতই আরবদের ইরাক বিজয়ও সহজ হয়েছিল।

পারস্যের রাজধানী মাদায়িন দজলার উভয় তীরে গড়ে উঠেছিল। পশ্চিম তীরের নগরীর নাম ছিল সেলুসিয়া (Seleucia) পূর্ব তীরের নগরীর নাম ছিল টেসিফোন (Ctesiphon)। এ যুগল নগরী আরবদের নিকট মাদায়িন নামে পরিচিত হত। পূর্বতীরের নগরীতেই পারস্য সম্রাটের প্রাসাদ (ইওয়ান-ই-কিস্‌রা) অবস্থিত ছিল। মুসলিম সৈন্যাধ্যক্ষ সা'দ প্রথমে পশ্চিম তীরের নগরী আক্রমণ করলেন। নদীর অপর তীর হতে শ্বেত মর্মরে নির্মিত কিসরার প্রাসাদ সা'দের চক্ষু ঝলসিয়ে ফেলল। পারস্য সম্রাট সা'দের কাছে একজন দূত প্রেরণ করে এ মর্মে প্রস্তাব করলেন যে তিনি মুসলমানদেরকে দজলার পশ্চিমাঞ্চলের যাবতীয় অধিকার ছেড়ে দিতে প্রস্তুত রয়েছেন যদি তারা সম্রাটকে পূর্বাঞ্চলে নির্বিঘ্নে বসবাস করতে দেয়। সা'দ এ প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করলেন। পারসিকগণ পশ্চিমতীরের নগরী হতে সদলবলে প্রস্থান করল। মুসলমানগণ কয়েক সপ্তাহ এখানে বিশ্রাম করল। ইতিমধ্যে সম্রাট ইয়াজদজির্দ তাঁর পরিবারবর্গ ও রাজকীয় ধনভাণ্ডার উত্তরাঞ্চলের হুলওয়ান নগরে প্রেরণ করে স্বয়ং প্রস্থানোদ্যত হলেন। আরবগণ দজলা অতিক্রম করার জন্য নৌযানের অনুসন্ধান করে ব্যর্থ হল কারণ পশ্চিম তীর হতে সব নৌকা সরিয়ে নেয়া হয়েছিল। অবশেষে সা'দ স্বল্প পরিসর একটি পারাপারের স্থান খুঁজে বের

মাদায়িন অধিকার ৬৩৭ খ্রিঃ

করলেন। খরস্রোতা নদীর মধ্যদিয়ে দুঃসাহসিক অশ্বারোহিগণ সাঁতার কেটে অপর তীরে উপস্থিত হল। একে একে সম্পূর্ণ সৈন্য বাহিনী নদী পার হল। পারস্যবাসিগণ আরবদের অতর্কিত আক্রমণে সন্ত্রস্ত হয়ে পলায়ন করল। সা'দ কিসরার প্রাসাদ দখল করলেন। বহু ধন-সম্পদ ও মূল্যবান তৈজসপত্র, স্বর্ণ, রৌপ্য, মূল্যবান পরিচ্ছদাদি হীরা, মুক্তা, মাণিক্য ও নানাপ্রকার শিল্পসামগ্রী মুসলমানদের হাতে পড়ল। খলিফা উমর (রা)-এর নিকট গনীমতের এক পঞ্চমাংশ মদীনায় প্রেরিত হল। বহুমূল্যবান দ্রব্য সামগ্রীর মধ্যে ছিল একটি প্রকাণ্ড গালিচা। সা'দ কিসরার প্রাসাদের বিরাট হল ঘরটিকে মসজিদে পরিণত করলেন। ইয়াজদর্জিদ হুলওয়ান হতে জালুলায় একটি সৈন্যবাহিনী প্রেরণ করলেন। কিন্তু তারা মুসলমানদের সাথে যুদ্ধে পরাজিত হয়ে পলায়ন করল। সম্রাট হুলওয়ান হতে রাই শহরে চলে গেলেন। মুসলমানগণ হুলওয়ানও অধিকার করল। হযরত ওমর (রা) মুসলমানদেরকে মেসোপটেমিয়ার সমতল ভূমি ছেড়ে পূর্বদিকে রাজ্য বিস্তার করতে নিষেধ করলেন।

জলুলীয় যুদ্ধ
৬৩৭ খ্রিঃ

হযরত উমর (রা) আরবদেরকে বিজিত দেশের শহরে বসবাস করতে নিষেধ করেন। সৈন্যেরা শহরের আরাম আয়েশ ও বিলাস ব্যসনে অভ্যস্ত হয়ে তাদের সামরিক শৌর্যবীর্য হারিয়ে ফেলবে এ ছিল তাঁর ভয়। ৬৩৮ খ্রিস্টাব্দে কুফা ও বসরায় সেনানিবাস স্থাপিত হয়। কালক্রমে এ দুটি সেনানিবাস প্রসিদ্ধ শহর ও সাংস্কৃতিক কেন্দ্র হিসেবে খ্যাতি অর্জন করে। কুফায় সেনাপতি সা'দ একটি মসজিদ নির্মাণ করেন। তিনি নিজের বসতির জন্য একটি সুরম্য অট্টালিকাও নির্মাণ করেন। এ প্রাসাদের সম্মুখে তিনি একটি ফটকদ্বার তৈরি করেন। এটা শুনে খলিফা উমর (রা) বিশেষ অসন্তুষ্ট হলেন। খলিফা এক দূত মারফৎ তাঁকে আদেশ দিয়ে পাঠালেন যে সেনাপতির ফটকদ্বার সেনাপতির ও জনসাধারণের মধ্যে এক বিরাট অন্তরায়ের সৃষ্টি করেছে। এ ফটক যেন অবিলম্বে ভেঙ্গে ফেলা হয়। সা'দ খলিফার আদেশ শিরোধার্য করে ফটকটি ভেঙ্গে ফেললেন কিন্তু তিনি খলিফাকে জানালেন যে ফটক তৈরির পেছনে তাঁর এরূপ কোন উদ্দেশ্য ছিল না। হযরত ওমর (রা) আরবদেরকে ইরাক ছেড়ে পারস্যের অভ্যন্তরে প্রবেশ করতে বার বার নিষেধ করতে থাকেন কিন্তু পারস্য বাসীদের শত্রুতামূলক আচরণের ফলে

কুফা ও বসরার
পত্তন ৬৩৮
খ্রিঃ

পারস্যের মূল
ভূখণ্ডে যুদ্ধ

এবং মুসলমান সেনাপতিগণের অনুরোধক্রমে ধীরে ধীরে তাঁকে উক্ত নিষেধাজ্ঞা প্রত্যাহার করতে হয়। খুজিস্তানের পারসিক প্রতিনিধি হরমুজান কাদিসিয়ার যুদ্ধ হতে অব্যাহতি পেয়ে আরব অধিকৃত স্থানসমূহের ওপর আক্রমণ চালাতে থাকেন। মুসলমান সেনাপতি উৎবা হরমুজানকে পরাজিত করে ৬৩৮ খ্রিস্টাব্দে খুজিস্তান অধিকার করেন। এর দু বছর পরে হরমুজান পুনরায় মুসলমানদেরকে আক্রমণ করে পরাজিত হলেন। মুসলমানগণ হরমুজানকে অনুসরণ করে যুদ্ধ চালিয়ে যাবার জন্য খলিফার নিকট অনুমতি প্রার্থনা করলে হযরত ওমর (রা) তাদেরকে খুজিস্তানের সেচ ব্যবস্থা উন্নয়ন, পতিত ও অনাবাদী জমি আবাদের ব্যবস্থা করতে আদেশ দেন। ইতিমধ্যে সম্রাটের আদেশক্রমে হরমুজান পুনরায় মুসলমানদের সাথে যুদ্ধ করতে অগ্রসর হলেন। নু'মান নামক মুসলমান সেনাপতির নেতৃত্বে কুফা ও বসরার সম্মিলিত বাহিনী হরমুজানকে রামহরমুজ নামক স্থানে পরাজিত করে তাঁকে বন্দী করেন (৬৪০ খ্রিঃ)। এর পর মুসলমানগণ সুস ও জুন্দিসাবুর অধিকার করল। এ সময় মুসলমান সৈনিকদের একদল প্রতিনিধি হযরত উমর (রা) নিকট আবেদন করল যে পারস্য সম্রাটের বিরুদ্ধে অভিযান চালিয়ে যাবার জন্য তাদেরকে অনুমতি দেয়া হোক। হযরত উমর (রা) প্রতিনিধি দলের নিকট জানতে চাইলেন পারসিকরা কেন বার বার বিদ্রোহী হয়; তাদের বিরুদ্ধে মুসলমানদের কঠোর ব্যবহার এ বিদ্রোহের কারণ কিনা। প্রতিনিধিদল উত্তর করল যে তারা কখনও পারসিকদের সাথে কঠোর ব্যবহার করেনি বরং তাদের সম্রাট বার বার তাদেরকে মুসলমানদের বিরুদ্ধে লেলিয়ে দিয়েছে এবং তাদের সাথে চুক্তি ভঙ্গ করতে উৎসাহিত করেছে। পরিশেষে হযরত ওমরকে বাধ্য হয়ে পারস্যাভিযানের ওপর হতে যাবতীয় নিষেধাজ্ঞা প্রত্যাহার করতে হল।

পারস্য সম্রাট ইয়াজদজির্দ মুসলমানদের সাথে শেষবারের মত শক্তি পরীক্ষার উদ্দেশ্যে প্রাদেশিক শাসনকর্তাগণকে এক বিশাল সৈন্যবাহিনী সমাবেশ করতে আহ্বান জানালেন। "কাস্পিয়ানের তীর হতে ভারত মহাসাগর পর্যন্ত, অক্ষু নদীর
নিহাওন্দের যুদ্ধ, তীর হতে পারস্যোপসাগর পর্যন্ত বিশাল এলাকার লোকগণ এ
৬৪২ খ্রিঃ আহ্বানে সাড়া দিয়ে কাস্পিয়ান সাগরের তীরবর্তী দানাবান্দ নামক
স্থানে সম্রাটের পতাকাতলে সমবেত হল। ২১ লক্ষ ৫০ হাজার লোকের এক সেনাবাহিনী ফিরুজান নামক সেনাপতির অধীনে একত্রিত হল। অচিরেই এ বিপুল বাহিনী পার্বত্য এলাকা হতে কুফা ও বসরার ওপর আপতিত হয়ে মুসলমানদেরকে বিপর্যস্ত ও পর্যুদস্ত করবার উপক্রম হবে। এ শুনে হযরত উমর (রা) স্বয়ং যুদ্ধক্ষেত্রে অবতীর্ণ হবার ইচ্ছে প্রকাশ করলেন কিন্তু সাহাবাদের অনুরোধ ক্রমে মদীনায় থাকাই শ্রেয় মনে করলেন। খুজিস্তান হতে সেনাপতি নুমানকে ডেকে তিনি সৈন্যাধ্যক্ষের পদ দান করলেন। বসরা, কুফা ও সুস হতে

সৈন্যবাহিনী এসে হুলওয়ানে সমবেত হল। মুসলমানদের সৈন্যসংখ্যা ছিল ৩০,০০০ শত্রুর এক পঞ্চমাংশ মাত্র। নিহাওন্দ নামক স্থানে উভয়পক্ষে যুদ্ধ হল। সেনাপতি নুমান শহীদ হলেন। কিন্তু মুসলমানগণ যুদ্ধে জয়লাভ করলেন। পারসিকদের সেনাপতি ফিরুজান হামাদান অভিমুখে পলায়নপর হলে পথিমধ্যে ধৃত হয়ে নিহত হলেন। মুসলমানগণ হামাদানও অধিকার করলেন। হামাদানের অগ্নি-মন্দিরে রক্ষিত রাজকীয় ধনসম্পদ ও মূল্যবান রত্নসম্ভার মুসলমানদের হাতে পড়ল। তার মধ্যে দুটি পাত্রে রক্ষিত রত্ন ৪০ লক্ষ দিরহাম মূল্যে বিক্রীত হল। (৬৪৪-৬৪৫ খ্রিস্টাব্দে) মুসলমানগণ রাই শহর অধিকার করেন। ইয়াজদজির্দ শহর হতে শহরে, স্থান হতে স্থানান্তরে পলায়ন করে আত্মরক্ষা করলেন। কুফা ও বসরা হতে ছয়টি সৈন্যদল একে একে ফারস, কিরমান, মাকরান, সিজিস্তান, খুরাসান ও আজরবাইজান দখল করল।

মিসর বিজয়

হযরত উমর (রা) যখন জেরুজালেমে আসেন তখন সেনাপতি আমর ইবনুল-আস খলিফার নিকট মিসর জয়ের অনুমতি প্রার্থনা করেন। আমর প্রাগ-ইসলামী যুগে বহুবার ব্যবসা-বাণিজ্য ব্যপদেশে মিসরে যাতায়াত করেছিলেন। ঐদেশের রাস্তাঘাট তাঁর জানা ছিল। হযরত উমর (রা) বরাবর রাজ্যসীমা বিস্তারের বিরোধী ছিলেন। আমরের অনুরোধক্রমে খলিফা নিতান্ত অনিচ্ছাসত্ত্বে ও মিসর জয়ের অনুমতি দিলেন। দুঃসাহসী আমর মাত্র ৪০০০ লোক নিয়ে মিসর অভিমুখে রওয়ানা হলেন। মদীনায় ফিরে হযরত উমর (রা) সাহাবাদের সাথে পরামর্শ করে আমরকে ডেকে পাঠাতে চাইলেন কিন্তু আমর ইতিমধ্যে মিসর সীমান্তে পদার্পণ করায় তিনি সেনাপতি জুবায়রকে এক বিরাট সৈন্যদলসহ তাঁর সাহায্যার্থে প্রেরণ করলেন।

আমর প্রথমে ফারামা, বিলবায়স ও আইন শামস্ অধিকার করে ব্যাবিলন নামক দুর্গের সম্মুখে উপস্থিত হলেন। এ সময় সাইরাস (Cyrus) নামক বাইজান্টাইন রাজ প্রতিনিধি ও ধর্মাধ্যক্ষ আলেকজান্দ্রিয়ায় অবস্থান করছিলেন। তিনি তাঁর সেনাপতি থিওডোরাসসহ মুসলমানদের মুকাবিলা করবার জন্য ব্যাবিলনে চলে আসলেন। আমর মদীনা হতে প্রেরিত সৈন্যদলের জন্য অপেক্ষা করছিলেন। অবশেষে সেনাপতি জুবায়রের নেতৃত্বে নতুন সৈন্য এসে উপস্থিত হল এবং মুসলমানদের সৈন্যসংখ্যা ১০ হাজারে উন্নীত হল। বাইজান্টাইনদের সৈন্যসংখ্যা ছিল ২০ হাজার; এ ছাড়া দুর্গের অভ্যন্তরে তাদের আরও ৫০০০ সৈন্য ছিল। এতদসত্ত্বেও বাইজান্টাইন সৈন্যবাহিনী শোচনীয়ভাবে পরাজিত হল, থিওডোরাস আলেকজান্দ্রিয়ায় পলায়ন করলেন এবং সাইরাস ব্যাবিলনের দুর্গ মধ্যে আশ্রয় গ্রহণ করলেন। আরবগণ দুর্গ অবরোধ করে রাখল। সাইরাস অর্থ দ্বারা অবরোধকারিগণকে নিরস্ত করতে চেষ্টা করে ব্যর্থ মনোরথ হলেন। আরবগণ

করদান, ইসলাম গ্রহণ অথবা যুদ্ধ এ তিনটি পন্থার যে কোন একটি গ্রহণ করতে সাইরাসকে আহ্বান জানাল। সাইরাসের দূত মুসলমানদের শিবির হতে ফিরে এসে তাদের সম্বন্ধে নিম্নলিখিত বিবৃতি দান করল ঃ

"আমরা এমন একদল লোকের সাক্ষাৎ পেয়েছি যাদের প্রত্যেকের নিকট জীবন অপেক্ষা মৃত্যুই শ্রেয়, এবং খ্যাতি-প্রতিপত্তির চেয়ে দীন-হীন অবস্থা অধিক পছন্দনীয়। এ পৃথিবীর প্রতি এদের কারও বিন্দুমাত্র আকর্ষণ নেই। তারা মাটির ওপর ছাড়া বসে না, এবং জানুর ওপর ছাড়া খায় না। তাদের নেতা তাদের একজনেরই মত। তাদের নিচকে উচ্চ হতে এবং প্রভুকে ভৃত্য হতে তারতম্য করা যায় না। যখন নামাজের সময় আসে তখন তাদের কেউই অনুপস্থিত থাকে না, সকলেই অজু করে বিনীতভাবে নামাজ আদায় করে।"

আরবদের পক্ষ হতে একদল প্রতিনিধি সাইরাসের সঙ্গে সাক্ষাৎ করল। এ প্রতিনিধিদলের নেতৃত্ব করলেন উবাদা ইবন সামিত নামক একজন হাবশী মুসলমান। এটা দেখে সাইরাস নিতান্ত আশ্চর্য বোধ করলেন। সাইরাস মুসলমানদেরকে কর দিতে রাজি হয়ে সম্রাট হিরাক্লিয়াসের নিকট সন্ধির শর্ত অনুমোদনের জন্য প্রেরণ করলেন। হিরাক্লিয়াস সন্ধির শর্ত অনুমোদন করলেন না। অধিকন্তু তিনি সাইরাসকে বিশ্বাসঘাতকতার অভিযোগে অভিযুক্ত করে নির্বাসন দণ্ড দান করলেন।

আরবগণ ব্যাবিলনের অবরোধ চালিয়ে গেল। সাতমাস অবরোধের পর জুবায়র ও তাঁর সঙ্গীরা দুর্গের চারপাশের পরিখাটি ভর্তি করে দেওয়াল উলঙ্ঘন করে অতর্কিতে দুর্গের ভেতর প্রবেশ করল। মুহুর্মুহু 'আল্লাহু আকবর' ধ্বনিতে দুর্গের অভ্যন্তর প্রকম্পিত হল। ৬৪১ খ্রিস্টাব্দের ৬ এপ্রিল দুর্গটি মুসলমানদের নিকট আত্মসমর্পণ করল।

ইতিমধ্যে সম্রাট হিরাক্লিয়াসের মৃত্যু হয়েছে। মিসরের গ্রীক শাসকগোষ্ঠী ক্রমশ দুর্বল হয়ে পড়ল। মিসরের স্থানীয় খ্রিস্টানগণ কপ্ট (কিব্তী) নামে অভিহিত হত। গ্রীক শাসকগণ তাদের ওপর গ্রীক ধর্মমত চাপাবার চেষ্টা করে ব্যর্থ হয়। কপ্ট ধর্মাধ্যক্ষ বেঞ্জামিন গ্রীক শাসন থেকে পালিয়ে একটি মঠে আত্মগোপন করেছিলেন। ব্যাবিলনের যুদ্ধের পর হতে কপ্টগণ আরব শাসকগণকে সাহায্য করতে থাকে। সেনাপতি আমর ব্যাবিলনে একটি সেনাবাহিনী রেখে

নিহাওন্দের যুদ্ধ, ৬৪২ খ্রিঃ

মিসরের বাইজান্টাইন রাজধানী আলেকজান্দ্রিয়ার দিকে অগ্রসর হলেন। তৎকালে আলেকজান্দ্রিয়া কনস্টান্টিনোপলের পরেই পৃথিবীর মধ্যে সর্বাপেক্ষা সুন্দর ও শক্তিশালী নগর ছিল। মদীনা হতে নতুন সৈন্যদলসহ আমর সর্বমোট ২০ হাজার সৈন্য নিয়ে আলেকজান্দ্রিয়ার দুর্ভেদ্য প্রাচীরের সম্মুখে

এসে উপস্থিত হলেন। দুর্গাভ্যন্তরে ৫০,০০০ বাইজান্টাইন সৈন্য ছিল। এছাড়া আলেকজান্দ্রিয়ার অনতিদূরে ভূমধ্য সাগরের উপকূলে মোতায়েন ছিল শক্তিশালী গ্রীক নৌ-বহর। দুর্গের ভেতর হতে গ্রীকগণ আরবদের প্রতি প্রস্তরাদি নিক্ষেপ করছিল। হিরাক্লিয়াসের মৃত্যুর পর তাঁর পুত্র কনস্টান্স নির্বাসিত সাইরাসকে পুনরায় আলেকজান্দ্রিয়ায় প্রত্যাবর্তন করবার অনুমতি দান করেন। ৬৪১ খ্রিস্টাব্দের ৮ই নভেম্বর সাইরাস আমরের সাথে এক সন্ধি স্থাপন করে কর দিতে স্বীকৃত হন। কোন বাইজান্টাইন সেনাবাহিনী মিসরে থাকতে পারবে না বলে উভয়পক্ষ সম্মত হয়।

ব্যাবিলনের উপকণ্ঠে যেখানে আমর শিবির সংস্থাপন করেছিলেন সেখানে একটি সামরিক নিবাস গড়ে ওঠে। একে ফুস্তাত নাম দেয়া হয়। এখানে আমর একটি মসজিদও স্থাপন করেন। ফুসতাত কালক্রমে একটি শহরে উন্নীত

ফুসতাত নগর স্থাপিত

হয় এবং এটা ফাতিমীয় খলিফাগণের সময় পর্যন্ত মিসরের রাজধানী ছিল। আমর নীলনদের সাথে লোহিত সাগরের সংযোগকারী একটি প্রাচীন খালের সংস্কার সাধন করেন। এর ফলে মিসর হতে প্রয়োজনীয় দ্রব্যাদি সমুদ্রপথে আরবের বন্দরসমূহে পৌঁছাবার সুযোগ হল। আমর ক্ষমতায় প্রতিষ্ঠিত হয়েই মিসরের কপ্ট খ্রিস্টান ধর্মাধ্যক্ষ বেঞ্জামিনের অনুসন্ধান করলেন এবং তাকে পূর্বপদে অধিষ্ঠিত করলেন। আলেকজান্দ্রিয়া অধিকারের পর আরবদের সহজ সরল জীবনযাত্রা ও সামরিক শৌর্যবীর্য সম্পর্কে মিশরীয়গণকে অবহিত করার উদ্দেশ্যে সেনাপতি আমর একটি কৌশল অবলম্বন করলেন। প্রথমে তিনি বেদুঈন পদ্ধতিতে উট জবেহ করে একটি বিরাট ভোজের আয়োজন করলেন। এতে মিসরীয়গণও উপস্থিত ছিলেন। পরদিন মিসরের উপাদেয় খাদ্য সামগ্রীর ব্যবস্থা করে আবার সকলকে ডাকলেন। এবারও আরবগণ পরম তৃপ্তি সহকারে ভোজন পর্ব সমাধা করল। তৃতীয়দিন সৈন্য-বাহিনীকে যুদ্ধ সাজে সজ্জিত করে উপস্থিত স্থানীয় জনসাধারণকে সম্বোধন করে বললেন "প্রথমদিনের ভোজের আয়োজন করা হয়েছে আমাদের স্বদেশের সহজ জীবনযাত্রা সম্বন্ধে তোমাদেরকে অবহিত করার জন্য। পরেরদিনের অনুষ্ঠানের উদ্দেশ্য এ যে আমরা তোমাদেরকে দেখাতে চেয়েছি বিজিত দেশের সৌখিন জিনিসও আমরা উপভোগ করতে পারি এবং তা সত্ত্বেও আমরা আমাদের সামরিক শৌর্য রক্ষা করতে পারি যেমন আজ তোমরা দেখতেছ।"

আলেকজান্দ্রিয়া বিজয়ের পর সেনাপতি আমর পশ্চিমদিকে অগ্রসর হয়ে বার্কা ও ত্রিপলি অধিকার করেন। খলিফা উসমানের সময় গ্রীকগণ আলেকজান্দ্রিয়া

পুনরাধিকারের চেষ্টা করে। মুসলমানগণ অন্যত্র রাজ্যজয়ে ব্যাপৃত ছিল। সেনাপতি আমর দ্রুত প্রত্যাবর্তন করে গ্রীকদের সাথে ঘোরতর যুদ্ধ করলেন এবং তাদেরকে পরাজিত করলেন (৬৪৬ খ্রিঃ)।

হযরত উমরের শাসন ব্যবস্থা

হযরত উমরের সময় মুসলমানদের রাজ্য বহুদূর বিস্তৃতি লাভ করায় হযরত উমর (রা)-ই সর্বপ্রথম একটি সুষ্ঠু ও সুপরিকল্পিত শাসনব্যবস্থা প্রবর্তন করেন। বহুজাতি ও ধর্মের লোকের সমন্বয়ে গঠিত বিশাল সাম্রাজ্যে কিভাবে ন্যায় ও নীতির সুপ্রশস্ত ভিত্তির ওপর প্রতিষ্ঠিত শাসনব্যবস্থা কায়েম করা যায় এ ছিল দূরদর্শী হযরত উমররের চিন্তা। ইসলাম ধর্মাবলম্বীদের যাবতীয় স্বার্থ সংরক্ষণ, বিজিত দেশে অমুসলমানদের জানমালের নিরাপত্তা বিধান ও সর্বোপরি জনসাধারণের কল্যাণ সাধন ছিল তাঁর শাসন ব্যবস্থার প্রধান লক্ষ্য।

হযরত আবু বকরের খিলাফত আমলে যে রিদ্দার যুদ্ধ সংঘটিত হয়েছে তার অভিজ্ঞতা খলিফা ওমরকে সুস্পষ্ট শাসন নীতি নির্ধারণ করতে সহায়তা করেছিল।

শাসননীতি হযরতের জীবদ্দশায় ইহুদিরা সর্বশক্তি নিয়োগ করে মুসলমানদের সাথে যুদ্ধ করেছিল। তাঁর মৃত্যুর পরে ধর্মত্যাগীদের আন্দোলনের সময় ইহুদি ও খ্রিস্টানগণ ধর্মত্যাগীদেরকে প্রকাশ্যভাবে সহায়তা করেছিল। এছাড়া বাইজান্টাইন-দের সাথে মুসলমানদের বরাবর যুদ্ধ করতে হত। তাই হযরত উমর (রা) এ সিদ্ধান্তে উপনীত হলেন যে, আরব উপ দ্বী পকে ইসলামের দুর্ভেদ্য ঘাটিরূপে—কেবলমাত্র মুসলমানদের আবাস ভূমি হিসেবে—সম্ভাব্য বিদ্রোহ, ষড়যন্ত্র ও অসদাচরণের হাত হতে রক্ষা করতে হবে। এতদুদ্দেশ্যে তিনি আরবের খ্রিস্টান ও ইহুদি সম্প্রদায়কে আরবদেশ ছেড়ে মুসলিম সাম্রাজ্যের অন্যত্র চলে যেতে আদেশ করলেন। নাজরানের খ্রিস্টানগণকে তাদের জায়দাদের বদলে অন্যত্র জমি অথবা নগদ অর্থ গ্রহণ করতে বলা হল। এদের কেউ কেউ সিরিয়ায় চলে গেল। কিন্তু তাদের অধিকাংশ লোক কুফায় বসতি স্থাপন করল। তাদের সাথে পূর্ববর্তী সন্ধির শর্তানুসারে কর আদায়ের বিনিময়ে নতুন আবাসভূমিতে তাদের জানমালের নিরাপত্তা বিধান করা হল। অনুরূপ খাইবারের ইহুদিগণকেও তাদের সম্পত্তির বিনিময়ে অর্থ দান করে সিরিয়ায় প্রেরণ করা হল। খলিফা উমরের শাসন ব্যবস্থার দ্বিতীয় প্রধান নীতি এ ছিল যে যেহেতু আরব উপদ্বীপ এখন মুসলমানদের আবাসভূমি হিসেবে নির্ধারিত হল সেজন্য তারা আরবদেশের বাইরে কোথাও ভূসম্পত্তির মালিক হয়ে চাষাবাদ করতে বা বসবাস করতে পারবে না। এর কারণ হযরত উমর (রা) বুঝতে পারছিলেন যে আরবগণ বিদেশে বসবাস আরম্ভ করলে তাদের সামরিক শৌর্যবীর্য নষ্ট হয়ে যাবে এবং তারা আরাম আয়েশে লিপ্ত হয়ে শান্তি প্রিয় নিরীহ জাতিতে পরিণত হবে। অন্যপক্ষে বিজিত দেশে মূল জমিজমার

মালিকগণ তাদের জায়গা জমি হারিয়ে অর্থনৈতিক বিপর্যয়ের সৃষ্টি করবে। এতে রাষ্ট্রের রাজস্বেরও ক্ষতি হবে। মুসলমানগণ যোদ্ধা হিসেবে রাষ্ট্র হতে বেতন ও ভাতা পাবে। তারা মূল আরব ভূখণ্ডে কোন জমির মালিক থাকলে উশর নামক কর প্রদান করবে।

হযরত উমর (রা) আরবের বাইরে আরবগণকে কোন শহরে বা নগরে বাসেরও অনুমতি দেননি। কারণ এতে তারা নগর সভ্যতার বিলাসব্যসনে মগ্ন হয়ে সামরিক কর্তব্য বিচ্যুত হবে। সেজন্য তিনি বিভিন্ন দেশে তাদেরকে সুনির্দিষ্ট সামরিক নিবাসে বসবাস করতে নির্দেশ দেন। সিরিয়ায় জাবিয়া হিম্‌স্‌, আমওয়াস, তাবারিয়া, লুদ্দ ও রামলায় সেনানিবাস স্থাপিত হল। মিসরে ফুসতাত ও আলেকজান্দ্রিয়ায় সামরিক শিবির স্থাপিত হল। ইরাকে নবনির্মিত কুফা ও বসরা নগরী নতুন সেনানিবাস হিসেবে নির্দিষ্ট হল।

অমুসলমানগণ তাদের ধর্মের ব্যাপারে পূর্ণ স্বাধীনতা ভোগ করত। তাদের ধর্মীয় নেতাদের শাসনাধীনে তারা স্ব স্ব ধর্মীয় আইন অনুসারে শাসিত হত। মুসলিম রাষ্ট্রের সাথে তারা চুক্তিবদ্ধ বা সন্ধিসূত্রে আবদ্ধ থাকত। এজন্য তাদেরকে

অমুসলমানদের প্রতি নীতি

'আহ্‌লুজ-জিম্মাহ' বা চুক্তিবদ্ধ সম্প্রদায় বলা হত। সংক্ষেপে এরা জিম্মী নামে অভিহিত হত। এরা মুসলিম রাষ্ট্রে করদানের বিনিময়ে জানমাল ও ধর্মের নিরাপত্তা লাভ করত। অমুসলমানগণ উক্ত চুক্তি অনুসারে বহির্শত্রুর আক্রমণ হতে রক্ষার জন্য এক প্রকার সামরিক কর দিত। এটাই জিয্‌য়া নামে অভিহিত হত। ভূসম্পত্তির মালিক হিসেবে এরা ভূমি রাজস্ব ও (খারাজ) আদায় করত।

রাজস্ব ব্যবস্থা

খলিফা উমরের সময় নিম্নলিখিত উপায়ে রাজস্ব সংগৃহীত হত। খারাজ বা ভূমি রাজস্ব কর্ষণযোগ্য ভূমির ওপর ধার্য করা হত। এতদুদ্দেশ্যে সিরিয়া ও ইরাকে

খারাজ

ক্ষেত্র পরিমাপ করা হল। এ জরিপের ভিত্তিতে জমির পরিমাণ ও উৎপাদিকা শক্তি ও পূর্বতন আইন-কানুন মোতাবেক জমির রাজস্ব নির্ধারণ করা হল। সিরিয়ায় প্রতি জরিপ (৬০ হাত × ৬০ হাত) জমির ওপর এক নির্দিষ্ট কর ধার্য করা হল। ইরাকে রাজস্ব আদায় ও শান্তিরক্ষার জন্য স্থানীয় সর্দারগণের সাহায্য নেয়া হত। অমুসলমানদের নিকট হতে জিয্‌য়া নামক রক্ষা কর গ্রহণ করা হত। রাজ্যজয়ের সময় তাদের সাথে যে সন্ধি করা হত তারই শর্তানুসারে এ করের পরিমাণ নির্ধারিত হত। মোটামুটি বিত্তবানদের জন্য মাথাপিছু

জিয্‌য়া

৪ দীনার, মধ্যবৃত্ত শ্রেণীর জন্য ২ দীনার ও সাধারণ শ্রেণীর জন্য ১ দীনার হিসেবে জিয্‌য়া ধার্য হত। যেহেতু এ কর সামরিক কাজের পরিবর্তে ধার্য হত সেজন্য অমুসলমানদের সবল সক্ষম ব্যক্তিদের নিকট হতেই এ কর গ্রহণ করা হত। স্ত্রীলোক, অপ্রাপ্ত বয়স্ক ছেলেমেয়ে, ভিক্ষুক, সন্ন্যাসী, বৃদ্ধ

অপ্রকৃতিস্থ ও রোগগ্রস্ত ব্যক্তির ওপর এ কর ধরা হত না। বিত্তবান মুসলমানগণের নিকট হতে সুনির্ধারিত নিয়মে জাকাত আদায় করা হত। জাকাতের অর্থ দরিদ্র ও নিঃস্ব ব্যক্তিদের ভরণ-পোষণের জন্য ব্যয়িত হত।

হযরত উমরের সময় গণীমৎ (যুদ্ধক্ষেত্রে লব্ধ সামগ্রী) হতে রাষ্ট্রীয় তহবিলে বহু অর্থ সংগৃহীত হত। খাইবারের যুদ্ধের পর হযরত মুহম্মদ (স) নিয়ম করে
জাকাত দিয়েছিলেন যে যুদ্ধক্ষেত্রে শত্রুর নিকট হতে যে সকল দ্রব্য সামগ্রী পাওয়া যাবে তার এক পঞ্চমাংশ রাষ্ট্রীয় তহবিলে জমা হবে। বাকি পাঁচভাগের চারভাগ যুদ্ধে যোগদানকারী সৈনিকদের মধ্যে বিতরণ করে দেয়া হবে। হযরত ওমরের সময় এ উপায়ে বহু অর্থ আমদানি হত। গণীমতের এক পঞ্চমাংশকে 'খুমুস' বলা হত।

হযরত উমরের রাজস্ব ব্যবস্থার সর্বাপেক্ষা উল্লেখযোগ্য ব্যাপার তাঁর রাজস্ব বন্টন। উপরোক্ত উপায়ে রাজস্ব সংগৃহীত হওয়ার পর শাসন সংক্রান্ত ও সামরিক
দীওয়ান ব্যয় নির্বাহের পর যা উদ্বৃত্ত থাকত তা মুসলমানদের মধ্যে বিতরণ করা হত। এ উদ্দেশ্যে আদম শুমারী করা হল। ঐতিহাসিক হিট্টি বলেন, এটাই "পৃথিবীর ইতিহাসে লিখিত সর্বপ্রথম আদমশুমারী যা রাজস্ব বণ্টনের উদ্দেশ্যে করা হয়েছে।" মুসলমানদের নামধাম যে বালাম খাতায় লিপিবদ্ধ করা হত তাকে দীওয়ান বলা হত। এ খাতায় প্রত্যেকের নামে ভাতা নির্ধারিত করে দেয়া হয়েছে। ভাতা নির্ধারণের ব্যাপারে তিনটি বিষয় বিবেচনা করা হত—ইসলাম গ্রহণে অগ্রগণ্যতা, রসূলুল্লার সাথে সম্পর্ক ও জিহাদে অংশ গ্রহণ। তালিকায় সর্বাগ্রে উম্মাহাতুল মুমিমীন (মুমীনগণের মাতা) অর্থাৎ হযরত রসূলুল্লাহ (স)-এর সহধর্মিনীগণের নাম লিপিবদ্ধ করা হল। এদের ভাতা বছরে ১০,০০০ দিরহাম ধার্য হল। এর পর আনসার ও মুহাজিরগণের নাম লিপিবদ্ধ করা হল। বদরের যুদ্ধে যোগদানকারী মুজাহিদগণ প্রত্যেকে ৫০০০ দিরহাম পেতেন। হুদায়বিয়ার যুদ্ধে যারা অংশ গ্রহণ করেছিল তাদের বৃত্তি ছিল ৪০০০ দিরহাম। রিদ্দার যুদ্ধে অংশ গ্রহণকারীদের বৃত্তি ৩০০০ দিরহাম ধার্য হল। যারা সিরিয়া ও ইরাকে যুদ্ধ করেছিল তাদের বৃত্তি এবং বদরের মুজাহিদগণের পুত্রদের বৃত্তি ছিল ২০০০ দিরহাম। কাদিসিয়া ও ইয়ারমুকের যুদ্ধের পর যারা সৈন্যবিভাগে যোগদান করে ছিল তাদের বৃত্তি ছিল ১০০০। একজন সাধারণ সৈনিকের ন্যূনপক্ষে ৫০০–৬০০ দিরহাম বৃত্তি নির্ধারিত হত। সৈনিকদের স্ত্রী, বিধবা মেয়েলোক, ছেলেমেয়ে প্রত্যেকে রাষ্ট্রীয় তহবিল (বায়তুলমাল) হতে নির্ধারিত ভাতা প্রাপ্ত হত। প্রত্যেক নবজাত শিশুর নামে ১০ দিরহাম ভাতা মঞ্জুর করা হত এবং বয়ঃবৃদ্ধির সাথে সাথে তার ভাতাও বৃদ্ধি

হত। আরবদের গোলাম, তাদের মাওলারা ও (মুক্তিপ্রাপ্ত দাস অথবা আশ্রিত) বৃত্তি পেত। উইলিয়াম ম্যুর বলেন, "একটি জাতির পক্ষে সম্পূর্ণ রাজস্ব, গণীমৎ ও রাষ্ট্রের জয়লব্ধ সম্পদ সম-ভ্রাতৃত্বের ভিত্তিতে ভাগাভাগি করে নেয়ার দৃষ্টান্ত সম্ভবত জগতে বিরল।" হযরত উমর (রা)-এর উদ্বৃত্ত রাজস্বের শেষ কপর্দক পর্যন্ত জনসাধারণের মধ্যে বিতরণ করে দিতে পারলে গৌরবান্বিত বোধ করতেন।

প্রাদেশিক শাসন

হযরত মুহম্মদের (স)-এর সময় প্রধান প্রধান শহরে ও প্রদেশে আমীর নামধারী শানকর্তা নিযুক্ত হয়েছে। হযরত উমর (রা) এ পদবী বহাল রাখেন। তিনি বিজিত দেশসমূহকে সুনির্দিষ্ট প্রদেশে বিভক্ত করে প্রত্যেক প্রদেশে শাসনকর্তা নিযুক্ত করেন। আহওয়াজও বাহরাইন একটি প্রদেশ ছিল ঃ সিজিস্তান, মাকরান ও কিরমান নিয়ে একটি প্রদেশ গঠিত হয়েছিল। তাবারিস্তান ও খুরাসান দুটি ভিন্ন প্রদেশ ছিল। দক্ষিণ পারস্য তিনটি প্রদেশে বিভক্ত ছিল। ইরাকের বসরা ও কুফায় দুজন শাসনকর্তা ছিলেন। সিরিয়ায় হিমস্, দামিস্ক ও জেরুজালেমে তিনজন শাসনকর্তা ছিলেন। আফ্রিকা তিনটি প্রদেশে ও আরবদেশ পাঁচটি প্রদেশে বিভক্ত ছিল। ছোট প্রদেশের শানকর্তাকে ওয়ালী বা নায়িব বলা হত। প্রাদেশিক শাসনকর্তা পদাধিকার বলে জুমা ও জামাতের ইমামতি করতেন এবং শুক্রবারে খুৎবা পাঠ করতেন। প্রদেশের শাসনকর্তৃত্ব ছাড়া কৃষির উন্নতি বিধানও আমীর বা ওয়ালীর দায়িত্ব ছিল। হযরত উমরের নির্দেশে ইরাকের পয়ঃপ্রণালীর সংস্কার সাধন করা হয়। দজলা ও ফুরাত নদীর বহুদিনের অবহেলিত বাঁধসমূহের পুনর্নির্মাণ ও রক্ষণাবেক্ষণের জন্য বিশেষ ধরনের কর্মচারী নিয়োগ করা হল। যুদ্ধক্ষেত্রে প্রেরিত সেনাবাহিনী ছাড়া প্রদেশের রাজধানীসমূহে কোন জরুরি অবস্থার মোকাবেলা করার জন্য অশ্বারোহী বাহিনী সংরক্ষিত করা হত।

হযরত উমর (রা) সর্বপ্রথম বিচারের জন্য কাজী নিযুক্ত করেন। ঐতিহাসিক বালাজুরী বলেন যে তিনি দামিস্কে ও উরদুনে এবং হিম্স্ ও কিন্নিসরিনে কাজী নিযুক্ত করেছিলেন। প্রত্যেক সবল সক্ষম মুসলমান সৈন্যবাহিনীতে যোগদান করত। খলিফা নিজেই সৈন্যবাহিনীর সর্বাধ্যক্ষ ছিলেন। তবে বিশেষ অভিযান উপলক্ষে খলিফা কোন একজনকে সৈন্যাধ্যক্ষ নিযুক্ত করতেন। সৈন্যাধ্যক্ষ খলিফার নায়েব বা স্থলাভিষিক্ত হিসেবে নামাজে নেতৃত্ব করতেন। সৈন্যগণ পতাদিক ও অশ্বারোহী বাহিনীতে বিভক্ত ছিল। অশ্বারোহিগণ প্রধানত তীর-ধনুক ও বর্শা ব্যবহার করত এবং পদাতিকগণের প্রধান যুদ্ধ সরঞ্জাম ছিল ঢাল, তরবারি ও তীর-ধনুক। প্রতিরক্ষার জন্য সৈনিকগণ বর্মও পরিধান করত। বর্শার ফলক বাহরাইনের উপকূলে খাত্ নামক স্থানে নির্মিত হত

কাজী নিয়োগ

সৈন্যবিভাগ বলে এটি খাত্তী নামে অভিহিত হত। উৎকৃষ্ট তরবারী ভারত হতে আমদানি হত বলে এটি হিন্দী নামে পরিচিত হত। চিরাচরিত প্রথা অনুযায়ী যুদ্ধক্ষেত্রে সৈন্যবাহিনী পাঁচটি শ্রেণীতে বিভক্ত হত, যথা, অগ্র, মধ্য, বাম, ডান ও পশ্চাৎ। অশ্বারোহিগণ ডাইনে ও বামে থাকে পদাতিকগণকে রক্ষা করত। পদাতিক দল তিন শ্রেণীতে দণ্ডায়মান হত। সম্মুখে থাকত বর্শাধারী ও পশ্চাতে থাকত ধনুধরগণ। আর মধ্যভাগেও থাকত সাধারণ পদাতিকগণ। পরস্পরকে দ্বন্দ্বযুদ্ধে আহ্বান করে যুদ্ধ আরম্ভ করা হত। দামামা ও ভেরীর আওয়াজের সাহায্যে যুদ্ধ ঘোষণা করা হত। যুদ্ধক্ষেত্রে আল্লাহ্ আকবর ধ্বনি সৈনিকদেরকে উৎসাহিত করত। কোরআন শরীফের আয়াত পাঠ করেও যুদ্ধে সৈনিকগণকে উৎসাহ দেয়া হত। হযরত উমরের সময় মুসলমান বাহিনী এর অপূর্ব মনোবলের জন্য বিখ্যাত ছিল। সৈনিকগণ আল্লার ওপর গভীর বিশ্বাস ও ধর্মে অবিচলিত আস্থা হতে এ মনোবল প্রাপ্ত হত। মুসলমানদের দ্বিতীয় প্রধান গুণ ছিল তাদের অপরিসীম সহিষ্ণুতা। এ সহিষ্ণুতা তারা তাদের আবাসভূমি মরুভূমি হতে লাভ করেছিল। মুসলিম বাহিনীর তৃতীয় প্রধানগুণ ছিল এর গতিশীলতা। উটের ব্যবহার তাদেরকে এ গতিশীলতা দান করেছিল।

অন্যান্য ঘটনাবলি

হযরত ওমর (রা) মাঝে মাঝে মক্কায় হজ্ব করতে যেতেন। তাঁর মৃত্যুর কিছুকাল পূর্বে তিনি তিন সপ্তাহকাল মক্কায় অবস্থান করে কাবা শরীফের চারিদিকের অঙ্গন বর্ধিত করেন। এ উদ্দেশ্যে কিছু বাড়িঘর ভেঙ্গে ফেলতে হয়েছিল। বাড়ির মালিকগণকে উপযুক্ত ক্ষতিপূরণ দেয়া হল। হারাম শরীফের চৌহদ্দীর স্তম্ভগুলি নতুন করে নির্মিত হল। হজ্ব যাত্রীদের সুবিধার জন্য রাস্তায় বিভিন্ন স্থানে বিশ্রামাগার স্থাপিত হল। এগুলির রক্ষণাবেক্ষণের জন্য স্থানীয় আরব গোত্রগুলিকে দায়িত্ব দেয়া হল। হযরত উমর (রা) হিজরী সনের প্রতিষ্ঠা করেন। যে বছর হিজরত সংঘটিত হয়েছে সেই বছরের পহেলা মুহরম হতে হিজরী সাল গণনা আরম্ভ করা হয়।

হযরত উমরের খিলাফতের আর একটি উল্লেখযোগ্য ঘটনা কুরআন শরীফের বিভিন্ন সূরা ও অধ্যায়ের একত্রীকরণ। তাঁর খিলাফতের প্রথম দিকে এ কাজ আরম্ভ করা হয়। এর প্রথম প্রচেষ্টা হযরত আবু বকরের খিলাফতের সময় হযরত উমরের অনুরোধ ক্রমেই আরম্ভ হয়েছে। ইয়ামামার যুদ্ধে কুরআন মুখস্থকারীদের অনেকেই শহীদ হওয়ার ফলেই কুরআনের বিভিন্ন অংশ সংগ্রহ ও একত্রীকরণের প্রয়োজন বিশেষভাবে অনুভূত হয়। জায়দ ইবন সাবিত এ গুরুত্বপূর্ণ কাজের ভারপ্রাপ্ত হন। বিশেষ যত্ন সহকারে বিভিন্ন সূত্রে নানা উপকরণাদি—যথা চামড়া, তালপাতা, পাথর বা লোহার ফলক-হতে অথবা মুখস্থকারীদের উদ্ধৃতি হতে পূর্ণ কুরআন শরীফের পাঠ সমাপ্ত করে এর পাণ্ডুলিপি হযরত ওমরের কন্যা হাফসার হেফাজতে রাখা হয়।

বিশাল মুসলিম জাহানের অবিসংবাদিত নেতা রোমের কাইসার ও পারস্যের খসরুর ত্রাস দ্বিতীয় খলিফা হযরত উমরের মৃত্যু বড়ই শোকাবহ ও করুণ। আবু লুলুয়া নামক একটি পারসিক ক্রীতদাসের হস্তে তিনি নিহত হন। সেনাপতি মুগীরা তাকে ইরাক হতে যুদ্ধবন্দী হিসেবে মদীনায় নিয়ে এসেছিলেন। সে মনে মনে হযরত উমরের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র ফাঁদতেছিল। একদিন প্রত্যুষে যখন মুসল্লিগণ মদীনার মসজিদে জামাতের জন্য কাতার বন্দী হয়ে দাঁড়িয়েছিল তখন আবু লুলুয়া সকলের অলক্ষ্যে ও অজ্ঞাতসারে নামাজীদের মধ্যে মিশে গেল। যে মাত্র তকবীরের সাথে নামাজ আরম্ভ হল আবু লুলুয়া একটি ছোরার সাহায্যে হযরত উমরের গায়ে ছয়টি আঘাত হানল। হযরত ওমরের আদেশক্রমে আবদুর রহমান নামাজের নেতৃত্ব করলেন।[১] আহত খলিফাকে তাঁর গৃহে নিয়ে যাওয়া হল। তিনি আবদুর রহমানকে খিলাফতের দায়িত্ব গ্রহণ করতে অনুরোধ করলেন কিন্তু আবদুর রহমান এতে রাজি হলেন না। হযরত উমর (রা) তখন ছয়জন সাহাবার নাম করে বললেন যে এঁরা একজনকে খলিফা বলে মনোনীত করবেন। এদের নাম আবদুর রহমান, আলী, উসমান, জুবায়র, সাদ ও তালহা। তালহা তখন মদীনায় ছিলেন না। উমর এ নির্বাচক মণ্ডলীকে তিনদিন পর্যন্ত তালহার জন্য অপেক্ষা করতে বললেন। তারপর তিনি তাঁর পুত্র আবদুল্লাহকে সম্বোধন করে বললেন, "যদি নির্বাচকগণের মধ্যে মতভেদ হয় তবে তুমি সংখ্যাগরিষ্ঠদের দলে থাকবে, যদি ভোট সমান সমান হয় তবে তুমি আবদুর রহমানের পক্ষে থাকবে।" তিনি হিজরী ২৩ সালের শেষের দিকে সাড়ে দশ বছর খিলাফতে অধিষ্ঠিত থাকার পর ইনতিকাল করেন।

মৃত্যু ৬৪৪ খ্রিঃ

চরিত্র ও কৃতিত্ব

হযরত ওমরের সময় মুসলিম সাম্রাজ্য বহুদূর পর্যন্ত বিস্তৃত হয়। হযরত আবু বকরের মৃত্যুর সময় মুসলমানগণ সিরিয়ায় যুদ্ধে ব্যাপৃত ছিল। হযরত উমরের সময় সিরিয়া, ইরাক, পারস্য ও মিসর বিজিত হয়। বাইজান্টাইন সম্রাট শোচনীয়ভাবে পরাজিত হন এবং সাসানীয় সাম্রাজ্য পর্যুদস্ত হয়। বহু ধনৈশ্বর্যের মালিক হয়েও হযরত উমর (রা) আরবীয় প্রথামত সাদাসিধা জীবন-যাপন করতেন। বিশাল সাম্রাজ্যের অধিপতি হযরত উমরকে তাঁর সমসাময়িক রাজা বাদশাহের দূতগণ নিতান্ত অনাড়ম্বর অবস্থায় দেখে বিস্মিত হত। জেরুজালেমের ধর্মাধ্যক্ষের আহ্বানে সেখানে যাওয়ার সময় তিনি একটি ভৃত্যের সাথে অদল -বদল করে একবার উটের পিঠে চড়তেন আর একবার ভৃত্যকে চড়িয়ে নিজে উটের রশি ধরে টানতে। এতে তিনি বিন্দুমাত্র সঙ্কোচ বোধ করলেন না। তাঁর জীর্ণ সাধারণ পোশাক পরিবর্তনের জন্য সেনাপতি আবু উবায়দা বহু মিনতি

১. আবদুর রহমান ইবন আউফ।

করে শুধু খলিফার ভর্ৎসনাই শুনেছিলেন। খিলাফতের গুরুদায়িত্ব ও ন্যায় বিচার প্রতিষ্ঠার চিন্তা তাঁকে এতই ব্যাকুল করে তুলত যে তিনি বিনয় করে বলতেন, "আমার মাতা যদি আমাকে গর্ভে ধারণ না করতেন তবে ভালই হত, আমি যদি তার বদলে এ ঘাসের গুচ্ছ হতাম!"

শাসনকর্তা ও সেনাপতি মনোনয়নে উমর (রা) পক্ষপাত শূন্য ছিলেন। তাঁর শাসনে যুযুধান ও প্রতিদ্বন্দ্বী আরব গোত্রসমূহ ঐক্যের বন্ধনে আবদ্ধ হয়ে ইসলামের সম্মান ও প্রতিপত্তি বৃদ্ধির পথ প্রশস্ত করেছিল। রাজ্যে আইন-শৃঙ্খলা সুপ্রতিষ্ঠিত ছিল। বিদ্রোহপ্রবণ কুফা ও বসরা নগরী তাঁর খিলাফত সময়ে তাঁর বশ্যতা স্বীকার করে চলত। বয়োবৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে প্রথম বয়সের তেজোদৃপ্ততা বহুলাংশে প্রশমিত হয়েছে। তথাপি ন্যায়ের খাতিরে উমর (রা) আমরণ বজ্রকঠোর ছিলেন। তাঁকে অধিকাংশ সময় মদীনার বাজারে কোড়া হাতে দেখা যেত। অন্যায় আচরণকারীকে তিনি কঠোর হস্তে দমন করতেন। হযরত উমরের কোড়া অন্যলোকের তরবারী অপেক্ষা ভয়াবহ বলে বিবেচিত হত। দরিদ্র জনসাধারণের প্রতি তাঁর দয়া বদান্যতার বহু গল্প প্রচলিত আছে। রাত্রিতে ছদ্মবেশে তাদের অবস্থা স্বচক্ষে দেখবার জন্য তিনি ভ্রমণ করে বেড়াতেন। একদা তিনি এক দরিদ্র বৃদ্ধার ক্ষুধার্ত ছেলে-মেয়েদেরকে ক্রন্দনরত অবস্থায় দেখতে পেলেন। বৃদ্ধা তাদেরকে সান্ত্বনা দেবার উদ্দেশ্যে উনুনে একটি শূন্য হাঁড়ি চাপিয়ে আগুনে জ্বাল দিতেছিল। হযরত উমর (রা) সঙ্গে সঙ্গে তাদের জন্য খাবার এনে নিজ হাতে পরিতৃপ্তির সাথে খাইয়ে তাদের মুখে হাসি ফুটিয়ে তুলেছিলেন।

গ্রন্থনির্দেশ

১. উইলিয়াম ম্যুর ঃ কলিফেট,. *ইট্‌স্ রাইজ ডিক্লাইন এণ্ড ফল।*
২. পি. কে. হিট্টি ঃ *হিস্ট্রি অব দি এরাব্‌স্।*

১০

উসমান গনী (রা)

(৬৪৪ – ৬৫৪ খ্রিঃ)

স্বাভাবিকভাবে হযরত উমর (রা)-এর জীবনাবসান হলে তিনি উত্তরাধিকারী মনোয়নের জন্য কি ব্যবস্থা গ্রহণ করতেন তা অনুমান করা কঠিন। তবে তিনি যে আরও সুনিশ্চিত কোন ব্যবস্থা অবলম্বন করতেন এতে কোন সন্দেহ নেই। মারাত্মকভাবে আহত খলিফা জীবন ও মৃত্যুর সন্ধিক্ষণে দাঁড়িয়ে মুসলিম জগতের ভবিষ্যৎ চিন্তা করে ছয়জন প্রধান সাহাবার স্কন্ধে এ গুরুদায়িত্ব অর্পণ করার সিদ্ধান্ত করলেন। এদের মধ্যে যে কেউ নির্বাচিত হলে এবং এ ছয় জনের সর্বসম্মতিক্রমে নির্বাচন অনুষ্ঠিত হলে তা সর্বসাধারণের নিকটও গ্রহণযোগ্য হবে মনে করেই হযরত উমর (রা) এরূপ ব্যবস্থা করেছিলেন। নির্বাচকগণ দু-দিন ধরে বাকবিতণ্ডা ও আলাপ-আলোচনা করেও কোন সিদ্ধান্তে পৌঁছতে পারলেন না। তাঁদের মধ্যে মতভেদ ও মতবিরোধ দেখা দিল। প্রবীণ আবদুর রহমান এক বিনিদ্র রজনী যাপন করে শহরের নেতৃস্থানীয় লোক ও রাজধানীতে উপস্থিত প্রাদেশিক কর্মকর্তাগণের সাথে পরামর্শ করলেন। তারপর তিনি নির্বাচকদের নিকট এ মর্মে আবেদন করলেন যে তিনি নিজের দাবি প্রত্যাহার করবেন যদি নির্বাচকগণ তাঁকে সালিসি করার ভার দেন। এতে তাঁরা সকলেই সম্মত হলেন। তারপরও তিনি নির্বাচকদের প্রত্যেকের সঙ্গে পৃথক পৃথকভাবে আলোচনা করলেন। অবশেষে দেখা গেল হযরত উসমান ও হযরত আলীকে খলিফা মনোনয়নের ব্যাপারে নির্বাচকগণ প্রায় দ্বিধা বিভক্ত হয়ে পড়ল। আবদুর রহমান এক্ষণে তালহা ও আলীর সাথে আলাদাভাবে আলোচনা চালালেন। এভাবে তৃতীয় দিন অতিবাহিত হল। হযরত উমর (রা)-এর ওয়াসিয়ৎ অনুসারে চতুর্থদিনে অবশ্যই খলিফা নির্বাচনের কাজ সম্পন্ন করতেই হবে।

ওসমান খলিফা নির্বাচিত নভেম্বর, ৬৪৪ খ্রিঃ

প্রত্যুষে ফজরের নামাজ আদায় করবার উদ্দেশ্যে মুসল্লিগণ মদীনার মসজিদ প্রাঙ্গনে সমবেত হলেন। সমবেত জনসাধারণের উপস্থিতিতে আবদুর রহমান উসমান ও আলী উভয়কে পর পর জিজ্ঞেস করলেন যে তিনি খলিফা হলে আল্লাহ্ ও রসূলের নির্দেশ এবং রসূলের খলিফাগণের রীতিনীতি অনুসারে চলবেন কিনা। উভয়ে সম্মতিসূচক উত্তর প্রদান করলেন। তারপর তিনি নিজের সালিসি ক্ষমতা প্রয়োগ করে উসমানের হাত ধরে বয়আৎ (আনুগত্যের শপথ) করলেন এবং

তাঁকে খলিফা বলে ঘোষণা করলেন। হযরত উসমানের বয়স এ সময় সত্তর পূর্ণ হয়েছে। তিনি হযরত রসূলুল্লাহ(স)-এর অত্যন্ত প্রিয়পাত্র ছিলেন এবং হযরতের দুই কণ্যাকে বিবাহ করে ছিলেন। রুকাইয়াকে প্রথমে এবং তাঁর মৃত্যুর পর উম্মে-কুলসুমকে বিবাহ করেছিলেন। তিনি ধন্যাঢ্য ছিলেন এবং মুসলমানদের কল্যাণার্থে অকাতরে দান করেছিলেন। তিনি আবিসিনিয়ায় অন্যান্য মুসলমানদের সঙ্গে হিজরতে যোগদান করেছিলেন। কাজেই খিলাফতের সর্বপ্রকার যোগ্যতাই তাঁর মধ্যে ছিল। হিজরী ২৪ সালের ১লা মুহররম উসমান (রা) খলিফা হিসেবে আনুগত্যের শপথ গ্রহণ করেন এবং সমবেত জনমণ্ডলীকে সম্বোধন করে এক সংক্ষিপ্ত ভাষণ দান করেন।

হযরত আলী (রা) অপরাপর সকলের মত ওসমানের আনুগত্য স্বীকার করে নিলেন কিন্তু সালিস আবদুর রহমান তাঁর খিলাফতের দাবি অস্বীকার করায় তিনি মনক্ষুণ্ন হলেন। কিছু দিন পর তালহা মদীনায় ফিরে আসলেন। তিনিও ওসমানকে খলিফা বলে মেনে নিলেন।

হযরত ওসমানের খিলাফত বার বছর স্থায়ী হয়েছে। তাঁর খিলাফত রাজ্য বিস্তারের দিক দিয়ে প্রথম দুই খলিফার আরব্ধ কার্যের পরিপূরক। তাঁর সময়ে বিভিন্ন দিকে মুসলমান সেনাপতি ও সৈন্য বাহিনী কৃতকার্যতার সাথে যুদ্ধ-বিগ্রহ পরিচালনা করে তাদের পূর্ববর্তী বিজয় গৌরব অক্ষুণ্ন রেখে চলল। পারস্য বিজয় তাঁর সময়েই পরিসমাপ্ত হয়েছে। পূর্ব সীমান্তে নতুন নতুন এলাকায় নামে মাত্র হলেও খলিফার আধিপত্য স্থাপিত হল। কিন্তু তাঁর খিলাফতের শেষের দিকে নানা কারণে মুসলমান সমাজে মতদ্বৈধ ও দলাদলি ভয়াবহ রূপ পরিগ্রহ করে নৈরাজ্যের সৃষ্টি করল।

খলিফা ওমরের মৃত্যুর অল্পকাল পরেই পারস্যে বিদ্রোহ দেখা দিল। উসমানের আদেশে বসরার শাসনকর্তা ইবন আমির একাধিক যুদ্ধে বিদ্রোহিগণকে পরাজিত করে এ সকল অঞ্চলে খলিফার আধিপত্য সুপ্রতিষ্ঠিত করেন। নিশাপুর ও মার্ভ শহরদ্বয় আত্মসমর্পণ করে কর দিতে অঙ্গীকারাবদ্ধ হল। অক্ষু নদীর তীরে

যুদ্ধ-বিগ্রহ ও রাজ্য জয়

খওয়ারিজমে যুদ্ধ হল এবং বল্খ ও তুখারিস্তান পর্যন্ত অঞ্চল খলিফার আনুগত্য স্বীকার করে নিল। কিরমান ও সিজিস্তানে খলিফার আধিপত্য পুনঃ প্রতিষ্ঠিত হল এবং হেরাত, কাবুল ও গজনীর শাসকগণও খলিফার কর্তৃত্ব মেনে নিল। কিরমানে দুর্গাদি নির্মিত হল, পয়ঃপ্রণালী খোদিত হল এবং বিজেতাদের কেউ কেউ সেখানে জমিজমা অধিকার করে বসবাস করতে আরম্ভ করল। পলায়মান পারসিক রাজা ইয়াজদজির্দ স্থান হতে স্থানান্তরে ঘুরে ফিরে অবশেষে হযরত উসমানের খিলাফতের অষ্টম বছর (৬৫২

খ্রিঃ) আততায়ী কর্তৃক নিহত হন। তাঁর ধনরত্নের লোভে পারসিকরাই তাঁকে হত্যা করেছিল।

কাস্পিয়ান সাগরের পশ্চিম দিকে ৬৫৩ খ্রিস্টাব্দে তুর্কী ও খাজারদের বিরুদ্ধে একটি অভিযান প্রেরিত হয়েছে। কিন্তু আজরবাইজানের পার্বত্য অঞ্চলে আরব নেতাগণ ও সেনাবাহিনী শোচনীয়ভাবে পরাজয় বরণ করে। ঐ সময়ে কিরমানের বরফাবৃত পার্বত্য অঞ্চলেও একটি মুসলিম সেনাবাহিনী সম্পূর্ণ নিশ্চিহ্ন হয়ে যায়। সিরিয়ায় মুআবিয়া একটি বাইজান্টাইন আক্রমণ প্রতিহত করেন। এর পর প্রতি বছর গ্রীষ্মকালে মুআবিয়া গ্রীকদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করতেন।

ইবন আবি সারাহ

মিসরে হযরত উসমান আমরের পরিবর্তে ইবন আবি সারাহকে শাসনকর্তা নিযুক্ত করেন। ৬৪৭ খ্রিস্টাব্দে ইবন আবি সারাহ ত্রিপলি ও বার্কায় মুসলমান আধিপত্য বিস্তার করেন। কার্থেজের শাসনকর্তা গ্রেগরীর সাথে তাঁর এক ঘোরতর যুদ্ধ হয়। এ যুদ্ধে মুসলমানগণ গ্রেগরীর ১ লক্ষ ২০ হাজার সৈন্যের মুকাবিলা করে জয়লাভ করেছিল। সিরিয়ার শানকর্তা মুআবিয়া সমুদ্রাভিযানের অনুমতি চেয়ে খলিফা উমরের নিকট আবেদন করেছিলেন কিন্তু দূরদর্শী ও সাবধানী উমর (রা) মুআবিয়াকে সমুদ্রযাত্রার অনুমতি দিলেন না। উমরের মৃত্যুর পর মুআবিয়া উসমানের নিকট আবেদন করলেন। খলিফা এতে আপত্তি করলেন না। ৬৪৯ খ্রিস্টাব্দে আবু কয়েসের নেতৃত্বে সাইপ্রাসে একটি অভিযান প্রেরিত হল। মিসর হতে ইবন-আবি-সারাহ এ অভিযানে যোগদান করেছিলেন। অনায়াসে সাইপ্রাস অধিকৃত হল। কয়েক বছর পর রোড্স্ দ্বীপও মুসলমানদের দখলে আসল। ৬৫২ খ্রিস্টাব্দে ইবন-আবি-সারাহ আলেকজান্দ্রিয়ার নিকটে একটি বিরাট বাইজান্টাইন নৌ-বাহিনীকে পর্যুদস্ত করেন।

এই সকল বিজয় অভিযান ও রাজ্য বিস্তার ক্রমশ কমে আসছিল। সৈন্যগণ অপেক্ষাকৃত অবসর জীবন-যাপন করছিল। এ দিকে হযরত ওসমানের খিলাফত লাভের পর কুরাইশদের দু প্রধান শাখা বনু হামিশ ও বনু উমাইয়ার মধ্যে দলাদলি ও রেশারেশি আরম্ভ হল হযরত ওসমান (রা) ছিলেন উমাইয়া বংশের লোক আর হযরত আলী (রা) হাশিমী বংশের লোক। তাই

আভ্যন্তরীণ গোলযোগ

তাঁদের সমর্থকগণ পরস্পরকে ঈর্ষা ও সন্দেহের চোখে দেখতে লাগল। কুরাইশদের মধ্যে যখন এরূপ অন্তর্দ্বন্দ্ব চলতেছিল, তখন সুযোগ বুঝে বেদুঈন সৈন্যগণ রাষ্ট্রের বিরুদ্ধে বিদ্রোহী হয়ে উঠল। এ অসন্তোষ নবনির্মিত সেনানিবাস কুফা ও বসরায় গুরুতর আকার ধারণ করল। তারা ক্রমশ মনে করতে লাগল যে, ইসলামের যাবতীয় বিজয় তাদের বাহু বলেই অর্জিত হয়েছে। কিন্তু কুরাইশ গোত্রের লোকেরাই রাষ্ট্রের সব সুযোগ-সুবিধা করায়ত্ত করে নিয়েছে।

খলিফা ছিলেন কুরাইশ বংশের, তিনি সব সময় কুরাইশ নেতাদের পরামর্শ অনুসারেই রাষ্ট্র পরিচালনা করেন। যুদ্ধ-বিগ্রহের স্বল্পতা ও অপেক্ষাকৃত অবসর জীবন তাদেরকে এ সকল কথা ভাববার সুযোগ দিয়েছিল। তাই তারা দিন দিন কুরাইশদের কর্তৃত্ব ও শাসন ক্ষমতার বিরুদ্ধে অসন্তোষ প্রকাশ করে বিদ্রোহী হতে লাগল। রাষ্ট্রের এ সঙ্কটের সময় কুরাইশদের মধ্যে ঐক্য ও সদ্ভাবের প্রয়োজন ছিল সর্বাপেক্ষা বেশি; কিন্তু হযরত উসমানের দুর্ভাগ্য যে, এ সময় নানা কারণে কুরাইশদের উমাইয়া ও হাশিমী শাখার মধ্যে অন্তর্দ্বন্দ্ব বৃদ্ধি পাওয়ায় সৈনিকদের বিদ্রোহ দমনে তিনি অপারগ হলেন। হযরত উসমানের বয়স তখন আশি পার হয়ে গিয়েছে। তাঁর চরিত্রে দৃঢ়তা ও তৎপরতার অভাব পরিলক্ষিত হল। ধার্মিক-প্রবর উসমানের বার্ধক্য প্রযুক্ত দুর্বলতার সুযোগ নিয়ে তাঁর পরিবারের লোকেরা ও মন্ত্রণাদাতাগণ তাঁকে সম্পূর্ণ করায়ত্ত করে ফেলল। বিশেষত তাঁর প্রধান উপদেষ্টা মারওয়ান রাষ্ট্রের প্রধান কর্ণধার সেজে বসলেন। মারওয়ানের কার্যকলাপে জনসাধারণ উত্তরোত্তর বিদ্রোহ প্রবণ হয়ে উঠল।

কুফা ও বসরায় বেদুঈন সৈন্যগণ ও জনসাধারণ বার বার শাসনকর্তার বিরুদ্ধে বিদ্রোহী হয়ে উঠল। হযরত উসমান (রা) শান্তি ও শৃঙ্খলার খাতিরে বারবার শাসনকর্তা পরিবর্তন করে বিদ্রোহের অনল প্রশমিত করতে চেষ্টা

কুফা ও বসরায় বিদ্রোহ

করলেন। তিনি উমাইয়া বংশের লোকজনকে শাসনকর্তা পদে নিযুক্ত করে ক্রমশ হাশিমীদের বিরাগভাজন হলেন। হযরত উসমানের বিরুদ্ধে স্বজন-প্রীতির অভিযোগ রাজ্যের সর্বত্র ছড়িয়ে পড়িল। গণদাবির প্রতি শ্রদ্ধা জানাতে গিয়ে হযরত উসমান (রা) স্থানে স্থানে উমাইয়া শাসকগণকেও অপসারিত করে অন্য শাসনকর্তা নিযুক্ত করলেন কিন্তু পরিস্থিতি ক্রমশ এরূপ গুরুতর আকার ধারণ করল যে, বিক্ষুব্ধ জনসাধারণকে কিছুতেই সন্তুষ্ট করা সম্ভব হল না। উমাইয়া হোক আর অন-উমাইয়া হোক হযরত উসমানের কোন শাসনকর্তাকে তারা মেনে নিবে না। বেদুঈনদের প্রধান অভিযোগ ছিল কুরাইশদের কর্তৃত্বের বিরুদ্ধে। প্রথম হতেই কঠোর হয়ে বিদ্রোহদমনই ছিল হযরত উসমানের জন্য প্রকৃষ্ট পন্থা। কিন্তু তিনি দৃঢ়তা ও তৎপরতার সাথে কোন ব্যবস্থা অবলম্বন না করায় বিদ্রোহিগণ আস্কারা পেয়ে গেল। তাঁর মনোনীত শাসনকর্তাগণও এ সঙ্কট সময়ে একে একে অযোগ্য প্রমাণিত হল।

অন্যান্য কারণ

হযরত উসমানের বিরুদ্ধে যখন তীব্র অসন্তোষ ধূমায়িত হয়ে উঠছিল, তখন বিদ্রোহী ও দুষ্কৃতিকারীরা তাঁর বিরুদ্ধে একাধিক অভিযোগ উপস্থাপিত করল। কুরআন শরীফ সংগ্রহ ও সংরক্ষণের ব্যবস্থা হযরত উসমানের এক স্মরণী

কুরআন সংগ্রহ ও সংরক্ষণ

ও প্রশংসনীয় কীর্তি। মুসলিম জগতের বিভিন্ন স্থানে কুরআন পাঠে বিভিন্নতা পরিলক্ষিত হয়। হযরত ওসমান (রা) পবিত্র কিতাবের নির্ভুল সংরক্ষণের জন্য উদগ্রীব হয়ে পড়লেন। তিনি বিখ্যাত সাহাবাগণের পরামর্শক্রমে রাজ্যের সর্বত্র হতে প্রচলিত কুরআনের কপিগুলি মদীনায় নিয়ে আসলেন। তারপর তিনি কয়েকজন বিশেষজ্ঞ নিযুক্ত করলেন। তাঁরা হযরত হাফসার নিকট সংরক্ষিত আবুবকরের আমলের কুরআনের প্রতিলিপির সাথে মিলিয়ে নির্ভুল ও বিশুদ্ধ কপি প্রস্তুত করলেন। এখন এ কপি হতে অনেকগুলি কপি প্রস্তুত করে মক্কা, মদিনা, কুফা ও দামিস্কে রেখে দেয়া হল, এগুলি হতে রাজ্যের সর্বত্র কুরআনের প্রতিলিপি ছড়িয়ে দেয়া হল। পুরাতন কপিগুলিকে আগুনে পুড়িয়ে ফেলা হল। হযরত উসমানের সময়োপযোগী প্রচেষ্টার ফলে কুরআনের বিশুদ্ধতা রক্ষা পেল এবং তাঁর এ কার্য সকলের অকুণ্ঠ প্রশংসা অর্জন করল। কিন্তু শীঘ্রই তাঁর শত্রুরা তাঁর বিরুদ্ধে এ অভিযোগ আনয়ন

আবু জার আল-গিফারী

করল যে, তিনি কুরআন শরীফের অসংখ্য কপি জ্বালাইয়া দিয়েছেন। বিদ্রোহপ্রবণ জনতার মুখে এ অভিযোগ সর্বত্র প্রতিধ্বনিত হতে লাগল। আবু-জার-আল্‌গিফারী নামক জনৈক সুফী সাধকের নির্বাসন হযরত উসমানের বিরুদ্ধে অসন্তোষ আরও বাড়িয়ে তুলল। তিনি হযরত মুহম্মদ (স)-এর একজন বিশ্বস্ত সহচর ও প্রাথমিক মুসলমানদের অন্যতম ছিলেন। তিনি সংসারের প্রতি উদাসীন ছিলেন এবং ইবাদত বন্দেগীতেই সর্বদা ব্যাপৃত থাকতেন। রাজ্য বিস্তারের সঙ্গে সঙ্গে মুসলমানদের মধ্যে ধন-সম্পদের প্রাচুর্য ও বিলাস ব্যসনের সমারোহ দেখে তিনি নিতান্ত মর্মাহত ও ব্যথিত বোধ করলেন। সুরম্য অট্টালিকা, অসংখ্য দাসদাসী, বহুমূল্য পোশাক-পরিচ্ছদ, অগণিত অশ্ব ও উষ্ট্রাদি রাজ্যের সর্বত্র এমন কি পবিত্র নগরদ্বয় মক্কা ও মদিনার সহজ সরল জীবন যাত্রাকে আমূল পরিবর্তন সাধিত করেছিল। আবু জার এ বস্তুতান্ত্রিক জীবন-যাত্রার বিরুদ্ধে প্রতিবাদ উত্থাপন করলেন। তিনি ধনী সম্প্রদায়কে দরিদ্রদের উপকারার্থে তাদের ধন পরিহার করতে বললেন। কুরআনের বাণী উদ্ধৃত করে তিনি দামিস্কে ওজস্বিনী ভাষায় প্রচার আরম্ভ করলেন। বহুলোক তাঁর চারপাশে একত্রিত হল। মুআবিয়া তাঁর আন্তরিকতা ও সাধুতা পরীক্ষা করবার জন্য তাঁকে এক সহস্র মুদ্রার একটি থলি উপহার পাঠালেন। পরের দিন তিনি বলে পাঠালেন যে, থলিটি ভুলক্রমে তাঁকে পাঠান হয়েছে। তাই তিনি এর প্রত্যর্পণ দাবি করলেন। আবু জার মু'আবিয়াকে জানালেন তিনি রাত্রিতেই ঐ মুদ্রা গরিব-দুঃখীদের মধ্যে বিতরণ করে দিয়েছেন। মুআবিয়া বিপদ আশঙ্কা করে তাঁকে খলিফা উসমানের নিকট পাঠিয়ে দিলেন। খলিফা তাঁর সাথে তর্ক-বিতর্ক করেও তাঁকে প্রচার হতে নিবৃত্ত করতে পারলেন না। তিনি আবু জারকে বললেন

যে, ধনী ও সম্পদশালী ব্যক্তিরা জাকাত আদায় করলে তিনি তাদেরকে আর কিছুই করতে পারেন না বা তাদের ধন-সম্পদে কোনরূপ হস্তক্ষেপ করতে পারেন না। অবশেষে শান্তিভঙ্গের আশঙ্কায় হযরত উসমান আবু জারকে মরুভূমির রাবাজা নামক স্থানে নির্বাসিত করলেন। সেখানে দারিদ্র্য ও অনশনে তাঁর মৃত্যু হয়। তাঁর এ মৃত্যু সংবাদ দাবানলের মত চতুর্দিকে ছড়িয়ে পড়ল এবং উসমানের শত্রুরা এ ঘটনার যথাযোগ্য সদ্ব্যবহার করতে বিন্দুমাত্র ত্রুটি করল না।

হযরত ওসমান (রা) লক্ষ্য করলেন যে, মক্কা ও মদীনায় কিছুসংখ্যক লোক জুয়া ইত্যাদি খেলে পবিত্র নগরীর মর্যাদা ক্ষুণ্ণ করছে। তাই তিনি ইসলামের বিধান অনুসরণে এ সকল খেলা নিষিদ্ধ করে দেন। কিন্তু যুবা শ্রেণীর লোকেরা উসমানের ওপর অসন্তুষ্ট হল এবং অচিরে তারা খলিফার শত্রুদের সাথে মিলিত হল।

হযরত ওমর (রা) মক্কা ও মদীনার মসজিদগুলির সংস্কার ও সম্প্রসারণের ব্যবস্থা করেন। মক্কায় হজ্ব করতে গিয়ে তিনি কব্বাশরীফের অঙ্গনকে বর্ধিত করতে চাইলেন। কিন্তু বাড়ির মালিকেরা সরকার কর্তৃক প্রদত্ত ক্ষতিপূরণ নিতে অস্বীকার করে ভীষণ গোলযোগ আরম্ভ করে দিল। খলিফা তাদেরকে কারাগারে আবদ্ধ করলেন। এতেও উসমানের বিরুদ্ধে কিছু লোক বিদ্রোহী হয়ে উঠল। হযরত উসমান হজ্বের অনুষ্ঠানে স্থানে স্থানে সামান্য পরিবর্তন সাধন করেন। এগুলি নিতান্ত অকিঞ্চিৎকর ছিল; কিন্তু দুষ্ট লোকেরা এ সুযোগে খলিফার বিরুদ্ধে অপপ্রচার আরম্ভ করে তাঁকে লোকচক্ষে হেয় প্রতিপন্ন করতে চেষ্টা করল। উল্লিখিত সকল কারণে রাজ্যের সর্বত্র হযরত উসমানের বিরুদ্ধে তুমুল বিক্ষোভ আরম্ভ হল এবং খলিফার বিরুদ্ধে যারই কোন প্রকৃত অথবা অপ্রকৃত অভিযোগ ছিল, সেই বিদ্রোহীদের দলে যোগদান করল। উসমানের খিলাফতের শেষের দিকে এ সকল পুঞ্জীভূত অসন্তোষ ক্রমশ ধূমায়িত হয়ে প্রচণ্ড আক্রোশে বিস্ফোরিত হল।

এ সময় ইবন সাবা নামক জনৈক নও-মুসলিম দিকে দিকে বিপ্লবের আগুন ছড়াতে আরম্ভ করল। সে পূর্বে ইহুদি ধর্মাবলম্বী ছিল এবং দক্ষিণ আরবের অধিবাসী ছিল। ইসলাম ধর্ম গ্রহণের পর সে সরকার বিরোধী কার্যকলাপে লিপ্ত হয় এবং একে একে বসরা, কুফা ও সিরিয়া হতে নির্বাসিত হয়ে অবশেষে মিসরের জনসাধারণের মধ্যে অপপ্রচার আরম্ভ করে। তার মতে হযরত মুহম্মদ (স) পুনরায় আবির্ভূত হবেন, আলীই তাঁর প্রকৃত প্রতিনিধি। উসমান ছিলেন খিলাফতে অনধিকার চর্চাকারী। উসমানের প্রাদেশিক শাসনকর্তাগণ সকলেই অত্যাচারী। মুসলিম জগতের সর্বত্র অধর্ম ও জুলুমের রাজত্ব। উমাইয়াদের কর্তৃত্বের অবসান না হলে রাজ্যে সত্য ও ন্যায় পুনঃ প্রতিষ্ঠিত হবে না। মিসরের

জনসাধারণের মধ্যে এ সকল মতবাদ প্রচার করেই ইবন সাবা ক্ষান্ত হল না। পত্রযোগে বিভিন্ন স্থানে এ সকল ভাবধারা প্রচার করা হল। মিসর, কুফা ও বসরায় হযরত উসমানের বিরুদ্ধে ও প্রাদেশিক শাসনকর্তাগণের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ক্রমে প্রবল আকার ধারণ করল। রাজধানী মদীনায়ও অল্পসংখ্যক লোকই হযরত ওসমানের অনুগত রইল। হযরত আলী (রা) উসমানকে কঠোর হস্তে বিদ্রোহ দমন করতে উপদেশ দিলেন। কিন্তু ক্রমবর্ধমান অরাজকতার মুখে উসমান (রা) রক্তপাত ও যুদ্ধ-বিগ্রহ এড়িয়ে যেতে চাইলেন। অথচ তাঁর এ নীতি অন্তিমে রক্তপাত ও বিদ্রোহ বন্ধ করতে পারল না। দৃঢ় ও কঠোর হস্তে একবার বিদ্রোহ দমন করলে বিপদ এত গুরুতর আকার ধারণ করত না।

খিলাফতের দ্বাদশবর্ষে বিদ্রোহ চরম আকার ধারণ করল। হযরত উসমানের নিকটাত্মীয় ব্যতীত আর কেউই তাঁকে সমর্থন করল না। মদীনার পথে-ঘাটে তাঁর বিরুদ্ধে অভিযোগ উত্থিত হল। হযরত উসমান হজ্বের পূর্বে রাজ্যের সর্বত্র ঘোষণা করে দিলেন যে, হজ্বের সময় প্রাদেশিক শাসনকর্তাগণ যথারীতি মদীনায় আগমন করবেন। তাঁদের বিরুদ্ধে জনসাধারণের কোন অভিযোগ থাকলে তারা যেন ঐ সময় খলিফার নিকট তা উপস্থাপিত করে। কিন্তু এরূপ অবস্থায় যেমন সচরাচর ঘটে থাকে অভিযোগকারীরা কেউই তাদের অভিযোগ খলিফার সম্মুখে পেশ করতে সাহস করল না।

হযরত উসমানকে নানালোকে নানারকম উপদেশ দিল। কেউ বলল, বিদ্রোহী-দেরকে কঠোর হস্তে দমন করা উচিত; কেউ বলল, শাসনকর্তাগণকে তাদের আচরণ সংশোধন করতে হবে; আবার কেউ বলল, রাজ্যজয়ের জন্য বিদেশে সৈন্যবাহিনী প্রেরণ করে অন্তর্দ্বন্দ্বের অবসান ঘটান হোক। সিরিয়ার শাসনকর্তা মু'আবিয়া হযরত উসমানকে মদীনা ত্যাগ করে দামিস্কে চলে যেতে অথবা মদীনায় খলিফার রক্ষণাবেক্ষণের জন্য দামিস্ক হতে কিছু সৈন্য আনয়নের জন্য পরামর্শ দান করলেন। কিন্তু ধর্মপ্রাণ উসমান রসূলুল্লার নগরী ছেড়ে যেতে কিংবা সৈন্যবাহিনী মোতায়েন করে উক্ত নগরীর পবিত্রতা ও মর্যাদা ক্ষুণ্ন করতে অস্বীকার করলেন।

· ইতিমধ্যে চক্রান্তকারীরা সিদ্ধান্ত করল যে, তারা একযোগে কুফা, বসরা ও ফুসতাত হতে মদীনায় উপস্থিত হয়ে খলিফার নিকট তাদের দাবি-দাওয়া পেশ করবে এবং সমস্বরে এর প্রতিকার দাবি করবে। হযরত উসমান তাদের দাবি-দাওয়া মেনে না নিলে তারা তাঁর পদত্যাগ দাবি করবে। অচিরেই বিদ্রোহীরা মদীনার উপকণ্ঠে শিবির সংস্থাপিত করল। তারা মদীনাবাসীদের নিকট নগর-প্রবেশের অনুমতি প্রার্থনা করল। আলী, তালহা ও যুবাইর বিদ্রোহীদিগকে কঠোরভাবে তিরস্কার করলেন। মদীনার জনসাধারণ অস্ত্রশস্ত্রে সজ্জিত হয়ে

তাদেরকে বাধাদানের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করল। বিদ্রোহীরা খলিফার নিকট হতে শাসন-সংস্কারের প্রতিশ্রুতি পেয়ে নগর ত্যাগ করে চলে গেল। অকস্মাৎ তারা প্রত্যাবর্তন করল। হযরত আলী (রা) তাদের এ আচরণের কথা জিজ্ঞেস করলে তারা বলল যে, তারা হযরত উসমানের একজন ভৃত্যের নিকট হতে খলিফার সিলমোহরাঙ্কিত একটি ফরমান উদ্ধার করেছে। উক্ত ভৃত্য ফরমানটি নিয়ে দ্রুত মিসর অভিমুখে যাত্রা করেছিল এতে তাদের স্বদেশ প্রত্যাবর্তনের পর কারাদণ্ড, নির্যাতন ও মৃত্যুদণ্ডের আদেশ রয়েছে। হযরত আলী (রা) জানতে চাইলেন যে, কুফা, বসরা ও ফুসতাতে প্রত্যাবর্তনরত তিনটি দলের লোকেরা কিভাবে উক্ত খবর জানতে পেরে আবার একসঙ্গে মদীনায় প্রত্যাবর্তন করেছে। বিদ্রোহীরা কোন যুক্তি-তর্ক মানতে চাইল না। হযরত আলী (রা) খলিফা উসমানকে উক্ত ফরমানের বিষয় জিজ্ঞেস করলে তিনি এরূপ দলিলে সিলমোহর দিয়েছেন বলে অস্বীকার করলেন। বিদ্রোহীরা হযরত উসমানের সাথে তর্ক-বিতর্ক জুড়ে দিল এবং তাঁর পদত্যাগ দাবি করল। উসমান পদত্যাগ করতে অস্বীকার করলে তারা তাঁর সাথে যুদ্ধ করে তাঁকে হত্যা করবার ভয় দেখাল। উসমান (রা) দৃঢ়তার সাথে উত্তর করলেন, "আমি মৃত্যুই শ্রেয় মনে করি, কিন্তু যুদ্ধ-বিগ্রহের কথা আমি পূর্বেই বলেছি, আমার লোকেরা যুদ্ধ করবে না। যদি যুদ্ধ করাই আমার অভিপ্রেত হত, তাহলে আমি আমার পার্শ্বে বহু সৈন্যবাহিনী ডেকে আনতে পারতাম।" পরবর্তী জুমার নামাজের সময় বিদ্রোহীরা মসজিদে গোলযোগ আরম্ভ করল এবং খুৎবা পাঠরত খলিফাকে প্রস্তরাঘাতে আহত করল। এর পর তারা খলিফাকে তাঁর প্রাসাদে ঘিরে রাখল। খলিফার অন্তরীণাবস্থায় আলী, তালহা ও যুবাইর তাঁর অবস্থা জানবার জন্য একবার খলিফার প্রাসাদে আগমন করলেন কিন্তু মারওয়ান হযরত আলীকে এ সকল গোলযোগের জন্য দায়ী করলেন, এতে তাঁরা ক্রুদ্ধ হয়ে প্রাসাদ ত্যাগ করে চলে গেলেন।

প্রাসাদের অবরোধ কয়েক সপ্তাহ ধরে অব্যাহত রইল। বিদ্রোহীরা কাউকেও বাইরে আসতে কিংবা ভেতরে যেতে দিল না। এমন কি প্রাসাদে আবদ্ধ লোকেরা বাইরে থেকে একটু পানিও পেল না। ৩৫ হিজরীর ১৮ই জিলহজ্ব (১৭ই জুন, ৬৫৬ খ্রিঃ) বিদ্রোহীরা প্রাসাদ আক্রমণ করল। যে সকল নাগরিক প্রাসাদ রক্ষার দায়িত্ব গ্রহণ করেছিল, তারা বেগতিক দেখে প্রাসাদের অভ্যন্তরে প্রবেশ করল। বিদ্রোহীরা প্রাসাদের অভ্যন্তরে প্রবেশ করে হযরত উসমানকে কুরআন পাঠরত অবস্থায় হত্যা করল। হযরত উসমানের স্ত্রী নায়লা তাঁকে রক্ষা করতে চেষ্টা করলে তাঁর কয়েকটি আঙ্গুল কেটে গেল। বার বছর খিলাফতের পর ওসমান (রা) বিরাশি বছর বয়সে বিদ্রোহীদের হাতে নিহত হলেন। দয়ালু ও সরল প্রাণ খলিফা অপেক্ষাকৃত শান্তিপূর্ণ সময়ে জনসাধারণের প্রিয়পাত্র হয়ে থাকতে

পারতেন। বস্তুত খিলাফতের প্রথমদিকে তিনি সকলের শ্রদ্ধার পাত্র ছিলেন। কিন্তু শেষের দিকে নানা কারণে পরিস্থিতি এত মারাত্মক হয়ে দাঁড়াল যে, হযরত উসমানের পক্ষে তা আয়ত্তে আনা কোনক্রমেই সম্ভব ছিল না।

উসমানের হত্যার পরিণতি

জার্মান ঐতিহাসিক ওয়েল হাউসেনের মতে, 'উসমানের হত্যা ইসলামের ইতিহাসের অন্য যে কোন ঘটনা হতে অধিকতর যুগান্তকারী।' এ সর্বপ্রথম খলিফার রক্তে আততায়ীদের হস্ত কলঙ্কিত হল। এতে খিলাফতের পবিত্রতা ও খলিফার দৈহিক নিরাপত্তা ক্ষুণ্ণ হল। পরবর্তীকালে উসমানের হত্যা খারিজী সম্প্রদায়ের মতবাদ রূপায়ণে অনুপ্রেরণা যুগিয়েছিল। অযোগ্য খলিফার পদচ্যুতি অথবা হত্যা সম্পর্কে নানা মতবাদ গড়ে উঠল।

উসমানের হত্যা মুসলমানদের মধ্যে গৃহযযুদ্ধের দ্বার উন্মোচিত করল। এ গৃহযুদ্ধ একবার আরম্ভ হলে আর কখনও বন্ধ হল না। মুসলিম জমাতের ঐক্য বিনষ্ট হল এবং খলিফা মুসলিম রাষ্ট্রের অবিসম্বাদিত নেতারূপে স্বীকৃতি পেলেন না। এখন হতে তরবারীর দ্বারাই খিলাফতের অধিকার মীমাংসিত হতে লাগল। ধর্মপ্রাণ মুসলমানদের জন্য এটি একটি জটিল পরিস্থিতি ছিল। ধর্ম-বিশ্বাস মতে তাঁরা গৃহযুদ্ধে কোন দলে অংশ গ্রহণ সমীচীন মনে করতে পারলেন না। কারণ মুসলমান কর্তৃক মুসলমানের রক্তক্ষয় ধর্মে নিষিদ্ধ। আবার নিরপেক্ষ থাকলেও তাঁরা ন্যায়ের পক্ষে ও অন্যায়ের প্রতিকূলে সংগ্রামের ধর্মীয় প্রত্যাদেশ লংঘন করবেন। অচিরেই মুসলমানদের মধ্যে শিয়া, খারিজী ও অন্যান্য ধর্ম সম্প্রদায়ের উদ্ভব হল।

উসমানের হত্যার ফলে হযরত মুহম্মদ (স)-এর পবিত্র নগরী মদীনার গুরুত্ব ও রাজনৈতিক প্রাধান্য ক্রমান্বয়ে নিঃশেষিত হয়ে আসল। পরবর্তী খলিফা হযরত আলী (রা) কুফায় ও উমাইয়া খলিফা মুআবিয়া দামিস্কে রাজধানী স্থানান্তরিত করে মদীনার প্রাধান্যের অবসান ঘটালেন। খিলাফতের ঐক্য বিনষ্ট হয়ে পরবর্তীকালে বিভিন্ন প্রদেশের মধ্যে ক্ষমতার দ্বন্দ্ব আরম্ভ হল। এর ফলে রাজনীতিতে সাহাবাদের (হযরতের সঙ্গী) প্রাধান্য বিলুপ্ত হল।

গ্রন্থনির্দেশ

১. উইলিয়াম ম্যুর : কলিফেট, *ইট্স্ রাইজ, ডিক্লাইন এণ্ড ফল।*
২. পি. কে. হিট্টি : *হিস্ট্রি অব দি এরাব্স্।*
৩. ওয়েল হাউসেন (মিসেস উইর) : *এরাব কিংডম এণ্ড ইট্স্ ফল।*

আলী মুর্তজা (রা)

(৬৫৬ – ৬৬১ খ্রিঃ)

খলিফা উসমানের হত্যা ইসলামের ইতিহাসে এক মর্মান্তিক ও শোচনীয় ঘটনা। মদীনায় কিছুদিন ধরে ভয়াবহ অরাজকতা বিরাজ করছিল। একজন মদীনাবাসী অতি সন্তর্পণে খলিফা-পত্নী নায়লার কর্তিত অঙ্গুলী ও খলিফার রক্ত-রঞ্জিত জামা দামিস্কে নিয়ে গিয়ে মুআবিয়ার হাতে সমর্পণ করল। খলিফার হন্তাগণ ঘটনার পঞ্চম দিবসে একজন খলিফা নির্বাচন প্রয়োজনীয় মনে করে হযরত আলীকে খিলাফতের দায়িত্ব গ্রহণ করার জন্য অনুরোধ জানাল। আলী (রা) নিতান্ত অনিচ্ছাসত্ত্বেও রাজি হলেন এবং ইসলামের চতুর্থ খলিফা হিসেবে স্বীকৃত হলেন (২৩ জুন, ৬৫৬ খ্রিঃ)। তালহা ও জুবাইর তাঁর প্রতি আনুগত্যের শপথ গ্রহণ করলেন। এর পর অপরাপর সকলে হযরত আলীকে খলিফা বলে মেনে নিল। বিদ্রোহীরা হযরত আলীকে খিলাফতের পদে অধিষ্ঠিত করে তাদের কৃতকার্যতার সংবাদ আপন দেশে প্রচার করবার উদ্দেশ্যে কুফা, বসরা ও ফুসতাত অভিমুখে প্রস্থান করল।

আলী খলীফা মনোনীত, ২৩শে জুন, ৬৫৬ খ্রিঃ

খিলাফতে অধিষ্ঠিত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই হযরত আলীকে কঠোর সমস্যার সম্মুখীন হতে হল। হযরত উসমানের হত্যাজনিত ত্রাস ও অরাজকতা শেষ হতে না হতে নতুন সমস্যার উদ্ভব হল। এতদিনে জনসাধারণ উপলব্ধি করতে পারল শান্ত ও নির্বিরোধ বৃদ্ধ খলিফার হত্যা মুসলমানদের জন্য এক দূরপনেয় কলঙ্ক-বিশেষ। তাই জনসাধারণের মধ্যে গুঞ্জন উঠল এ মহাপাতকের শাস্তি বিধান সমাজ ও সরকারের অবশ্য কর্তব্য। একাধিক লোক এ জনপ্রিয় দাবির সমর্থনে আওয়াজ তুললেন। কেউবা হযরত আলীকে বেকায়দায় ফেলে স্বীয় স্বার্থ উদ্ধারের জন্য, আবার কেউবা ন্যায় ও সত্য প্রতিষ্ঠার তাগিদে সরল বিশ্বাসে অনুপ্রাণিত হয়ে উসমানের হত্যাকারীদের সমুচিত শাস্তিবিধানের জন্য মুখর হয়ে উঠল। বনু-উমাইয়া ও বনু-হাশিমের কলহ, বেদুঈনদের বিদ্রোহ-প্রবণতা আইন ও শৃঙ্খলার বন্ধনকে পূর্বেই শিথিল করে ফেলে ছিল। এর সাথে 'উসমান-হত্যার প্রতিশোধের' দাবি মিলিত হয়ে পরিস্থিতিকে জটিল ও ঘোরালো করে তুলল। সিরিয়ার শাসনকর্তা মু'আবিয়া উমাইয়া বংশের লোক ছিলেন। তিনি হাশিমী বংশের খলিফা হযরত আলীর নিকট ওসমানের হত্যার প্রতিশোধ দাবি করলেন।

হযরত উসমানের খিলাফতের শেষের দিকে রাজ্যের সবত্র শাসনকর্তা পরিবর্তনের দাবি উঠেছিল। হযরত আলী (রা) মনে করেছিলেন যে, জনসাধারণের

শাসনকর্তা পরিবর্তন

এ দাবি মেনে নিলেই নতুন শাসনকর্তাগণের সহযোগিতায় পরিস্থিতি আয়ত্তে আনা সম্ভব হবে। কিন্তু সকল শাসনকর্তার অপসারণ ও পদচ্যুতি তখনকার পরিস্থিতিতে সমীচীন কিনা তা তিনি ভেবে দেখেননি। বহু প্রবীণ ব্যক্তি হযরত আলীকে শাসনকর্তা পরিবর্তন না করতে উপদেশ দিলেন। হযরত আলীর পিতৃব্য পুত্র আবদুল্লাহ-ইবন-আব্বাস তাঁকে বললেন যে, মু'আবিয়া উসমান কর্তৃক নিযুক্ত হননি। তিনি হযরত উমর (রা) কর্তৃক নিযুক্ত হয়েছেন। এছাড়া সিরিয়ার জনসাধারণ তাঁর একান্ত অনুগত। ইবন-আব্বাস আরও বললেন, রাজ্যে শান্তি প্রতিষ্ঠিত হলে সময় ও সুযোগ বুঝে পরে মু'আবিয়ার বিরুদ্ধে যে কোন ব্যবস্থা অবলম্বন করা যাবে। কিন্তু হযরত আলী (রা) এ সকল যুক্তি মানতে চাইলেন না। তিনি রাজ্যের সকল প্রাদেশিক শাসনকর্তার অপসারণ তাঁর শাসন-সংস্কারের প্রথম ও প্রধান কর্তব্য বলে মনে করলেন এবং ইবন আব্বাসকেই সিরিয়ার শাসনকর্তার পদে অধিষ্ঠিত করতে চাইলেন। কিন্তু ইবন আব্বাস অসম্ভব জ্ঞানে তা প্রত্যাখ্যান করলেন।

হযরত আলী (রা) রাজ্যের সকল প্রাদেশিক শাসনকর্তার অপসারণের আদেশ দিয়ে প্রত্যেক প্রদেশে তাঁর মনোনীত শাসনকর্তা পাঠালেন। আলী (রা)

প্রাদেশিক শাসনকর্তা পরিবর্তন

যাঁদেরকে কুফা ও সিরিয়ায় প্রেরণ করেছিলেন তাঁরা নতুন পদে প্রতিষ্ঠা লাভ করতে না পেরে প্রাণ ভয়ে মদীনায় পলায়নপর হলেন। বসরার নতুন শাসনকর্তা লক্ষ্য করলেন যে, জনসাধারণের মধ্যে আলী ও উসমানের সমর্থক দল প্রায় সমান সংখ্যক। মিসরের নব-নিযুক্ত শাসনকর্তা উসমানের হত্যাকারীদেরকে শাস্তিবিধান করবার অঙ্গীকার সাপেক্ষে তাঁর পদে প্রতিষ্ঠা লাভ করলেন। হযরত আলী (রা) তালহা ও জুবাইরের সাথে পরামর্শ করে সিরিয়ায় মু'আবিয়ার নিকট ও কুফায় আবু মূসার নিকট আনুগত্যের শপথ দাবি করে পত্র প্রেরণ করলেন। আবু মূসা আলীর আনুগত্য স্বীকার করে নিলেন কিন্তু সিরিয়ার সাথে সকল যোগাযোগ ছিন্ন হয়ে গেল এবং আলীর পত্রের কোন প্রত্যুত্তর আসল না। অধিকন্তু মু'আবিয়া হযরত ওসমানের রক্ত-রঞ্জিত জামা ও নায়লার কর্তিত আঙ্গুল দামিস্কের মসজিদে দেখিয়ে উসমানের হত্যার প্রতিশোধের জন্য জনসাধারণকে উত্তেজিত করে তুলতে লাগলেন। এ সময় হযরত আলীর দূত সেখানে গিয়ে পৌঁছল। সিরিয়ায় দিনের পর দিন যে প্রচণ্ড বিক্ষোভ দানা বেঁধে উঠছিল, দূত তা প্রত্যক্ষ করল এবং মু'আবিয়ার প্রত্যুত্তরের জন্য অপেক্ষা করতে লাগল। অবশেষে মু'আবিয়া এক অদ্ভুত উত্তর পাঠালেন। পত্রের শিরোনামা ছাড়া আর কিছুই ছিল না। হযরত আলী (রা) পত্রবাহককে এর

কারণ জিজ্ঞেস করে জানতে পারলেন যে, দামিস্কে ষাট হাজার সৈন্য হযরত ওসমানের জামার পার্শ্বে অশ্রু বিসর্জন করছে এবং তারা হযরত আলীর বিরুদ্ধে অস্ত্রধারণ করতে দৃঢ়প্রতিজ্ঞ। হযরত আলী (রা) ক্রুদ্ধ হয়ে মু'আবিয়ার বিরুদ্ধে যুদ্ধ করবার জন্য আদেশ দিলেন। কিন্তু মু'আবিয়ার বিরুদ্ধে কোন ব্যবস্থা অবলম্বন করবার পূর্বে হযরত আলীকে আরেকটি বিপদের সম্মুখীন হতে হল।

আলী ও মু'আবিয়ার মধ্যে যখন সংঘর্ষ অনিবার্য হয়ে উঠল, তখন তালহা ও জুবায়ের মদীনা ত্যাগ করে মক্কায় চলে গেলেন। মক্কায় ইতিমধ্যে হযরত উসমানের হত্যার প্রতিশোধকামী জনসাধারণ সক্রিয় হয়ে উঠেছিল। হযরত আয়েশা (রা) তখন মক্কায় অবস্থান করতেছিলেন। তিনিও উসমানের হত্যায় নিতান্ত মর্মাহত হয়ে এর প্রতিকার দাবি করলেন। এখন বিক্ষুব্ধ জনতা তালহা, জুবাইর ও আয়েশার নেতৃত্বে সমবেত হল এবং তিন সহস্র লোক এই প্রথমে বসরা আক্রমণ করবার জন্য যাত্রা করল। বসরায় আলীর মনোনীত শাসনকর্তা ইবন হুনাইফ ও তালহা-জুবাইরের মধ্যে বাক্‌বিতণ্ডা আরম্ভ হল। বিদ্রোহী পক্ষ হতে হযরত উসমানের হত্যাকারীদের শাস্তির দাবি করা হল। প্রতিপক্ষ হতে হযরত আয়েশার অন্তঃপুর ত্যাগও তালহা ও জুবাইর কর্তৃক আলীর প্রতি আনুগত্য ত্যাগের অভিযোগ করা হল। তালহা ও জুবাইর প্রতিবাদ করে বললেন যে, তাদেরকে আনুগত্যের শপথ গ্রহণ করতে বাধ্য করা হয়েছিল। এ সকল বাক-বিতণ্ডা হতে হাতাহাতি ও যুদ্ধ আরম্ভ হল এবং বিদ্রোহীরা জয়লাভ করল। ইবন হুনাইফ বন্দী হলেন। বসরা বিদ্রোহীদের দখলে আসল। জনসাধারণ তালহা ও জুবাইর উভয়ের প্রতি আনুগত্যের শপথ গ্রহণ করল। হযরত উসমানের হত্যার সাথে সংশ্লিষ্ট সকল লোককে প্রাণদণ্ডে দণ্ডিত করা হল। ইতিমধ্যে হযরত আলী (রা) বসরা আক্রমণ করলেন।

বসরায় বিদ্রোহ

হযরত আলী (রা) বসরার পথে যাত্রা করে কুফায় তাঁর জ্যেষ্ঠ পুত্র হাসানকে সৈন্য সংগ্রহের জন্য পাঠালেন। কুফাবাসীরা তাঁর আহ্বানে সাড়া দিয়ে বিপুল সংখ্যায় হযরত আলীর সাথে যোগদান করল। এভাবে দশ সহস্র সৈন্য নিয়ে হযরত আলী (রা) বসরা আক্রমণ করলেন। তালহা ও জুবাইর অনুরূপ সংখ্যক সৈন্যবাহিনী নিয়ে হযরত আলীর মুকাবিলা করলেন। হযরত আয়েশা (রা) একটি উষ্ট্রপৃষ্ঠে আরোহণ করে তাঁদের সাথে আগে যোগদান করলেন। যুদ্ধের প্রারম্ভেই হযরত আলী (রা) তালহা ও যুবাইরের সঙ্গে আপোষ-নিষ্পত্তির জন্য কথাবার্তা আরম্ভ করলেন। হযরত উসমানের হত্যাকারীদের শাস্তির ব্যাপারে তিনি তাঁদের সাথে সম্পূর্ণ একমত বলে প্রকাশ করলেন এবং এর জন্য তিনি সময় চাইলেন। এভাবে শান্তিপূর্ণ মীমাংসার আশা নিয়ে উভয়পক্ষ পরস্পরের শিবিরে প্রত্যাবর্তন করলেন।

উষ্ট্র যুদ্ধ, ডিসেম্বর ৬৫৬ খ্রিঃ

কিন্তু হযরত আলীর সৈন্য দলে উসমানের হত্যার সাথে সংশ্লিষ্ট বহুলোক ছিল। তারা ভাবল যে, যুদ্ধের সব সম্ভাবনা সুদূর পরাহত। তাই পরদিন প্রত্যুষে তারা অতর্কিতে তালহা ও জুবাইরের দলকে আক্রমণ করল। তুমুল যুদ্ধ আরম্ভ

উষ্ট্রের যুদ্ধ, ৬৫৬ খ্রিঃ

হল। তালহা ও যুবাইর যুদ্ধে নিহত হইলেন। হযরত আয়িশা (রা)-এর উষ্ট্রকে ঘিরে বহুক্ষণ যুদ্ধ চলল। অবশেষে তাঁর উষ্ট্র আহত হল এবং যুদ্ধ থেমে গেল। হযরত আলী (রা) আয়েশাকে যথাযোগ্য সম্মান প্রদর্শন করলেন। আয়েশা (রা) প্রথমে মক্কায় ওমরা পালন করলেন। অতঃপর মদীনায় অবসর যাপন করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করলেন। এর পর তাঁকে আর কোন রাষ্ট্রীয় ব্যাপারে অংশ গ্রহণ করতে দেখা যায় নি। উষ্ট্রের যুদ্ধে উভয় পক্ষে মোট দশ সহস্র মুসলমান নিহত হল। আলী (রা) তাঁর পিতৃব্যপুত্র আবদুল্লাহ ইবন আব্বাসকে বসরার শাসনকর্তা নিযুক্ত করে কুফার দিকে যাত্রা করলেন। তিনি আর মদীনায় ফিরে যেতে চাইলেন না। কুফায় তাঁর রাজধানী স্থাপিত হল।

কুফায় কিছুদিন হযরত আলীর শান্তিতে কাটিল। দূর-দারাজ হতে লোকেরা নতুন রাজধানীতে এসে তাঁর প্রতি আনুগত্যের শপথ গ্রহণ করল। কিছুদিন পর আলী একজন বেদুঈন সর্দারকে দামিস্কে মু'আবিয়ার নিকট এক পত্র নিয়ে পাঠালেন। এতে উষ্ট্রের যুদ্ধের কথা উল্লেখ করে তিনি মু'আবিয়াকে আনুগত্যের শপথ গ্রহণ করতে আহ্বান করলেন। কিছুকাল দূতকে অপেক্ষা করিয়ে

সিফ্ফীনের যুদ্ধ ৬৫৭ খ্রিঃ

মু'আবিয়া এক মৌখিক উত্তর পাঠিয়ে বললেন যে, হযরত উসমানের হত্যাকারীদের সমুচিত শাস্তিবিধান না হলে তিনি আনুগত্যের শপথ গ্রহণ করবেন না। দূত হযরত আলী (রা)-কে আরও জানাল যে, সিরিয়াবাসীরা খলিফার হত্যাকারীদেরকে নিপাত না করে পানি স্পর্শ করবে না কিংবা শয্যায় শয়ন করবে না বলে বজ্রকঠোর শপথ গ্রহণ করেছে। উপায়ান্তর না দেখে আলী (রা) মু'আবিয়ার বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করলেন। অচিরে ৫০,০০০ লোকের এক বিপুলবাহিনী তাঁর পতাকাতলে সমবেত হল। এ বিশাল সৈন্যবাহিনী নিয়ে আলী (রা) সিরিয়ার দিকে যাত্রা করলেন। মু'আবিয়াও সংবাদ পেয়ে বিরাট দলবলসহ অগ্রসর হলেন। সিফ্ফীন নামক প্রান্তরে উভয় পক্ষ পরস্পরের মুকাবিলা করল। যুদ্ধ আরম্ভহওয়ার আগে আলী (রা) পুনরায় শান্তিপূর্ণ মীমাংসার আশায় মু'আবিয়াকে আনুগত্যের শপথ গ্রহণ করতে আহ্বান করলেন। কিন্তু মু'আবিয়া আগের মতই উসমানের হত্যার বিচার দাবি করলেন। অবশেষে যুদ্ধ আরম্ভ হল। আলী (রা) বীর-বিক্রমে যুদ্ধ করলেন। তাঁর সেনাপতি আশ্তার প্রচণ্ডবেগে মু'আবিয়ার সৈন্যদের ওপর আপতিত হয়ে তাদেরকে ছত্রভঙ্গ করে ফেলল। মু'আবিয়ার সেনাপতি সুচতুর আমর-ইবনুল আস্ পরাজয়ের গ্লানি

এড়াবার জন্য এক কৌশল আবিষ্কার করলেন। তিনি মু'আবিয়ার সৈন্যগণকে বর্শা ফলকে কুরআনের পাতা ঝুলিয়ে শান্তি প্রার্থনা করতে বললেন। তারা তাঁর উপদেশ মত বর্শার ফলকে কুরআনের পাতা ঝুলিয়ে চিৎকার করে বলল, "আল্লার কানুন আমাদের মধ্যে মীমাংসক হোক।" আলী (রা) তাদের দূরভিসন্ধি বুঝতে পেরে বলে উঠলেন যে, এরা পরাজয়ের ভয়ে চতুরতার আশ্রয় গ্রহণ করেছে। কিন্তু আলীর সৈন্যদল কুরআনের নামে আবেগপ্রবণ হয়ে উঠল এবং যুদ্ধ বন্ধ না করলে তারা আলীর পক্ষ ত্যাগ করে চলে যাবে বলে ভয় দেখাল। তাঁর সেনাপতি আশতার যুদ্ধ বন্ধ করতে অনিচ্ছুক ছিলেন। কিন্তু সৈন্যরা তুমুল বিক্ষোভ আরম্ভ করল। অবশেষে অনেক অনিচ্ছা সত্ত্বেও তাঁকে যুদ্ধ বন্ধ করতে হল। আলী ও মু'আবিয়ার পক্ষ হতে একজন করে সালিস নিযুক্ত হল। আলীর পক্ষ হতে আবু মূসা আল-আশআরী ও মুআবিয়ার পক্ষ হতে চতুর আমর-ইবনুল-আস্ সালিস নিযুক্ত হলেন। হযরত আলী (রা) আবু মূসাকে সালিস নিযুক্ত করতে রাজি ছিলেন না। কিন্তু এ ব্যাপারেও তাঁকে সৈন্যবাহিনীর মতানুসারে কাজ করতে হয়েছে।

আলীর দলের বেদুঈন সৈন্যগণ যুদ্ধ বিরতির পর অন্যভাবে চিন্তা করতে আরম্ভ করল। তারা ভাবল সালিসগণ আলী (রা) ও মু'আবিয়ার মধ্যে একজনকে খলিফা সাব্যস্ত করবেন। কিন্তু তাদের নালিশ ছিল কুরাইশদের প্রাধান্যের
দুমার সালিস বিরুদ্ধে। তারা ছিল সাম্য ও গণতন্ত্রের সমর্থক। কাজেই
৬৫৮ খ্রিঃ কুরাইশ বংশের যে কেউ খলিফা থাকুক না কেন, তাদের অবস্থার কোন পরিবর্তন হবে না। এরকম ভেবে আলীর সৈন্যবাহিনীর ১২০০০ লোক মূল বাহিনী থেকে পৃথক হয়ে হারুরা নামক স্থানে শিবির সংস্থাপিত করল। তারা এখন সালিস নিযুক্তির বিরুদ্ধে অসন্তোষ প্রকাশ করল। এরাই পরবর্তীকালে খারিজী বা দলত্যাগী নামে অভিহিত হল। ৬৫৮ খ্রিষ্টাব্দের ফেব্রুয়ারি মাসে দুমাতুল জন্দল নামক স্থানে সালিসদ্বয় মিলিত হলেন। চতুর ও ধূর্ত আমর সরল প্রকৃতি আবু মূসাকে নানা যুক্তি-তর্ক জালে জড়িয়ে ফেললেন এবং কৌশলে নিজের অভিসন্ধি চরিতার্থ করে নিলেন। আমর প্রথমে মু'আবিয়ার খিলাফতের দাবি নিয়ে তর্ক জুড়ে দিলেন এবং বললেন যে, তিনি কুরাইশ বংশের লোক, অন্যায়ভাবে নিহত হযরত উসমানের আত্মীয়। সুতরাং তিনি খিলাফতের প্রকৃত হকদার। আমর আবু মূসাকে মু'আবিয়ার অধীন উচ্চপদের লোভ দেখলেন। কিন্তু মূসা কিছুতেই মু'আবিয়ার দাবি স্বীকার করতে রাজি হলেন না। আমর একে একে আরও অনেকের নাম প্রস্তাব করলেন। অবশেষে আমর আবু মূসাকে তাঁর ব্যক্তিগত মতের কথা জিজ্ঞেস করলেন। আবু মূসা সরল বিশ্বাসে এ অভিমত

প্রকাশ করলেন যে, আলী (রা) ও মু'আবিয়া উভয়কে পদচ্যুত করে জনসাধারণের ইচ্ছেনুসারে অন্য কাকেও খলিফা নিযুক্ত করা হোক। আমর খুশি হয়ে এ মতে সায় দিলেন এবং তাঁরা বাইরে অপেক্ষমান জনতার নিকট তাঁদের এ সিদ্ধান্ত ঘোষণা করার জন্য এগিয়ে আসলেন। তিনি প্রথমে আবু মূসাকে এ সিদ্ধান্ত ঘোষণা করতে বললেন। আবু মূসা দ্ব্যর্থহীন ভাষায় ঘোষণা করলেন যে, মুসলিম জগতের শান্তি ও নিরাপত্তার খাতিরে আলী (রা) ও মু'আবিয়া উভয়কে পদচ্যুত করা হোক এবং জনসাধারণের ভোটে তৃতীয় ব্যক্তিকে খলিফা নির্বাচিত করা হউক। অতঃপর আমর মঞ্চে দাঁড়িয়ে ঘোষণা করলেন "আবু মূসা আলীকে পদচ্যুত করেছে আমি কিন্তু মু'আবিয়াকে খিলাফতে অধিষ্ঠিত করলাম, তিনি উসমানের উত্তরাধিকারী, তাঁর হত্যার প্রতিশোধ গ্রহণকারী এবং খিলাফতের প্রকৃত দাবিদার।" সমবেত জনসাধারণ বজ্রাহতের মত আমরের ঘোষণা শ্রবণ করল। প্রকৃতপক্ষে আলী (রা) ছিলেন খলিফা। দুমায় সালিসীর নামে প্রহসনের ফলে তাঁরই ক্ষতি হল সর্বাধিক। মু'আবিয়া ছিলেন একজন প্রাদেশিক শাসনকর্তা। তিনি এখন খিলাফতের পদে আলীর প্রতিদ্বন্দ্বী হয়ে বসলেন। সিরিয়ার লোকেরা তাঁকে খলিফা বলে মেনে নিলেন। কিন্তু তিনি হযরত আলীর মৃত্যুর পূর্ব পর্যন্ত প্রকাশ্যে খলিফা উপাধি গ্রহণ করতে সাহস পাননি। হযরত আলী (রা) কূফায় ফিরে এসে মু'আবিয়া, আমর ও তাঁদের দলের লোকদের নামে অভিসম্পাত বর্ষণ করতে আরম্ভ করলেন। মু'আবিয়াও আলী (রা), তাঁর পুত্রদ্বয় ও সেনাপতি আশতারের নামে অনুরূপ অভিসম্পাত বর্ষণ করতে লাগলেন।

দুমার সালিসের রায় প্রকাশিত হওয়ার পরই আলী (রা) মু'আবিয়ার বিরুদ্ধে যুদ্ধযাত্রা করতে মনস্থ করলেন কিন্তু খারিজীদের বিদ্রোহের ফলে তা সম্ভব হয়ে উঠেনি। তারা ৪০০০ লোক নাহরাওয়ান নামক স্থানে সমবেত হল। আলী (রা)

খারিজীদের বিদ্রোহ : নাহরাওয়ানের যুদ্ধ ৬৫৮ খ্রিঃ

তাদেরকে নানাভাবে বুঝিয়ে শান্ত করতে চাইলেন এবং তাঁর সাথে সিরিয়ায় মু'আবিয়ার বিরুদ্ধে যুদ্ধযাত্রা করতে আহ্বান করলেন। কিন্তু তারা নানাপ্রকার ধ্বংসাত্মক কার্যকলাপে লিপ্ত হয়ে নাগরিকদের জীবন বিপন্ন করে তুলতে লাগল। আলী (রা) নাহরাওয়ানে তাদের সাথে যুদ্ধ করলেন। এদের কেউ কেউ পালিয়ে আত্মরক্ষা করল কিন্তু অধিকাংশ লোক যুদ্ধে নিহত হল। নাহরাওয়ানের যুদ্ধের পর আলী (রা) সিরিয়ায় যুদ্ধ যাত্রা করতে চাইলেন কিন্তু তাঁর সৈন্যগণ অল্প সময়ের জন্য কূফায় ফিরে যেতে চাইল কিন্তু একবার ফিরে আসলে তারা আর সিরিয়ায় যেতে রাজি হল না।

আবু বকরের পুত্র মুহম্মদ মিসরে হযরত আলীর শাসনকর্তা নিযুক্ত হয়েছিলেন। কিন্তু মিসরে ক্রমশ মু'আবিয়ার সমর্থকদল সংখ্যাধিক্য লাভ করছিল। সিফফীনের যুদ্ধের পর মু'আবিয়া আমর ইবনুল-আসকে মিসর জয়ের জন্য পাঠালেন। হযরত আলী (রা) সেনাপতি আশতারকে মিসরে প্রেরণ করলেন কিন্তু পথিমধ্যে একজন মিসরীয় সর্দার তাঁকে বিষ-প্রয়োগে হত্যা করেন। এ হত্যা মু'আবিয়ার প্ররোচনায় সংঘটিত হয়েছিল বলে সন্দেহ করা হয়। আমর ও মুহম্মদের মধ্যে যুদ্ধ হয়। যুদ্ধে মুহম্মদ নিহত হলেন। আলী (রা) বহু চেষ্টা করেও কুফা হতে মুহম্মদের সাহায্যার্থে কোন সৈন্য পাঠাতে পারলেন না। কুফাবাসীরা তাদের নিষ্ক্রিয়তা ও ঔদাসীন্যের দ্বারা বারে বারে হযরত আলীর জন্য পরাজয়ের গ্লানি ডেকে আনল। মিসর মুআবিয়ার অধিকারে চলে গেল।

মিসরে বিদ্রোহ
জুলাই, ৬৫৮ খ্রিঃ

হযরত আলীর খিলাফতের শেষের দিকে বসরা ও পারস্যের বিভিন্ন স্থানে বিদ্রোহ দেখা দিল। দক্ষিণ পারস্যের খারিজী বিদ্রোহ তার মধ্যে প্রধান। হযরত আলী (রা) বহু কষ্টে এ সব বিদ্রোহ দমন করলেন। সেনাপতি জিয়াদ্ এ সব বিদ্রোহ দমনে হযরত আলীকে বিশেষ সহায়তা করেছিলেন। সুযোগ বুঝে মু'আবিয়াও সিরিয়া হতে ইরাকে এবং আরবে বহুবার সৈন্যবাহিনী প্রেরণ করে আলীকে বিব্রত করতে চেষ্টা করলেন। ৬৬০ খ্রিস্টাব্দে আলী (রা) ও মু'আবিয়া পরস্পরের সাথে শান্তি চুক্তিতে আবদ্ধ হলেন। তাঁরা একে অপরের রাজ্য আক্রমণ করবেন না বলে প্রতিশ্রুত হলেন।

এ দু প্রতিদ্বন্দ্বীর মধ্যে শান্তি প্রতিষ্ঠা বিদ্রোহী খারিজিগণকে আরও উত্তেজিত করে তুলল। তাদের খোদায়ী হুকুমত প্রতিষ্ঠার স্বপ্নের বাস্তবায়ন বিলম্বিত হবে মনে করে তিনজন খারিজী ৪০ হিজরীর রমজান মাসে কাবাগৃহে পরস্পরের মধ্যে কঠোরভাবে প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হল যে, তারা একই দিনে কুফা, দামিস্ক ও ফুস্তাতের মসজিদে আলী, মু'আবিয়া ও আমরকে বিষমাখা তরবারী দ্বারা ঘায়েল করে হত্যা করবে। তাদের মতে এরা তিনজনই মুসলিম জগতের যাবতীয় দুর্দশা ও অশান্তির জন্য দায়ী ছিল। পূর্ব প্রতিশ্রুতি অনুযায়ী তারা এক যোগে এ তিন জনের প্রাণনাশের চেষ্টা করে। আমর অসুস্থতার জন্য ঐ দিন মসজিদে অনুপস্থিত ছিলেন। মু'আবিয়া মারাত্মকভাবে আহত হয়ে প্রাণে বেঁচে গেলেন কিন্তু আলী (রা) আবদুর রহমান ইবন মুল্জাম নামক খারিজী কর্তৃক আহত হয়ে মৃত্যুমুখে পতিত হলেন। তাঁর মৃত্যুর সঙ্গে সঙ্গে ইসলামের ইতিহাসে খুলাফা-ই-রাশিদীনের যুগের অবসান হয়।

আলীর মৃত্যু,
জানুয়ারি, ৬৬১ খ্রিঃ

ধার্মিক প্রবর হযরত আলী (রা) জ্ঞান গরিমায়, বিদ্যাবত্তায় ও বীরত্বে অতুলনীয় ছিলেন। ইসলামের প্রাথমিক যুগে বহু যুদ্ধে তিনি অসীম সাহস ও বীরত্ব প্রদর্শন করে রসূলুল্লার কাছ থেকে আল্লার শার্দুল (আসাদুল্লাহ) উপাধি লাভ করেছিলেন। তাঁর বীরত্ব নিম্নলিখিত প্রবাদ বাক্যে রূপ লাভ করেছে ঃ লা সাইফা ইল্লা জুল-ফাকার ওয়ালা ফাতা ইল্লা আলী–জুল-ফাকারের মত তরবারী নেই, আলীর মত বীর নেই। তাঁর বীরত্ব যেমন অতুলনীয় ছিল, তাঁর জ্ঞানও তেমনি ছিল অপরিসীম। তাঁর লেখনী খুরধার এবং বাগ্মীতা অসাধারণ ছিল। তিনি বন্ধুর প্রতি অকপট ও শত্রুর প্রতি মহানুভব ছিলেন। তাঁর নামে আরবি ভাষায় বহু কবিতা, প্রবাদ-বাক্য, উপদেশাবলি ও কিংবদন্তী প্রচলিত আছে। নাজাফে তাঁর সমাধিতে হাজার হাজার তীর্থযাত্রী ভিড় জমিয়ে থাকে। সুন্নীদের তিনি চতুর্থ খলিফা এবং শিয়াদের তিনি প্রথম ইমাম।

আলীর চরিত্র

বাস্তব জীবনে অকৃতকার্যতা

কিন্তু বাস্তব জীবনে হযরত আলীর জ্ঞান ও বীরত্ব তাঁর কোন কাজে আসেনি। তাঁর খিলাফতের প্রথম থেকে সিরিয়ার শাসনকর্তা মুআবিয়া কৌশলে তাঁর কৃতকার্যতার পথে নানা বিঘ্ন সৃষ্টি করতে আরম্ভ করলেন। মুআবিয়া নিজেকে খলিফা উসমানের আত্মীয় ও তাঁর হত্যাকারীদের প্রতিশোধ গ্রহণকারী বলে জনসমক্ষে প্রচার করতে লাগলেন। উসমানের হত্যার প্রতিকার না হলে তিনি আলীর আনুগত্য স্বীকার করবেন না বলে স্পষ্ট জানিয়ে দিলেন। হযরত আলী (রা) উসমানের হত্যাকারীদের অনুরোধে খিলাফতের পদ গ্রহণ করেছিলেন। রাজ্যে শান্তি ও শৃঙ্খলা ফিরে আসলে তিনি খলিফা-হন্তাদের শাস্তি বিধান করবেন বলে প্রতিশ্রুতি দিলেন কিন্তু রাজ্যে ক্রমাগত অশান্তি বেড়েই চলল। সুযোগ বুঝে মুআবিয়া তাঁর বিরুদ্ধে যাবতীয় কৌশল ও চাতুরী প্রয়োগ করতে আরম্ভ করলেন। বস্তুত, ছলচাতুরীতে আলী (রা) মু'আবিয়ার সমকক্ষ ছিলেন না।

মুআবিয়ার প্রতিদ্বন্দ্বিতা

হযরত আলী (রা) প্রাথমিক মুসলমানদের অন্যতম ছিলেন এবং খলিফা আবু বকর ও উমরের মতই ইসলামের মৌলিক নীতির অনুসারী ছিলেন। খিলাফতের পদকে তিনি ধর্মীয় পদ বলে মনে করতেন এবং ন্যায় ও সত্যের ভিত্তিতে তা পরিচালনা করতে চেয়েছিলেন কিন্তু মু'আবিয়া ও তাঁর সহকর্মীরা হযরত আলীর সাথে তাঁদের দ্বন্দ্বকে হাশিমী–উমাইয়া দ্বন্দ্ব ও ক্ষমতার লড়াই বলে ধরে নিয়েছিলেন। তাই তাঁরা হযরত আলীকে বিপর্যস্ত করবার জন্য যে কোন পন্থা অবলম্বন করতে কুণ্ঠাবোধ করেননি। সিফফীনের যুদ্ধে নিশ্চিত পরাজয়ের গ্লানি এড়াবার জন্য আমরের পরামর্শে মু'আবিয়া কুরআনের নাম ভেঙ্গে যুদ্ধ বন্ধ

করতে সক্ষম হয়েছিলেন। প্রয়োজনমত উৎকোচ প্রদান ও বিষ প্রয়োগে মু'আবিয়া কার্যসিদ্ধি করতেন।

হযরত আলী (রা) তাঁর সেনাপতি, শাসনকর্তা ও কর্মচারিগণের কাছ থেকে টাকা পয়সার সঠিক হিসাব দাবি করতেন। কিন্তু মু'আবিয়া এ সব ব্যাপারে কোন বিশেষ কড়াকড়ি করতেন না। এ জন্য হযরত আলীর নিকটাত্মীয়রাও মাঝে মাঝে তাঁর উপর ক্ষুণ্ন হত। অন্যপক্ষে কূটনীতিক মু'আবিয়া আরবদের মধ্যে সুচতুর ব্যক্তিগণকে টাকা-পয়সার প্রলোভন ও পদমর্যাদার লালসা দেখিয়ে দলে টেনে নিয়েছিলেন।

হযরত আলী (রা) কুফায় রাজধানী স্থানান্তরিত করেছিলেন কিন্তু কুফার আরবগণ বিপদের সময় তাঁকে সাহায্য করতে এগিয়ে আসেনি। সিরিয়ার বিরুদ্ধে অভিযান প্রেরণের জন্য বার বার অনুরোধ করেও তিনি কুফাবাসীদের কাছ থেকে যথাযোগ্য সাড়া পাননি। অন্যপক্ষে সিরিয়ায় মু'আবিয়ার প্রভাব প্রতিপত্তি বহুকাল যাবৎ সুপ্রতিষ্ঠিত ছিল। সিরিয়াবাসীরা মু'আবিয়ার একান্ত অনুগত ছিল। তারপর সুচতুর আমরের সহযোগিতায় মিসর জয় করার পর তাঁর ক্ষমতা আরও বেড়ে গেল।

দুমার সালিসীর ব্যাপারে খারিজীদের বিদ্রোহ হযরত আলীকে বিপর্যস্ত করে তুলেছিল এরা হযরত আলীর পক্ষ ত্যাগ করে বিদ্রোহী হওয়ায় আলীকে তাদের সাথে যুদ্ধে অনেক শক্তি ক্ষয় করতে হয়েছিল। এ সব কারণে হযরত আলীর খিলাফতকাল দারুণ অশান্তিতে কেটেছিল। অন্যপক্ষে মু'আবিয়া সিরিয়া ও মিসরে নিজের ক্ষমতা সুপ্রতিষ্ঠিত করে খিলাফতের পদ দখল করবার জন্য সব প্রস্তুতি সমাপ্ত করলেন। হযরত আলীর মৃত্যুর পর তিনি নিজেকে সমগ্র মুসলিম জগতের খলিফা বলে ঘোষণা করলেন (৬৬১ খ্রিঃ)।

গ্রন্থনির্দেশ

১. উইলিয়ম ম্যুর ঃ *কলিফেইট।*
২. পি. কে. হিট্টি, ঃ *হিষ্ট্রি অব দি এরাব্‌স্।*
৩. জুরজিজায়দান ঃ *তমদ্দুন ইসলাম*, ৪র্থ খণ্ড।

১২
খুলাফা-ই-রাশিদীনের যুগে রাজনীতি ও সমাজ

খুলাফা-ই-রাশিদীনের যুগ ইসলামের স্বর্ণযুগ।* এ যুগে যাঁরা খিলাফতে অধিষ্ঠিত ছিলেন এবং যাঁরা নানা শাসনকার্যে ব্যাপৃত ছিলেন তাঁদের সবাই হযরত মুহম্মদ (স)-এর অত্যন্ত অনুগত ও অনুরক্ত ছিলেন। তাঁদের কাজকর্ম ও চাল-চলনে রসূলের দৃষ্টান্ত ও কুরআনের শিক্ষা সরাসরি প্রভাব বিস্তার করছিল। এ সময় ধর্ম, ভ্রাতৃত্ব ও ন্যায়বিচারের সুদৃঢ় ভিত্তির উপর রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল। এর সাথে পুরাতন বেদুঈন গুণাবলি, যেমন বীরত্ব ও সহিষ্ণুতা মিলিত হয়ে এ যুগের মুসলমানগণকে অজেয় করে তুলেছিল। তাই তারা মাত্র দশ বছরের ভেতর তাদের মরুভূমির অখ্যাতনামা বাসস্থান হতে বহির্গত হয়ে দুর্বারগতিতে মধ্যপ্রাচ্যের বিশাল অংশে নিজেদের আধিপত্য বিস্তার করতে সক্ষম হয়।

রাজ্যজয়

প্রাথমিক মুসলমানদের রাজ্যজয় পৃথিবীর ইতিহাসে এক যুগান্তকারী ঘটনা। ইসলামের যাদুর মোহময় স্পর্শে সমগ্র আবরদেশ বীর যোদ্ধাদের লালনভূমিতে পরিণত হল। খালিদ ইবন ওয়ালিদ, সাদ, আমর প্রভৃতি নাম যে কোন যুগের যে কোন জাতির গৌরবের বস্তু।

খলিফা

খুলাফা-ই-রাশিদীনের যুগে খলিফা ছিলেন রাষ্ট্রের সর্বময় কর্তা। তিনি জনসাধারণের সমর্থনক্রমে নির্বাচিত হয়ে তাদের নিকট যাবতীয় কার্যকলাপের জন্য জবাবদেহী হতেন। খলিফার রাজকীয় বেশভূষা কিংবা দৌবারিক-প্রহরী ছিল না। জনসাধারণের জন্য তাঁর দ্বার অবারিত ছিল। একজন দীনতম নাগরিক সরাসরিভাবে খলিফার কাছ তার অভিযোগ উত্থাপন করতে পারত কিংবা খলিফার আচরণের সমালোচনা করতে পারত। খলিফা রাষ্ট্রের কাজকর্ম পরিচালনার জন্য শুরার (মন্ত্রণাসভা) পরামর্শ গ্রহণ করতেন। হযরত মুহম্মদ (স)-এর প্রধান সহচরগণ এ শুরার সদস্য ছিলেন। খলিফা খুব সাদাসিধা জীবনযাপন করতেন এবং শুরার সদস্যদের অনুমোদনক্রমে নিজের ও পরিবারের ভরণপোষণের জন্য সামান্য বৃত্তি গ্রহণ করতেন। প্রথম খলিফা হযরত আবু বকরের মৃত্যুর পর তাঁর ব্যক্তিগত তহবিলে মাত্র একটি দীনার পাওয়া গিয়েছিল। মৃত্যুর সময় তিনি অছিয়ত করে গিয়েছিলেন যে, তিনি খলিফা থাকাকালীন যে অর্থ বৃত্তি বাবদ রাষ্ট্রীয় তহবিল থেকে গ্রহ করেছিলেন

---

* জুরজিজায়দান, *তমদ্দুন ইসলাম*, ৪র্থ খণ্ড, পৃঃ ২৭।

তাঁর নিজের একখণ্ড জমি বিক্রয় করে সেই অর্থ যেন রাষ্ট্রীয় তহবিলে (বায়তুলমাল) প্রত্যর্পণ করা হয়।

কুরআনের অনুশাসন ও হযরত রসূলুল্লার (স)-এর জীবনাদর্শ মোতাবেক তাঁরা শাসনকার্য পরিচালনা করতেন। রাষ্ট্রীয় তহবিল বায়তুলমাল নামে অভিহিত হত এবং এটা জনসাধারণের সম্পত্তি ছিল।

খলিফাদের নীতি

খলিফা জনসাধারণের নামে তাদের স্বার্থে এ তহবিল তদারক করতেন। রাষ্ট্র পরিচালনার ব্যাপারে ধর্মীয় নীতি এবং জনসাধারণের মঙ্গল খলিফার ব্যক্তিগত অথবা পারিবারিক স্বার্থের উপর প্রাধান্য পেত।

ইসলামের সাম্য ও ভ্রাতৃত্বের আদর্শ এ যুগে পূর্ণরূপে বাস্তবায়িত হয়েছিল। এরই কল্যাণে আরবগণ প্রাচীন গোত্রীয় বিভেদ ও দলাদলি ভুলে একটি

ভ্রাতৃত্বের আদর্শ

সাধারণতন্ত্র গড়ে তুলতে সক্ষম হয়েছিল। ইসলামী রাষ্ট্রে, অভিজাত, অনভিজাত, প্রভু, ভৃত্য ও ধনী-দরিদ্রের নাগরিক ও সামাজিক অধিকার সমান ছিল। আইনের চোখে সবাই সমান ছিল। হযরত উমর মদ্যপানের অপরাধে আপন পুত্রকে ইসলামী আইন মোতাবেক শাস্তি বিধান করতে ইতস্তত করেননি। জাবালা নামক একজন লোক সিরিয়ার গাস্‌সান রাজ বংশোদ্ভূত ছিলেন। তিনি ইসলাম ধর্মে দীক্ষিত হয়ে হযরত উমরের খিলাফতের সময় কাবা শরীফে তওয়াফ করবার জন্য এসেছিলেন। তওয়াফের সময় একজন সাধারণ মুসলমান জাবালার কাপড় মাড়িয়ে দেয়ায় জাবালা তাকে চপেটাঘাত করেছিল। হযরত উমরের কাছে এ সংবাদ পৌঁছলে তিনি জাবালার এ আচরণের শাস্তিস্বরূপ উক্ত সাধারণ মুসলমানকে জাবালার গালে অনুরূপ চপেটাঘাত করার অনুমতি দান করেন। এতে ক্রুদ্ধ হয়ে জাবালা ইসলাম ধর্ম ত্যাগ করে নিজের দেশে ফিরে যান। ইসলাম ধর্মের সাম্য ও ভ্রাতৃত্বে যাদের আস্থা ছিল না তাদের জন্য মুসলমান সমাজে কোন স্থান ছিল না।

খুলাফা-ই-রাশিদীনের আমলেই সর্বপ্রথম মুসলিম রাষ্ট্রের কাঠামো সুনির্দিষ্ট রূপ লাভ করে। হযরত উমরের শাসন ব্যবস্থায় আমরা এর পরিচয় পাই।

রাজ্যশাসন

জনসাধারণের সার্বিক মঙ্গল বিধান এ শাসন-ব্যবস্থার মূল উদ্দেশ্য ছিল। হযরত ওমরই সর্বপ্রথম প্রদেশসমূহে প্রাদেশিক শাসনকর্তা নিযুক্ত করেন এবং ন্যায় বিচার প্রতিষ্ঠার জন্য কাজী নিযুক্ত করেন। তিনি জমির উৎপাদিকা শক্তির ভিত্তিতে রাজস্ব-ব্যবস্থা কায়েম করেন এবং সৈন্যবাহিনী সুগঠিত করেন। অমুসলমানদের (জিম্মীদের) অধিকার ও কর্তব্য সুনির্ধারিত করেন। খুলাফা-ই-রাশিদীনের আমলে হযরত উমরের শাসন-ব্যবস্থা অনুসারেই রাষ্ট্রশাসন পরিচালিত হত। পরবর্তীকালে বিভিন্ন মুসলিম রাষ্ট্রের রাজ্যশাসন প্রণালী হযরত উমরের শাসন-পদ্ধতি অনুসরণ করেই গড়ে উঠেছিল।

খুলাফা-ই-রাশিদীনের শাসনামলে জনসাধারণের জীবনযাত্রা সহজ, সরল ও অনাড়ম্বর ছিল। হযরত উমরের কঠোর অনুশাসনের ফলে আরবগণ বিলাসব্যসন

সমাজজীবন

পরিহার করে চলত। মেয়েদের মধ্যে তখনও অবরোধ প্রথার সৃষ্টি হয়নি। তারা অবাধে চলাফেরা করতে পারত এবং খলিফাগণের বক্তৃতা ও আলেমদের ধর্মোপদেশ শ্রবণ করতে পারত। কিন্তু চারদিকে রাজ্য বিস্তারের ফলে সৈন্যবাহিনী ও সাধারণ লোকদের মধ্যে ক্রমশ সম্পদ বৃদ্ধির কারণে এ যুগের শেষের দিকে ক্রমশ জীবন-যাত্রার মান উন্নত হতে থাকে এবং অনেকের মধ্যে জাঁকজমক ও বিলাসিতা পরিলক্ষিত হয়।

গ্রন্থনির্দেশ

১. সৈয়দ আমীর আলী : *হিস্ট্রি অব সারাসেন্স্।*
২. জুরজিজায়দান : *তমদ্দুন ইসলাম,* ৪র্থ খণ্ড।

উমাইয়া বংশের প্রতিষ্ঠাতা মু'আবিয়া

(৬৬১ খ্রিঃ – ৬৮০ খ্রিঃ)

হযরত আলীর মৃত্যুর পর কুফার জনসাধারণ তাঁর জ্যেষ্ঠপুত্র হাসানকে খলিফা নির্বাচিত করল। মুআবিয়া হযরত আলীর জীবদ্দশায়ই সিরিয়া ও মিসরে আধিপত্য স্থাপন করেছিলেন। হযরত আলীর মৃত্যুতে তিনি সমগ্র মুসলিম জগতের খিলাফত দাবি করলেন এবং হাসানের সাথে যুদ্ধ করবার জন্য ইরাকে সৈন্যবাহিনী প্রেরণ করলেন। হাসান তাঁর বিশ্বস্ত সেনাপতি কায়েসকে ১২০০০ সৈন্যের এক বাহিনীসহ মু'আবিয়ার বিরুদ্ধে প্রেরণ করলেন এবং অবশিষ্ট সৈন্যবাহিনীসহ স্বয়ং মাদায়িনে অবস্থান করতে লাগলেন। ইতিমধ্যে এক গুজব রটল যে, মু'আবিয়ার সাথে যুদ্ধে কায়েস পরাজিত ও নিহত হয়েছেন। এতে মাদায়িনে হাসানের সৈন্যবাহিনীর মধ্যে বিদ্রোহ দেখা দেয়। তারা হাসানের শিবির লুণ্ঠন করেই নিরস্ত হল না বরং তাঁকে মু'আবিয়ার হাতে ধরিয়ে দিয়ে সুযোগ-সুবিধা লাভের জন্য চেষ্টিত হল। হাসান তাঁর অনুগামীদের এ বিসদৃশ আচরণে মনক্ষুণ্ন হয়ে খিলাফতের দাবি প্রত্যাহার করে মু'আবিয়ার সাথে সন্ধি করতে মনস্থ করলেন। তিনি মদীনায় শান্তিপূর্ণ জীবন-যাপনের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করলেন এবং এ মর্মে প্রস্তাব করলেন যে, কুফায় তাঁর পিতার যে ধন-ভাণ্ডার রয়েছে তা তাঁকে ছেড়ে দিতে হবে এবং পারস্যের একটি এলাকার রাজস্ব তাঁর জন্য নির্ধারিত করতে হবে। মু'আবিয়া হাসানের এ দাবি মেনে নিয়ে তাঁর সাথে সন্ধিসূত্রে আবদ্ধ হলেন। এভাবে মাত্র পাঁচ ছয় মাস খিলাফতে অধিষ্ঠিত থাকার পর হাসান কুফা ত্যাগ করে মদীনায় চলে গেলেন। মু'আবিয়া কুফায় প্রবেশ লাভ করে পূর্বাঞ্চলের প্রদেশসমূহের উপর স্বীয় আধিপত্য বিস্তার করলেন এবং মুসলিম জগতের অপ্রতিদ্বন্দ্বী খলিফা হিসেবে দামিস্কে প্রত্যাবর্তন করলেন। তখন হতে দামিস্ক মুসলিম জগতের রাজধানীর মর্যাদা লাভ করল। হাসান মদীনায় আপন পরিবারবর্গসহ শান্তিতে বসবাস করতে লাগলেন। অনধিক আট বছরকাল এভাবে অতিবাহিত হওয়ার পর তাঁর এক স্ত্রী তাঁকে বিষ প্রয়োগে নিহত করেন। এ হত্যায় উমাইয়াগণের ষড়যন্ত্র ছিল বলে অনুমান করা হয়।

হাসানের খিলাফত ত্যাগ

মু'আবিয়ার শাসনকালে মুসলিম রাজ্য শান্তিপূর্ণ ও সমৃদ্ধিশালী ছিল। হযরত উসমানের হত্যার পর থেকে মুসলিম জগতে যে অভ্যন্তরীণ বিবাদ ও বিশৃঙ্খলা

চলে আসছিল মু'আবিয়া দৃঢ়হস্তে তা দমন করে রাজ্যে পুনরায় শান্তি ও শৃঙ্খলা ফিরিয়ে আনেন। এ ব্যাপারে তিনি কয়েকজন সুযোগ্য শাসক ও রাজনীতিকের সমর্থন ও সহায়তা লাভ করেছিলেন। এ সব সুযোগ্য শাসকের মধ্যে আমর, মুগীরা ও জিয়াদের নাম সর্বাপেক্ষা উল্লেখযোগ্য। এরা তায়িফের সাকিফ গোত্রের লোক।

আমর আমর সিফফীনের যুদ্ধে মু'আবিয়াকে নিশ্চিত পরাজয়ের হাত থেকে রক্ষা করেন। তাঁর ধূর্ততার সাহায্যে তিনি প্রতিপক্ষকে যুদ্ধ থামাতে বাধ্য করলেন এবং কূটনৈতিক বুদ্ধিতে আলীর প্রতিনিধিকে দুমার সালিসে পরাভূত করে আলীর জন্য বিপদ ডেকে আনলেন। অতঃপর মিসরে আলীর শাসনকর্তাকে পরাজিত ও নিহত করে তিনি সেখানে মু'আবিয়ার আধিপত্য প্রতিষ্ঠিত করলেন।

মুগীরা মু'আবিয়া মুগীরাকে বিদ্রোহ-প্রবণ কুফা নগরীর শাসনকর্তা নিযুক্ত করেন। তিনি দক্ষতার সাথে কুফার শাসনকার্য পরিচালনা করেন।

জিয়াদ প্রাদেশিক শাসনকর্তাদের মধ্যে জিয়াদ ছিলেন সর্বাপেক্ষা সুদক্ষ ও দূরদর্শী। জিয়াদ হযরত আলীর অধীনে বসরা ও পারস্যের শাসনকর্তা ছিলেন। তিনি প্রথমে মু'আবিয়ার বশ্যতা স্বীকার করতে অনিচ্ছুক ছিলেন। অবশেষে মুগীরার মধ্যস্থতায় জিয়াদ ও মু'আবিয়ার মধ্যে সমঝোতা স্থাপিত হয়। মু'আবিয়া জিয়াদকে বসরার শাসনকর্তা নিযুক্ত করলেন এবং তাঁকে আপন ভাই বলে স্বীকৃতি দান করলেন। জিয়াদের সুযোগ্য শাসনে বসরায় শান্তি ও শৃঙ্খলা স্থাপিত হয়। মুগীরার মৃত্যুর পর জিয়াদ কুফার শাসনকর্তৃত্বও লাভ করেন। উত্তরে অক্ষু নদী হতে পূর্বে সিন্ধু নদী পর্যন্ত এবং দক্ষিণে পারস্য উপসাগর পর্যন্ত সমগ্র অঞ্চল তাঁর শাসনাধীন ছিল। তিনি কুফা ও বসরায় বিভিন্ন শাসন-সংস্কার প্রবর্তন করেন। কুফার সৈন্যবাহিনীকে তিনি চারভাগে ভাগ করে প্রতি বিভাগের উপর একজন সরকারি সৈন্যাধ্যক্ষ নিযুক্ত করেন। এ ব্যবস্থা অনুসারে বিভিন্ন গোত্রের লোকদেরকে একত্র করে এক এক বিভাগের অন্তর্ভুক্ত করা হয় এবং গোত্রীয় দলাদলি ও প্রাধান্যের বিলোপ সাধনের জন্য এদের কর্তৃত্ব গোত্রীয় প্রধানের উপর ন্যস্ত না করে সরকার কর্তৃত্ব নিযুক্ত কর্মচারীর উপর ন্যস্ত করা হয়। অনুরূপভাবে বসরায় পাঁচটি সামরিক বিভাগের সৃষ্টি করা হয়। গোত্রীয় দলাদলি নিরসনের জন্য জিয়াদ অনেকগুলি কুফী ও বসরী পরিবারকে খুরাসানে বসবাস করতে উৎসাহিত করেন।

রাজ্যবিস্তার মু'আবিয়ার শাসনামলে পূর্বাঞ্চলে ও আফ্রিকায় রাজ্যবিস্তার ঘটে। হিরাত ও কাবুলে পুনরায় খলিফার অধিকার প্রতিষ্ঠিত হয়। গজনী, বল্‌খ্‌ ও কান্দাহারে অভিযান প্রেরিত হয়। ৬৭৪ খ্রিস্টাব্দে জিয়াদের এক পুত্র অক্ষু নদী অতিক্রম করে বুখারা অধিকার করেন। দু বছর পর অপর

সেনাপতি সমরকন্দ ও তিরমিজ দখল করেন। মিসরের শাসনকর্তা আমর ৬৬১ খ্রিস্টাব্দে 'উক্‌বাকে উত্তর আফ্রিকার বার্বারদের বিরুদ্ধে প্রেরণ করেন। উক্‌বা এ অঞ্চলের বার্বারগণকে পরাজিত করে সেখানে খলিফার আধিপত্য প্রতিষ্ঠিত করেন। ৬৭০ খ্রিস্টাব্দে মু'আবিয়া উক্‌বাকে ১০,০০০ সৈন্যের এক বাহিনী দ্বারা শক্তিশালী করেন এবং ঐ বছরই উকবা তিউনিসের দক্ষিণে প্রসিদ্ধ সামরিক বন্দর কায়রোয়ান দখল করেন। এ নগর তখন হতে উত্তর আফ্রিকায় মুসলিম অধিকৃত অঞ্চলের রাজধানী বলে পরিগণিত হল। ৬৭৫ খ্রিস্টাব্দে উকবা পশ্চিমদিকে সৈন্যবাহিনী পরিচালনা করেন এবং একে একে আফ্রিকার শহরগুলি অধিকার করে আটলান্টিক সাগরের তীরে উপস্থিত হলেন। সমুদ্রের উত্তুঙ্গ তরঙ্গমালা তাঁর ও তাঁর অশ্বের গতিরোধ করে দাঁড়াল এবং তাঁর অশ্ব আবক্ষ নিমজ্জিত হয়ে পড়ল। তখন তিনি উচ্চৈঃস্বরে বলে উঠলেন ঃ

উকবার আফ্রিকা বিজয়

"হে সর্বশক্তিমান প্রভু, যদি মহাসমুদ্র আজ আমাকে বাধা প্রদান না করত, তবে আরও দূর দূরান্তে তোমার নামের মহিমা প্রচার করতাম এবং তোমার শত্রুগণকে আঘাত করতাম।"

আলী (রা) ও মু'আবিয়ার মধ্যে গৃহযুদ্ধ চলতে থাকাকালীন বাইজান্টাইন সীমান্তে যুদ্ধ-বিগ্রহ বন্ধ ছিল। বার্বারদের সাথে যুদ্ধের সুযোগ গ্রহণ করে গ্রীকগণ মুসলিম রাজ্যে প্রবেশ লাভ করে কিন্তু তারা মুসলমানদের সাথে যুদ্ধে পরাজিত হয়। মুসলমানগণ আর্মিনিয়ায় শীত যাপন করে এবং জলপথে ও স্থলপথে যুদ্ধ পরিচালনা করে। ৬৭০ খ্রিস্টাব্দে কনস্টান্টিনোপলের বিরুদ্ধে অভিযান প্রেরিত হয়। এ যুদ্ধে মু'আবিয়ার পুত্র ইয়াজীদ সাহায্যকারী সৈন্য নিয়ে পরে যোগদান করেন। উভয়পক্ষে তুমুল যুদ্ধ হয়। মুসলমানগণকে দূরদেশে অনেক ক্ষয়ক্ষতি স্বীকার করতে হয়। গ্রীকগণ 'গ্রীক অগ্নি' (Naptha) ব্যবহার করে শহরের নিরাপত্তা রক্ষা করে। এর পরও মু'আবিয়া হতোদ্যম হননি। তিনি প্রায় প্রতি বছর কনস্টান্টিনোপলের বিরুদ্ধে অভিযান প্রেরণ করেন। ৬৭৩ খ্রিস্টাব্দে কনস্টান্টিনোপলের নিকটস্থ সিজিকাস (Cyzicus) দ্বীপ অধিকৃত হয় এবং সাত বছর যাবৎ মুসলমানগণ ঐ দ্বীপ নিজেদের অধিকারে রাখতে সক্ষম হয়। মু'আবিয়ার পুত্র ইয়াজীদের রাজত্বকালে এ দ্বীপ আবার গ্রীকদের অধিকারে চলে যায়।

বাইজান্টাইনদের সাথে যুদ্ধ

মু'আবিয়া লক্ষ্য করলেন যে, হযরত উসমানের মৃত্যুর পর থেকেই খলিফা নির্বাচন নিয়ে গৃহ-বিবাদ ও দলাদলি অবশ্যম্ভাবী হয়ে উঠেছে। মুসলিম জগতের

উত্তরাধিকারী মনোনয়ন

ঐক্য বিনষ্ট হয়েছে এবং যে মদীনার আনসার ও মুহাজিরগণ খলিফা নির্বাচনে অগ্রগামী ভূমিকা গ্রহণ করতেন, সে মদীনা এখন আর মুসলিম রাজ্যের রাজধানী নেই। আলীর সঙ্গে তালহা ও জুবাইরের যুদ্ধ এবং হযরত উসমানের হত্যার প্রসঙ্গ নিয়ে হযরত আলীর সাথে তাঁর বিবাদের অনুরূপ ঘটনা মুসলিম রাজ্যের নিরাপত্তা ব্যাহত করতে পারে। এ সব কথা বিবেচনা করে এবং প্রধানত খিলাফতের পদ নিজের বংশে স্থায়ী করবার উদ্দেশ্যে তিনি তাঁর পুত্র ইয়াজীদকে উত্তরাধিকারী মনোনয়নের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন। তিনি নিজের জীবদ্দশায় জনসাধারণের কাছ থেকে ইয়াজীদের প্রতি আনুগত্যের শপথ (বাইআত) গ্রহণ করিয়ে খিলাফতে তাঁর উত্তরাধিকার সুনিশ্চিত করতে চেয়েছিলেন। তাঁর প্রধান সহকারী জিয়াদ ও মুগীরা উভয়েই এ সিদ্ধান্তের অনুকূলে মত প্রকাশ করেন। এদের উভয়ের মৃত্যুর পর ৬৭৬ খ্রিস্টাব্দে মু'আবিয়া জনসাধারণের সমর্থনের বিষয় স্থির নিশ্চিত হয়ে তাঁর সিদ্ধান্তের কথা জনসমক্ষে ঘোষণা করেন। তাঁর ইচ্ছানুযায়ী সকল প্রদেশ ও প্রধান নগরী হতে প্রতিনিধিসমূহ দামিস্কে এসে সমবেত হল। এরা সবাই ইয়াজীদের প্রতি ভাবী খলিফা হিসেবে আনুগত্যের শপথ গ্রহণ করে। সিরিয়া ও ইরাক এভাবে আনুগত্যের শপথ গ্রহণ করল। অতঃপর মু'আবিয়া এক সহস্র অশ্বারোহীসহ বাহ্যত উমরা পালনের জন্য মক্কা অভিমুখে রওয়ানা হলেন। কিন্তু তাঁর আসল উদ্দেশ্য ছিল ইয়াজীদের উত্তরাধিকার ব্যাপারে মক্কা ও মদীনাবাসীদের সমর্থন লাভ। প্রথমে তিনি মদীনায় গমন করেন। মদীনার প্রসিদ্ধ ব্যক্তিগণ, যেমন— আলীর পুত্র হুসাইন, আবু বকরের পুত্র আবদুর রহমান, উমরের পুত্র আবদুল্লাহ ও জুবাইরের পুত্র আবদুল্লাহ মদীনা ত্যাগ করে মক্কায় চলে যান। অবশিষ্ট নাগরিকগণ ইয়াজীদের প্রতি আনুগত্যের শপথ গ্রহণ করল। এর পর মু'আবিয়া মক্কায় গিয়ে উমরা পালন করলেন। তারপর তিনি এক বক্তৃতায় তাঁর আসল উদ্দেশ্য ব্যক্ত করে মক্কাবাসীদের সহযোগিতা কামনা করলেন। প্রথমে আবদুল্লাহ ইবন জুবাইর আপত্তি উত্থাপন করে বললেন যে, উত্তরাধিকারী মনোনয়ন পূর্ববর্তী সব রীতির বিরোধী। এর পর সবাই বলে উঠলেন, এ ব্যাপারে তিনটি নিয়ম এ পর্যন্ত প্রতিষ্ঠা লাভ করেছে। প্রথমত, হযরত মুহম্মদ (স) তাঁর উত্তরাধিকারী মনোনয়নের ব্যাপার মদীনার জনসাধারণের হাতে ছেড়ে যান। দ্বিতীয়ত, হযরত আবু বকর (রা) উমরকে তাঁর উত্তরাধিকারী মনোনীত করেন অথচ উমর তাঁর কোন আত্মীয় ছিলেন না। তৃতীয়ত, হযরত উমর (রা) এক নির্বাচকমণ্ডলীর হাতে উত্তরাধিকারী মনোনয়নের ভার অর্পণ করেন। মদীনার প্রধান ব্যক্তিগণ

মু'আবিয়াকে এ তিন পন্থার যে কোন একটি পন্থা অনুসরণ করতে বলেন। মু'আবিয়া এঁদের সাথে নানা যুক্তিতর্কের অবতারণা করে বিফল মনোরথ হলেন; পরিশেষে তরবারীর ভয় দেখিয়ে আনুগত্য আদায় করলেন।

মৃত্যু এপ্রিল, ৬৮০ খ্রিঃ

মু'আবিয়া দীর্ঘকাল শান্তি ও শৃঙ্খলার সাথে রাজত্ব করে ৭৫ বছর বয়সে মৃত্যুমুখে পতিত হন। বিশ বছর খলিফা হিসেবে শাসন করে তিনি উমাইয়া বংশের রাজত্ব প্রতিষ্ঠিত করেন। মু'আবিয়া তীক্ষ্ণধী, বিদ্বান, অসীম ধৈর্যশীল, বিচক্ষণ রাজনীতিজ্ঞ ও বাগ্মী ছিলেন।

চরিত্র ও কৃতিত্ব

ঐতিহাসিক আল-মাসউদী তাঁর দৈনন্দিন জীবন-যাত্রার একটি বিবরণ রেখে গিয়েছেন ঃ "মু'আবিয়া দিনে ও রাত্রিতে পাঁচবার সাধারণকে প্রবেশের অনুমতি দিতেন। প্রভাতে ফজরের নামাজ পড়ে তিনি গাল্পিকের নিকট গল্প শ্রবণ করতেন। তারপর কুরআন পড়ে দরবারে বসতেন এবং মন্ত্রীদের সাথে রাজকার্যের বিষয় আলোচনা করতেন। তারপর সামান্য প্রাতরাশ গ্রহণ করতেন। তারপর মসজিদে একটি বেষ্টনীর মধ্যে চেয়ারে বসে সর্বসাধারণের অভিযোগ শ্রবণ করতেন। তারপর পুনরায় প্রাতরাশ গ্রহণ করতেন। ঐ সময় সচিব তাঁকে চিঠিপত্র পাঠ করে শুনাতেন। তারপর অভাবগ্রস্তদেরকে খাওয়ান হত। জোহরের নামাজ পড়ে তিনি বিশেষ বিশেষ লোককে প্রবেশের অনুমতি দিতেন। এরা তাঁর জন্য উপঢৌকন নিয়ে আসতেন। এ মজলিসে আবার তিনি মন্ত্রীদেরকে উপদেশ দিতেন। আসরের নামাজের পর আবার সাধারণের জন্য তিনি দরবারে বসতেন। এর পর সান্ধ্যভোজ হত। তারপর মাগরিবের নামাজ পড়তেন। এশার নামাজের পর আবার বিশেষ বিশেষ লোকদের জন্য দরবারে বসতেন। তারপর রাত্রির এক তৃতীয়াংশ পর্যন্ত আরব ও অন্যান্য দেশীয় রাজা বাদশাহদের কাহিনী শুনতেন। তারপর সামান্য মিষ্টি খেয়ে শয়ন করতেন।"

মুসলমান ঐতিহাসিকগণ অভিযোগ করেন যে, মু'আবিয়া খিলাফত-প্রজাতন্ত্রকে রাজতন্ত্রে (মুলক) পরিবর্তিত করেছেন। তিনি তাঁর নিজ বংশে খিলাফতকে বংশানুক্রমিক করার জন্য স্বীয়পুত্র ইয়াজীদকে উত্তরাধিকারী মনোনীত করে যান। এভাবে তিনি জনসাধারণের দ্বারা নির্বাচিত খিলাফতের পরিবর্তে মুসলিম জগতে রাজতন্ত্রের প্রতিষ্ঠা করেন। পূর্ববর্তী খলিফাগণ সাদাসিধাভাবে চলাফেরা করতেন এবং নির্বিঘ্নে যেখানে সেখানে গমন করতেন কিন্তু মু'আবিয়া রাজা বাদশাহদের মত দেহরক্ষী পরিবেষ্টিত হয়ে থাকতেন। মসজিদে তাঁর জন্য একটি বিশেষ বেষ্টনী ছিল। তিনি সেখানে থেকে নামাজ পড়তেন। হযরত আলীর হত্যার পর সাবধানতামূলক ব্যবস্থা হিসেবে তিনি এমন করেছিলেন। তিনি বায়তুলমাল বা সরকারি তহবিলকে নিজের ব্যক্তিগত তহবিলে পরিণত

করেছিলেন। তাঁর পূর্ববর্তী খলিফাগণ এ তহবিলকে সর্বসাধারণের সম্পত্তি হিসেবে রক্ষণাবেক্ষণ করতেন এবং নিজেদের খরচপত্রের জন্য একটি নির্দিষ্ট ভাতা গ্রহণ করতেন। এ সব কারণে সনাতনধর্মী মুসলমানগণ মু'আবিয়াকে ভাল চোখে দেখতে পারেন না। ঐতিহাসিকগণ এজন্য তাঁর প্রশংসার চেয়ে তাঁর নিন্দাবাদই বেশি করেছেন।

উপরোক্ত অভিযোগ কমবেশি সত্য হলেও মু'আবিয়া যে, একজন যুগোপযোগী সুদক্ষ শাসক ও রাজনীতিজ্ঞ ছিলেন তাতে কোন সন্দেহ নেই। তিনি যখন খলিফা পদে অধিষ্ঠিত হয়েছিলেন তখন মুসলিম রাষ্ট্রের অবস্থা বড়ই শোচনীয় ছিল। মুসলমানদের মধ্যে বিভেদ ও দলাদলি চরম আকার ধারণ করেছিল। যে পবিত্র ধর্মবন্ধন মুসলমান জাতি ও মুসলিম রাষ্ট্রকে একক অবিচ্ছেদ্য বন্ধনে আবদ্ধ করেছিল, তা ক্রমশ শিথিল হয়ে আসছিল। এ আবহাওয়ায় মু'আবিয়াকে রাষ্ট্রীয় সংহতির জন্য নবতর ভিত্তির অনুসন্ধান করতে হয়েছিল। কিন্তু তবুও এ কথা মনে করা ভুল হবে যে, তিনি রাষ্ট্রের ধর্মীয় ভিত্তিকে সম্পূর্ণ উড়িয়ে দিয়েছিলেন কারণ রাষ্ট্রীয় প্রয়োজনে তিনি ধর্মের যথাযোগ্য সদ্ব্যবহার করেছিলেন।

রাষ্ট্রের ধর্মীয় ভিত্তি

তিনি বাহ্যিক আচার অনুষ্ঠানে নিষ্ঠাবান মুসলমান ছিলেন। পরবর্তী আব্বাসীয় খলিফা হারুনূর রশীদের মত তিনি বাইজান্টাইনদের বিরুদ্ধে অনেক যুদ্ধাভিযান প্রেরণ করেছিলেন এবং এ যুদ্ধে তিনি গাজী অর্থাৎ ধর্মযোদ্ধার ভূমিকা গ্রহণ করেছিলেন। তিনি পূর্ববর্তী খলিফাদের মত জুমা-জামাতে ইমামতী করতেন।

তিনি বাস্তবধর্মী শাসক হিসেবে রাষ্ট্রের উল্লিখিত ধর্মীয় ভিত্তির সাথে আরও অনেক জাগতিক ও ব্যবহারিক রীতিনীতির যোগাযোগ সাধিত করেন। তাঁর রাষ্ট্রীয় শক্তির মূল উৎস ছিল এক সুশিক্ষিত ও শক্তিশালী সেনাবাহিনী। সিরিয়াবাসীরা এ সেনাবাহিনীতে যোগদান করে তাঁর শক্তি বৃদ্ধি করেছিল। ইরাকের লোকেরা তাদের খলিফাকে বার বার সঙ্কট সময়ে পরিত্যাগ করে চলে গিয়েছিল। হযরত আলী (রা) ও তাঁর পুত্র হাসান লঘুচিত্ত ও বিশ্বাসঘাতক কুফাবাসীদের নিষ্ক্রিয়তার জন্যই অনেক কষ্টভোগ করেছিলেন কিন্তু সিরিয়াবাসিগণ সব সময় মু'আবিয়াকে অকুণ্ঠভাবে সমর্থন করেছিল। বিখ্যাত ঐতিহাসিক ওয়েল হাউসেনের মতে সিরিয়ায় রোমক সাম্রাজ্য ও খ্রিস্টধর্মের ঐতিহ্য সিরিয়াবাসীদেরকে রাজভক্ত করে তুলেছিল অন্যপক্ষে ইরাকের অধিবাসিগণের সেরকম কোন ঐতিহ্য ছিল না।

মু'আবিয়া রাষ্ট্র পরিচালনার ব্যাপারে ধৈর্যের পরাকাষ্ঠা প্রদর্শন করেন। ঐতিহাসিক

শাসন-নীতি

ফখরী বলেন, "যেখানে ধৈর্যের প্রয়োজন সেখানে তিনি ধৈর্যশীল ছিলেন, যেখানে কঠোরতার প্রয়োজন—সেখানে তিনি কঠোর ছিলেন; কিন্তু ধৈর্যই তাঁর প্রধান বৈশিষ্ট্য ছিল।" যেখানে শক্তি প্রয়োগ নিতান্ত প্রয়োজন, সেখানেই কেবল তিনি শক্তি প্রয়োগ করতেন। কথিত আছে, মু'আবিয়া বলতেন, "যেখানে চাবুকের ব্যবহার যথেষ্ট, সেখানে আমি আমার তরবারি ব্যবহার করি না, যেখানে বাক্যপ্রয়োগ যথেষ্ট, সেখানে চাবুকও প্রয়োগ করি না। যদি আমার সহচরদের সাথে চুলের মত সূক্ষ্মতম বন্ধনও অবশিষ্ট থাকে, আমি একে ছিন্ন হতে দেই না। যখন সে সজোরে টানে, তখন আমি ঢিল দেই, আর যদি সে ঢিল দেয়, তখন আমি টানি।" মু'আবিয়া নিজের ক্ষমতা ও প্রতিপত্তি বৃদ্ধির উদ্দেশ্যে অকাতরে অর্থ ব্যয় করতেন। কুরাইশ বংশের সম্ভ্রান্ত ব্যক্তিগণকে তিনি নানা উপাচারে সন্তুষ্ট রাখতেন। একবার তিনি কোন 'আনসার'-কে ৫০০ স্বর্ণ মুদ্রা উপহার পাঠিয়েছিলেন। আনসার আপন পুত্রকে ঐ মুদ্রাসহ মু'আবিয়ার নিকট এ বলে পাঠালেন যে, সে যেন মু'আবিয়ার মাথার উপর তা ছুঁড়ে মারে। পুত্রটি মু'আবিয়ার অনুমতিক্রমে ঐ মুদ্রা পিতার আদেশমত মু'আবিয়ার মাথায় ছুঁড়ে মারল। মু'আবিয়া তখন ঐ মুদ্রা দ্বিগুণ করে আনসারের নিকট প্রেরণ করলেন। তাঁর এমন ব্যবহারের জন্যই আনসার ও মুহাজিরগণের পুত্ররা তাঁর আনুগত্য স্বীকার করেছিল।

মু'আবিয়া শাসন ব্যবস্থার উন্নতি বিধান করেন। তিনি বাইজান্টাইন শাসন-ব্যবস্থার অনুকরণে সিরিয়াবাসীদের সহযোগিতায় একটি সুষ্ঠু শাসন ব্যবস্থা গড়ে তুলতে চেষ্টা করেন। এ রাজকীয় শাসন ব্যবস্থার সাথে তিনি আরবীয় পদ্ধতির যোগাযোগ সাধন করেন। তিনি তাঁর বিশ্বস্ত ও মনোনীত আরব নেতাদের সাথে আলাপ-আলোচনার মাধ্যমে নিজের ইচ্ছা বলবৎ ও কার্যকরী করতে চেষ্টা করেন। কাজেই তিনি প্রকৃত প্রস্তাবে রাজাও ছিলেন না। একজন বাইজান্টাইন লেখক মু'আবিয়াকে উপদেষ্টা মণ্ডলীর প্রধান (First Councillor) বলে অভিহিত করেছেন। মু'আবিয়া তাঁর শাসন ব্যবস্থায় দুটি নতুন বিভাগ প্রবর্তন করেন। এর একটি হল বারিদ (ডাক বিভাগ)। তেজী ঘোড়া অদল বদল করে এ ব্যবস্থা চালু হত এবং এর সাহায্যে দ্রুত সংবাদ আদান-প্রদান সম্ভব হত। অপরটি হল রেজিস্ট্রারী বিভাগ (দীওয়ানুল খাতাম)। যখন খলিফার তরফ হতে কোন ফরমান বা প্রত্যাদেশ বাইরে প্রেরণ করা হত তখন এ বিভাগে এর একটি নকল রেখে দেয়া হত। সরকারি চিঠিপত্রের জাল আবিষ্কৃত হওয়ার ফলে সরকারি দলিল-পত্রাদির বিশুদ্ধতা রক্ষার জন্য মু'আবিয়া এ ব্যবস্থা অবলম্বন করেছিলেন।

শাসন-ব্যবস্থা

মু'আবিয়া সর্বপ্রথম আরব নৌবহর গঠন করেন। সিরিয়ায় বাইজান্টাইনগণ কর্তৃক পরিত্যক্ত জাহাজের কারখানাগুলির সদ্ব্যবহার করে মু'আবিয়া আরব নৌবহর সৃষ্টি করেন। হযরত উসমানের সময় ৬৫৫ খ্রিস্টাব্দে যখন তিনি সিরিয়ার প্রাদেশিক শাসনকর্তা তখনই তিনি বাইজান্টাইনদের বিরুদ্ধে সর্বপ্রথম নৌযুদ্ধে জয়লাভ করেন। তিনি কনস্টান্টিনোপলের বিরুদ্ধে যে সব অভিযান প্রেরণ করেছিলেন তার প্রত্যেকটির সাথে নৌ-বাহিনীও প্রেরিত হত।

মু'আবিয়া তাঁর রাজ্যের কয়েস বংশীয় ও কাল্‌ব্‌ বংশীয় যুযুধান আরবদের মধ্যে ক্ষমতাসাম্য রক্ষার চেষ্টা করতেন। তিনি নিজে কায়েসবংশীয় হলেও কাল্‌ব্‌ বংশের স্ত্রী গ্রহণ করেছিলেন এবং ঐ স্ত্রীর গর্ভজাত পুত্র ইয়াজীদকে উত্তরাধিকারী মনোনীত করে উভয় গোত্রকে সন্তুষ্ট রাখতে চেষ্টা করেন। তিনি তাঁর খ্রিস্টান প্রজাদের প্রতি সহনশীল ও উদার ছিলেন। তিনি খ্রিস্টানগণকে উচ্চ রাজপদে নিযুক্ত করেছিলেন। তাঁর একজন খ্রিস্টান উপদেষ্টা ছিল, তাঁর চিকিৎসক ছিলেন খ্রিস্টান এবং সভাকবিও খ্রিস্টান ছিলেন। ভূমিকম্পে বিনষ্ট হয়ে যাওয়ার পর তিনি এডেসার গির্জাকে পুনর্নির্মাণ করেন। মেরনাইট ও জেকবাইট খ্রিস্টানগণ নিজেদের বিবাদ মীমাংসার জন্য খলিফাকে সালিস মানত।

গ্রন্থনির্দেশ

১. পি. কে. হিট্টি : *হিস্ট্রি অব দি এরাব্‌স্‌।*

২. উইলিয়াম ম্যুর : *হিস্ট্রি অব দি কলিফেট।*

৩. আল ফখ্‌রী : *আদাবুস সুলতানিয়া ওয়াদ-দুয়াল্লুল-ইসলামিয়া।*

৪. ওয়েল হাউসেন : *এরাব কিংডম এণ্ড ইট্‌স্‌ ফল।*

১৪
কারবালার শোচনীয় হত্যাকাণ্ড

মু'আবিয়ার মৃত্যু যখন আসন্ন তখন তিনি মৃত্যুশয্যা হতে পুত্র ইয়াজীদের উদ্দেশ্যে উপদেশ রেখে যান। ইয়াজীদ তখন শিকারের উদ্দেশ্যে বের হয়েছিলেন।

ইয়াজীদের রাজত্ব ৬৮০-৬৮৩ খ্রীঃ

মু'আবিয়া বলেন, "কুরাইশ বংশের চার ব্যক্তি ব্যতীত আর কারও কাছ থেকে তোমার জন্য প্রতিদ্বন্দ্বিতার ভয় করি না। এঁরা হলেন, আলীর পুত্র হুসায়ন, উমরের পুত্র আবদুল্লাহ, জুবায়রের পুত্র আবদুল্লাহ ও আবু বকরের পুত্র আবদুর রহমান। উমরের পুত্রকে ধর্মভীরুতা সম্পূর্ণ পেয়ে বসেছে, তিনি যদি সর্বশেষ লোক হন তবে তিনি তোমার প্রতি আনুগত্যের শপথ গ্রহণ করবেন। আলীর পুত্র হুসায়ন বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ লোক নন, ইরাকের লোকেরা তাঁকে বিদ্রোহ ঘোষণা করতে বাধ্য না করে ছাড়বে না। যদি তিনি বিদ্রোহী হন এবং তুমি তাঁর উপর জয়ী হও তবে তাঁকে ক্ষমা করো কারণ তিনি নিকটাত্মীয় এবং হযরত মুহম্মদের (স) বংশধর ও উত্তরাধিকারী। আবু বকরের পুত্র তাঁর বন্ধুবান্ধবগণকে যা করতে দেখবেন তাই করবেন। তিনি শুধু নারী সাহচার্য ও খেলাধুলা পছন্দ করেন। কিন্তু যে ব্যক্তি তোমার জন্য সিংহের মত ওঁৎ পেতে বসে থাকে এবং শৃগালের মত তোমার বিরুদ্ধে ধূর্ত আচরণ করে এবং ক্ষমতা পেলেই তোমাকে আক্রমণ করে সে হল আব্দুল্লাহ্ ইবন জুবায়র। তুমি যদি তাকে কাবুতে পাও তবে তাকে টুকরো টুকরো করে কেটে ফেলবে এবং তোমার লোকদেরকে রক্তপাত থেকে যথাসম্ভব রক্ষা করবে।"

ইয়াজিদ খলিফা হয়ে মদীনায় যারা আনুগত্যের শপথ গ্রহণ করেনি তাদের নিকট হুকুমনামা পাঠালেন। উমরের পুত্র ও আব্বাসের পুত্র ইয়াজীদের প্রতি আনুগত্যের শপথ গ্রহণ করলেন। আব্দুল্লাহ ইবন জুবায়র ও হুসায়ন কিছু সময় চেয়ে মক্কায় চলে গেলেন। কুফার অধিবাসীরা হুসায়নকে কুফায় যাবার জন্য আহ্বান করল। মক্কায় তাঁর বন্ধুবান্ধব ও আত্মীয়স্বজনগণ তাকে কুফায় যেতে নিষেধ করলেন। কুফাবাসীদের চরিত্র সম্বন্ধে এরা সম্যক অবগত ছিলেন। তাদের চরিত্রে স্থিরতার অভাব ছিল। হঠাৎ তারা অতি উৎসাহী আবার পরক্ষণেই উদাসীন ও অসাড় হয়ে পড়ত। আবদুল্লাহ ইবন জুবায়র হুসায়নকে স্বীয় পথ থেকে অপসারণ করতে চেয়েছিলেন। সেজন্য কেবল তিনিই হুসায়নকে কুফায় যেতে উৎসাহিত করেন। কুফাবাসীরা ইয়াজীদের জীবনযাত্রা, মদ্যাসক্তি ও

পাপাচরণে চরম অসন্তুষ্টি প্রকাশ করে হুসায়নকে উমাইয়া সরকারের বিরুদ্ধে সর্বপ্রকার সাহায্যের প্রতিশ্রুতি দিয়ে বহুপত্র প্রেরণ করল। তারা পরস্পরের সাথে কঠোরভাবে অঙ্গীকারাবদ্ধ হয়ে হুসায়নের প্রতি অকুণ্ঠ সমর্থন জানাল। হুসায়ন ইয়াজীদের ও উমাইয়া সরকারের প্রতি আনুগত্য প্রকাশে শুধু অনিচ্ছুক ছিলেন না তিনি তাদের স্বৈরাচারী শাসনের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ জ্ঞাপনের জন্য সুযোগ খুঁজতেছিলেন। কুফাবাসীদের আমন্ত্রণে তাই তিনি সোৎসাহে সাড়া দিলেন।

হুসায়ন প্রথমে তাঁর পিতৃব্যপুত্র মুসলিমকে কুফার অবস্থা জানবার জন্য পাঠালেন। মুসলিম হানি নামক একজন নেতৃস্থানীয় ব্যক্তির গৃহে আশ্রয় গ্রহণ করেন। ইতিমধ্যে কুফাবাসীদের এসব কার্যকলাপের বিষয় ইয়াজীদের কর্ণগোচর হলে তিনি জিয়াদের পুত্র উবায়দুল্লাহকে কুফার শাসনকর্তা করে পাঠালেন। উবায়দুল্লাহ মুসলিমের অনুসন্ধান করে জানতে পারলেন যে মুসলিম হানির গৃহে অবস্থান করছেন, উবায়দুল্লাহ্ এদের উভয়কে ডেকে পাঠালেন এবং আশ্রিত ও আশ্রয়দাতা উভয়কে নৃশংসভাবে হত্যা করলেন। মুসলিমের মৃত্যু সংবাদ হুসায়নের নিকট পৌঁছবার পূর্বেই তিনি তাঁর পরিবারবর্গ, আত্মীয়স্বজন ও কয়েকজন অনুরক্ত ভক্তসহ কুফার দিকে যাত্রা করলেন। আরবের মরুভূমি অতিক্রম করে ইরাক সীমান্তে উপস্থিত হতে না হতেই মুসলিমের মৃত্যু সংবাদ তাঁর কানে আসল। তখনও তিনি ইচ্ছা করলে মক্কায় ফিরে যেতে পারতেন। কিন্তু তিনি তা করলেন না। কুফার পরিস্থিতির বিষয় ক্রমাগত দুঃসংবাদ আসতে লাগল। কবি ফারাজদাক ঐ পথ দিয়ে যাচ্ছিলেন। তিনি হুসায়নের একজন ভক্ত ছিলেন। তিনি বললেন, "(কুফা) নগরীর অন্তর আপনার পক্ষে রয়েছে কিন্তু এর তরবারি আপনার বিরুদ্ধে।" এ সব দুঃসংবাদের ফলে হুসায়নের সঙ্গে যোগদানকারী বেদুঈন সৈন্যগণ একে একে তাঁর পক্ষ ত্যাগ করে চলে যেতে লাগল। এখন হুসায়নের সঙ্গে ৩০ জন অশ্বারোহী ও ৪০ জন পদাতিক ব্যতীত আর কোন লোক রইল না।

হুসায়নের গতিরোধ করবার জন্য উবায়দুল্লাহ্ উমর ইবন সা'দকে ৪০০০ অশ্বারোহীসহ প্রেরণ করলেন। এভাবে বাধাপ্রাপ্ত হয়ে হুসায়ন কুফা হতে পঁচিশ মাইল দূরবর্তী কারবালা নামক স্থানে শিবির সংস্থাপন করলেন। হুসায়ন শত্রুপক্ষের সাথে বহু আলাপ-আলোচনার পর তিনটি প্রস্তাব করে পাঠালেন এবং এর যে কোন একটি গ্রহণ করবার জন্য তাদেরকে অনুরোধ করলেন; (১) তাঁকে হয় মক্কায় ফিরে যেতে দেয়া হোক নতুবা (২) তাঁকে দামিস্কে ইয়াজীদের নিকট পৌঁছিয়ে দেয়া হোক অথবা (৩) সীমান্তে ইসলামের দুশমনদের সঙ্গে যুদ্ধ করতে অনুমতি দেয়া হোক। কিন্তু উবায়দুল্লাহ এর কোন প্রস্তাবেই রাজি হলেন না।

তিনি হুসায়নকে বিনাশর্তে আত্মসমর্পণ করতে আদেশ করলেন। হুসায়ন ও তাঁর দলকে আত্মসমর্পণে বাধ্য করবার জন্য উবায়দুল্লাহ উমরকে আদেশ করলেন যেন নদীর সঙ্গে তাঁদের যোগাযোগ বন্ধ করে দেয়া হয়। উমাইয়া সেনাপতির ধারণা হল যে তৃষ্ণায় কাবু হয়ে হুসায়ন আত্মসমর্পণ করবেন। কিন্তু হুসায়ন তাঁর পূর্ব প্রস্তাবে অবিচল রইলেন। উবায়দুল্লাহ্ তখন শামীর নামক একজন নির্দয় ব্যক্তিকে উমরের নিকট পাঠাইয়া হুসায়নকে মৃত অথবা জীবিত যে অবস্থায়ই হউক কুফায় নিয়ে যেতে আদেশ করলেন। এ আদেশ পেয়ে উমর হুসায়নের শিবির অবরোধ করলেন। হুসায়ন তাঁর স্বল্পসংখ্যক অনুচর ও আত্মীয়স্বজনকে নিয়ে যুদ্ধ করতে দৃঢ়প্রতিজ্ঞ হলেন। পরিবার ও আত্মীয় স্বজনকে যুদ্ধক্ষেত্র হতে সরিয়ে নিয়ে যাওয়ার জন্য হুসায়নকে একদিন সময় দেয়া হল কিন্তু তারা কেউ ঐ মুহূর্তে হুসায়নকে ছেড়ে যেতে রাজি হল না।

দশই মুহররম সকালবেলা হুসায়ন তাঁর ক্ষুদ্র বাহিনীকে যুদ্ধের জন্য কাতারবন্দী করলেন। কিছুক্ষণের জন্য যুদ্ধক্ষেত্রে নিস্তব্ধতা বিরাজ করছিল। অবশেষে শত্রুপক্ষের তীর নিক্ষেপের সঙ্গে সঙ্গে স্ত্রীলোক ও শিশুদের ক্রন্দনের মধ্য দিয়ে যুদ্ধ আরম্ভ হল। একদিকে যথাযোগ্য সমর সাজে সজ্জিত বিরাট উমাইয়া বাহিনী, অপরদিকে ন্যায় ও সত্যের জন্য উৎসর্গীকৃত প্রাণ মুষ্টিমেয় নাগরিক। শত্রুপক্ষের তীর অগণিত সংখ্যায় হুসায়নের দলের লোকজনের উপর এসে পড়তে লাগল। হুসায়নের দশ বছর বয়স্ক ভ্রাতুষ্পুত্র কাসিম শরাহত হয়ে শহীদ হল। কিছুক্ষণের জন্য কেউ হুসায়নকে আক্রমণ করতে সাহস পেল না। হুসায়ন তৃষ্ণার্ত হয়ে নদীর ধার ঘেষে চললেন। শত্রুরা তাঁকে ঘিরে ফেলল। এবার নিষ্ঠুর শামীর নৃশংসভাবে তাঁকে আক্রমণ করল। তিনি তীর বিদ্ধ হয়ে ভূপতিত হলেন ও নিহত হলেন। তাঁর দলের লোকেরাও কেউ রক্ষা পেল না। হুসায়নের দু পুত্র, ছয় ভ্রাতা, হাসানের দু পুত্র এবং আরও অনেকে শাহাদাৎ বরণ করলেন। তাদের মস্তক দেহ থেকে বিচ্ছিন্ন করা হল এবং এরকম সত্তরটি কর্তিত মুণ্ড এবং স্ত্রী ও শিশু সন্তানগণকে কুফায় উবায়দুল্লাহ্‌র কাছে প্রেরণ করা হল। নবী করীমের দৌহিত্রের রক্তাক্ত শির যখন উবায়দুল্লাহর পদপ্রান্তে নিক্ষিপ্ত হল তখন জনসাধারণের মধ্যে ত্রাসের সঞ্চার হল। উবায়দুল্লাহ যখন আপন যষ্টির সাহায্যে হুসায়নের মস্তককে নাড়াচাড়া করে দেখছিল তখন একজন বৃদ্ধ আর্তনাদ করে উঠল, "ধীরে, ওহে ধীরে! এটি হযরতের দৌহিত্র , আল্লার কসম আমি মুহম্মদের পবিত্র মুখ দ্বারা এ ওষ্ঠদ্বয়ে চুম্বন করতে দেখেছি।" হুসায়নের ভগ্নী,

তাঁর শিশু পুত্র আলী আসগর ও দু কন্যাকে ইয়াজীদের নিকট প্রেরণ করা হল। এ শিশু সন্তান ও স্ত্রীলোকগণকে যথাযোগ্য সম্মানের সাথে মদীনায় প্রেরণ করা হল।

কারবালার তাৎপর্য

কারবালার ঘটনা ইসলামের ইতিহাসে এক শোচনীয় মর্মান্তিক ঘটনা। হুসায়ন ও তাঁর মুষ্টিমেয় অনুচরগণের প্রতি উমাইয়া সরকার যে নৃশংস ব্যবহার করেছিল তার সংবাদ দাবানলের মত মুসলিম জগতের সর্বত্র ছড়িয়ে পড়ল্। হজ্ব উপলক্ষে মক্কা ও মদীনায় সমাগত নরনারী নবীর পরিবারের বিধবা স্ত্রী ও এতিম শিশু সন্তানগণকে দেখে তাদের হৃদয়বিদারক কাহিনী মুসলিম জগতের নিভৃততম কোণ পর্যন্ত পৌঁছে দিল। সমগ্র মুসলিম জাহানের আন্তরিক সহানুভূতি ও অনুকম্পা তাদের উপর নিবদ্ধ হল এবং উমাইয়া শাসকদের প্রতি সকলের বিদ্বেষ ও রোষ প্রবল আক্রোশে ফেটে পড়ল। হুসায়ন ন্যায় ও সত্যের প্রতীক এবং উমাইয়া শাসক ইয়াজিদ অন্যায় ও অসত্যের প্রতীক বলে পরিগণিত হলেন। উমাইয়া শাসনের পতনের মূলেও এ শোচনীয় হত্যাকাণ্ড প্রচণ্ড শক্তি হিসেবে কাজ করেছিল। ধর্মপ্রাণ ও বিশ্বাসী মুসলমানগণ এ কারণে উমাইয়া শাসনকে কখনও মনে প্রাণে মেনে নিতে পারেননি। কারবালার শোচনীয় ঘটনা মুসলমানদের মনে এমন গভীর রেখাপাত করেছিল যে পরবর্তী যুগে মুসলমানদের চিন্তাধারায়, কাব্য কবিতায় ও শিল্প সাহিত্যে এর প্রতিফলন ঘটে। মুসলমানদের উপর কোন গুরুতর বিপদ আপতিত হলে একে কারবালার সাথে তুলনা করা হয়। বিশেষ করে শিয়া সম্প্রদায়ের মধ্যে এ উপলক্ষে পৃথিবীর সর্বত্র এক প্রবল শোকোচ্ছ্বাস বয়ে যায়। তারা বুক চাপড়িয়ে, মিছিল বের করে, মর্সিয়া গেয়ে এবং যুদ্ধাদি প্রদর্শন করে কারবালার মর্মান্তিক স্মৃতি পালন করে। কারবালার ঘটনার নামে ধর্মপ্রাণ মুসলমানদের চক্ষু অশ্রুসজল ও অন্তর শোকাকুল হয়ে ওঠে।

কারবালার যুদ্ধের পর রাজ্যের বিভিন্ন স্থানে ইয়াজীদের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ দেখা দেয়। তন্মধ্যে মদীনার বিদ্রোহ প্রধান। মদীনার অধিবাসিগণ ইয়াজীদের শাসনের বিরুদ্ধ বিদ্রোহ ঘোষণা করে এবং নগরীর এক হাজার উমাইয়া অধিবাসীকে কিছুকাল আবদ্ধ রেখে সদ্ব্যবহারের প্রতিশ্রুতিতে মুক্তি দেয়। এ সংবাদ পেয়ে ইয়াজিদ মুসলিম ইবন উকবা নামক একজন সেনাপতিকে এক বিরাট সেনাবাহিনীসহ মদীনাবাসীদের বিরুদ্ধে প্রেরণ করেন। মুসলিম তিনদিন পর্যন্ত মদীনায় অবাধ লুণ্ঠতরাজ ও হত্যাকাণ্ড চালালেন। এ যুদ্ধকে হাররার যুদ্ধ বলা হয় (আগস্ট, ৬৮৩ খ্রিঃ)। এভাবে মদীনার বিদ্রোহ কঠোর হাতে দমন করে সিরীয় বাহিনী মক্কার দিকে যাত্রা করল।

হাররার যুদ্ধ

মক্কায় আবদুল্লাহ ইবন জুবায়র সিরীয় সেনাবাহিনীকে বাধাদান করতে অগ্রসর হলেন। আবদুল্লাহ ধার্মিক প্রকৃতির লোক ছিলেন। মক্কার জনসাধারণ তাঁকে খলিফা বলে স্বীকার করে নিয়েছিল। তারা ইয়াজীদের সেনাবাহিনীর বিরুদ্ধে আবদুল্লাহকে সাহায্য করতে এগিয়ে আসল। কিন্তু পবিত্র নগরীর বিরুদ্ধে কোন মুসলমান সেনাবাহিনী যুদ্ধ করতে পারে তা জনসাধারণের ধারণার বহির্ভূত ছিল। তাই তারা অবাক বিস্ময়ে উমাইয়া সৈন্যবাহিনীর ধৃষ্টতামূলক আচরণ প্রত্যক্ষ করল। এদের প্রবল শক্তির বিরুদ্ধে আবদুল্লাহ ইবন জুবায়রের সহায়ক ও অনুচরগণ নিজদেরকে অসহায় বোধ করতে লাগল। দু মাস ধরে আক্রমণকারিগণ শহর অবরোধ করে রাখল। শত্রুরা কাবাঘরে আগুন ধরিয়ে দিল এবং পবিত্র হরাম শরীফ ভস্মীভূত হল। অবরোধের তৃতীয় মাসে দামিস্ক হতে ইয়াজীদের মৃত্যু সংবাদ এসে পৌঁছল এবং সঙ্গে সঙ্গে যুদ্ধ থেমে গেল। ইয়াজীদের মৃত্যুর পর সিরীয় বাহিনী এতই ভগ্নোৎসাহ হয়ে পড়ল যে তারা ইবন জুবায়রকে সিরিয়ায় গমন করে খিলাফতের ভার গ্রহণ করার জন্য আহ্বান জানাল। ইবন জুবায়র পবিত্র নগরী ত্যাগ করে সিরিয়ায় যেতে অনিচ্ছা প্রকাশ করলেন। তিনি মক্কায় থেকে কাবা শরীফের সংস্কার ও পুনঃনির্মাণের কাজে আত্মনিয়োগ করলেন।

মক্কা অবরোধ সেপ্টেম্বর ৬৮৩ খ্রিঃ অক্টোবর ৬৮৩ খ্রিঃ

ইয়াজীদ চল্লিশ বছর বয়সে সাড়ে তিন বছর রাজত্ব করার পর মৃত্যুমুখে পতিত হলেন। ঐতিহাসিক আল-ফখ্‌রী বলেন, "ইয়াজীদ সাড়ে তিন বছর রাজত্ব করেন। প্রথম বছর তিনি আলীর পুত্র হুসায়নকে হত্যা করেন; দ্বিতীয় বছর তিনি মদীনা আক্রমণ করেন এবং তিন দিন যাবৎ লুঠতরাজ চালান, তৃতীয় বছর তিনি কাবা আক্রমণ করেন।" ইয়াজীদ কবিতা রচনা করতেন। তিনি মদ্যপ এবং বিলাস প্রিয় ছিলেন। মক্কা ও মদীনা আক্রমণ এবং নবীর বংশধরদের প্রতি নিষ্ঠুর আচরণের জন্য মুসলমানগণ তাঁর রাজত্বকালকে ঘৃণার সাথে স্মরণ করে থাকে।

১৫

উমাইয়া রাজ্যের সংগঠক আবদুল মালিক

(৬৮৫—৭০৫ খ্রিঃ)

ইয়াজীদের অকাল মৃত্যুতে মু'আবিয়ার বংশধরগণ দুর্বল হয়ে পড়ল। তারা বেশিদিন খিলাফতের পদে টিকে থাকতে পারল না। ইয়াজীদের পুত্র দ্বিতীয় মু'আবিয়া মাত্র তিন মাস রাজত্ব করেছিলেন। তাঁর মৃত্যুর পর মু'আবিয়ার বংশের লোকেরা ইয়াজীদের আর এক পুত্র খালিদকে খলিফা নির্বাচিত করতে চাইল। কিন্তু উমাইয়া দরবারের প্রধান ব্যক্তিগণ মারওয়ানকে খলিফা করতে চাইলেন। অবশেষে স্থির হল যে মারওয়ান খলিফা হবেন এবং তাঁর মৃত্যুর পর খালিদকে খিলাফত দান করা হবে।

মু'আবিয়ার বংশ

উমাইয়া বংশের দুর্বলতার সুযোগে ইবন জুবায়র মুসলিম রাজ্যে বিশেষ প্রতিপত্তিশালী হয়ে উঠেন। তাঁর সাধুতা ও ধর্ম-পরায়ণতার জন্য কেবল মক্কা ও মদীনার জনসাধারণই যে তাঁকে খলিফা বলে মেনে নিয়েছিল তা নয়। মিসর ও সিরিয়ার কোন কোন অঞ্চলেও তাঁর আধিপত্য স্থাপিত হয়েছিল। ইরাকের কুফা ও বসরা নগরী ও তাঁর আনুগত্য স্বীকার করেছিল। এমন কি উমাইয়াদের রাজধানী দামিস্ক নগরেও জাহ্হাক নামক একজন সেনাপতি ইবন জুবায়রের পক্ষ অবলম্বন করল।

ইবন জুবায়র

খলিফা হয়েই মারওয়ানকে জাহহাকের সাথে যুদ্ধ করতে হয়েছিল। মারজ-ই-রাহিত নামক স্থানে উভয়পক্ষে যুদ্ধ হল। যুদ্ধে মারওয়ান জাহ্হাককে পরাজিত করে সমগ্র সিরিয়ায় উমাইয়াদের আধিপত্য পুনঃ প্রতিষ্ঠিত করেন (৬৮৪ খ্রিঃ)। কিন্তু এ কৃতকার্যতার পরে তিনি শোচনীয়ভাবে মৃত্যুবরণ করেন। তিনি খালিদের খিলাফতের দাবি অগ্রাহ্য করে নিজ পুত্র আবদুল মালিককে খলিফা মনোনীত করেন। ইতিমধ্যে তিনি খালিদের মাতা অর্থাৎ ইয়াজিদের বিধবা স্ত্রীকে বিবাহ করেছিলেন। কিন্তু নিজ পুত্রের দাবি প্রত্যাখ্যাত হওয়ায় উক্ত মহিলা মারওয়ানকে হত্যা করেন (৬৮৫ খ্রিঃ)। তাঁর মৃত্যুর পর তাঁর পুত্র আবদুল মালিক খিলাফতের পদে তাঁর উত্তরাধিকারী হলেন।

মারওয়ান নভেম্বর ৬৮৩ খ্রিঃ- মে, ৬৮৫ খ্রিঃ

খলিফা হয়ে আবদুল মালিককে বহু বিদ্রোহী ও প্রতিদ্বন্দ্বীর মোকাবিলা করতে হয়েছিল। আবদুল্লাহ ইবন জুবায়র মক্কায় অপ্রতিদ্বন্দ্বী ছিলেন। উমাইয়া বংশের আমর ইবন সা'দ খিলাফতের পদে আবদুল মালিকের প্রতিদ্বন্দ্বী ছিলেন। মুখতার নামক একজন দুঃসাহসিক ব্যক্তি হুসায়নের হত্যার প্রতিশোধ গ্রহণে বদ্ধ পরিকর

হয়ে কুফায় বিদ্রোহী হলেন। মুদার বংশীয় (উত্তরাঞ্চলের) আরব ও হিম্‌য়ার বংশীয় (দক্ষিণাঞ্চলের) আরবদের মধ্যে খুরাসানে কলহ চলছিল। খারিজিগণও বিদ্রোহ ঘোষণা করল। আবদুল মালিক এ সব বিপদাপদ কাটিয়ে বিদ্রোহাদি কঠোর হস্তে দমন করে সমগ্র মুসলিম সাম্রাজ্যকে উমাইয়াদের কর্তৃত্বাধীনে আনয়ন করেন। তিনি এভাবে উমাইয়া সাম্রাজ্যকে পুনরুজ্জীবিত করেন।

কুফার খারিজিগণ হুসায়নের হত্যার প্রতিশোধ গ্রহণের জন্য কুফায় সমবেত হল। তারা অনুশোচনাকারী (বা তাওয়াবুন) নামে অভিহিত হত। তারা

অনুশোচনাকারিগণ

কারবালায় হুসায়নের সমাধিতে উপস্থিত হয়ে একরাত্রিতে বিলাপ করে কাঁদতে কাঁদতে ফাতিমা ও আলীর পুত্রকে বিপদের সময় একাকী ফেলে যাওয়ার জন্য চরম অনুশোচনা প্রকাশ করল। তারপর তারা সিরিয়াবাসিগণকে আক্রমণ করল কিন্তু খলিফার সৈন্যগণ তাদেরকে যুদ্ধে পরাজিত করে ছত্রভঙ্গ করে দিল। এ সময় মুখতার রাষ্ট্রদ্রোহিতার অপরাধে

মুখতার

কুফার কারাগারে আবদ্ধ ছিলেন। তিনি অনুশোচনাকারীদেরকে উৎসাহ প্রদান করে কবিতা রচনা করলেন এবং কিছুকাল পর কারামুক্ত হয়ে তিনি মুহম্মদ আল-হানাফিয়া* নামক হযরত আলীর এক পুত্রের পক্ষ অবলম্বন করে কারবালার হত্যাকাণ্ডের প্রতিশোধ গ্রহণের জন্য উমাইয়াদের বিরুদ্ধে অস্ত্র ধারণ করলেন। তিনি কিছুদিনের মধ্যে কুফার প্রতিপত্তিশালী লোকজনকে বশীভূত করে কুফায় আধিপত্য স্থাপন করেন। সম্পূর্ণ ইরাক, আরব এবং পারস্যের কোন কোন অংশে মুখতার স্বীয় প্রাধান্য প্রতিষ্ঠিত করেন। কুফা হতে মুখতার তাঁর সেনাপতি ইবনুল আশতারকে উমাইয়া সেনাপতি উবায়দুল্লার বিরুদ্ধে প্রেরণ করলেন। মুখতারের সেনাবাহিনী কুফা ত্যাগ করে যাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে কুফায় এক তুমুল গৃহযুদ্ধ আরম্ভ হল। এ যুদ্ধে হুসায়নের সমর্থকগণ হুসায়নের হত্যাকারিগণকে হত্যা করল। এদের মধ্যে শামীর, ওমরসহ প্রায় ২৮৪ জন লোক প্রাণ হারাল। অপরদিকে ইবনুল আশতার জাব নদীর তীরে

জাব নদীর যুদ্ধ
৬৮৬ খ্রিঃ

সংঘটিত এক যুদ্ধে কারবালার প্রধান নায়ক উবায়দুল্লাকে পরাজিত ও নিহত করলেন। এভাবে মুখতার কারবালার শোচনীয় হত্যাকাণ্ডের উপযুক্ত প্রতিশোধ গ্রহণ করলেন।

মুখতারের অভূতপূর্ব কৃতকার্যতা ও সাফল্যে স্তম্ভিত হয়ে ইবন জুবায়র তাঁর প্রতি ঈর্ষাপরায়ণ হয়ে পড়েন। মুখতার ইবন জুবায়রের আনুগত্য স্বীকার করে

---

* ফাতিমার মৃত্যুর পর হযরত আলী হানিফা বংশের একজন রমণীকে বিবাহ করেছিলেন। ইবনুল হানাফিয়া এ মহিলার ছেলে।

মুখতার ও ইবন জুবায়েরের কলহ

নিলেও তাঁর আন্তরিকতা সম্বন্ধে ইবন জুবায়রের সন্দেহ ছিল। ইবন জুবায়র মুখতারের আন্তরিকতা পরীক্ষা করবার উদ্দেশ্যে তাঁকে মক্কায় ডেকে পাঠালেন। এতে মুখতার বিদ্রোহী হলেন। আবদুল মালিকের পরম সৌভাগ্য যে তাঁর শত্রুরা পরস্পর কলহে লিপ্ত হয়ে একে অন্যের শক্তি ক্ষয় করতে আরম্ভ করল। ইবন জুবায়রের ভ্রাতা মুস'আব বসরার শাসনকর্তা ছিলেন। ইবন জুবায়র এখন মুস'আবকে মুখতারের বিরুদ্ধে কুফায় প্রেরণ করলেন। মুখতার তাঁর আট হাজার সমর্থকসহ দুর্গাভ্যন্তরে আশ্রয় গ্রহণ করেন। কয়েক মাস যাবৎ মুখতার ও তাঁর অনুচরগণ শত্রুর আক্রমণ প্রতিহত করল কিন্তু অবশেষে ক্ষুধা ও তৃষ্ণায় অস্থির হয়ে মুখতার নিজ সৈন্যদলকে দুর্গের বাইরে এসে সম্মুখ যুদ্ধে প্রবৃত্ত হবার আদেশ দান করলেন। কিন্তু অল্পসংখ্যক লোকই তাঁর সাথে যুদ্ধে অংশ গ্রহণ করে মৃত্যুবরণ করল। মুখতারও মৃত্যুমুখে পতিত হলেন। তাঁর সমর্থকগণ মুস'আবের নিকট আত্ম সমর্পণ করল। কথিত আছে মুখতারের সৈন্যবাহিনীতে মাত্র ৭০০ জন লোক ছিল আরব আর বাকি

মাওয়ালি বিদ্রোহ

সবাই ছিল অনারব। মুস্‌আবের আদেশে মুখতারের সম্পূর্ণ সেনাবহিনীকে হত্যা করা হয়। মুখতারের অভ্যুত্থান এবং অনারব মুসলমানদের নেতা হিসেবে উমাইয়াদের বিরুদ্ধে তাঁর যুদ্ধ-বিগ্রহ ইসলামের ইতিহাসে অনারবদের (মাওয়ালী) অসন্তোষের প্রথম স্তর সূচিত করে। এ আরব অনারব দ্বন্দ্ব পরবর্তীকালে চরম আকার ধারণ করে। মুসলিম রাজ্যের পূর্বাঞ্চলে খারিজিগণ বিভীষিকার রাজত্ব সৃষ্টি করেছিল। তারা নিরপরাধ জনসাধারণের উপর

খারিজী বিদ্রোহ

হামলা চালিয়ে তাদের জীবন দুর্বিষহ করে তুলল। রাই ও ইস্পাহান অঞ্চলে তাদের আধিপত্য স্থাপিত হল এবং আহওয়াজ ও কিরমানে তাদের দৌরাত্ম্য অপ্রতিহত রইল। মুস'আব তাঁর সেনাপতি মুহাল্লাবের সাহায্যে এ সব অঞ্চলে শান্তি প্রতিষ্ঠা করেন। ৬৮ হিজরীতে (৬৮৮ খ্রিঃ) মক্কায় সমাগত হজ্বযাত্রীদের মধ্যে যে বিভিন্ন দলের লোক ছিল তা হতে তদানীন্তন মুসলিম জগতের বিভেদ ও বিশৃঙ্খলা অনুমান করা যায়। ঐ বছর চারজন রাষ্ট্রপ্রধানের পক্ষ হতে চারটি পতাকা আরাফাত ময়দানে প্রদর্শিত হয়। একটি আবদুল্লাহ্ ইবন জুবায়রের, একটি আবদুল মালিকের, একটি মুহম্মদ ইবনুল হানাফিয়ার ও অপরটি খারিজীদের। পতাকার চতুর্দিকে বেষ্টন করে রয়েছিল উক্ত রাষ্ট্রপ্রধানদের সমর্থকদল। হজ্বের পবিত্র মওসুমে এ যুযুধান দলগুলি পবিত্র মক্কা নগরীতে পরস্পর যুদ্ধ-বিগ্রহ হতে বিরত ছিল।

৬৮৯ খ্রিস্টাব্দে যখন আবদুল মালিক রাজধানী হতে দূরে বিদ্রোহ দমনে ব্যাপৃত ছিলেন তখন আমর ইবন সাঈদ নামক খলিফার এক পিতৃব্য পুত্র দামিস্কে নিজেকে খলিফা বলে ঘোষণা করলেন। আবদুল মালিক রাজধানীতে প্রত্যাবর্তন

আমর ইবন সাঈদের বিদ্রোহ ৬৮৯ খ্রিঃ

করে আমরের সাথে যুদ্ধ করলেন এবং তাঁকে ক্ষমা করে দিলেন। এর কিছুদিন পর আবদুল মালিক আমরকে প্রাসাদে ডেকে এনে নৃশংসভাবে হত্যা করেন।

এক্ষণে আবদুল মালিক তাঁর দু শত্রু মুস'আব ও মুসআবের ভ্রাতা আবদুল্লাহ ইবন জুবায়রের বিরুদ্ধে অস্ত্রধারণ করতে মনস্থ করলেন। প্রথমে আবদুল মালিক মুস'আবের বিরুদ্ধে সৈন্য প্রেরণ করেন। মুস'আব তাঁর ভ্রাতা আবদুল্লার পক্ষে

মুস্আবের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ৬৯১ খ্রিঃ

বসরা ও কুফায় শাসনকার্য পরিচালনা করতেন। উভয়পক্ষে যুদ্ধ হল। খলিফা আবদুল মালিক টাকা-পয়সার সাহায্যে মুস'আবের দলের বহুলোককে বশীভূত করে ফেললেন। মুস'আব নিরুৎসাহ হয়ে পড়লেন। অবশেষে তাঁর পক্ষীয় একজন কুফাবাসী তাঁকে হত্যা করে (৬৯১ খ্রিঃ)। মুসআবের মৃত্যুর পর কুফাবাসীরা আবদুল মালিকের বশ্যতা স্বীকার করল। এ সময় মুসআবের বিখ্যাত সেনাপতি মুহাল্লাবও আবদুল মালিকের বশ্যতা স্বীকার করেন। এভাবে কুফা, বসরা ও পূর্বাঞ্চলের অনেক স্থান আবদুল মালিকের অধীনে আসে।

মুস'আবের মৃত্যুর পর আবদুল মালিক আবদুল্লাহ ইবন জুবায়রের বিরুদ্ধে সৈন্য প্রেরণ করতে মনস্থ করলেন। ইয়াজীদের ভয়াবহ ধ্বংসযজ্ঞের পর ইবন

ইবন জুবায়রের বিরুদ্ধে যুদ্ধ

জুবায়র মক্কায় কাবার জীর্ণ সংস্কারে মনোনিবেশ করেন। তাঁর ধার্মিকতা, সাধুতা ও কাবা শরীফের তত্ত্বাবধানে তাঁর ঐকান্তিক আগ্রহ তাঁকে জনপ্রিয় করে তুলেছিল। আবদুল মালিক ইবন জুবায়রের বিরুদ্ধে হাজ্জাজ ইবন ইউসুফ নামক একজন নির্দয় ও অসমসাহসী সেনাপতিকে পাঠালেন। হাজ্জাজ প্রথম জীবনে তায়িফে স্কুল শিক্ষক ছিলেন। পরে আবদুল মালিকের অধীনে সৈন্যাধ্যক্ষের পদ গ্রহণ করে পতনোন্মুখ উমাইয়া রাজ্যকে বিপদের হাত হতে রক্ষা করবার জন্য মসী ছেড়ে অসি ধারণ করলেন। হাজ্জাজ মক্কার কাছে উপস্থিত হয়ে ইবন জুবায়রের কাছে এ শর্তে এক ক্ষমাপত্র প্রেরণ করলেন যে ইবন জুবায়র আত্মসমর্পণ করলে তাঁর বিরুদ্ধে কোন শাস্তিমূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে না। কিন্তু ইবন জুবায়র এ প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করলেন। হাজ্জাজ আবদুল মালিকের অনুমতি নিয়ে পবিত্র নগরী অবরোধ করলেন। চতুর্দিক হতে ক্ষেপণাস্ত্র নিক্ষিপ্ত হতে লাগল। বজ্র নিনাদে আকাশ বাতাস প্রকম্পিত করে পবিত্র নগরীর দালান কোঠা ধ্বসে পড়ল। সাত মাস ধরে অবরোধ চলতে থাকে। ইবন যুবায়র নিতান্ত হতোদ্যম হয়ে তাঁর শতবর্ষ বয়স্কা বৃদ্ধা মাতা আসমার (হযরত আবু বকরের কন্যা) নিকট পরামর্শ চাইলেন। বৃদ্ধা মাতা পুত্রকে উপদেশ দিলেন যে যদি নিজের পন্থা ন্যায়সঙ্গত বলে মনে হয় তবে শেষ পর্যন্ত যুদ্ধ করে যাওয়াই কর্তব্য। তদনুসারে ইবন জুবায়র বীর বিক্রমে যুদ্ধ করে মৃত্যু বরণ করেন। এভাবে ধার্মিক প্রবর আবদুল্লাহর জীবনাবসান ঘটে (৬৯২ খ্রিঃ)। তিনি তের বছর ধরে উমাইয়া শাসকদের বিরুদ্ধে প্রতিদ্বন্দ্বী খলিফা হিসেবে মক্কায় প্রতিষ্ঠা লাভ করেছিলেন। ঐ বছর হতে আবদুল মালিক মুসলিম জগতের অবিসংবাদিত খলিফা বলে স্বীকৃত হলেন।

আবদুল মালিক হাজ্জাজকে প্রথমে আরবদেশের শাসনকর্তার পদ দান করেন। মক্কায় শান্তি ও শৃঙ্খলা স্থাপনের পর হাজ্জাজ মদীনায় গমন করেন এবং মদীনাবাসিগণকে কঠোর ভাষায় নিন্দাবাদ করেন। পর বছর (৬৯৩ খ্রিঃ) পারস্য সীমান্তে খারিজীরা বিদ্রোহী হলে খলিফা সেনাপতি মুহাল্লাবকে তাদের বিরুদ্ধে পাঠালেন। কুফা ও বসরার সৈন্য বাহিনীকে তাঁর সঙ্গে যেতে আদেশ করা হল। কিন্তু ঐ সময় ইরাকের শাসনকর্তার মৃত্যু হলে কুফা ও বসরার সৈন্যগণ মুহাল্লাবের পক্ষ ত্যাগ করে গৃহে প্রত্যাবর্তন করল। আবদুল মালিক ইরাকবাসীদের এধরনের অন্যায় আচরণের বিষয় চিন্তা করে তখন হাজ্জাজকে ইরাকের শাসনকর্তা নিযুক্ত করলেন। হাজ্জাজ আরবদেশ হতে মাত্র বারজন সঙ্গীসহ রাত্রিতে দ্রুত মরুভূমি অতিক্রম করে অতর্কিতে প্রত্যুষে কুফায় উপস্থিত হলেন। তাঁর শিরস্ত্রাণে মুখমণ্ডল ঢাকা পড়েছিল। একজন প্রাচীন আরব কবির কবিতা আবৃত্তি করতে করতে তিনি মিম্বরে দাঁড়িয়ে মুখমণ্ডল হতে আবরণ উন্মোচন করলেন। তখন লোকেরা তাঁকে চিনতে পারল। তারপর কুফাবাসিগণকে উদ্দেশ্য করে বললেনঃ "হে কুফাবাসিগণ, আমি নিশ্চিত যে বহু মস্তক আমি কাটবার উপযুক্ত দেখছি এবং নিশ্চয়ই আমিই তা করব। আমার মনে হয় আমি শিরস্ত্রাণ ও শ্মশ্রুর মধ্যবর্তী স্থানে রক্ত দেখছি।" অতঃপর তিনি কুফাবাসিগণকে তিনদিনের মধ্যে মুহাল্লাবের সেনাবাহিনীতে যোগদান করতে আদেশ করলেন। অন্যথায় তাদেরকে কঠোর শাস্তির ভয় প্রদর্শন করলেন। হাজ্জাজ রাষ্ট্রদ্রোহিতার অপরাধে অগণিত লোককে হত্যা করেন এবং উমাইয়া খলিফাদের জন্য রাজ্যে শান্তি ও শৃঙ্খলা আনয়ন করেন। কথিত আছে যে হযরত মুহম্মদের (স) বিখ্যাত সাহাবা আনাস ইবন মালিকের পুত্র সেনাবাহিনীতে বিদ্রোহী হলে হাজ্জাজ তাকে মৃত্যুদণ্ড দান করেন। হাজ্জাজ পিতা আনাসের ভূ-সম্পত্তিও বাজেয়াপ্ত করেন এবং তাঁকে অকথ্য ভাষায় নিন্দাবাদ করেন। অবশ্য পরে খলিফার আদেশে হাজ্জাজকে আনাসের নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করতে হয়। হাজ্জাজের কঠোর শাসনে সমস্যাসঙ্কুল নগরী কুফা ও বসরায় বিদ্রোহ প্রশমিত হয় ও আইন শৃঙ্খলা পুনরায় স্থাপিত হয়। হাজ্জাজ ৭০২ খ্রিষ্টাব্দে কুফা ও বসরার মাঝামাঝি ওয়াসিত নামক একটি শহর পত্তন করেন এবং সেখান হতে উভয় শহরের প্রতি সজাগ দৃষ্টি রাখেন।

হাজ্জাজ বিন ইউসুফ ইরাকের শাসনকর্তা নিযুক্ত ৬৯৪ খ্রিঃ

ওয়াসিত

খারিজী বিদ্রোহ

হাজ্জাজ ইবন ইউসুফকে খারিজিদের সঙ্গেও যুদ্ধ করতে হয়। খারিজিগণ জনসাধারণের ভোটে নির্বাচিত খলিফা ব্যতীত অন্য কারো কাছে বশ্যতা স্বীকার করবে না। তারা বিভিন্ন দলে বিভক্ত ছিল। একদলের নেতা শাবীব কুফার নগর-প্রাচীর ভেঙ্গে নগরে প্রবেশ লাভ করে এবং এক মসজিদে সমবেত বহু নামাজীকে হত্যা করে। হাজ্জাজ খলিফার কাছ থেকে নতুন সৈন্য এনে বহু কষ্টে এদেরকে দমন করেন। তাঁর সেনাপতি মুহাল্লাব আজরাকী গোত্রের খারিজিদেরকে কঠোর হস্তে দমন করেন। এরা বিশ বছর ধরে ইরাক ও পারস্যে অশান্তি ও বিশৃঙ্খলার সৃষ্টি করে আসছিল।

পূর্বদিকে রাজ্য বিস্তার

পূর্বাঞ্চলের শাসনকর্তা হাজ্জাজ শুধু যে অরাজকতা দমন করে খ্যাতি অর্জন করেছিলেন তা নয়। তাঁরই পরিচালনায় পূর্বদিকে রাজ্য বিস্তার আরম্ভ হয়। সিজিস্তানের শাসনকর্তা আবদুর রহমান ইবন আশ'আসকে কাবুলের রাজার (জানবিল মতান্তরে রাতবিল) বিরুদ্ধে প্রেরণ করা

কাবুল

হয়। ইবনুল আশ্'আস্ তাঁর "ময়ূর বাহিনী" (শ্রেষ্ঠ যোদ্ধা সমন্বিত বলে এরূপ অভিহিত) সহ রাজা জানবিলকে আক্রমণ করে পরাজিত করেন। কিন্তু দুর্ভাগ্যক্রমে হাজ্জাজের ব্যবহারে অসন্তুষ্ট হয়ে ইবনুল আশআস বিদ্রোহী হন। হাজ্জাজ তাঁকে সীমান্ত অঞ্চলে যুদ্ধ চালিয়ে যেতে বললেন কিন্তু সেনাপতি ধীরে সুস্থে বুঝে শুজে অগ্রসর হতে চাইলেন। ইবনুল আশআস ছিলেন কিন্দা রাজবংশের লোক; সেইজন্য তাঁর অহমিকা ছিল বেশি। এছাড়া ইরাকের লোকদের নেতা হিসেবে সিরিয়াবাসীদের বিরুদ্ধে তাঁর বহু রকম অভিযোগ ছিল। ইরাকীদের ভাতা ও বৃত্তি সিরীয়গণের মত ছিল না। ইবনুল আশ্'আস্ হাজ্জাজের বিরুদ্ধে বিদ্রোহী হয়ে বার বার তাঁকে যুদ্ধে পরাস্ত করে ইরাকে নিজের আধিপত্য স্থাপনে প্রয়াসী হন। এমন কি খলিফা ও তাঁর সাথে আপোষ-রফা করতে ইচ্ছুক ছিলেন। কিন্তু আশ্আসের অনুচরগণ খলিফার প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করে যুদ্ধ চালিয়ে যেতে মনস্থ করল। অবশেষে আশআস পরাজিত হয়ে প্রথমে কিরমানে গমন করেন ও পরে কাবুলে জানবিলের শরণাপন্ন হন। সেখানে তাঁর মৃত্যু হয়।

মুহাল্লাবের পুত্র ইয়াজীদ পিতার মৃত্যুর পর খুরাসানের শাসনকর্তা নিযুক্ত হয়েছিলেন কিন্তু হাজ্জাজ ইবন ইউসুফ গোত্রীয় দলা-দলির ফলে ইয়াজীদকে পদচ্যুত করে কুতায়বা ইবন মুসলিমকে খুরাসানের শাসনকর্তা নিযুক্ত করেন।

কুতায়বা ইবন মুসলিম

কুতায়বা বীর যোদ্ধা ছিলেন এবং খুরাসানে তাঁর অধীনে ৪৭,০০০ আরব সৈন্য ও ৭,০০০ অনারব সৈন্য ছিল। এদের সাহায্যে কুতায়বা অচিরে মধ্য এশিয়ায় রাজ্য বিস্তারে সক্ষম হন।

আবদুল মালিকের সময় এশিয়া মাইনর ও আফ্রিকার মুসলমানদের সাথে গ্রীকদের যুদ্ধ হয়। এ যুদ্ধের ফলে আর্মিনিয়ার লোকেরা বিশেষভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয়। আবদুল মালিকের স্বতন্ত্র ও স্বাধীন আরব মুদ্রা প্রবর্তনের ফলে

গ্রীকদের সাথে যুদ্ধ

গ্রীকরা আবদুল মালিকের মুদ্রা গ্রহণ করতে অস্বীকার করায় উভয় পক্ষে যুদ্ধ বেধে ওঠে। কিন্তু এ যুদ্ধ অমীমাংসিত থেকে যায়। আফ্রিকায় সেনাপতি উকবার উল্লেখযোগ্য বিজয়ের পর মুসলমানদের ভাগ্য বিপর্যয় ঘটে। ৬৮৩ খ্রিস্টাব্দে আফ্রিকার বার্বারগণ বিদ্রোহী

আফ্রিকা

হয়ে গ্রীকদের সাথে মিলিত হয় এবং উকবাকে তাঁর সমগ্র সৈন্যবাহিনীসহ হত্যা করে। বার্বারগণ মুসলিম রাজধানী কায়রোয়ান দখল করে। ৬৮৮ খ্রিস্টাব্দে আবদুল মালিক উত্তর আফ্রিকা পুনরাধিকার করার চেষ্টা করেন। কিন্তু এ প্রচেষ্টা সম্পূর্ণ সফলকাম হয়নি। ৬৯৩ খ্রিস্টাব্দে আবদুল মালিক এক বিরাট সৈন্যবাহিনীসহ সেনাপতি হাসান ইবন নুমানকে কায়রোয়ানে প্রেরণ করেন। হাসান কারোয়ান থেকে কার্থেজে গমন করেন এবং সমবেত বার্বার ও গ্রীক সেনাবাহিনীকে পরাজিত করে পুনরায়

কায়রোয়ানে প্রত্যাবর্তন করেন। কিন্তু ঐ সময় বার্বারদের মধ্যে একজন পুরোহিতনীর (কাহিনা) উদ্ভব হয়। সে বার্বারগণকে উত্তেজিত করে হাসানকে শোচনীয়ভাবে পরাজিত করে। হাসান বার্কায় পশ্চাদপসরণ করে পাঁচ বছর পর্যন্ত নিষ্ক্রিয়ভাবে বসে কাটান। অতঃপর খলিফার কাছ থেকে নতুন সৈন্য পেয়ে তিনি কাহিনাকে পরাজিত ও নিহত করেন। কায়রোয়ান পুনরায় অধিকৃত হয়। বার্বারদের মধ্যে ইসলাম দ্রুত প্রসার লাভ করতে থাকে।

মারওয়ানের অছিয়ত অনুসারে আবদুল মালিকের ভ্রাতা আবদুল আজিজেরই পরবর্তী খলিফা হওয়ার কথা। কিন্তু আবদুল মালিক ভ্রাতার দাবিকে অগ্রাহ্য করে নিজপুত্র ওয়ালীদকে খলিফা মনোনীত করে যেতে ইচ্ছা করলেন। এ ব্যাপারে হাজ্জাজ ইবন ইউসুফ ও আবদুল মালিককে সমর্থন করেন কিন্তু আবদুল আজিজ কিছুতেই নিজের দাবি পরিত্যাগ করতে রাজি হলেন না। কিন্তু পর বছর আবদুল আজিজের মৃত্যু হলে সাম্রাজ্যের সর্বত্র ওয়ালীদের প্রতি খিলাফতের উত্তরাধিকারী হিসেবে আনুগত্য প্রকাশ করা হয়।

ওয়ালীদ
উত্তরাধিকারী
মনোনীত

আবদুল মালিক একুশ বছর রাজত্ব করার পর ষাট বছর বয়সে মৃত্যুমুখে পতিত হলেন (৮ সেপ্টেম্বর ৭০৫ খ্রিঃ)। রাজত্বের প্রথম সাত বছর ইবন জুবায়র মক্কায় তাঁর সাথে খিলাফতে প্রতিদ্বন্দ্বী ছিলেন। আবদুল মালিক মৃত্যুশয্যা থেকে পুত্রগণকে উপদেশ দিয়ে যান যে তাঁরা যেন হাজ্জাজের প্রতি সদয় ব্যবহার করেন কারণ হাজ্জাজই মুসলিম জগতের সর্বত্র মিম্বরসমূহ থেকে উমাইয়া খলিফার নাম উচ্চারিত হতে সাহায্য করেন এবং তাঁদের শত্রুগণকে দমন করেন।

আবদুল
মালিকের
মৃত্যু. ৭০৫ খ্রিঃ

উমাইয়া সাম্রাজ্যের ভিত্তি দৃঢ়করণ, রাজ্যে শান্তি ও শৃঙ্খলা স্থাপন ও বহির্শত্রুর আক্রমণ হতে রাষ্ট্রকে রক্ষা করা ব্যতীত আবদুল মালিক তাঁর বিবিধ শাসন সংস্কার এবং সংস্কৃতি সেবার জন্য ইসলামের ইতিহাসে বিখ্যাত। শাসন সংস্কারের মধ্যে সরকারি ভাষা হিসেবে আরবির প্রবর্তন বিশেষ উল্লেখযোগ্য। আরবগণ প্রথমে তাদের মরুভূমির বাসস্থান হতে বাইরে এসে হিসাব রক্ষা ও রাজস্ব আদায়ের কাজ কিছুই বুঝতে পারত না। তাই তার সিরিয়ায় গ্রীক ভাষাভাষী কর্মচারী এবং ইরাক ও পারস্যে পারস্য-ভাষাভিজ্ঞ কর্মচারিগণকে নিজ নিজ পদে বহাল রেখে তাদের সাহায্যে সরকারি কাজকর্ম চালাত। আবদুল মালিকের সময় এ অবস্থার পরিবর্তন ঘটে এবং আরবগণ রাজস্ব আদায় ও হিসাব রক্ষার কাজে অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করে, ফলে আবদুল মালিক এ উভয় ভাষার পরিবর্তে আরবি ভাষা প্রবর্তনের আদেশ দান করেন। এর ফলে তখন থেকে স্থানীয় ভাষার পরিবর্তে আরবিই সরকারি কাজকর্মের ভাষা বলে গৃহীত হয়। এ ব্যবস্থা আবদুল মালিকের সময় আরম্ভ হয়ে তাঁর পুত্র ওয়ালীদের সময়ে পরিপূর্ণতা লাভ করে। এ ব্যবস্থার ফলে যে সব অনারব আরবি ভাষা জানত না তারা স্বভাবতই চাকরি হারাল কিন্তু অনেক অনারব আবার আরবি ভাষা আয়ত্ত করে চাকরিতে বহাল

শাসন সংস্কার

আরবি ভাষা
প্রবর্তন

হারাল কিন্তু অনেক অনারব আবার আরাব ভাষা আয়ত্ত করে চাকরিতে বহাল থেকে যায়। এ ব্যবস্থার ফলে রাজ্যে ভাষাগত ঐক্য স্থাপিত হয় এবং আরবি ভাষা আরব-অনারব সবার কৃষ্টি ও সংস্কৃতির ভাষায় পরিগণিত হয়।

ইসলাম পূর্ব যুগে হিজাযে রোমান ও পারসিক মুদ্রা প্রচলিত ছিল। পুরাতন হিময়ার যুগের পেচক চিহ্নিত কিছু মুদ্রাও দেখা যেত। খুলাফা-ই-রাশিদীনের

আরবি মুদ্রা প্রবর্তন

যুগে এবং উমাইয়া যুগের প্রথমদিকে বিদেশী মুদ্রার উপর কিছু মুসলমানী লেখা ও নামধাম অঙ্কিত করে সেই গুলিকেই সরকারি মুদ্রা বলে চালান হত। আবদুল মালিকের পূর্বে সামান্য সংখ্যক স্বর্ণ ও রৌপ্যমুদ্রা প্রবর্তিত হয়েছিল কিন্তু তাও বাইজান্টাইন বা পারসিক মুদ্রার অনুকরণে তৈরি হয়েছিল। আবদুল মালিক সর্বপ্রথম ৬৯৫ খ্রিস্টাব্দে দামিস্কের টাকশালে স্বর্ণের দীনার ও রৌপ্যের দিরহাম প্রস্তুত করান এবং এগুলিতে আরবি লেখা অঙ্কিত করান। পরবর্তী বছর হাজ্জাজ কুফায় রৌপ্যমুদ্রা অঙ্কিত করেন। এ সব মুদ্রায় মুসলিম কলেমা ও কুরআনের বিভিন্ন আয়াত লিখিত হত।

আবদুল মালিক মুসলিম রাজ্যে নিয়মিত ডাক ব্যবস্থা চালু করেন। এ ব্যবস্থায় তিনি পর্যায়ক্রমে দ্রুতগামী অশ্বের ব্যবহার করেন। বিশেষত সরকারি

ডাক ব্যবস্থা

প্রয়োজনে সংবাদ ও জিনিসপত্র আদান-প্রদানের জন্য ডাক বিভাগ চালু করা হয়। সংবাদ আদান-প্রদান ছাড়াও ডাক বিভাগের কর্মচারিগণ খলিফাকে নিজ নিজ এলাকার জরুরি তথ্যাদিও সরবরাহ করত।

আবদুল মালিকের শাসনামলে এক সুদূর প্রসারী অর্থনৈতিক সংস্কার প্রবর্তন করা হয়। মুসলমান আইন অনুসারে কোন মুসলমানকেই জাকাত ছাড়া অন্য

অর্থনৈতিক সংস্কার

কোন প্রকার রাজস্ব দিতে হত না। এ আইনের সুবিধা ভোগ করার উদ্দেশ্যে ইরাকে ও খুরাসানে বহু অনারব ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করে। তারা তাদের গ্রামের বাস্তুভূমি ও জোতজমা ত্যাগ করে শহরে ভিড় জমতে আরম্ভ করল এবং মুসলিম সেনাবাহিনীতে যোগদান করে সৈনিকদের জন্য বরাদ্দকৃত ভাতা দাবি করল। এর ফলে রাষ্ট্রীয় তহবিল শূন্য হবার উপক্রম হল। কারণ মুসলমান হওয়ার পর তারা ভূমি-রাজস্বও দিতে চাইল না বরং সেনাবাহিনীতে যোগদানের ফলে তাদেরকে রাষ্ট্রীয় তহবিল হতে ভাতা দিতে হত। আবদুল মালিক তাঁর সুযোগ্য সহকারী হাজ্জাজের সাহায্যে এ সব লোককে গ্রামে নিজ নিজ জমিতে ফিরে যেতে বাধ্য করলেন এবং তারা যে পরিমাণ রাজস্ব মুসলমান হবার আগে দিত তা-ই প্রদান করতে তাদেরকে বাধ্য করা হল। অনারব মুসলমানগণ (মাওয়ালী) এতে নিতান্ত অসন্তুষ্ট বোধ করল। এ অসন্তোষ পরবর্তীকালে তীব্র আন্দোলনে রূপ লাভ করে উমাইয়া শাসকদের বিরুদ্ধে পরম আক্রোশে আত্মপ্রকাশ করল।

আবদুল মালিক কেবল যে সুযোগ্য শাসক ছিলেন তা নয় শিল্প ও সাহিত্যে তাঁর অনুরাগ ছিল প্রগাঢ়। তিনি কবি ও কবিতার সমাদর করতেন। তাঁর সময় আরবি কাব্য বিশেষ উন্নতি লাভ করে। তাঁর সভায় অনেক বিখ্যাত কবি

শিল্প ও সাহিত্যের উন্নতি

ছিলেন। এঁরা উমাইয়া খলিফার উচ্ছ্বসিত প্রশংসা করে কবিতা রচনা করতেন। এঁদের মধ্যে জরীর, ফারাজদাক ও আখতাল প্রধান ছিলেন। আবদুল মালিকের সময় স্থাপত্য শিল্পেরও উৎকর্ষ সাধিত হয়। ৬৯১-২খ্রিষ্টাব্দে তিনি জেরুজালেমে 'প্রস্তর গম্বুজ' (কুব্বাতুস্-সাখরা) নামক মসজিদ নির্মাণ করেন। ঐ সময় মক্কা শরীফ তাঁর প্রতিদ্বন্দ্বী আবদুল্লাহ ইবন জুবায়রের অধীনে থাকায় তিনি রাজ্যের জনসাধারণকে জেরুজালেমে হজ্ব করতে আহ্বান করেন।

চরিত্র ও কৃতিত্ব

যদিও খলিফা পদে অধিষ্ঠিত হওয়ার সময় আবদুল মালিক উমাইয়া খলিফাদের মধ্যে সর্বাপেক্ষা দুর্বল ছিলেন তথাপি রাজত্বের শেষে তিনি সর্বাপেক্ষা শক্তিশালী হয়ে ওঠেন। চতুর্দিকে শত্রু পরিবেষ্টিত হয়েও তিনি মনোবল ও সৎসাহস হারাননি। তিনি উমাইয়া বংশকে সুদৃঢ় ভিত্তির ওপর স্থাপিত করেন এবং বিভিন্ন শাসন সংস্কারের সাহায্যে রাজ্যে স্থিতিশীলতা আনয়ন করেন। যদিও তাঁর পুত্র (প্রথম) ওয়ালীদের সময় উমাইয়া সাম্রাজ্য উন্নতির উচ্চ শিখরে আরোহণ করে তথাপি তিনিই রাজ্যে শান্তি ও শৃঙ্খলা স্থাপন করে ওয়ালীদের শ্রেষ্ঠত্ব ও সুখ্যাতির পথ সুগম করেন। তাঁর সময় রাজ্যের সর্বত্র শান্তি ও শৃঙ্খলা স্থাপিত হয় এবং উত্তর আফ্রিকায় বিদ্রোহী বার্বারগণ পুনরায় উমাইয়া খলিফাদের প্রাধান্য স্বীকার করে। বস্তুত পূর্বাঞ্চলে হাজ্জাজ ইবন ইউসুফের নেতৃত্বে ইসলামের দ্বিতীয় উল্লেখযোগ্য বিজয়ের অধ্যায় আবদুল মালিকের রাজত্বের শেষভাগেই আরম্ভ হয়ে ওয়ালীদের সময় পরিপূর্ণতা লাভ করে। আবদুল মালিকের সম্বন্ধে বলা হয় যে তিনি খলিফা হওয়ার পূর্ব পর্যন্ত ধার্মিক ছিলেন। খলিফা হওয়ার সংবাদ যখন তাঁর কাছে পৌঁছে তখন তিনি কুরআন শরীফ পাঠরত ছিলেন, তিনি কুরআনকে একদিকে সরিয়ে দিয়ে মন্তব্য করলেন যে "তোমার সাথে আমার এ শেষ।" তাঁর সম্বন্ধে আরও বলা হয় যে তিনি জনসাধারণকে খলিফার সম্মুখে কথা বলতে নিষেধ করেন। ইবন জুবায়রের মৃত্যুর পর তিনি ঘোষণা করেন যে "কেউ যেন সুবিচার ও আল্লার ভয়ের জন্য আমাকে আদেশ না করে অন্যথায় আমি তার স্কন্ধ হতে মস্তক বিচ্ছিন্ন করব।" দূরদর্শী ও সুদক্ষ শাসক আবদুল মালিকের সম্বন্ধে উপরোক্ত মন্তব্য আধুনিক ঐতিহাসিকদের মতে অতিরঞ্জিত, কারণ আব্বাসীয় যুগে উমাইয়া-বিদ্বেষী ঐতিহাসিকদের কাছ থেকে আমরা এ সব কথা জেনে থাকি।

গ্রন্থনির্দেশ

১. পি. কে. হিট্টি : *হিস্ট্রি অব দি এরাব্স্।*
২. উইলিয়াম ম্যুর : *কেলিফেট ইট্স্ রাইজ ডিক্লাইন এণ্ড ফল।*
৩. জুরিজজায়দান : *তমদ্দুন ইসলাম,* ৪র্থ খণ্ড।

১৬

উমাইয়া রাজ্যবিস্তার ঃ ওয়ালীদ ও হাজ্জাজ ইবন ইউসুফ

ওয়ালীদ (৭০৫—৭১৫ খ্রিঃ)

আবদুল মালিকের মৃত্যুর পর তাঁর ইচ্ছে অনুসারে তাঁর পুত্র ওয়ালীদ খলিফা হলেন। তাঁর শাসনকালে দেশে শান্তি ও সমৃদ্ধি বিদ্যমান ছিল। আবার তাঁর রাজত্বকালেই উমাইয়া সাম্রাজ্যের সীমানা বিভিন্ন দিকে বিস্তার লাভ করে। ওয়ালীদের সময় ঘটনাক্রমে এমন কয়েকজন যোদ্ধা ও বীর পুরুষের আবির্ভাব হল যাঁরা ইসলামের প্রাথমিক যুগের সুপ্রসিদ্ধ বীর পুরুষদের মত অসম সাহসী ও দুর্জেয় ছিলেন। এঁরা খলিফা ওয়ালীদের সময় রাজ্যজয়ে প্রশংসনীয় ভূমিকা গ্রহণ করেন।

ওয়ালীদ তাঁর পিতৃব্যপুত্র উমরকে আরবদেশের শাসনকর্তা নিযুক্ত করেন। আবদুল মালিকের মৃত্যুর পর তাঁর ভাই আবদুল আজিজেরই খলিফা হওয়ার কথা ছিল কিন্তু আবদুল মালিকের আগেই আবদুল আজিজের মৃত্যু হওয়ায় ওয়ালীদের উত্তরাধিকার সহজ ও নিষ্কণ্টক হয়েছিল। পিতৃব্য আবদুল আজিজের পরিবারের প্রতি বিশেষ বিবেচনা প্রদর্শন করে ওয়ালীদ উমর ইবন আবদুল আজিজকে আরবদেশের শাসনকর্তা নিযুক্ত করেন। তাঁর শাসনামলে মক্কা ও মদীনায় শান্তি বিরাজমান ছিল। মদীনায় কয়েকজন আলিমের সমবায়ে গঠিত একটি মন্ত্রণাসভার সাহায্যে তিনি আরব দেশ শাসন করতেন। তিনি মদীনার মসজিদের সংস্কার সাধন করেন। ওয়ালীদের আদেশ মত উমর হজ্বযাত্রীদের যাতায়ত সহজ, আরামদায়ক ও নিরাপদ করেন। স্থানে স্থানে মরুভূমি অঞ্চলে পানির কূপ খনন করা হয় এবং মক্কা ও মদীনায় পানির ফোয়ারা তৈরি করা হয়। হজ্বের সময় খলিফা পবিত্র নগরদ্বয়ের উন্নতি ও শ্রীবৃদ্ধি দেখে সন্তোষ প্রকাশ করেন এবং উমরের ভূয়সী প্রশংসা করেন। ইরাকের শাসনকর্তা উমরের সুশাসনে আকৃষ্ট হয়ে বহু লোক হাজ্জাজের শাসনাধীন এলাকা হতে মক্কা ও মদীনায় এসে আশ্রয় গ্রহণ করতে আরম্ভ করল। হাজ্জাজ এ ব্যাপার খলিফার গোচরীভূত করে হিজায হতে উমরের অপসারণ দাবি করলেন। খলিফা উমরকে অপসারিত করে মক্কা ও মদীনায় ভিন্ন ভিন্ন শাসনকর্তা নিযুক্ত করলেন। এরা হাজ্জাজের ইচ্ছানুযায়ী ইরাক হতে আশ্রয়প্রার্থী লোকদেরকে কঠোর হাতে দমন করেন এবং এদেরকে হিজায থেকে তাড়িয়ে দেন।

উমর ইবন আবদুল আজীজ

রাজ্য বিস্তার

হাজ্জাজের সুযোগ্য পরিচালনায় পূর্বাঞ্চলে উল্লেখযোগ্য রাজ্য জয় ঘটে। সেনাপতি কুতায়বা ইবন মুসলিমের কথা পূর্বেই উল্লেখ করা হয়েছে। তিনি হাজ্জাজের আদেশক্রমে মধ্য এশিয়ায় রাজ্য বিস্তারে অগ্রসর হন। ইতিপূর্বে সেনাপতি মুহাল্লাব অক্ষু নদী আমুরিয়া, জয়হুন অতিক্রম করে পূর্বদিকে তুর্কোমানদের সাথে যুদ্ধ করলেও এ অঞ্চলে ওয়ালীদের খিলাফতের আগে স্থায়ী রাজ্যজয় সম্ভব হয়নি। মুসলমান ঐতিহাসিক ও ভৌগোলিকগণ ঐ অঞ্চলকে 'মা ওয়ারা উন-নাহার' বা নদীর পর পারস্থ অঞ্চল নামে অভিহিত করত। সেনাপতি কুতায়বা সর্বপ্রথম ঐ অঞ্চলে তুর্কীদের সাথে যুদ্ধ করে তাদেরকে পরাজিত করেন এবং সেখানে মুসলিম অধিকার সুপ্রতিষ্ঠিত করেন। ৭০৫ খ্রিস্টাব্দে কুতায়বা তুখারিস্তানের নিম্নাঞ্চল ও এর রাজধানী বল্খ্ (ব্যাক্ট্রিয়া) জয় করেন। তিনি ৭০৬-৯ খ্রিস্টাব্দে সুগদিয়ানা অঞ্চলে বুখারা ও এর পার্শ্ববর্তী এলাকা জয় করেন। ৭১০ হতে ৭১২ খ্রিস্টাব্দের মধ্যে তিনি সুগদিয়ানার সমরকন্দ এলাকা এবং খাওয়ারিজম (খিবা) দখল করেন। বুখারা, বল্খ ও সমরকন্দে বৌদ্ধ ধর্মাবলম্বী লোক ও বৌদ্ধ মঠ বিরাজমান ছিল। বল্খের যুদ্ধ বন্দীদের মধ্যে ছিলেন এক মহিলা যিনি বারমাক উপাধি ধারী এক বৌদ্ধ পুরোহিতের স্ত্রী ছিলেন। তাঁরই গর্ভজাত পুত্র খালিদ ইবন বারমাক ভবিষ্যৎ উজীর বংশ বারমাকীদের উর্ধ্বতন পুরুষ। কুতায়বা ৭১৩-৭১৫ সালে জাক্সার্টেস (Jaxartes) (সির দরিয়া, সায়হুন) নদী অতিক্রম করে ফরগণার অধীনস্থ খোজান্দা, শাশ (তাসখন্দ) ও অন্যান্য নগর অধিকার করে চীন সীমান্তে কাশগড় পর্যন্ত অগ্রসর হলেন। এ অঞ্চলে মোঙ্গল বংশোদ্ভূত লোকেরা বসবাস করত। কুতায়বার এ সব উল্লেখযোগ্য বিজয়ের ফলে মধ্য এশিয়ার মুসলিম সভ্যতার কেন্দ্রস্থল বুখারা, সমরকন্দ ও খাওয়ারিজমে মুসলিম শাসন সুপ্রতিষ্ঠিত হল। এর ফলে মোঙ্গল জাতি ও মোঙ্গল সভ্যতার সাথে সর্বপ্রথম মুসলমানদের সম্পর্ক স্থাপিত হয়।

মধ্য এশিয়ায়

হাজ্জাজ তাঁর ভ্রাতুষ্পুত্র ও জামাতা মুহম্মদ ইবন কাসিমকে সিন্ধুররাজা দাহিরের সঙ্গে যুদ্ধ করতে পাঠালেন। এর কারণ এই যে সিংহলের রাজা

খলিফার নিকট আটখানি জাহাজ বোঝাই করে বহু মূল্যবান উপঢৌকন পাঠিয়েছিলেন। এ

মুহম্মদ ইবন কাসিমের সিন্ধু জয়

জাহাজগুলি পথিমধ্যে সিন্ধুর জলদস্যু কর্তৃক লুণ্ঠিত হয়। হাজ্জাজ খলিফার পক্ষ হতে সিন্ধুর রাজা দাহিরের নিকট লুণ্ঠিত দ্রব্যের ক্ষতি পূরণ দাবি করেন। দাহির ক্ষতিপূরণ দিতে অস্বীকার করলে হাজ্জাজ ইবন কাসিমকে সিন্ধু অভিযানে প্রেরণ করেন। মুহম্মদ ইবন কাসিম ৭১০ খ্রিষ্টাব্দে এক বিরাট সৈন্যবাহিনীসহ মাকরান ও বেলুচিস্তান অধিকার করে ৭১২ খ্রিষ্টাব্দে সিন্ধুতে উপস্থিত হন। তাঁর সৈন্য বাহিনীতে ছিল ৬০০০ ইরাকী ও সিরিয়া বাসী যোদ্ধা। এছাড়া সম সংখ্যক উষ্ট্রারোহী ও তিন সহস্র মালবাহী উষ্ট্র এ সৈন্যবাহিনীর সাথে যোগদান করেছিল। তাঁদের সঙ্গে অন্যান্য অস্ত্রশস্ত্রের সঙ্গে ছিল 'দুলহান' *নামক একটি ক্ষেপণাস্ত্র। এটা চালনা করতে ৫০০ লোকের প্রয়োজন হত। স্থানীয় জাঠ ও মেড জাতীয় লোকেরা দাহিরের ব্যবহারে অসন্তুষ্ট ছিল। এ জন্য তারাও মুহম্মদ ইবন কাসিমের দলে যোগদান করেছিল। দেবল বন্দরে পৌছে আরবগণ দেখল যে সেখানকার বড় মন্দিরের চূড়ায় একটি লাল পতাকা উড়ছে। দেবলের অধিবাসীরা মনে করত যে যতক্ষণ এ পতাকা উড়তে থাকবে ততক্ষণ দেবল অধিকার করা যাবে না। আরবগণ ক্ষেপণাস্ত্রের সাহায্যে প্রস্তর নিক্ষেপ করে এ পতাকা অবনমিত করল। হিন্দুগণ এতে নিরাশ হয়ে যুদ্ধে পরাজিত হল। দেবল মুসলমানদের অধিকারে এল। এর পর নীরুন অধিকৃত হল। অতঃপর ইবন কাসিম সিন্ধু নদী অতিক্রম করে দাহিরকে রাওর নামক স্থানে আক্রমণ করলেন। দাহির মুসলমানদের সাথে প্রাণপণ যুদ্ধ করে পরাজিত ও নিহত হলেন। হিন্দু রমণীগণ জহর ব্রত পালন করে জলন্ত অগ্নিতে প্রাণ বিসর্জন দিলেন। রাওরের পর ব্রাহ্মণাবাদ অধিকৃত হয়। এর পর আলোর দুর্গ অধিকৃত হয়। ইবন কাসিম তারপর মুলতান অধিকার করেন। মুলতানের সওদাগর, বণিক ও কারিগরগণ এবং জাঠ ও মেড সম্প্রদায়ের লোকগণ মুহম্মদের আনুগত্য স্বীকার করে তাঁর পক্ষে যোগদান করল। মুহম্মদ ইবন কাসিম এভাবে

* আরুস।

মধ্য এশিয়া

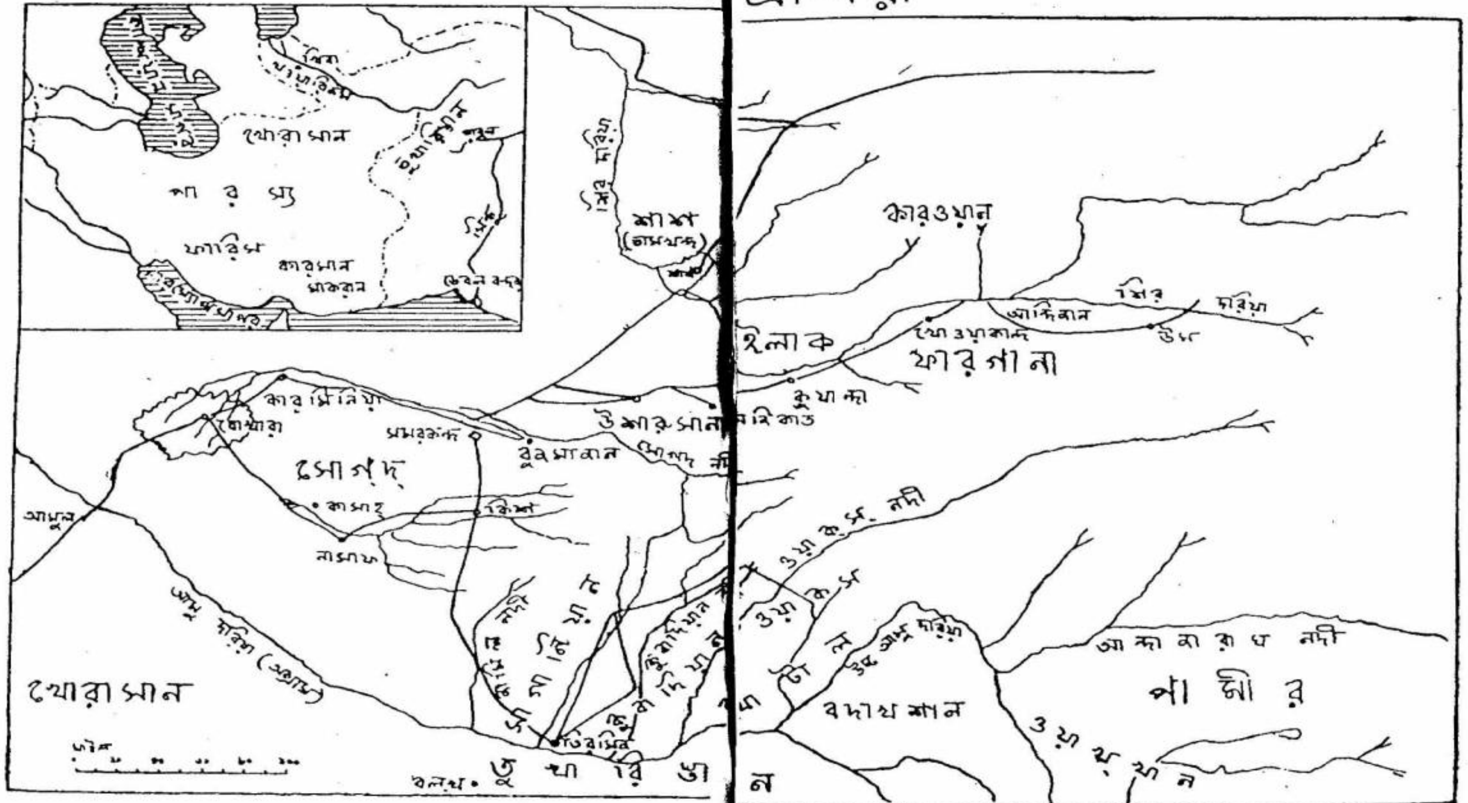

খোরাসান
পারস্য
ফারিস
কারমান
মাকরান
শাশ
(তাসখন্দ)
ইলাক
ফারগানা
কারওয়ান
সির দরিয়া
আখসিকাত
খোওয়াকান্দ
উশ
কুখান্দ
উশরুসানা
কারমিনিয়া
বোখারা
সমরকান্দ
বুনজাকাত
সোগদ
কাসাহ
কিশ
নাসাফ
আমুল
আমু দরিয়া (অক্সাস)
তিরমিজ
বলখ
তুখারিস্তান
বদাখশান
ওয়াখশ নদী
আক্সারাব নদী
পামীর
ওয়াখান

মাওয়ালী (অনারব মুসলমানগণ) মুসলমানগণ আপন আপন ন্যায্য দাবি-দাওয়া ও অধিকারের জন্য সংঘবদ্ধভাবে আন্দোলন চালাবার অনুপ্রেরণা লাভ করল। কিন্তু এ জন্য উমরকে দোষারোপ করা যায় না। উমাইয়াদের পতনের জন্য তাদের অবিচার ও অসাম্য নীতিই দায়ী। উমর এ অসাম্য দূর করার চেষ্টা করেছিলেন। তাঁর পরবর্তী শাসকগণ পূর্বতন নীতি পুনঃপ্রবর্তন করায় এ বংশের পতন দ্রুত ঘনিয়ে এসেছিল। উমর মাত্র উনচল্লিশ বছর বয়সে ৭২০ খ্রিস্টাব্দের ফেব্রুয়ারি মাসে পরলোক গমন করেন।

গ্রন্থনির্দেশ

১. উইলিয়াম ম্যুর : *কলিফেট।*
২. ওয়েলহাউসেন : *এরাব কিংডম এণ্ড ইট্‌স্ ফল।*
৩. জুরজীজায়দান : *তমদ্দুন ইসলাম*, ৪র্থ খণ্ড।

১৮

দ্বিতীয় ইয়াজীদ ও হিশাম

দ্বিতীয় ইয়াজিদ আবদুল মালিকের পুত্র ছিলেন। খলিফা দ্বিতীয় ইয়াজিদের আমলে দ্বিতীয় উমর কর্তৃক প্রবর্তিত অনেক বিধি-ব্যবস্থা বাতিল করা হয়।

দ্বিতীয় ইয়াজীদ (৭২০—৭২৪ খ্রিঃ)

উমরের ন্যায়নীতি ও সুব্যবহারের ফলে পূর্ববর্তী উমাইয়াগণের নিষ্ঠুর আচরণের কথা জনসাধারণ ভুলে না যেতেই ইয়াজীদ খলিফা হলেন। যে খারিজিগণ দ্বিতীয় উমরের সময় তাদের অসি কোষবদ্ধ করেছিল তারা আবার উমাইয়াগণের বিরুদ্ধাচরণ আরম্ভ করল। ইয়াজীদ ইবন মুহাল্লিব কারাগার থেকে পালিয়ে নতুন খলিফা ইয়াজীদের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ঘোষণা করলেন। খলিফার বাহিনী বিদ্রোহী সেনাপতিকে ফুরাতের পশ্চিম তীরে সংঘটিত এক যুদ্ধে পরাজিত ও নিহত করল। রাজ্যের সর্বত্র বিশৃঙ্খলা ও অরাজকতা ছড়িয়ে পড়ল। বংশগত বিভেদ ও রেষারেষি ইয়ামনী ও মুদার বংশীয় আরবদের কলহ নতুন রূপে আত্মপ্রকাশ করল। উমরের সুশাসনে গোত্রীয় কলহ অল্পকালের জন্য বন্ধ ছিল। এখানে তা বহু গুণে বৃদ্ধি পেয়ে রাজ্যের ভিত্তিমূল পর্যন্ত কাঁপিয়ে তুলল।

ইয়াজীদের শাসনামলে সাম্রাজ্যের পূর্বাঞ্চলে আব্বাসীয়দের স্বপক্ষে প্রচারণা আরম্ভ হল। আব্বাসীয় গুপ্তচরগণ খুরাসানে হযরতের পিতৃব্য আব্বাসের বংশধরগণের খিলাফতের দাবি প্রচার করতে আরম্ভ করল।

এভাবে সাম্রাজ্য যখন শতধা বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ছিল তখন ইয়াজীদ তাঁর অন্তঃপুরের হাবাবা নাম্নী এক গায়িকার মৃত্যুতে শোকাভিভূত হয়ে প্রাণত্যাগ করেন (জানুয়ারি, ৭২৪ খ্রিঃ)।

ইয়াজীদের মৃত্যুর পর আবদুল মালিকের অপর এক পুত্র হিশাম খলিফা হলেন। তিনি ইয়াজীদ অপেক্ষা অধিকতর যোগ্যতাসম্পন্ন ছিলেন। দ্বিতীয় উমরের

হিশাম (৭২৪—৭৪৩ খ্রিঃ)

ন্যায় তিনিও দরবার থেকে অশোভন ও ধর্ম বিগর্হিত কার্যকলাপ বন্ধ করে রাজধানীতে সুষ্ঠু জীবন যাত্রা পুনঃ প্রতিষ্ঠিত করলেন। তাঁর খ্রিস্টান প্রজাদের প্রতি তিনি বন্ধুভাবাপন্ন ছিলেন। তিনি খাল খনন, প্রাসাদ নির্মাণ ও উদ্যান তৈরিতে মনোনিবেশ করেন। কৃষির উন্নতি বিধানে তিনি বিশেষ আগ্রহী ছিলেন। তিনি অপচয় পছন্দ করতেন না। খলিফা হওয়ার পর বছর তিনি যখন মক্কায় হজ্ব করতে গেলেন তখন তাঁকে খুৎবায়

আলীর নামে অভিসম্পাত বর্ষণ করতে অনুরোধ করা হল। তদুত্তরে হিশাম বললেন যে তিনি হজ্ব পালন করতে এসেছিলেন, কারও নিন্দা করতে বা কাকেও অভিশাপ দিতে আসেননি। কিন্তু তাঁর এ সব সৎগুণ সাম্রাজ্যের অধোগতি রোধ করতে পারল না। আব্বাসীয় প্রচারক ও ধর্মান্ধ খারিজীদের কার্যকলাপের ফলে উমাইয়া বংশের অধঃপতন শনৈঃ শনৈঃ তরান্বিত হতে লাগল। তাঁর কর্তব্য নিষ্ঠা, অমিতব্যয়িতা এবং ন্যায়ানুগ শাসন বহুধা বিভক্ত সাম্রাজ্যকে শেষ রক্ষা করতে পারল না। তদুপরি তাঁর কয়েকটি প্রধান দোষও ছিল। তিনি গভর্ণর ও কর্মচারী নিয়োগে সব সময় দূরদর্শিতার পরিচয় দিতে পারেননি। অধিকন্তু অনেক কর্মচারীর বিরুদ্ধে বৃথা সন্দেহ পোষণ করে তিনি তাঁদের প্রতি নিষ্ঠুর আচরণ করতে কুণ্ঠা বোধ করেননি। তাঁর মিতব্যয় অর্থগৃধ্নু তার নামান্তর ছিল। তাঁর সময় কোষাগার পরিপূর্ণ থাকা সত্ত্বেও প্রয়োজনবোধেও তিনি অর্থব্যয় করতে চাইতেন না। এর ফলে তাঁর সুনাম ও জনপ্রিয়তা বহুলাংশে ক্ষুণ্ন হয়। কর বৃদ্ধির সাহায্যে রাজ্যের আয় বৃদ্ধিই তাঁর একমাত্র লক্ষ্য ছিল।

তাঁর সময় যে স্বল্প সংখ্যক লোক দীর্ঘ সময়ের জন্য উচ্চ রাজপদে বহাল ছিলেন খালিদ আল্-কাসরী তাঁদের অন্যতম। তিনি হিশামের খিলাফতের প্রথম

খালিদ আল-কাসরী

হতে পনর বছর পর্যন্ত ইরাকের গভর্ণর ছিলেন। তিনি উদার মতাবলম্বী ছিলেন এবং আরবদের ইয়ামনী ও মুদার বংশীয় শাখার মধ্যে ভারসাম্য রক্ষা করে সুষ্ঠুভাবে শাসন কার্য সম্পাদন করেছিলেন। খ্রিস্টান ও ইহুদিদের প্রতি তাঁর ব্যবহার সদয় ও ন্যায়ানুগ ছিল, তিনি তাদের গির্জা ও মন্দিরগুলি মেরামত করে দেন এবং তাদেরকে বিভিন্ন রাজকার্যে নিযুক্ত করেন।

হিশামের শাসনামলে রাজ্যের বিভিন্ন অঞ্চলে বিদ্রোহ ও গোলযোগ দেখা দেয়। খুরাসানে ইয়ামনী ও মুদার বংশীয় আরবদের মধ্যে এক মারাত্মক যুদ্ধ

খুরাসান ও সুগদিয়ানার বিদ্রোহ

বেধে ওঠে। এ বিদ্রোহ প্রশমিত হওয়ার পর বুখারা ও সুগদিয়ানা অঞ্চলে নওমুসলিমগণ বিদ্রোহী হয়। তথাকার শাসনকর্তা নও মুসলিমগণকে জিযিয়া হতে অব্যাহতি দেবার অঙ্গীকার ভঙ্গ করলে এ বিদ্রোহ দেখা দেয়। যাযাবর তুর্কোমানদের দলপতি খাকান এ বিদ্রোহীদের সহায়তা করেন। হারিস নামক একজন আরব নেতাও এ বিদ্রোহে যোগদান করেন। খালিদের ভ্রাতা আসাদ খুরাসানের শাসনকর্তা নিযুক্ত হয়ে এ সব বিদ্রোহ দমনে চেষ্টিত হলেন। আসাদ বিদ্রোহী হারিসের দলবলকে নির্মূল করেন এবং হারিস বিধর্মী তুর্কীদের সাথে যোগদান করে রক্ষা প্রাপ্ত হন। অতঃপর আসাদ

বলখে তাঁর রাজধানী স্থাপন করেন। তিনি ৭১৭ খ্রিস্টাব্দে খাকানকে পরাজিত করে বহু মুসলমান বন্দীকে মুক্ত করেন। অল্পকাল পরেই খাকান তাঁর অধীনস্থ এক সর্দারের হাতে নিহত হন। পর বছরই আসাদের মৃত্যু হয়। এর পর নাসর ইবন সাইয়ার খুরাসানের শাসনকর্তা নিযুক্ত হন। তিনি আবার মার্ভে রাজধানী স্থানান্তরিত করেন। নাসরের সময় অক্ষু নদীর পূর্বদিকে শান্তি ও শৃঙ্খলা স্থাপিত হয়। খাকানের মৃত্যুতে তুর্কোমানগণ বিভিন্ন দলে বিভক্ত হয়ে পড়ে এবং এ

নাসর ইবন সাইয়ার

অঞ্চলে আইন-শৃঙ্খলা রক্ষার কাজ সহজতর হয়। দূরদর্শী নাসর সুগদিয়ানগণের প্রতি সাধারণ ক্ষমা ঘোষণা করে তাদেরকে বশে আনতে সমর্থ হলেন। জিযিয়া ও খারাজ সম্পর্কিত বহুদিনের বাকবিতণ্ডার অবসান ঘটিয়ে নাসর উল্লেখযোগ্য অর্থনৈতিক সংস্কার প্রবর্তন করেন। তিনি ঘোষণা করেন যে কেবল অমুসলমানগণই জিযিয়া কর প্রদান করবে। মুসলমানগণকে, আরব হোক বা অনারব (মাওয়ালী) হোক ভূমির জন্য খারাজ বা ভূমি রাজস্ব আদায় করতে হবে। এভাবে তিনি মধ্য এশিয়ায় শান্তি স্থাপন করেন।

পাক-ভারতের সিন্ধু অঞ্চলে জুনায়দ নামক শাসনকর্তার দুর্ব্যবহারে অতিষ্ঠ হয়ে স্থানীয় হিন্দুগণ বিদ্রোহ ঘোষণা করে। এর ফলে সিন্ধুর তীরে মাহফুজা ও মনসুরা নামক দুটি নতুন দুর্গ নির্মাণ করা হয়। এদের সাহায্যে বিদ্রোহ প্রশমিত

সিন্ধু

হয় এবং দাক্ষিণাত্যের কিয়দংশে মুসলিম অধিকার বিস্তৃত হয়।

খলিফার দুই পুত্র মু'আবিয়া ও সুলায়মান এশিয়া মাইনরে বাইজান্টাইনদের সাথে যুদ্ধ পরিচালনা করেন। এ যুদ্ধে আল-বাত্তাল নামক একজন বীর সেনানী বিশেষ কৃতিত্ব প্রদর্শন করে অবশেষে ৭৪০ খ্রিস্টাব্দে স্বয়ং

এশিয়া মাইনর

পরাজিত ও নিহত হন। আর্মিনিয়ায় ও কাস্পিয়ান সাগরের তীরে খাজার উপজাতি লুটতরাজ করতে থাকে। খলিফার ভ্রাতা মাসলামা ও পিতৃব্য পুত্র মারওয়ান (পরবর্তীকালে দ্বিতীয় মারওয়ান ও শেষ উমাইয়া খলিফা) পর পর খাজারদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করে তাদেরকে দমন করেন।

সাজর বাইজান

আফ্রিকায় নও মুসলিম ও খারিজী সম্প্রদায় বিদ্রোহী হয়ে খলিফার সেনাবাহিনীকে বার বার পর্যুদস্ত করতে থাকে। আরবগণ ১১৭/৭৩৫ সালে ৩ লক্ষ বার্বারদের এক বিশাল বাহিনীকে পরাজিত করেন। এ সময় আরব নৌবাহিনী সিসিলি আক্রমণ করে সিরাকুজ অধিকার করে এবং সার্ডিনিয়া জয় করে। ফ্রান্সে কয়েকটি নতুন স্থান অধিকৃত হয়।

আফ্রিকা ১১৩/ ৭৩১ সালে আবদুর রহমান আল-গাফিকী স্পেনের শাসনকর্তা নিযুক্ত হন। তিনি অতি সুযোগ্য শাসক ছিলেন। সর্বশ্রেণীর লোক জাতিধর্ম নির্বিশেষে তাঁর নিকট সমান ও নিরপেক্ষ বিচার পেত। তিনি উত্তরাঞ্চলে জোরদার অভিযান আরম্ভ করে পয়েটিয়ার্স পর্যন্ত সমগ্র ভূভাগ করতলগত করেন। ফ্রাঙ্কদের নেতা চার্লস মার্টেল খ্রিস্টানদের সাহায্যার্থে মুসলমানদের

টুরসের যুদ্ধ ৭৩২ খ্রিঃ

বিরুদ্ধে অগ্রসর হলেন। টুরস ও পয়েটিয়ার্সের মধ্যবর্তী স্থানে মুসলমান সেনাবাহিনী ও চার্লস মার্টেলের সেনাবাহিনী পরস্পর মুখোমুখী হল। হালকা খণ্ডযুদ্ধে সাতদিন কেটে গেল। অষ্টম দিবসে মুসলমানগণ ফ্রাঙ্কবাহিনীকে আক্রমণ করল। তাদের পাল্টা আক্রমণে মুসলিম বাহিনী বিপর্যস্ত হল। সেনাপতি আবদুর রহমান অন্যান্য যোদ্ধাসহ নিহত হলেন। রাত্রির অন্ধকার ঘনীভূত না হওয়া পর্যন্ত যুদ্ধ চলল। আরবগণ রাত্রির অন্ধকারে শিবির উঠিয়ে নিয়ে গেল। গোত্রগত কলহের ফলে তারা ফ্রাঙ্কদের বিরুদ্ধে আর যুদ্ধ করতে সক্ষম হল না। বহু আরব নেতা এ যুদ্ধে শহীদ হওয়ায় আরবগণ এ যুদ্ধকে 'বালাতুল-শুহাদা' বা 'শহীদী চত্বর' বলে অভিহিত করে থাকে।

ইরাকের শাসনকর্তা খালিদ আল-কাসরীর কথা আগে উল্লেখ করা হয়েছে। তাঁর উদার ও ন্যায়-পরায়ণ শাসনে ইরাকে শান্তি ও শৃঙ্খলা বিরাজমান ছিল। কিন্তু তাঁর একদল শত্রু তাঁর বিরুদ্ধে খলিফার মনকে বিষিয়ে তুলল। ফলে হিশাম খালিদের পনর বছরের প্রশংসনীয় শাসনের কথা বিস্মৃত হয়ে তাঁকে পদচ্যুত করলেন (৭৩৮ খ্রিঃ) এবং ইউসুফ নামক নিষ্ঠুর প্রকৃতির লোককে ইরাকের গভর্ণর নিযুক্ত করেন। তাঁর দুর্ব্যবহারে উত্যাক্ত হয়ে হুসায়নের পৌত্র জায়দ বিদ্রোহী হলেন। কুফাবাসীরা তাঁকে দলে দলে সাহায্য করবার প্রতিশ্রুতি দিলেও প্রয়োজনের সময় খুব অল্প লোকই তার পাশে এসে দাঁড়াল। উমাইয়া

কুফায় জায়দের বিদ্রোহ ৭৪০ খ্রিঃ

বাহিনীর সাথে যুদ্ধে তিনি তীরবিদ্ধ হয়ে নিহত হলেন। তাঁর শিষ্যগণ তাকে গোপনে সমাহিত করল কিন্তু নিষ্ঠুর ইউসুফ তার কবর হতে মৃতদেহ বের করে হিশামের কাছে তার মস্তক প্রেরণ করলেন। জায়দের মৃত্যুর ফলে আব্বাসীয়গণের ভবিষ্যৎ নিষ্কণ্টক হল এবং খিলাফতের প্রতি তাদের দাবি জোরদার হল।

হিশামের শাসনামলে আব্বাসীয়গণের খিলাফতের দাবি উত্তরোত্তর শক্তি সঞ্চয় করতে থাকে। এঁরা হযরতের পিতৃব্য আব্বাসের বংশধর ছিলেন। আব্বাসের চার পুত্র ছিল তন্মধ্যে আবদুল্লাহ ইবন আব্বাস হাদিসবিদ হিসেবে

আব্বাসীয়গণের খিলাফতের দাবি

বিখ্যাত ছিলেন। ইনি হযরত আলীর বিশেষ বিশ্বাসভাজন ছিলেন। কারবালায় হুসায়নের হত্যার পর ৬৮৬-৭ খ্রিস্টাব্দে

কারবালায় হুসায়নের হত্যার পর ৬৮৬-৭ খ্রিস্টাব্দে ভগ্নহৃদয়ে তাঁর মৃত্যু হয়। তাঁর পুত্র আলী হযরত আলী (রা)-এর বংশধরগণের প্রতি বিশেষ অনুরক্ত ছিলেন। ৭৩৫ খ্রিস্টাব্দে আলীর মৃত্যুর পর তৎপুত্র মুহম্মদ আব্বাসীয়গণের নেতা হলেন। মুহম্মদ অতিশয় উচ্চাভিলাষী ব্যক্তি ছিলেন এবং তিনিই আব্বাসীয়গণের মধ্যে সর্বপ্রথম খিলাফত লাভ করার আশা হৃদয়ে পোষণ করেন। এ উদ্দেশ্যে তিনি এক নতুন মতবাদ প্রচার করেন যে কারবালায় হুসায়নের হত্যার পর মুসলমানদের ধর্মীয় নেতৃত্ব উত্তরাধিকার সূত্রে হুসায়নের পুত্র আলীর (জয়নুল আবিদীনের) ওপর না বর্তে মুহম্মদ ইবনুল হানাফিয়ার (আলীর হানিফা বংশীয়া স্ত্রীর গর্ভজাত পুত্র) ওপর বর্তেছে। আল-হানাফিয়ার মৃত্যুর পর তাঁর পুত্র আবুল হাশিম নেতৃত্ব পদ লাভ করেন। তিনি উক্ত পদ আব্বাসীয় বংশের মুহম্মদ ইবন আলী ইবন আবদুল্লাহকে প্রদান করেন। আব্বাসীয় প্রচারকগণ এ বিশ্বাসে আস্থা স্থাপন করে গোপনে মুহম্মদের জন্য প্রচারণা চালাতে থাকে। তবে তারা আলীর অনুরক্ত ও ভক্তগণের সহযোগিতা লাভের উদ্দেশ্যে এই বলে প্রচারণা চালাত যে তারা আহ্‌ল-বায়ত অর্থাৎ নবীর বংশধরগণের খিলাফতের দাবি অগ্রগণ্য করার উদ্দেশ্যে অসাধু ও ধর্মবিরোধী উমাইয়া রাজত্বের বিরুদ্ধে বিপ্লবের আয়োজন করছে। ৭৪২—৪৩ খ্রিস্টাব্দে মুহম্মদের মৃত্যু হয়। মৃত্যুর পূর্বে তিনি তাঁর পুত্র ইব্রাহীম, আবুল আব্বাস ও আবু জাফরকে যথাক্রমে উত্তরাধিকারী মনোনীত করে যান।

হিশামের বিশ বছরের খিলাফত কাল এভাবে নানা গোলযোগ ও বিদ্রোহের মধ্য দিয়ে অতিবাহিত হয়। ৭৪৩ খ্রিস্টাব্দের ফেব্রুয়ারি মাসে তার মৃত্যু হয়। আরব ঐতিহাসিকগণ হিশামকে মু'আবিয়া ও আবদুল মালিকের পর উমাইয়া বংশের "তৃতীয় ও শেষ রাজনীতিক" বলে অভিহিত করেন। কিন্তু তার কার্যকলাপ পতনোন্মুখ উমাইয়া সাম্রাজ্যকে ধ্বংস হতে রক্ষা করতে পারল না।

গ্রন্থনির্দেশ

১. উইলিয়াম মুর : *কলিফেট।*
২. সৈয়দ আমীর আলী : *হিস্ট্রি অব সারাসেন্স।*

১৯

শেষ উমাইয়া খলিফাগণ

দ্বিতীয় ওয়ালীদ
৭৪৩ খ্রিঃ—৪৪ খ্রিঃ

দুশ্চরিত্রতার জন্য দ্বিতীয় ওয়ালীদ তাঁর পিতৃব্য হিশামের দরবার হতে নির্বাসিত হয়েছিলেন। হিশামের মৃত্যুর পর তিনি দামিস্কের খলিফা হলেন এবং হিশামের আত্মীয়স্বজন ও প্রিয়পাত্রগণকে নানাভাবে নির্যাতন করতে আরম্ভ করেন। তারই প্ররোচনায় ইরাকের শাসনকর্তা ইউসুফ পদচ্যুত খালিদকে নিতান্ত নিষ্ঠুরভাবে হত্যা করেন। জায়দের পুত্র ইয়াহিয়াও হিশামের বিরুদ্ধে বিদ্রোহী হয়ে শোচনীয়ভাবে মৃত্যুবরণ করেন। মদ্যপান, সঙ্গীত ও ঘোড়দৌড়ে অপরিসীম আসক্তি দামিস্কের জনসাধারণের থেকে তাঁকে অপ্রিয় করে তোলে। অবশেষে তাঁর অশোভন আচরণে বীতশ্রদ্ধ হয়ে উমাইয়াগণ তাঁর বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র আরম্ভ করে এবং খলিফা প্রথম ওয়ালীদের পুত্র ইয়াজীদের (তৃতীয় ইয়াজীদ নামে পরিচিত) নেতৃত্বে বিদ্রোহ ঘোষণা করে। জনসাধারণ দ্বিতীয় ওয়ালীদকে রাজধানীর উপকণ্ঠে এক দুর্গে অবরোধ করে এবং তাঁকে নির্মমভাবে হত্যা করে। বিদ্রোহীরা তারপর তৃতীয় ইয়াজীদকে খলিফা বলে ঘোষণা করে।

এপ্রিল ৭৪৪ খ্রিঃ—
সেপ্টেম্বর, ৭৪৪ খ্রিঃ

খলিফা তৃতীয় ইয়াজীদ ধার্মিক ও কর্তব্যনিষ্ঠ ছিলেন। তিনি প্রতিজ্ঞা করলেন যে তিনি সীমান্ত সুরক্ষিত করবেন, নগরসমূহের রক্ষার ব্যবস্থা করবেন, জনসাধারণের করভার লাঘব করবেন এবং অসাধু কর্মচারিগণকে অপসারিত করবেন। কিন্তু তাঁর শাসনকাল মাত্র ছয় মাস স্থায়ী হয়েছিল এবং সর্বত্র অবস্থা এত গোলযোগপূর্ণ ছিল যে রাজ্যে কোন রকম সংস্কার প্রবর্তন সম্ভবপর ছিল না। ইয়াজীদ একটিমাত্র সংস্কার প্রবর্তন করেছিলেন, তা হল সৈনিকদের বেতন হ্রাস। এজন্য তিনি 'আন-নাকিস' বা ব্যয় সংকোচনকারী আখ্যা প্রাপ্ত হয়েছিলেন। ইয়াজীদের মৃত্যুর পর তাঁর ভ্রাতা ইব্রাহীম মাত্র দু'মাস দশদিন রাজত্ব করেন। এর পর প্রথম মারওয়ানের পৌত্র দ্বিতীয় মারওয়ান খলিফা বলে ঘোষিত হলেন। ইনিই শেষ উমাইয়া খলিফা।

খলিফা দ্বিতীয় মারওয়ান আর্মিনিয়ার শাসনকর্তা হিসেবে ইতিপূর্বে যথেষ্ট যোগ্যতা প্রদর্শন করেছিলেন এবং উত্তরদিক হতে যে সব যাযাবর জাতি মুসলিম রাজ্যে হানা দিয়ে অশান্তি সৃষ্টি করছিল তাদেরকে তিনি বার বার বিতাড়িত

দ্বিতীয় মারওয়ান
৭৪৪—৭৫০ খ্রিঃ

করেন। অসাধারণ ধৈর্যগুণের জন্য তিনি আল-হিমার (গর্দভবৎ ধৈর্যশীল) উপাধি দ্বারা আখ্যায়িত হয়েছিলেন। তিনি অপেক্ষাকৃত সাধু ও সংযমী ছিলেন। উমাইয়া প্রাসাদের বিলাস ব্যসনে তার আসক্তি ছিল না। ইতিহাস পাঠে তাঁর যথেষ্ট অনুরাগ ছিল। অধিক বয়সে শাসনকার্যের ভার প্রাপ্ত হলেও তাঁর কর্মক্ষমতা অপরিবর্তিত ছিল এবং রাজ্যের

চরিত্র

একপ্রান্ত হতে অপর প্রান্ত পর্যন্ত বিদ্রোহ দমনে তিনি ক্ষিপ্রহস্ততার পরিচয় দিয়েছিলেন। কিন্তু রাজ্যের এ সঙ্কটময় মুহূর্তে যে গুণের প্রয়োজন সর্বাপেক্ষা অধিক ছিল তারই অভাব তাঁর মধ্যে সবিশেষ পরিলক্ষিত হয়। যে সাম্প্রদায়িক বিরোধ আরবগণকে দ্বিধা বিভক্ত করে তাদের প্রাণশক্তিকে বিনষ্ট করে দিয়েছিল সেই হিময়ার ও মুদার দ্বন্দ্বে খলিফা শেষোক্ত দলের প্রতি পক্ষপাত প্রদর্শন করে এবং হিময়ারগণের প্রতি নিষ্ঠুর আচরণ করে সাম্রাজ্যের ধ্বংস ত্বরান্বিত করলেন।

খলিফা হওয়ার অল্পকাল পরেই হিম্স ও প্যালেস্টাইনে তার বিরুদ্ধে প্রচণ্ড বিদ্রোহ দেখা দিল। ধর্মোন্মত্ত খারিজিগণ এ সময় উমাইয়া শাসনের বিরুদ্ধে তীব্র প্রচারণা আরম্ভ করল। তারা সমগ্র ইয়ামন, হিজায ও ইরাক পদদলিত করে খলিফার কর্তৃত্বের অবসান ঘোষণা করল। এ সব বিদ্রোহ দমনে মারওয়ান অসাধারণ নৈপুণ্য ও সাহসের পরিচয় দেন। তিনি ক্রমান্বয়ে হিমস ও প্যালেস্টাইনে বিদ্রোহীদেরকে পরাজিত করেন এবং ইরাকে খারিজীদের সাথে যুদ্ধ করে তাদেরকে দজলার অপর পারে বিতাড়িত করেন। ইতিমধ্যে খারিজীদের একদল মদীনা অধিকার করে। মারওয়ানের সহকারী যুদ্ধে খারিজীদেরকে পরাজিত করে হিজায ও ইয়ামন মুক্ত করেন। হিজায ও ইয়ামনে পরাজিত খারিজীরা হাজরা মাউতে এবং ইরাক থেকে বিতাড়িত খারিজিগণ পারস্যে আশ্রয় গ্রহণ করে।

খারিজী বিদ্রোহ

মারওয়ান যখন রাজ্যের পশ্চিমাঞ্চলে বিদ্রোহ দমনে ব্যাপৃত ছিলেন তখন খুরাসানে হিময়ার ও মুদারগণের পারস্পরিক কলহ উমাইয়া রাজ্যের ধ্বংস অত্যাসন্ন করে তুলল। খুরাসানের শাসনকর্তা নাস্‌র ছিলেন মুদার বংশীয় এবং হিময়ারগণ তাঁর বিরুদ্ধে সশস্ত্র বিদ্রোহ ঘোষণা করল। আরবদের এ অন্তর্দ্বন্দ্বের সাথে যুক্ত হল অনারবদের অসন্তোষ। উমাইয়া শাসকগণ অনারব মুসলমানগণকে উচ্চপদে নিযুক্ত করতেন না। রাজ্যের সব সুযোগ সুবিধা আরবদেরই একচেটিয়া ছিল। সমাজে অনারব মুসলমানদের স্থান ছিল আরবদের নিচে। ইসলামের

মাওয়ালী

সাম্য ও ভ্রাতৃত্বের নীতি উপেক্ষা করে উমাইয়া শাসকগণ আরব ও অনারবদের মধ্যে বিভেদের দুর্লংঘ্য প্রাচীর গড়ে তুলেছিল। পারসিক মুসলমানগণ যত যোগ্য ও উপযুক্ত হোক না কেন তারা আরব রমণীর পাণিগ্রহণ করতে পারত না। আরবগণ অশ্বারোহণে যুদ্ধ করত অনারবগণকে পায়ে হেঁটে যুদ্ধ করতে হত। অনারবগণ গণীমতের অংশীদার হলেও রাজকোষ হতে বৃত্তি পেত না। তাদেরকে রাষ্ট্রে নানারকম কর দিতে হত। এ সব বিভেদ ও অসন্তোষের পূর্ণ সুযোগ নিয়ে আব্বাসীয় নেতা ও তাদের সমর্থকদল ক্রমান্বয়ে আহল-বায়ত অর্থাৎ রসূলের বংশধরদের খিলাফতের দাবি জনসাধারণে সমক্ষে পেশ করছিল।

এ সময় খুরাসানে আব্বাসীয় দলের সমর্থক এক প্রতিভাবান ব্যক্তির আবির্ভাব হয়। তিনি হলেন আবু মুসলিম খুরাসানী। তিনি অনারব ছিলেন এবং

আবু মুসলিম

আব্বাসীয় ইমাম মুহম্মদ কর্তৃক আব্বাসীয়গণের পক্ষে প্রচারণার জন্য নিযুক্ত হয়েছিলেন। তিনি দক্ষিণ প্যালেস্টাইনে অবস্থিত হুমায়মা নামক আব্বাসী প্রচার কেন্দ্র হতে খুরাসান পর্যন্ত গোপনে বহুবার যাতায়াত করলেন এবং ১২৯ হিজরীর রমজান মাসে উমাইয়া রাজ্যের চতুর্দিকে গোপন দূতসমূহ প্রেরণ করে বিরাট বিপ্লবের জন্য খুরাসান মাহেন্দ্র ক্ষণের অপেক্ষায় চেয়েছিলেন। অবশেষে সুযোগ বুঝে ১২৯ হিজরী সালের ২৫শে রমজান (৯ জুন, ৭৪৭ খ্রিঃ) আব্বাসীয় বিপ্লবের সময় ধার্য করে পর্বতের ওপর এক উৎসবাগ্নি প্রজ্বলিত করলেন। চতুর্দিক হতে অগণিত লোক শোক চিহ্ন প্রকাশক কৃষ্ণবর্ণ পোশাক পরিধান করে দলে দলে সমবেত হতে লাগল। আবু মুসলিমের কাল পতাকা তলে সমবেত বিক্ষুব্ধ জনসাধারণ নগর হতে নগরান্তরে বিপ্লবের পতাকা উড্ডীন করতে লাগল। হিরাত ও অন্যান্য শহর হতে উমাইয়া দুর্গ রক্ষীদল বিতাড়িত হল। আবু মুসলিমের সেনাবাহিনীর সাথে মুকাবিলা করতে না পেরে রাজপ্রতিনিধি নাসর খলিফার সাহায্য প্রার্থনা করলেন। মারওয়ান এ সময় খারিজিদের সাথে মেসোপটেমিয়ায় যুদ্ধে ব্যাপৃত ছিলেন। মার্ভ আবু মুসলিমের অধিকার ভুক্ত হল। ইতিমধ্যে আব্বাসী ইমাম ইব্রাহীম ইবন মুহম্মদ আবু মুসলিমের নিকট একটি পত্রে আব্বাসী আন্দোলনের ধীর গতি সম্বন্ধে অভিযোগ করেন। উক্ত পত্র খলিফা মারওয়ানের হস্তগত হলে তিনি ইব্রাহীমকে হুমায়মা কেন্দ্র হতে বন্দী করে হাররানে নিয়ে গেলেন। সেখানে বন্দী অবস্থায়

তাঁর মৃত্যু হয়। ইব্রাহীমের ভ্রাতা আবুল আব্বাস ও আবু জাফর তাঁদের পরিবারের অন্যান্য লোকজনসহ কুফায় পালিয়ে আত্মগোপন করলেন।

আবু মুসলিম তাঁর অনাড়ম্বর জীবনযাত্রা ও সদ্ব্যবহারের সাহায্যে বহুলোককে আপন করে নিলেন। তিনি তাঁর অনুচরদের মধ্য হতে দ্বাদশ সদস্যের একটি উপদেষ্টা সভার সাহায্যে শাসনকার্য পরিচালনা করতে লাগলেন। তিনি খিলাফতের দাবিদার কোন ব্যক্তি বিশেষের নামে আন্দোলন পরিচালনা না করে আলীর বংশীয় ও আব্বাসীয় উভয় দলের লোকজনকে সন্তুষ্ট করার উদ্দেশ্যে হাশিমী বংশের নামে আন্দোলন চালাতে থাকেন। কারণ আলী ও আব্বাস উভয়েই হাশিমের অধঃস্তন পুরুষ ছিলেন। আবু মুসলিমের সেনাপতি কাহতাবা নাসরকে স্থান হতে স্থানান্তরে অনুসরণ করে পরাজিত করেন। খুরাসান হতে গুরগাঁওয়ে এবং সেখান হতে রাই ও হামাদানে পলায়ন পর অবস্থায় তিনি পীড়িত হয়ে মৃত্যুমুখে পতিত হন (৭৪৮ খ্রিঃ)। উমাইয়া খলিফাদের অধীনে বহুদিন যাবৎ খুরাসানের শাসনকর্তা হিসেবে কাজ করার পর ৮৫ বছর বয়সে তাঁর মৃত্যু হয়।

সেনাপতি কাহতাবা সহকারী আবু আওন ও খালিদ ইবন বারমাক (বারমাকী উজীর পরিবারের ঊর্ধ্বতন পুরুষ) সহ রাই অধিকার করেন এবং ইবন কাহতাবা নিহাওয়ান্দ অবরোধ করলেন। কাহতাবা নগরীর সাহায্যার্থে প্রেরিত এক লক্ষ উমাইয়া সৈন্যের এক বিরাট বাহিনীকে পথিমধ্যে বাধাদান করে পরাজিত করেন। তিন মাস অবরোধের পর নিহাওয়ান্দ আত্মসমর্পণ করল। এরপর কাহতাবা কুফার দিকে যাত্রা করলেন। উমাইয়া সেনাপতি ইবন হুবায়রার নেতৃত্বে সিরীয় বাহিনী কারবালার সন্নিকটে কাহতাবার মুকাবিলা করল। সিরীয় বাহিনী পরাজিত হল। কিন্তু কাহতাবা নিজেও যুদ্ধক্ষেত্রে প্রাণ হারালেন। ইবন কাহতাবা সেনাপতির পদ গ্রহণ করে কুফার দিকে অগ্রসর হলেন এবং প্রায় বিনা বাধায় কুফা দখল করলেন। আবু সালামা নামক একজন হাশিমী প্রচারককে 'রসূলের বংশের ওয়াজীর' বলে ঘোষণা করা হল। আবু সালামা ও ইবন কাহতাবার যুক্ত নামে কুফার জনসাধারণের প্রতি একটি ঘোষণা প্রচার করে বলা হল যে পরদিন জামে মসজিদে একজন খলিফা নির্বাচন করা হবে। নির্দিষ্ট দিনে বনু আব্বাসের কৃষ্ণবর্ণ পোশাকে সজ্জিত জনসাধারণ দলে দলে জামে মসজিদে সমবেত হল। আবু সালামা জুমার নামাজের শেষে খলিফা নির্বাচনের

প্রয়োজনীয়তার কথা বললেন এবং প্রস্তাব করলেন যে আবুল আব্বাস খলিফা হওয়ার জন্য যাবতীয় গুণে গুণান্বিত। সমবেত জনমণ্ডলী উচ্চৈঃস্বরে তকবীর ধ্বনি করে প্রস্তাবে তাদের সম্মতি জ্ঞাপন করল। আবুল আব্বাসকে তাঁর গুপ্তস্থান হতে আনয়ন করবার জন্য দূত প্রেরণ করা হল। তিনি মসজিদে পৌছলে তাঁর হস্তধারণ করে বায়আৎ করার জন্য লোকজনের মধ্যে তুমুল প্রাণ চাঞ্চল্য পরিলক্ষিত হল। এভাবে আবুল আব্বাস খলিফা নির্বাচিত হলেন।

আবুল আব্বাস খলিফা নির্বাচিত ২৯ নভেম্বর ৭৪৯ খ্রিঃ

ইতিমধ্যে কাহতাবার সহকারী আবু আওন শাহরাজোরের কাছে মারওয়ানের পুত্র আবদুল্লাকে পরাজিত করে মসুল অধিকার করেন। খলিফা মারওয়ান শেষবারের মত আব্বাসীয়দের বিরুদ্ধে সর্বশক্তি নিয়োগ করবার, সঙ্কল্প করে স্বয়ং ১ লক্ষ ২০ হাজার সৈন্যের এক বিরাট বাহিনী নিয়ে যাত্রা করলেন। আব্বাসীয় খলিফা আবুল আব্বাস তাঁর পিতৃব্য আবদুল্লাকে সর্বাধিনায়ক নিযুক্ত করে আবু আওনের সাহায্যার্থে প্রেরণ করলেন। উভয় সৈন্যদল জাব নদীর তীরে পরস্পরের সম্মুখীন হল, সিরীয় বাহিনী নদীর ডান তীরে ও আব্বাসীয় বাহিনী নদীর বাম তীরে। মারওয়ান নদীর ওপর সেতু নির্মাণ করে যুদ্ধে অগ্রসর হলেন। প্রথম আক্রমণে আব্বাসীয়গণ পিছু হটে গেল। কিন্তু এর পর আব্বাসীয়গণের প্রচণ্ড আক্রমণের ধাক্কায় সিরীয় বাহিনী পশ্চাদপসরণ করল। মারওয়ান সেতুটি কেটে দিয়েও তাদের পশ্চাদ্ধাবন রোধ করতে পারল না। তারা অধিক সংখ্যায় তরবারির আঘাতে ধরাশায়ী হল এবং ততোধিক সংখ্যায় জাব নদীর গর্ভে নিমজ্জিত হল। এ যুদ্ধে উমাইয়াদের গৌরব রবি চিরতরে অস্তমিত হল। সমগ্র সিরিয়া আব্বাসীয়দের করতলগত হল এবং একে একে সব সিরীয় নগরী আবদুল্লাহ ও তাঁর খুরাসানী বাহিনীর সম্মুখে তাদের দ্বার উন্মুক্ত করে দিল। কেবল দামিস্ক নগরী তাদের গতিরোধ করলে নগরী অবরুদ্ধ হল। ৭৫০ খ্রিস্টাব্দের ২৬ এপ্রিল উমাইয়া রাজধানী অধিকৃত হল এবং সেখানে আব্বাসীয় পতাকা উড্ডীয়মান হল। আবদুল্লাহ্ পলাতক খলিফা মারওয়ানকে অনুসরণ করবার জন্য একদল সৈন্য পাঠালেন। তারা মিসরে নীল নদের পশ্চিম উপকূলে বুসির নামক স্থানে একটি ক্ষুদ্র গির্জায় পলাতক খলিফাকে পেয়ে তাঁকে হত্যা করে (৫ আগস্ট, ৭৫০খ্রিঃ)।

জাবের যুদ্ধ ২৫ জানুয়ারি ৭৫০ খ্রিঃ

আবুল আব্বাস হাশিমীয়গণের প্রতি উমাইয়া নির্যাতনের প্রতিশোধ গ্রহণের জন্য যে ভীষণ শপথ গ্রহণ করেছিলেন তা তিনি এত নিষ্ঠার সাথে পালন করলেন

যে তিনি আস্-সাফ্ ফাহ অর্থাৎ রক্তপাতকারী এই উপাধি প্রাপ্ত হয়েছিলেন। তাঁর আদেশে পরাজিত উমাইয়া বংশের লোকদেরকে নির্মমভাবে অনুসরণ করে হত্যা করা হয়। প্যালেস্টাইনে আবু ফুৎরুস নদীর তীরে আবদুল্লাহ ইবন আলী মারওয়ানের আশিজন আত্মীয় কুটুম্বকে সাধারণ ক্ষমার প্রতিশ্রুতি দিয়ে তাঁর শিবিরে আনয়ন করে নির্মমভাবে হত্যা করেন। উমাইয়া বংশের যে স্বল্পসংখ্যক লোক আব্বাসীয় নিধনযজ্ঞ হতে রক্ষা পেয়েছিল তন্মধ্যে হিশামের দৌহিত্র আবদুর রহমান অন্যতম। তিনি স্পেনে পালিয়ে গিয়ে একটি নতুন উমাইয়া বংশের প্রতিষ্ঠা করেছিলেন। দামিস্ক ও সিরিয়ার অন্যান্য স্থানে অবস্থিত উমাইয়া খলিফাদের সমাধিগুলিও প্রতিহিংসা পরায়ণ আব্বাসীয়দের হাত হতে রক্ষা পায়নি। কেবল ধার্মিক প্রবর দ্বিতীয় উমরের সমাধির ওপর কোন প্রকার অত্যাচার করা হয়নি। এভাবে উমাইয়া বংশের খিলাফতের অবসান হয়ে আব্বাসীয়দের খিলাফত প্রতিষ্ঠিত হল।

গ্রন্থনির্দেশ

১. উইলিয়াম ম্যুর : *কলিফেট।*
২. সৈয়দ আমীর আলী : *হিস্ট্রি অব সারাসেন্স্।*

২০

উমাইয়া বংশের পতন

পূর্ববর্তী অধ্যায়সমূহে উমাইয়াগণের যে ধারাবাহিক ইতিহাস বর্ণিত হয়েছে তাতে মাঝে মাঝে তাদের পতনের কারণসমূহের প্রতি ইঙ্গিত করা হয়েছে। বিশদ আলোচনার সুবিধার জন্য এক্ষণে আমরা কারণগুলি পরস্পর সন্নিবেশিত করছি।

এ সঙ্গে বিখ্যাত মুসলিম ঐতিহাসিক ও সমাজবিজ্ঞানী ইবন খলদুনের মতবাদ বিশেষ প্রণিধানযোগ্য। তাঁর মতে কোন রাজবংশের আয়ু শত বছরের অধিক স্থায়ী হয় না। উমাইয়া বংশের শাসনকাল ছিল নব্বই বছরের মত।

উমাইয়া বংশের পতনের সর্ব প্রধান কারণ শাসকদের দুর্বলতা। একই বংশে বহুদিন ধরে পুরুষানুক্রমে যোগ্য শাসকের জন্ম হয় না। হিশামের চারজন

শাসকদের দুর্বলতা

উত্তরাধিকারীর মধ্যে মারওয়ান ছাড়া অপর সবাই শাসনকার্যের অযোগ্য ও আরাম আয়েশ প্রিয় ছিলেন। উমাইয়া শাসকগণের অনেকেই রাজকার্য ও ধর্মচর্চার চেয়ে শিকার, মদ্যপান ও গান বাজনায় বেশি সময় অতিবাহিত করতেন। অর্থের প্রাচুর্য ও ক্রীতদাস-ক্রীতদাসীর প্রতুলতা রাজবংশকে বিলাসিতা ও স্বেচ্ছাচারিতার পথে ঠেলে দিয়েছিল। হারেমে সংখ্যাতিরিক্ত ক্রীতদাসী রাজবংশের রক্তের বিশুদ্ধতা বিনষ্ট করেছিল। শেষ উমাইয়া খলিফাদের মধ্যে কেউ কেউ অনারব ক্রীতদাসীর গর্ভজাত ছিলেন। মদ্য ও সঙ্গীতের প্রতি অতিশয়াসক্তি এবং হেরেম প্রথা আরবদের নৈতিক অধঃপতন ত্বরান্বিত করেছিল।

অনাদিকাল হতে আরবগণ মুদারী (কয়েস) বা উত্তর আরব এবং হিময়ার (ইয়ামনী) বা দক্ষিণ আরব এ দু প্রধান শাখায় বিভক্ত ছিল। এ দু শাখার

আরবদের অন্তর্দ্বন্দ্ব

আরবগণ কালক্রমে রাজ্য বিস্তারের সঙ্গে সঙ্গে ইরাকে, সিরিয়ায়, খুরাসানে, স্পেনে এবং অন্যান্য স্থানে ছড়িয়ে পড়ে। ইরাকে দাজলা ও ফুরাত নদীর তীরে প্রধানত মুদার বংশীয় এবং সিরিয়ায় প্রধানত ইয়ামনী আরবগণ অধিক সংখ্যায় বসতি স্থাপন করে। সেরকম খুরাসানে উভয়শাখার আরবগণ বিভিন্ন স্থানে বসবাস করতে থাকে। এরা নিজেদের স্বাতন্ত্র্য ও বৈশিষ্ট্য সযত্নে ও সজ্ঞানে রক্ষা করে চলত এবং কালক্রমে দুটি যুযুধান শাখায় বিভক্ত হয়ে পরস্পরের প্রাধান্য প্রতিষ্ঠার জন্য রাজনৈতিক সংগ্রামে অবতীর্ণ হয়। উমাইয়া শাসকগণ একদলের পক্ষাবলম্বন করে অন্য দলকে নির্যাতন করত।

মু'আবিয়া সহ অধিকাংশ খলিফা ইয়ামনী আরবদের মুখপাত্র হিসেবে তাদের স্বার্থ সংরক্ষণে চেষ্টিত ছিলেন। খলিফা প্রথম ওয়ালীদের সময় মুদারবংশীয় কয়েস শাখা বিশেষ প্রাধান্য লাভ করে। কিন্তু ওয়ালীদের ভ্রাতা সুলায়মান ইয়ামনী আরবগণকে বেশি অনুগ্রহ দেখাতেন। দ্বিতীয় ইয়াজিদ ও দ্বিতীয় ওয়ালীদ ছিলেন মুদার বংশের পৃষ্ঠপোষক; আবার তৃতীয় ইয়াজিদ ইয়ামনীদের সহায়তায় ক্ষমতা দখল করেছিলেন। এভাবে উমাইয়া খলিফাগণ দল বিশেষের ক্রীড়নক হিসেবে রাজ্যে সংহতি রক্ষার চেয়ে বিভেদের পথই সুপ্রশস্ত করছিলেন। উত্তর ও দক্ষিণ আরবদের এ বিভেদ সামান্য উস্কানীতেই বিরাট কলহে রূপান্তরিত হতে থাকে এবং শেষ খলিফা মারওয়ানের সময় এ অন্তর্দ্বন্দ্বই রাজ্যের অপরাপর সমস্যার মুকাবিলা করতে প্রতিবন্ধকতার সৃষ্টি করেছিল।

উত্তরাধিকার সমস্যা

মুসলিম রাষ্ট্রে উত্তরাধিকারের জন্য নির্ধারিত কোন নিয়ম ছিল না। প্রাথমিক খলিফাগণের সময় মদীনার জনসাধারণ এবং হযরত মুহম্মদ (স) -এর সাহাবা খলিফা নির্বাচনে বিশিষ্ট ভূমিকা গ্রহণ করতেন। সাম্রাজ্যের বিস্তারের ফলে এবং মুসলমানদের মধ্যে বিভেদের সৃষ্টি হওয়ায় যে কোন খলিফার মৃত্যুর পর খিলাফত নিয়ে বিভ্রান্তি ও অরাজকতার উৎপত্তি হতে পারে মনে করে এবং খিলাফত নিজের বংশে স্থায়ী করার উদ্দেশ্যে সুচতুর মু'আবিয়া তাঁর জ্যেষ্ঠপুত্র ইয়াজীদকে নিজ উত্তরাধিকারী মনোনয়ন করেন। কিন্তু প্রাচীন আরব প্রথা অনুযায়ী বয়োজ্যেষ্ঠ দলপতি নির্বাচন অথবা ইসলামের বিশ্ব ভ্রাতৃত্ব ও সাম্যনীতি বংশগত উত্তরাধিকারের নীতির পরিপন্থী ছিল। এজন্য এনীতি সর্ব সম্মতিক্রমে গৃহীত হয়নি। তাছাড়া গদীনসিন খলিফা পর্যায়ক্রমে দু পুত্রকে উত্তরাধিকারী মনোনীত করতেন, আবার এক পুত্র খলিফা হয়ে ভ্রাতাকে বঞ্চিত করে স্বীয় পুত্রকে খলিফা মনোনয়ন করতেন। এভাবে উত্তরাধিকারের প্রশ্ন নিয়ে কলহ ও অন্তর্দ্বন্দ্বের সূত্রপাত হত।

শিয়া সম্প্রদায়

হযরত আলীর সমর্থক শিয়া সম্প্রদায় উমাইয়া খলিফাগণকে মেনে নিতে পারেনি বিশেষত কারবালার শোচনীয় হত্যাকাণ্ডের পর তারা উমাইয়াগণের বিরোধিতা করতে থাকে। হযরত রসূলুল্লার বংশধর হিসেবে আলীর সন্তানগণ বিশেষ সমাদৃত হতেন। হাসান ও হুসায়নের বংশধরগণ মদীনায় বসবাস করতেন এবং মক্কা-মদীনায় আগত হজ্বযাত্রীদের মনোযোগ ও সহানুভূতি আকর্ষণ করতেন। এভাবে শিয়া সম্প্রদায় ছাড়া অন্যান্য মুসলমানগণও তাদের প্রতি বিশেষভাবে ভক্তিশ্রদ্ধা প্রদর্শন করত এবং উমাইয়া খলিফাগণকে তাদের ধর্ম বিগর্হিত কার্যকলাপের জন্য নিন্দা করত।

অনারব মুসলমানগণ বিশেষত পারস্যদেশীয় মুসলমানগণ নানা কারণে উমাইয়াদের বিরুদ্ধাচরণ করত। তারা উমাইয়া রাষ্ট্রে আরব মুসলমানদের মত সম্পত্তি সমান সুযোগ-সুবিধা পেত না। কোন কোন সময় ইসলাম গ্রহণের পরেও তারা জিযিয়া হতে অব্যাহতি পেত না। কোন অনারব মুসলমান আরব মহিলার পাণি প্রার্থী হতে পারত না। যুদ্ধক্ষেত্রে তারা পায়ে হেটে যুদ্ধ করত এবং তারা গণীমতের অংশীদার হলেও রাষ্ট্রীয় ভাতায় তাদের অধিকার সুপ্রতিষ্ঠিত হয়নি। অন্য পক্ষে ইসলাম ধর্ম এ অসাম্য ও বিভেদ নীতির ঘোরতর বিরোধী ছিল। খারিজী,-মুরজিয়া ও শিয়া সম্প্রদায় মাওয়ালীদের সমান অধিকারের দাবি সমর্থন করত। আব্বাসী প্রচারকগণও তাদের দাবি-দাওয়া মেনে নিয়েছিল। খুরাসানের আব্বাসী নেতা আবু মুসলিম স্বয়ং অনারব ছিলেন এবং অগণিত মাওয়ালী মুসলমান আব্বাসী বিপ্লবের প্রাক্কালে তাঁর পতাকা তলে সমবেত হয়েছিল।

এভাবে শিয়া, মাওয়ালী ও আব্বাসীয় দলের সম্মিলিত প্রচেষ্টার ফলে আবু মুসলিমের নেতৃত্বে খুরাসানের মার্ভ নগরীতে ৭৪৭ খ্রিস্টাব্দের ৯ জুন আব্বাসীয় কৃষ্ণ পতাকা উন্মোচিত ও উত্তোলিত হল। ৭৪৯ খ্রিস্টাব্দের ২৯ নভেম্বর কুফার জুমা মসজিদে আবুল আব্বাস খলিফা নির্বাচিত হলেন। ৭৫০ সালের ২৫ জানুয়ারি জাবের যুদ্ধে আব্বাসীয় বাহিনী মারওয়ানের নেতৃত্বে পরিচালিত সিরীয় বাহিনীকে পরাজিত করে আব্বাসীয় বংশের শক্তি সুদৃঢ় করে। উমাইয়াদের গৌরব-রবি চিরদিনের জন্য অস্তাচলে ডুবে গেল। আরবদের প্রভুত্বের অবসান হয়ে অনারবদের প্রাধান্যের পথ সুপ্রশস্ত হল।

গ্রন্থনির্দেশ

১. পি. কে. হিট্টি : *হিষ্ট্রি অব দি এরাবস।*
২. উইলিয়াম ম্যুর : *কলিফেট।*

২১

উমাইয়া যুগে জ্ঞান-বিজ্ঞান ও সংস্কৃতি

উমাইয়া যুগের প্রধান কীর্তি পৃথিবীর বিভিন্ন অঞ্চলে সাম্রাজ্য বিস্তার। কিন্তু এ যুগেই জ্ঞান বিজ্ঞানের বিভিন্ন শাখায় মুসলমানদের কমবেশি অবদান রয়েছে। গ্রীক, আর্মিনীয়, পারসিক ও পাক-ভারতীয় জ্ঞান-বিজ্ঞানের প্রভাবে মুসলমানগণ নতুন নতুন জ্ঞান-বিজ্ঞানের চর্চা ও অনুশীলন আরম্ভ করে। এ যুগে জ্ঞান-বিজ্ঞানের যে বীজ উপ্ত হয়েছিল তা পরবর্তী আব্বাসীয় যুগে বিরাট মহীরূহে রূপান্তরিত হয়ে শাখা-প্রশাখায় পল্লবিত ও ফলে ফুলে সুশোভিত হয়ে ওঠে। জ্ঞান-বিজ্ঞানের উন্মেষের জন্য উমাইয়া যুগ ইসলামের ইতিহাসে বিখ্যাত হয়ে রয়েছে। এ যুগের খলিফাগণ বিশেষ ধরনের সাহিত্য ও সংস্কৃতির প্রতি আগ্রহশীল ছিলেন। তারমধ্যে কবিতা, গান, স্থাপত্য ও চিত্রকলা প্রধান। উমাইয়া খলিফাগণ কবি ও চারণ, গায়ক ও গায়িকার পৃষ্ঠপোষকতা করতেন। তাঁরা মুসলিম স্থাপত্য শিল্পের উৎকর্ষ সাধন করেন। শাসকের পৃষ্ঠ-পোষকতা ছাড়াও জ্ঞান ও বিজ্ঞানের বিভিন্ন শাখায় এ যুগে মুসলমানদের দান অকিঞ্চিৎকর নয়।

এ যুগেই সর্ব প্রথম কুরআন ও হাদীসের চর্চা আরম্ভ হয়। কুরআন ও হাদীসের চর্চাই পরবর্তীকালে ফিকহ বা মুসলিম আইনের জন্ম দেয়। উমাইয়া

হাদীস ঃ বসরা ও কুফা

যুগের সর্বশ্রেষ্ঠ হাদীসবিদ ছিলেন ইমাম হাসান আল-বসরী। মুসলমানদের বহু ধর্মীয় আন্দোলন বসরীর নিকট হতে অনুপ্রেরণা লাভ করেছিল। সুফীরা তাঁকে বিশেষ শ্রদ্ধা প্রদর্শন করে, মুতাজিলাগণ তাঁকে, তাদেরই একজন মনে করে। সুন্নী মুসলমানগণ তাঁর বিভিন্ন বাণী ভক্তিভরে উদ্ধৃতি করে থাকে। এ যুগের অপর একজন হাদীসবিদ ছিলেন ইবন শিহাব জুহরী। কুফার আবদুল্লাহ ইবন মাসুদ বহু হাদীস বর্ণনা করেন। অপর হাদীসবিদ ইবন শারাহবিল আশ-শাবী বিখ্যাত ইমাম আবু হানীফার শিক্ষক ছিলেন। মক্কা ও

মক্কা ও মদীনা

মদীনায় হাদিসবিদগণের মধ্যে মদীনায় আনাস ইবন মালিক এবং আবদুল্লাহ ইবন উমর ও মক্কার আবদুল্লাহ ইবন আব্বাস বিখ্যাত।

কুফা ও বসরায় এ যুগে আরবি ব্যাকরণের উদ্ভব হয়। অমুসলমানদের কুরআন পাঠ ও কুরআনের অর্থ অনুধাবন করার জন্য ব্যাকরণের উৎপত্তি হয়।

আরবি ব্যাকরণ

আরবি ব্যাকরণের স্থাপয়িতা আবুল আসওয়াদ আদ-দুয়ালী বসরার অধিবাসী ছিলেন। তিনি এ বিষয়ে হযরত আলীর নিকট হতে অনুপ্রেরণা লাভ করেছিলেন বলে মনে করা হয়। অপর বৈয়াকরণ খলিল আরবি ছন্দপ্রকরণ ও অভিধান প্রণয়ন করেন। তাঁরই শিষ্য সিবাওয়াইহ প্রথম

পূর্ণাঙ্গ আরবি ব্যাকরণ গ্রন্থ রচনা করেন। বসরার দেখাদেখি কুফায়ও প্রতিদ্বন্দ্বী ব্যায়াকরণ মতবাদ গড়ে ওঠে।

উমাইয়া খলিফাগণ প্রাচীন আরব রাজা-বাদশাহদের কাহিনী শুনতে পছন্দ করতেন। মু'আবিয়ার আহ্বানে দক্ষিণ আরবের আবিদ ইবন শারইয়াহ

ইতিহাস

'কিতাবুল-মুলুক ওয়া আখবারুল মাদীন' নামক গ্রন্থ প্রণয়ন করেন। ওয়াহাব ইবন মুনাব্বিহ ও কা'ব-আল আহবার নামক ধর্মান্তরিত ইহুদিদের মাধ্যমে অনেক ইহুদি গল্প ও গাঁথা ইসলামী সাহিত্যে স্থান লাভ করে।

উমাইয়া যুগে খলিফাদের প্রত্যক্ষ পৃষ্ঠপোষকতার ফলে কাব্য ও কবিতায় চরম উন্নতি পরিলক্ষিত হয়। এ যুগে রাজনৈতিক কবিতার জন্ম হয়। মিসকিন

কবিতা

আদ-দারিমী নামক জনৈক কবি মু'আবিয়া কর্তৃক ইয়াজীদের খলিফা মনোনয়ন সম্পর্কে কবিতা রচনা করে জনসাধারণের মধ্যে প্রচার করতে থাকেন। হাম্মাদ নামক একজন সংগ্রাহক জাহিলিয়া যুগের কবিতা সঙ্কলন করেন। উমাইয়াদের চারণ কবিদের মধ্যে ফারাজদাক, জরীর ও আখতাল বিখ্যাত। শেষোক্তজন খ্রিস্টধর্মাবলম্বী ছিলেন এবং জোরালো ভাষায় উমাইয়াদের খিলাফতের দাবি সমর্থন করতেন। জরীর ও ফারাজদাক পরস্পর প্রতিদ্বন্দ্বী ছিলেন এবং ব্যাঙ্গরসাত্মক কবিতায় সুনিপুণ ছিলেন। ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কবিগণ জরীর কর্তৃক নিন্দিত হতে পারলেও নিজদেরকে ধন্য মনে করতেন। রাজনৈতিক কবিতা ছাড়া প্রেমের কবিতাও এ যুগে বিশেষ উন্নতি লাভ করে। এ জাতীয় কবিদের মধ্যে উমর ইবন রাবিয়া ও জামীল প্রধান। মজনু ও লায়লার প্রেমের উপাখ্যানের উৎপত্তি এ যুগেই হয়েছিল বলে মনে করা হয়।

উমাইয়া যুগে বাগ্মীতার জন্য কয়েকজন ধর্মীয় ও রাজনৈতিক নেতা বিশেষ খ্যাতি অর্জন করেন। শুক্রবারের নামাজের পূর্বে খুৎবা (বক্তৃতা) করার প্রথা বাগ্মিতা প্রদর্শনের সুযোগ দেয়। গভর্নর ও সৈন্যাধ্যক্ষগণ এতদুপলক্ষে রাজভক্তি ও সামরিক চেতনার ওপর জোর দিতেন। ধর্মীয় বক্তৃতার মধ্যে ইমাম হাসান

বাগ্মিতা ও পত্র লিখন

আল-বসরীর বক্তৃতা, এবং রাজনৈতিক বক্তৃতার মধ্যে জিয়াদ ও হাজ্জাজের বক্তৃতা এ যুগের শ্রেষ্ঠ সাহিত্যিক সম্পদ। খলিফার কর্মাধ্যক্ষগণ সরকারি প্রত্যাদেশ ও চিঠিপত্রে ব্যবহারের জন্য একটি ভাষা পদ্ধতির প্রবর্তন করেন। এ জাতীয় লিখন পদ্ধতির জন্মদাতা আবদুল হামীদ শেষ উমাইয়া খলিফাদের কর্মাধ্যক্ষ ছিলেন।

আল-কেমী, চিকিৎসা-বিজ্ঞান ও জ্যোতির্বিদ্যার প্রারম্ভ এ যুগেই হয়েছিল বলে ধরা হয়। খালিদ ইবন ইয়াজীদ গ্রীক-বিজ্ঞান হতে উপরোক্ত বিষয়সমূহের

বিজ্ঞান

জ্ঞান অর্জন করেছেন বলে বিশ্বাস করা হত। ইমাম জাফর আস-সাদিককে আল-কেমী ও জ্যোতিষের গ্রন্থ প্রণেতা বলে মনে করা হত। বর্তমান গবেষণার ফলে এগুলি কাল্পনিক বলে প্রমাণিত হলেও বিদেশী প্রভাবের ফলে এ যুগে এসব বিজ্ঞানের শাখায় আরবগণ মনোনিবেশ করতে আরম্ভ করেছিলেন বলে নিঃসন্দেহে ধরে নেয়া যেতে পারে। এ যুগের ইহুদি ও খ্রিস্টান চিকিৎসকগণ খলিফাদের পৃষ্ঠপোষকতার ফলে গ্রীক ও সিরীয় ভাষায় লিখিত চিকিৎসা-বিজ্ঞানের গ্রন্থসমূহ আরবিতে অনুবাদ করতে আরম্ভ করেন।

এ যুগে অদৃষ্টবাদ ও মানুষের স্বাধীন কর্মক্ষমতাকে কেন্দ্র করে দুটি বিপরীত ধর্মীয় মতবাদ গড়ে ওঠে। যারা অদৃষ্টবাদকে সমর্থন করত তাদেরকে 'জাবরিয়া'

ধর্মীয় আন্দোলন

ও যারা মানুষের স্বাধীন কর্মক্ষমতায় বিশ্বাসী ছিল তাদেরকে 'কাদরিয়া' বলা হত। উমাইয়া খলিফাগণ নিজেদের রাজনৈতিক স্বার্থে মোটামুটিভাবে জাবরিয়া মতবাদের সমর্থক হলেও পরবর্তী যুগের খলিফাগণ ক্রমবর্ধমান কাদরিয়া মতবাদকে অস্বীকার করতে পারেননি। দ্বিতীয় মু'আবিয়া ও তৃতীয় ইয়াজীদ এ মতবাদে বিশ্বাসী ছিলেন। কাদরিয়াদের অনুরূপ মতামতে বিশ্বাসী মুতাজিলা সম্প্রদায়ের উদ্ভব এ যুগেই হয়েছিল। কথিত আছে, ইমাম হাসান আল-বসরীর শিষ্য ওয়াসিল ইবন আতা ওস্তাদের সাথে একটি আইনের প্রশ্নে বিরুদ্ধ মত পোষণ করে মুতাজিলা (অর্থাৎ দলত্যাগী) আখ্যা লাভ করেন। মুতাজিলাগণও মানবীয় স্বাধীনতায় বিশ্বাসী ছিল এবং পরবর্তীকালে আল্লাহর একক অস্তিত্বে বিশেষ গুরুত্বারোপ করে তারা নিজেদেরকে 'আহলুল-আদল ওয়াত-তাওহীদ' (সুবিচার ও একত্ববাদে বিশ্বাসী) বলে অভিহিত করত।

বিখ্যাত মহীয়সী সাধ্বী রাবিয়া বসরী এ যুগেই তাঁর সাধনা ও তপস্যার জন্য খ্যাতি অর্জন করেছিলেন। এ যুগে মুসলমানদের মধ্যে কতকগুলি ধর্মভিত্তিক রাজনৈতিক দলের উদ্ভব হয়। প্রধানত খলিফা বা ইমাম নির্বাচনের প্রশ্নে মতবিরোধের ফলেই এ দলগুলির জন্ম হয়। খারিজী সম্প্রদায়ের উদ্ভব হয় সিফফিনের যুদ্ধের পর। আলীর (রা) দল হতে বহুসংখ্যক লোক সরে পড়ে এবং খারিজী বা দলত্যাগী আখ্যা প্রাপ্ত হয়। এ সম্প্রদায়ের মতে, খলিফা সার্বজনীন ভোটে নির্বাচিত হবে। তাদের আদর্শ বাস্তবে রূপায়িত করার জন্য তারা বল প্রয়োগের পক্ষপাতী ছিল এবং এজন্য তারা মুসলিম রাজ্যে বহু রক্তের নদী প্রবাহিত করেছিল।

মুরজিয়া নামক এক সম্প্রদায় পাপিষ্ঠ মুসলমানদেরকে কাফির বলে আখ্যায়িত করতে চাইত না। তারা এ সব লোকের বিচারের ভার আল্লাহর ওপর

ছেড়ে দিবার পক্ষপাতী ছিল এদের অপর মতবাদ রাজনৈতিক ক্ষমতায় প্রতিষ্ঠিত শাসকদের (উমাইয়া খলিফাগণের) স্বীকৃতি দান। এ দলের মতে, উমাইয়াগণ শুধু যে মুসলমান ছিলেন, এটাই তাঁদের খলিফা হওয়ার জন্য যথেষ্ট। অন্যপক্ষে শিয়া-সম্প্রদায় নির্বাচন অথবা বল প্রয়োগে ক্ষমতা দখলের বিরুদ্ধাচরণ করে আলী (রা) ও তাঁর বংশধরগণের মধ্যে বংশানুক্রমে ইমামের (ধর্মীয় ও রাজনৈতিক নেতা) পদ সুনির্ধারিত থাকবে, এ বিশ্বাসে অটল ছিল।

উমাইয়া খলিফাগণ স্থাপত্য শিল্পে অনুরাগী ছিলেন। খলিফা প্রথম ওয়ালীদ ছিলেন এ যুগের সর্বশ্রেষ্ঠ নির্মাতা। তাঁর পিতা আবদুল মালিক জেরুজালেমের

স্থাপত্য বিখ্যাত 'কুব্বাতুস-সাখরা'(প্রস্তর গুম্বুজ) নির্মাণ করেন। ইবন

চিত্রকলা, সঙ্গীত জুবায়র কর্তৃক অধিকৃত মক্কা-মদীনা হতে হজ্বযাত্রীদেরকে আকৃষ্ট করার উদ্দেশ্যে তিনি এটা নির্মাণ করেছিলেন। এ যুগের সর্বাপেক্ষা উল্লেখযোগ্য কীর্তি ওয়ালীদ কর্তৃক নির্মিত দামিস্কের জুমা মসজিদ। এতে জুমা মসজিদের যাবতীয় বৈশিষ্ট্য, যেমন — মিনার, প্রদীপের কুলুঙ্গী, মিম্বর, গুম্বুজ ও ঘোড়ার নালের আকৃতি খিলান ইত্যাদির একত্র সমাবেশ একে অপূর্ব সুষমামণ্ডিত করে পরবর্তীকালে মসজিদ নির্মাণের জন্য আদর্শ স্থানীয় করে তুলেছিল। উমাইয়া খলিফাগণ সিরিয়ার মরু অঞ্চলে প্রমোদ-ভবন তৈরি করেছিলেন। তন্মধ্যে বিখ্যাত 'কায়সার আমরা' প্রাসাদ অপূর্ব কলা-নৈপুণ্যের পরিচায়ক। এ প্রাসাদের দেয়াল-চিত্র বিশেষ প্রশংসার যোগ্য। কোন কোন প্রতীক চিত্রে বিজয়, দর্শন, ইতিহাস, কাব্য প্রভৃতি ভাব রূপায়িত হয়েছে। আবার কোন কোন চিত্রে নর্তক-নর্তকী ও গায়ক-গায়িকার নগ্নমূর্তি প্রদর্শিত হয়েছে। উমাইয়া খলিফাগণ সঙ্গীতের একনিষ্ঠ পৃষ্ঠপোষক ছিলেন। খলিফাগণের মধ্যে কেউ কেউ সঙ্গীতকলায় পারদর্শীও ছিলেন। সঙ্গীতজ্ঞ ও গায়কদের মধ্যে সাঈদ ও মা'বাদের নাম উল্লেখযোগ্য। মদীনার জমীলা বিখ্যাত গায়িকা ও বহু গায়ক-গায়িকার শিক্ষাদাত্রী ছিলেন। দ্বিতীয় ইয়াজীদের প্রিয়পাত্রী সাল্লামা ও হাবাবা নাম্নী গায়িকাদ্বয় জমীলার শিষ্যা ছিলেন।

গ্রন্থনির্দেশ

১. নিকলসন ঃ *লিটারারি হিস্ট্রি অব দি এরাবস্।*

২. পি. কে. হিট্টি ঃ *হিস্ট্রি অব দি এরাবস্।*

২২

উমাইয়া শাসন ও সমাজ

উমাইয়া সাম্রাজ্যের প্রদেশ-বিভাগ মোটামুটি বাইজান্টাইন ও সাসানীয় প্রদেশের অনুরূপ ছিল। নিম্নলিখিত নয়টি প্রদেশ পাঁচজন রাজ-প্রতিনিধির দ্বারা শাসিত হত ঃ

১। সিরিয়া-প্যালেস্টাইন।

২। কুফা (ইরাকসহ)।

৩। বসরা-পারস্য, সিজিস্তান, খুরাসান, বাহরাইন, উমান এবং সম্ভবত নাজদ ও ইয়ামামা এ প্রদেশের অন্তর্ভুক্ত ছিল।

৪। আর্মিনিয়া।

৫। হিজায।

৬। কিরমান ও পাক-ভারতের প্রত্যন্ত অঞ্চল।

৭। মিসর।

৮। ইফ্রিকিয়া।

৯। ইয়ামন ও দক্ষিণ আরব।

মু'আবিয়া বসরা ও কুফাকে একত্রিত করে কুফায় রাজধানীসহ একজন রাজপ্রতিনিধির অধীনে ন্যস্ত করলেন। পারস্য ও পূর্ব-আরব এই ইরাকের রাজপ্রতিনিধির অধীনে ছিল। পরবর্তীকালে ইরাকের রাজপ্রতিনিধির অধীনে খুরাসান ও ট্রান্সঅক্সিয়ানার জন্য মার্ভে একজন সহকারী গভর্নর এবং সিন্ধু ও পাঞ্জাবে অপর একজন সহকারী গভর্নর নিযুক্ত হয়। অনুরূপ হিজায, ইয়ামন এবং মধ্য-আরব মিলে এক রাজপ্রতিনিধির শাসনাধীন ছিল। জজীরা, আর্মিনিয়া, আজরবাইজান ও পূর্ব-এশিয়া—মাইনরের কিয়দংশ মিলে তৃতীয় অঞ্চল গঠিত হল। মিসর চতুর্থ রাজপ্রতিনিধির অধীনে ছিল। মিসরের পশ্চিমের উত্তর-আফ্রিকা অঞ্চলই স্পেন, সিসিলি ও পার্শ্ববর্তী দ্বীপাঞ্চল নিয়ে পঞ্চম রাজপ্রতিনিধির অঞ্চল গঠিত হল। ইফ্রিকিয়া নামে অভিহিত এ অঞ্চলের রাজধানী কায়রোয়ান।

এসব বড় বড় অঞ্চলের রাজনৈতিক অধিকর্তার উপাধি ছিল আমীর অথবা সাহিব। রাজনৈতিক ও সামরিক সব ক্ষমতা আমীরের হাতে ন্যস্ত ছিল, কিন্তু

রাজস্ব আদায়ের জন্য প্রায়শ সাহিবুল খারাজ নামক একজন বিশেষ কর্মচারী নিযুক্ত হতেন। তিনি শুধু খলিফার নিকট আপন কাজের জন্য জবাবদিহী থাকতেন। কখনও কখনও রাজপ্রতিনিধিরা স্বয়ং রাজধানীতে অবস্থান করে নিজ নিজ অঞ্চলে নিজেদের প্রতিনিধি (নায়িব) প্রেরণ করতেন।

রাজ্যের রাজস্ব খুলাফায়ে রাশেদীনের সময়ের মতই ভূমি-রাজস্ব (খারাজ), জিয্য়া, যাকাত ও খুমুস (গনীমতের এক-পঞ্চমাংশ) হতে গৃহীত হত। প্রদেশের রাজস্ব প্রথমে প্রদেশেই সংগৃহীত হয়ে প্রাদেশিক কোষাগারে রক্ষিত হত। প্রাদেশিক শাসনের যাবতীয় ব্যয়। যেমন—সৈন্যদের বেতন, ভাতাভোগীদের ভাতা, কর্মচারীদের বেতন, জনহিতকর কাজ; যেমন—রাস্তাঘাট, খাল, দালানকোঠা নির্মাণ, মসজিদ-মাদ্রাসার ব্যয় প্রভৃতি নির্বাহ হত। উদ্বৃত্ত রাজস্ব খলিফার নিকট কেন্দ্রীয় কোষাগারে জমা দেয়া হত।

বিচার-বিভাগ কাজীদের দ্বারা পরিচালিত হত। বড় বড় শহরের জন্য কাজী নিযুক্ত হত। আইনজ্ঞ (ফকীহ) লোকদের মধ্য হতে কাজী নিযুক্ত হত। এঁদের কুরআন ও হাদীসে সম্যক জ্ঞান থাকত। মুসলমানদের মধ্যে বিরোধ নিষ্পত্তির জন্য মুসলিম আইন অনুসারে এঁরা বিচার করতেন। কারণ অমুসলমানগণ নিজ নিজ আইন অনুসারে তাদের ধর্মীয় নেতার বিচারাধীন থাকত। বিচারের কাজ ছাড়া কাজিগণ ওয়াক্ফ্-সম্পত্তির তত্ত্বাবধান করতেন।

পুলিশের অধিনায়ককে সাহিবুশ-শুরতা বলা হত। মু'আবিয়া সরকারি প্রত্যাদেশ ও চিঠিপত্রের বিশুদ্ধতা সুনিশ্চিত করার জন্য দীওয়ানুল খাতাম নামক বিভাগ প্রবর্তন করেন। এ বিভাগে যাবতীয় সরকারি আদেশ ও চিঠিপত্রের অনুলিপি রক্ষিত হত। এর ফলে আবদুল মালিকের সময়ের মধ্যে দামিস্কে সরকারি দলীলপত্রের এক বিরাট সম্ভার গড়ে ওঠে। মু'আবিয়ার অপর কীর্তি দীওয়ানুল বারীদ বা ডাকবিভাগ সংগঠন। আবদুল মালিকের সময় এ বিভাগের প্রভূত উন্নতি সাধিত হয়। সরকারি কাজের জন্য প্রদেশসমূহ গ্রীক ও সিরীয় ভাষার পরিবর্তে আরবি ভাষার ব্যবহার, খাঁটি আরবি মুদ্রার প্রবর্তন প্রভৃতি শাসন সংস্কারের জন্য আবদুল মালিকের নাম চিরস্মরণীয় হয়ে রয়েছে।

উমাইয়াদের সময় বাইজান্টাইনদের অনুরূপ বেতনভুক নিয়মিত সেনাবাহিনী রাখা হত। মু'আবিয়া আরবদের একটি নৌ-বহরও গঠন করেছিলেন। যুদ্ধের সময় সৈন্যগণ অন্যান্য সময়ের চেয়ে বেশি বেতন-ভাতা পেত। পদাতিক ও অশ্বারোহী ছাড়া সেনাবাহিনীতে গোলন্দাজ বাহিনীও থাকত। এক সময় উমাইয়া

বাহিনী ৬০,০০০ লোকের দ্বারা গঠিত ও বাৎসরিক ৬০,০০০,০০০ দিরহাম ব্যয়ে পরিপোষিত হত। পরবর্তীকালে এ সৈন্যসংখ্যা ১,২০,০০০-এ উন্নীত হয়।

খলিফার জীবনযাত্রা

উমাইয়া খলিফাগণ রাজকীয় প্রাসাদে সাড়ম্বরে জীবনযাত্রা নির্বাহ করতেন। খলিফা শুক্রবারে জুমার নামাজে ও দৈনিক পাঁচবার নামাজে নেতৃত্ব করতেন। মু'আবিয়া, আবদুল মালিক ও দ্বিতীয় উমর এ কর্তব্য যথাযথ পালন করতেন। অন্যান্য খলিফাগণ দৈনিক নামাজে নেতৃত্ব করতে শৈথিল্য প্রদর্শন করতেন। জুমার নামাজের সময় খলিফা খুৎবা (বক্তৃতা) দিতেন। কোন কোন খলিফা জুমার নামাজের ইমামতিও পছন্দ করতেন না।

নামাজে নেতৃত্ব করা ছাড়া খলিফা আমীর-উমরার সাথে সর্বসাধারণ্যে অথবা বিশেষকক্ষে সাক্ষাৎদান করতেন। সাধারণ দরবারে তিনি উচ্চ সিংহাসনে সমাসীন থাকতেন। খলিফার পরিবারের সদস্যগণ বসতেন তাঁর ডানে এবং সভাসদ ও আমীর-উমরা তাঁর বামে উপবিষ্ট থাকতেন। তাঁর সম্মুখে অগণিত জনসাধারণ, রাজধানীর গণ্যমান্য ব্যক্তি, সওদাগর, শিল্পী, কবি ও অন্যান্য লোক তাঁর দর্শনপ্রার্থী হয়ে তাঁকে সালাম জানাতেন। বিশেষ দরবারে (খাস দরবারে) তিনি আমীর-উমরা, উমাইয়া বংশের বিশিষ্ট ব্যক্তি ও অন্যান্য অনুগ্রহভাজনদের সাথে মিলিত হতেন। এ সব সাক্ষাৎকার উপলক্ষে খলিফা জাঁকজমকপূর্ণ পোশাকে সুসজ্জিত হতেন।

সন্ধ্যার পর খলিফাগণ লঘু পরিবেশে গল্পের আসর বা গান-বাজনার মজলিসে কালাতিপাত করতেন। মু'আবিয়া প্রাচীনকালের রাজা-বাদশাহদের, বিশেষত দক্ষিণ-আরবের বাদশাহদের কাহিনী শ্রবণ করতে ভালবাসতেন। তিনি ইয়ামন হতে আবীদ ইবন শারইয়াহ নামক একজন গাল্পিককে আহ্বান করেন এবং তাঁর মুখে প্রাচীন লোকদের কাহিনী শুনতে শুনতে অধিক রাত্রি জাগরণ করতেন। মু'আবিয়ার পুত্র ইয়াজীদের আমল হতে নৈশ-অনুষ্ঠানে সুরাপান প্রচলিত হয়। মক্কা ও মদীনা এ সময় সঙ্গীতচর্চার কেন্দ্র হয়ে ওঠে। খলিফার আহ্বানে গায়ক-গায়িকা ও নর্তক-নর্তকী মক্কা-মদীনা হতে দামিস্কে আসত এবং তাদের শিল্পনৈপুণ্যে নৈশ-মজলিস সরগরম করে তুলত। এ সব অনুষ্ঠানে একদিকে যেমন সুরাপান অব্যাহত থাকত, অপরদিকে তেমনি এসবের মাধ্যমে কাব্য ও সঙ্গীতের চরম উৎকর্ষ সাধিত হয়।

খলিফা ও তাঁর সভাসদগণ মৃগয়া, ঘোরদৌড়, পাশাখেলা ও পোলোখেলা পছন্দ করতেন। মোরগের লড়াই এ সময় প্রচলিত ছিল এবং অনেকে এতে বেশ আনন্দ উপভোগ করতেন। শিকারের জন্য পোষা শিকারী কুকুর ব্যবহার করা হত। এ উদ্দেশ্যে পোষা চিতার ব্যবহারও প্রচলিত ছিল। উমাইয়া খলিফাগণ ঘোড়দৌড়ে বিশেষ আগ্রহশীল ছিলেন। ভাল জাতের ঘোড়া প্রতিপালন এবং সেগুলিকে দৌড়-প্রতিযোগিতার জন্য ব্যবহার করার শখ অনেকেরই ছিল। খলিফা প্রথম ওয়ালীদ জনসাধারণের জন্য ঘোড়াদৌড় প্রতিযোগিতার ব্যবস্থা করেন। খলিফা সুলায়মানও ঘোড়দৌড়ে আমোদ পেতেন। হিশামের সময়ে অনুষ্ঠিত এক ঘোরদৌড়ে খলিফা ও অন্যদের ঘোড়াসমেত মোট ৪০০০ ঘোড়া অংশগ্রহণ করেছিল। এই খলিফার একজন দুহিতাও দৌড়ের জন্য অশ্ব পুষতেন।

উমাইয়া যুগে মেয়েরা স্বাধীনভাবে ও অবাধে ঘুরে বেড়াতে পারত। দ্বিতীয় ওয়ালীদের সময় পর্যন্ত এ স্বাধীনতা অব্যাহত থাকে। এর পর ধীরে ধীরে বাইজান্টাইনদের অনুকরণে মেয়েদের জন্য অবরোধ প্রথা চালু হয়। অন্তঃপুরে রক্ষণাবেক্ষণের জন্য খোজা প্রহরী নিযুক্ত হয়। এটাও একটা বাইজান্টাইন প্রথা। এ যুগে মেয়েরা শিল্প ও সাহিত্য চর্চায় বিশেষ আগ্রহ দেখাত। মদীনায় হুসায়নের কন্যা সৈয়দা সুকায়না তাঁর সঙ্গীত ও কাব্যে অনুরক্তি, তাঁর অপূর্ব সৌন্দর্য ও প্রত্যুৎপন্নমতিত্বের জন্য খ্যাতি অর্জন করেছিলেন। তাঁর বাসভবন কবি সাহিত্যিক, আইনজ্ঞ ও অন্যান্য গুণী ব্যক্তিদের সমাবেশে সুষমামণ্ডিত হয়ে উঠতো। সুকায়নার মত তালহার কন্যা আয়েশা তায়িফে তাঁর বিদ্যা-বুদ্ধি, সৌন্দর্য ও সুরুচির জন্য সমসাময়িকদের অকুণ্ঠ প্রশংসা লাভ করেন।

আরবদের পোশাক-পরিচ্ছেদ বিশেষ পরিবর্তন লাভ করেনি। তবে এখানে আঁটসাট 'কাবা'র প্রচলন হতে দেখা যায়। পেশা অনুযায়ীও পোশাকের কিঞ্চিদধিক তারতম্য হতে থাকে। যেমন ফকীহের (আইনজ্ঞের) পোশাক, কেরানির পোশাক অথবা সৈনিকের পোশাক হতে ভিন্ন ছিল। বিভিন্ন কাজের জন্যও বিভিন্ন পোশাকের প্রচলন ছিল। যেমন অশ্বারোহণে আঁটসাট জামা ও আঁটসাট পায়জামা ব্যবহৃত হত; আর বাড়িতে ঢিলাঢালা ও লম্বা পোশাক পরিধান করা হত। দামিস্কের জীবনযাত্রা লঘু ও চটুল পরিবেশে বিশেষ স্বকীয়তার দাবিদার ছিল। দর্শক সচরাচর দেখবে, দামিস্কের অধিবাসী ঢিলাঢালা পায়জামা, লাল চোখা জুতা ও প্রকাণ্ড শিরস্ত্রাণ পরিহিত হয়ে মরুভূমির আতপ-দগ্ধ ও

কুফিয়া নামক লাল শিরস্ত্রাণ পরিহিত বেদুঈনের সাথে কাঁধে কাঁধ মিলাচ্ছে। এখানে-সেখানে সম্ভ্রান্ত ও অভিজাত দামিস্কবাসিকে সাদা রেশমের তৈরি আবা পরিহিত ও তরবারী কিংবা বর্শায় সজ্জিত হয়ে অশ্বারোহণে ঘুরে বেড়াতে দেখা যাবে। স্বল্পসংখ্যক বুরকা পরিহিতা মহিলা রাস্তা পার হচ্ছে; কেউ কেউ জাফরিমণ্ডিত বাতায়ন পথে উঁকি মেরে হাটবাজার ও রাস্তাঘাট দেখছে। শরবত ও মিষ্টি বিক্রেতাগণ তারস্বরে হাঁকছে এবং অগণিত গাধা ও উট বিভিন্ন পশরা নিয়ে মৃদুমন্দ গতিতে চলে যাচ্ছে। এসব চিত্তাকর্ষক ও প্রাণবন্ত দৃশ্য দামিস্কের নিত্যনৈমিত্তিক ব্যাপার ছিল। অদ্যাপি এ জীবনযাত্রার বিশেষ পরিবর্তন ঘটেনি।

গ্রন্থনির্দেশ

১. পি. কে. হিট্টি : *হিস্ট্রি অব দি এরাবস্।*

২. সৈয়দ আমীর আলী : *হিস্ট্রি অব দি সারাসেনস্।*

২৩

আব্বাসীয় যুগ ঃ নতুন দিগন্ত

(৭৫০—১২৫৮ খ্রিঃ)

আবুল আব্বাস আস-সাফ্ফাহ্ যে বংশের শাসন প্রতিষ্ঠা করলেন, তাকে প্রকৃত খিলাফত আখ্যা দেয়া হয়েছে। আব্বাসীয় প্রচারণায় উমাইয়া বংশের খিলাফতকে রাজতন্ত্র ও ধর্মবিবর্জিত বলে জনসমক্ষে চিত্রিত করা হয়েছে। খলিফা এখানে তাঁর ধর্মীয় ভূমিকার উপর বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করা আরম্ভ করলেন। তিনি অধর্ম ও অনৈসলামিক কার্যকলাপের বিরুদ্ধে অবিশ্রান্ত জিহাদ ঘোষণা করলেন। তিনি ধর্মীয় আইন-কানুনের জ্ঞানসম্পন্ন আলিম ও ফকীহগণকে দরবারে সম্মানজনক আসন দান করতেন এবং তাঁদের পরামর্শ মত শাসনকার্য চালাতেন। নতুন বংশের খলিফাগণ তাঁদের উপাধি ও পদবীতে, বেশ-ভূষায় ও বাহ্যিক আচরণে ধর্মের প্রাধান্য প্রদর্শন করতে চেষ্টিত ছিলেন। ধর্মীয় বিধি-নিষেধ কার্যকরী করার উদ্দেশ্যে নতুন কর্মচারী নিযুক্ত হল। বিরুদ্ধবাদিদের বিরুদ্ধে কঠোর শাস্তির ব্যবস্থা করা হল। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে উমাইয়া ও আব্বাসীয় খলিফাদের মধ্যে ধর্মীয় পার্থক্য নামেমাত্র ছিল। প্রকৃত প্রস্তাবে আব্বাসীয় খলিফাগণও তাঁদের ব্যক্তিগত এবং পারিবারিক স্বার্থকে ধর্মীয় স্বার্থের উর্ধ্বে তুলে ধরতেন। তাঁরা বিলাসস্রোতে গা ভাসিয়ে দিয়ে দিনাতিপাত করতেন। রাজকীয় বেশভূষা ও জাঁকজমক, দরবারের জৌলুস, খলিফার একক প্রতিপত্তি ও ক্ষমতা প্রভৃতি বিষয়ে আব্বাসীয়গণ খুলাফায়ে রাশেদীনের চেয়ে প্রাচীন পারসিক সম্রাটদের সাথে বেশি তুলনীয়। বাগদাদে রাজধানী স্থাপিত হওয়ার পর হতে প্রাচীন পারসিক রাজতন্ত্র খলিফাগণকে বেশি প্রভাবিত করতে থাকে।

উমাইয়া যুগের সাথে আব্বাসীয় যুগের প্রধান পার্থক্য এই যে, উমাইয়া যুগে রাষ্ট্রের সর্বক্ষমতা আরবগণের একচেটে ছিল, কিন্তু আব্বাসীয় খলিফাগণ অনারবদের বাহুবলে ক্ষমতা দখল করেছিলেন, সেজন্য তাঁদের সময় রাষ্ট্রে আরবদের প্রাধান্য বিলুপ্ত হল। মাওয়ালী, মুসলমানগণ রাষ্ট্রের প্রধান প্রধান পদে শনৈঃ শনৈঃ উন্নতি লাভ করতে থাকে। খলিফাদের দেহরক্ষীরা খুরাসানের অধিবাসী ছিল। খলিফার উজীরগণ পারসিক ছিলেন। আরবীয় রাষ্ট্রের পরিবর্তে

বিভিন্ন জাতি ও বংশের আন্তর্জাতিক রাষ্ট্র স্থাপিত হল। ইসলামের পতাকাতলে আন্তর্জাতিক ইসলামের নামে ইরানীদের প্রভুত্ব স্থাপিত হতে চলল।

আব্বাসীয় যুগের অপর বৈশিষ্ট্য হল যে, মুসলিম সাম্রাজ্যের কোন কোন অঞ্চল এখানে স্বাধীন হতে লাগল। কাজেই সমগ্র মুসলিম জগৎ খলিফার প্রাধান্য মেনে চলত না। স্পেন ও উত্তর-আফ্রিকা, উমান, সিন্ধু ও খুরাসান নতুন খলিফাকে স্বীকার করত না। মিসরের আনুগত্যও নামেমাত্র ছিল।

আব্বাসীয় যুগে বহু জাতি ও বর্ণের লোকদের সমবেত চেষ্টায় এক অভূতপূর্ব অর্থনৈতিক উন্নতি ও সাংস্কৃতিক অভ্যুত্থান ঘটে। আন্তর্জাতিক ব্যবসা-বাণিজ্য প্রসারের ফলে বহু নগর-বন্দর গড়ে ওঠে। বিভিন্ন কাঁচামাল ও শিল্পজাত দ্রব্য মুসলিম সাম্রাজ্য ছাড়িয়ে সুদূর ভারত, সিংহল, মালয়, জাভা, সুমাত্রা ও চীনদেশ পর্যন্ত চলে যেত। ঐ সব অঞ্চল হতেও বিভিন্ন পণ্যাদি মুসলিম সাম্রাজ্যে আনীত হত। রাশিয়া, ফিনল্যাণ্ড, সুইডেন, জার্মানি প্রভৃতি অঞ্চলে প্রাপ্তমুদ্রা হতে এ সব দেশের সাথে ব্যবসা-বাণিজ্য চালু ছিল বলে জানা যায়। ব্যবসা-বাণিজ্যের ফলে আর্থিক উৎকর্ষ এবং পণ্য বিনিময়ের সাথে সাথে সংস্কৃতির আদান-প্রদান এ যুগে সাহিত্য ও সংস্কৃতির ক্ষেত্রে এক অভূতপূর্ব আলোড়নের সৃষ্টি করে। গ্রীক, পারসিক ও ভারতীয় জ্ঞান-বিজ্ঞানের প্রভাবে মুসলমানগণ সাহিত্য, দর্শন ও বিজ্ঞানে প্রভূত উন্নতি সাধন করে স্বকীয় মৌলিক অবদান রেখে যায়। এ সাংস্কৃতিক আন্দোলনে অনারব মুসলমান এবং অমুসলিমদের দান সর্বাধিক।

২৪

আব্বাসীয় বংশের প্রতিষ্ঠাতা ঃ সাফ্ফাহ্ ও মনসুর

নতুন খলিফা আব্বাসীয় বংশের জন্য কুফাকে নিরাপদ মনে করতে পারলেন না। কারণ কুফার অধিবাসিগণ আলীর (রা) বংশধরদের সমর্থক ছিল। তাই তিনি ফুরাত নদীর তীরবর্তী আল-আনবার নামক স্থানে বাসস্থান নির্মাণ করে

সাফ্ফাহ ৭৪৯ —৭৫৪ খ্রিঃ

পূর্ব-পুরুষের নামানুসারে এর নাম রাখলেন হাশিমীয়া। উমাইয়া পরিবারের সব লোককে ধরাপৃষ্ঠ হতে মুছে ফেলার যে-পরিকল্পনা তিনি গ্রহণ করেছিলেন, সে-বিষয়ে আগেই আলোচনা করা হয়েছে। উমাইয়া বংশের মৃত খলিফাগণও অপমানের হাত হতে রক্ষা পাননি, তাও আগে বলা হয়েছে। এ সব কার্যকলাপের ফলে দামিস্ক, হিম্স্, কিন্নিসরিন, প্যালেস্টাইন ও মেসোপটেমিয়ায় ব্যাপক বিদ্রোহ দেখা দিল। কিন্তু একে একে এ সব শহরে আব্বাসীয় শাসন প্রতিষ্ঠিত হল। ইরাকের উমাইয়া শাসনকর্তা ইয়াজীদ ইবন হুবায়রা ওয়াসিতে উমাইয়া অধিকার অব্যাহত রাখেন। আব্বাসীয় সেনাপতি হাসান ইবন কাহতাবা এবং খলিফার ভ্রাতা আবু জাফর ওয়াসিত অবরোধ করেন। এগার মাস অবরোধের পর ইয়াজীদ ইবন হুবায়রা নিরুপায় হয়ে আত্মসমর্পণের প্রস্তাব করলেন। ইতিমধ্যে শেষ উমাইয়া খলিফা মারওয়ানের মৃত্যু সংবাদও এসে পৌঁছল। ইয়াজীদ তাঁর নিজের, পরিবারবর্গের ও অনুচরদের নিরাপত্তার প্রতিশ্রুতি পেয়ে আবু জাফরের কাছে আত্মসমর্পণ করলেন। কিন্তু খুরাসান হতে আবু মুসলিম খলিফার কাছে ইয়াজীদ ও তাঁর অনুচরবর্গের হত্যার দাবি করে পরামর্শ পাঠালেন। খলিফা আবু জাফরকে বার বার এ মর্মে পত্র লিখলেন। কিন্তু আবু জাফর এতে রাজি হলেন না। অবশেষে খলিফা দুজন আজ্ঞাবহ ব্যক্তিকে পাঠিয়ে ইবন হুবায়রা ও তাঁর পুত্রকে হত্যা করালেন। খলিফার অপর ভ্রাতা ইয়াহিয়া মসুলের অধিবাসীদেরকে নানাভাবে নির্যাতন করে মসুলকে আব্বাসীয়দের অধিকারভুক্ত করেন। অনুরূপভাবে সিন্ধু, উমান ও খুরাসানে বিদ্রোহ প্রশমিত হয়।

হাশিমীবংশের ওয়াজীর আবু সালামার কথা পূর্বে উল্লেখ করা হয়েছে। আস্-সাফ্ফাহের সাথে অচিরেই আবু সালামার মনোমালিন্য উপস্থিত হয়। খলিফা

খুরাসানে আবু মুসলিমের কাছে উপদেশ চেয়ে পাঠালে, আবু মুসলিম আবু সালামার হত্যার পরামর্শ দান করলেন। আবু সালামাকে পরিকল্পিতভাবে হত্যা করে গুজব ছড়িয়ে দেয়া হল যে, খারিজিগণ তাঁকে হত্যা করেছে।

আস্-সাফ্ফাহ্ তাঁর আনবারস্থ প্রাসাদে অনধিক ত্রিংশ বছর বয়সে মৃত্যুমুখে পতিত হন। তিনি বার্মাকী বংশের খালিদকে অর্থমন্ত্রী নিযুক্ত করে বার্মাকী বংশের ভবিষ্যৎ সুখ ও সমৃদ্ধির পথ সুপ্রশস্ত করেন। তিনি তাঁর ভ্রাতা আবু জাফরকে এবং ভ্রাতুষ্পুত্র ঈসাকে পর পর তাঁর উত্তরাধিকারী মনোনীত করে যান।

আবু জাফর আল্ মনসুর
(৭৫৪ — ৭৭৫ খ্রিঃ)

আস্-সাফ্ফাহর মৃত্যুর সময় তাঁর ভ্রাতা আবু জাফর হজ্ উপলক্ষে মক্কায় অবস্থান করছিলেন। আবু জাফর কুফায় প্রত্যাবর্তন করে জামে মসজিদে নামাজ পড়ালেন এবং তৎপর আনবারে গমন করে আল্-মনসুর উপাধি ধারণ করে খিলাফতের ভার গ্রহণ করলেন। আল-মনসুরই আব্বাসীয় বংশের খিলাফতের প্রকৃত স্থাপয়িতা। আব্বাসীয় বংশের পঁয়ত্রিশজন খলিফাই তাঁর বংশধর ছিলেন।

খলিফা হওয়ার পর পরই তাঁর পিতৃব্য আবদুল্লাহ্ ও খুরাসানের শাসনকর্তা আবু মুসলিমের সাথে তাঁর বিবাদ আরম্ভ হয়। আবদুল্লাহ্ বিখ্যাত জাবের যুদ্ধে উমাইয়া-বাহিনীকে চূড়ান্তভাবে পরাজিত করেছিলেন। তিনি এখন সিরিয়ার শাসনকর্তা ছিলেন এবং বহু সৈন্যসামন্ত তাঁর অনুগত ছিল। মারওয়ানের বিরুদ্ধে জয়ী হলে তিনি খিলাফতের উত্তরাধিকারী মনোনীত হবেন, আস্-সাফ্ফাহ্ তাঁকে এরূপ প্রতিশ্রুতিও দিয়েছিলেন। তাই মনসুরের খিলাফত লাভের সঙ্গে সঙ্গে তিনি বিদ্রোহী হলেন। খলিফা আবু মুসলিমকে আবদুল্লাহ্র বিরুদ্ধে প্রেরণ করলেন। নাসিবিনের যুদ্ধে (নভেম্বর, ৭৫৪ খ্রিঃ) আবু মুসলিম আবদুল্লাহকে পরাজিত ও বন্দী করলেন। সাত বছর বন্দী অবস্থায় থাকার পর তাঁকে একটি জলপরিবৃত ও লবণের ভিত্তির ওপর নির্মিত একটি গৃহে নিয়ে যাওয়া হয়। পরবর্তী বৃষ্টিপাতের সঙ্গে সঙ্গে লবণের ঘর ধ্বসে তাঁর মৃত্যু হয়।

নাসিবিনের যুদ্ধের পর আবু মুসলিম খুরাসানে প্রত্যাবর্তন করতে চাইলে মনসুর তাকে রাজধানীতে ডেকে পাঠালেন। খুরাসানে আবু মুসলিমের প্রতিপত্তি ছিল অসীম। তিনি অঙ্গুলি হেলনের সাহায্যে আব্বাসীয় বংশের পতন ঘটাতে পারতেন। এ সব দেখে শুনে মনসুর প্রমাদ গুণলেন। আবু মুসলিমকে এমতাবস্থায় খুরাসানে ফিরে যেতে দেয়া যায় না। মনসুর দরবারে ডেকে তাঁকে

নৃশংসভাবে হত্যা করেন (৭৫৫ খ্রিঃ)। আবু মুসলিমের মৃত্যুর পর মনসুর নিজেকে প্রকৃত খলিফা বলে মনে করতেন। তাঁর শুভানুধ্যায়িগণ তাঁকে মোবারকবাদ জানাতে আসল। আবু মুসলিমের প্রচেষ্টা ও প্রচারণার ফলে আব্বাসীয়গণ শাসনক্ষমতা লাভ করেছিলেন। কিন্তু এমন ক্ষমতাবান ব্যক্তির সান্নিধ্যে খলিফা কখনও নিজেকে নিরাপদ মনে করতে পারলেন না। পরস্পর অবিশ্বাস ও সন্দেহের পরিণতি-স্বরূপ এমন একজন যোগ্য সহকারীর জীবন বিনষ্ট হল।

৭৫৮ খ্রিস্টাব্দে খলিফা মক্কায় পবিত্র হজ্ব সমাধা করতে গিয়েছিলেন। হজ্ব থেকে প্রত্যাবর্তনের পর তিনি একটি নতুন বিপদের সম্মুখীন হলেন। রাওয়ান্দিয়া নামক এক সম্প্রদায়ের লোক অবতারবাদ ও পুনর্জন্মে বিশ্বাস করত। তারা খলিফার প্রাসাদ পরিবেষ্টন করে চিৎকার করে বলতে লাগল, 'এ আমাদের প্রভুর গৃহ, যিনি আমাদেরকে আহার করতে খাদ্য ও পান করতে পানীয় প্রদান করেন।' এভাবে তারা খলিফাকে খোদা বলে মানতে চাইল, কিন্তু খলিফার পক্ষে তাদের অধার্মিক কার্যকলাপ ও আচরণ বরদাস্ত করা সম্ভব ছিল না। এতে এ সব লোক বিদ্রোহী হলে খলিফা কঠোর হাতে তাদেরকে দমন করেন। আবু মুসলিমের মৃত্যুর পর খুরাসানে তাঁর সমর্থক দল বিদ্রোহী হল। তারা আবু মুসলিমকে ইমাম বলে মানত এবং সান্‌বাদ নামক একজন লোকের নেতৃত্বে বিদ্রোহ ঘোষণা করল। মনসুর এদের দমন করে খুরাসানে শান্তি প্রতিষ্ঠা করেন। এভাবে মনসুর উত্তর আফ্রিকা ও স্পেন ছাড়া সমগ্র মুসলিম সাম্রাজ্যে তাঁর অধিকার সুপ্রতিষ্ঠিত করেন।

মনসুরের সময় বিভিন্ন সীমান্ত অঞ্চলে যুদ্ধ-বিগ্রহ চলে। বাইজান্টাইনদের সাথে যুদ্ধে মালাভিয়া ও মাসিসা পুনরধিকৃত হয়। বাকু অঞ্চলেও তিনি কর ধার্য করেন। কাস্পিয়ানের তীরবর্তী তাবারিস্তান অঞ্চলে পুরাতন পারসিক ইস্পাহ্‌বেদ উপাধিধারী স্বাধীনভাবে রাজত্ব করছিল। খলিফার পুত্র মাহদী এর বিরুদ্ধে যুদ্ধ করে তাবারিস্তানে খলিফার অধিকার প্রতিষ্ঠিত করেন। পাক-ভারত সীমান্তে কান্দাহার অধিকৃত হয় এবং মনসুরের সৈন্যবাহিনী কাশ্মীরেও আক্রমণ চালায়। ভারত মহাসাগরের জলদস্যুগণকে দমন করবার জন্য মনসুর সিন্ধু নদীর মোহনায় নৌবহর প্রেরণ করেন।

মনসুরের সময় আব্বাসীয়গণ ও আলীর (রা) বংশধরগণের মধ্যে সর্বপ্রথম বিভেদের সৃষ্টি হয়। ইতিপূর্বে তারা মিলে-মিশে উমাইয়া বংশের রাজত্বের

অবসান ঘটিয়েছিল। আলীর (রা) বংশধরগণ স্পষ্ট বুঝতে পারল যে, আহল-বায়তের নামে প্রচারণা চালিয়ে আব্বাসীয়গণ নিজেদের বংশে খিলাফত স্থায়ী করে নিয়েছে। মনসুর এদের রাজ্যের নিরাপত্তার জন্য বিপজ্জনক মনে করে আলীর (রা) পৌত্র আবদুল্লাহ্‌কে পরিবার-পরিজনসহ বন্দী করলেন। আবদুল্লাহ্‌র দুই পুত্র ইব্রাহীম ও মুহম্মদ পালিয়ে আত্মগোপন করলেন। মদীনায় মুহম্মদের সমর্থনে বিদ্রোহ দেখা দিল। অচিরেই মুহম্মদ মদীনায় আত্মপ্রকাশ করলেন। মনসুর পত্রযোগে তাঁকে বিদ্রোহ থেকে নিরস্ত করতে চেষ্টা করলেন। তাঁর ভ্রাতা ইব্রাহীম আহওয়াজও বসরায় বিদ্রোহ ঘোষণা করলেন। মনসুর তাঁর ভ্রাতুষ্পুত্র ঈসাকে মুহম্মদের বিরুদ্ধে প্রেরণ করলেন। ঈসার আগমন সংবাদে নগরবাসী ভীত হয়ে পলায়ন করল। মুহম্মদ যুদ্ধ করে তীরবিদ্ধ হয়ে নিহত হলেন। মুহম্মদ 'নাফস যাকিয়া' পবিত্রাত্মা নামে তাঁর অনুসারীদের কাছে পরিচিত।

ইব্রাহীম বসরায় বিদ্রোহ ঘোষণা করলে প্রসিদ্ধ সাহাবা আনাস ইবন মালিকসহ বহু লোক তাঁকে সমর্থন করলেন। বিদ্রোহিগণ ফারস, আহওয়াজ ও ওয়াসিত দখল করল। অতঃপর ইব্রাহীম কুফার দিকে রওয়ানা হলেন। খলিফা মনসুর এ সময় বাগদাদ নগরীর পত্তন করছিলেন। তাঁর সৈন্যবাহিনীর অধিকাংশ তখন রাজধানীর বাইরে পারস্য, আফ্রিকা ও আরবে যুদ্ধরত ছিল। ঈসা তড়িৎগতিতে মদীনা হতে কুফায় গমন করলেন। নগরীর উপকণ্ঠে উভয় সৈন্যদল পরস্পরের মুকাবিলা করল। খলিফা মনসুর গভীর উৎকণ্ঠার মধ্যে তাঁর জায়নামাজে শুয়ে একই বেশে দিবারাত্রি যাপন করতে লাগলেন। যুদ্ধে ইব্রাহীমের সেনাদল প্রশংসনীয় উদ্যম ও রণনৈপুণ্য প্রদর্শন করে খলিফার বাহিনীকে বিপর্যস্ত করে তুলল। কিন্তু অচিরেই ইব্রাহীম তাঁর ভ্রাতা মুহম্মদের মত তীরবিদ্ধ হয়ে ভূপতিত হলেন (৭৬২ খ্রিঃ)।

মনসুর ৭৬২ খ্রিস্টাব্দে নতুন রাজধানী বাগদাদের গোড়াপত্তন করেন। এ নগরীর নাম তিনি দিলেন দারুস-সালাম বা 'শান্তি সদন'। দাজলার পশ্চিম তীরে অবস্থিত এ নগরী বাগদাদ নামক সাসানীয় যুগের একটি গ্রামে স্থাপিত হয়। বাগদাদ অর্থ 'খোদাদত্ত'। দাজলা নদী এ নগরীকে সুদূর চীনের সাথে সংযুক্ত করেছে; অনতিদূরে অবস্থিত ফুরাত নদী একে সিরিয়া, রাক্কা ও অন্যান্য স্থানের সাথে যুক্ত করেছে। চার বছরে সমাপ্ত এ নগরী নির্মাণে এক লক্ষ স্থপতি, কারিগর ও শ্রমিকের প্রয়োজন হয়েছিল এবং ৪৮,৮৩,০০০ দিরহাম অর্থ ব্যয়িত হয়েছিল। বৃত্তাকার এ নগরীর চতুর্দিক বেষ্টন করে দু'টি প্রাচীর, তারপর একটি গভীর পরিখা ও একটি অভ্যন্তরীণ প্রাচীর বিদ্যমান ছিল। এ প্রাচীরের মধ্যে

সমান ব্যবধানে চারটি তোরণ রাজ্যের চারটি প্রধান রাজপথের সাথে বাগদাদকে সংযুক্ত করেছিল। এ নগরাভ্যন্তরে খলিফার প্রাসাদ ও জামে মসজিদ অবস্থিত ছিল। নগরের বাইরে খলিফা কাসরুল-খুলদ এবং রুসাফা নামক আরও দুটি প্রাসাদ নির্মাণ করেছিলেন। শেষোক্ত প্রাসাদ তাঁর উত্তরাধিকারী পুত্র মাহদীর জন্য নির্মিত হয়েছিল। বাগদাদ সামরিক দিক হতেই যে কেবল গুরুত্বপূর্ণ ছিল, তা নয়, একাধিক কারণে এ নগরী বিশ্ববিখ্যাত নগরী হিসেবে খ্যাতিলাভ করে। সিরিয়া ছিল উমাইয়াদের শক্তির উৎস। কুফা ও বসরার জনসাধারণ বহুকাল যাবৎ নানা কারণে রাষ্ট্রদ্রোহী কার্যকলাপে লিপ্ত ছিল। বাগদাদ সাম্রাজ্যের মধ্যস্থলে অবস্থিত বলে একদিকে যেমন বহিঃশত্রুর আক্রমণ হতে নিরাপদ ছিল, অপরদিকে তেমনি রাজ্যের সবদিকে নযর রাখা খলিফার পক্ষে সহজ ছিল। নদীপথে ও স্থলপথে দেশ-বিদেশের সাথে বাণিজ্যের যোগাযোগ বাগদাদকে ঐশ্বর্যমণ্ডিত ও সমৃদ্ধিশালী করে তুলেছিল। বাগদাদের অনতিদূরেই প্রাচীন সভ্যতার অন্তত চারটি প্রধান কেন্দ্র অবস্থিত ছিল, যথা—টেসিফোন (Ctesiphon), ব্যাবিলন, নিনিভা এবং উর। সভ্যতা ও সংস্কৃতির দিক দিয়ে বাগদাদ এ সব নগরীর সভ্যতার যোগ্য উত্তরাধিকারী বলে পরিগণিত হল। পূর্বাঞ্চল হতে, বিশেষত পারস্য হতে নতুন নতুন, ভাবধারা বাগদাদের জীবন পদ্ধতি, রাষ্ট্রীয় সংস্থা, খলিফার দরবারের চাল-চলন, আদব-কায়দা এবং শিক্ষা ও সংস্কৃতিকে বহুলাংশে প্রভাবিত করতে থাকে। শিক্ষা ও সংস্কৃতির পৃষ্ঠপোষক হিসেবে মনসুর গ্রীক ও পারস্য ভাষায় লিখিত জ্ঞান-বিজ্ঞানের গ্রন্থাবলি আরবি ভাষায় তরজমা করার জন্য একটি দফতর খুলে দেন। এ তরজমার কাজ খলিফা আল-মামুনের সময় সম্প্রসারিত হয়।

খলিফা মনসুর ৭৭৫ খ্রিস্টাব্দে হজ্ব পালন করতে যাওয়ার সময় পথিমধ্যে কুফার কাছে পীড়িত হয়ে পড়েন। মক্কা হতে তিন মাইল দূরে তিনি মৃত্যুমুখে পতিত হন এবং মক্কায় তাঁকে সমাহিত করা হয়। তিনি পঁয়ষট্টি বছর বয়সে বাইশ বছর শাসনকার্য চালাবার পর পরলোক গমন করেন।

খলিফা মনসুর কঠোর পরিশ্রমী, কর্তব্যপরায়ণ ও মিতব্যয়ী ছিলেন। তিনি রাষ্ট্রীয় কর্তব্যে নিজেকে এত অধিক ব্যাপৃত রাখতেন যে, খলিফা হওয়ার সময় তাঁর মাথার কেশরাশি সম্পূর্ণ কৃষ্ণবর্ণ ছিল, কিন্তু খলিফা হওয়ার নয় মাসের মধ্যে তাঁর একটি চুলও কৃষ্ণবর্ণ রইল না। তিনি ধর্মীয় কর্তব্যপালনে নিষ্ঠাবান ছিলেন। তিনি পূর্বাহ্নে রাষ্ট্রীয় কাজ-কর্ম সমাধা করতেন, অপরাহ্নে পরিবারের লোকজনের সাথে কথাবার্তা বলতেন ও আমোদ-প্রমোদ করতেন। সন্ধ্যার পর

দিবসের পত্রাদি শ্রবণ করতেন এবং উজীরদের সাথে পরামর্শ করতেন। অধিক রাত্রে শয়ন করেও তিনি প্রত্যুষে শয্যা ত্যাগ করতেন। তিনি স্বয়ং সৈন্যবাহিনী পরিদর্শন করতেন এবং তাদেরকে উপযুক্ত অস্ত্রশস্ত্রাদি দিয়ে সুসজ্জিত রাখতেন। তিনি সামান্য প্রতিবাদীর মত কাজীর আদালতে হাজির হয়ে কাজীর বিচার মেনে নিতে কুণ্ঠাবোধ করেননি। তাঁর মিতব্যয় প্রায় অর্থগৃধ্নুতার শামিল ছিল। এর ফলে যে প্রচুর অর্থ তিনি সঞ্চিত রেখে গিয়েছিলেন, তা তাঁর পুত্রের দশ বছরের ব্যয় নির্বাহের জন্য পর্যাপ্ত ছিল। তিনিই আব্বাসীয় বংশের প্রকৃত স্থাপয়িতা। তাঁরই দূরদর্শিতা ও বুদ্ধিমত্তার ফলে তাঁর বংশধরগণ পাঁচ শতাব্দী ধরে মুসলিম জগতের খলিফা হিসেবে স্বীকৃতি লাভ করেছিলেন। সুন্নী মতবাদকে রাষ্ট্রের প্রধান অবলম্বন হিসেবে স্বীকৃতি দান করে তিনি রাষ্ট্রকে সুদৃঢ় ভিত্তির ওপর স্থাপন করে গিয়েছিলেন।

গ্রন্থনির্দেশ

১. পি. কে. হিট্টি ঃ *হিস্ট্রি অব দি এরাবস্।*

২. উইলিয়াম ম্যুর ঃ *কলিফেট।*

৩. সৈয়দ আমীর আলী ঃ *হিস্ট্রি অব দি সারাসেনস।*

২৫

আল-মাহ্দী ও হাদী

(৭৭৫ — ৭৮৫ খ্রিষ্টাব্দ)

আল-মাহ্দী (৭৭৫—৭৮৫ খ্রিষ্টাব্দ)

মনসুরের মৃত্যুর পর তাঁর পুত্র মুহম্মদ আল-মাহ্দী খলিফা হলেন। ঐতিহাসিক উইলিয়াম ম্যুরের মতে তাঁর রাজত্বকাল "প্রাথমিক আব্বাসীয়দের অমার্জিত অথচ তেজোদৃপ্ত শাসন এবং পরবর্তী গৌরবময় যুগের মাঝামাঝি তথা প্রস্তুতিস্বরূপ ছিল।" মাহ্দী নম্রস্বভাবের ও মহানুভব চরিত্রের লোক ছিলেন। তিনি দাগী আসামী ছাড়া অন্য সব বন্দীকে কারাগার থেকে মুক্তিদান করেন। ইমাম হাসানের বংশধর ইব্রাহীমের পুত্র হাসানকে কারাগার থেকে মুক্তিদান করেন এবং তাঁকে উপযুক্ত ভাতা দান করেন। পিতার পরিত্যক্ত অর্থে তিনি অনেক জনহিতকর কাজ করেন এবং অনেক জ্ঞানী-গুণী ও অভাবগ্রস্তকে সাহায্য দান করেন। মক্কা ও মদীনার মসজিদগুলিকে তিনি সম্প্রসারিত ও সুষমামণ্ডিত করেন। হজ্বযাত্রীদের জন্য তিনি সরাইখানাগুলিতে পানির কূপ ও অন্যান্য সুযোগ-সুবিধার সুবন্দোবস্ত করেন। এ সব স্থান তাঁর সময়ে আরামদায়ক ও নিরাপদ হল। তিনি ৭৭৭ খ্রিস্টাব্দে মক্কায় হজ্ব করতে গিয়ে হিজাযের লোকদেরকে ৩০,০০০,০০০ দিরহাম অর্থ দান করেন এবং একমাত্র মক্কাতেই ১৫০,০০০টি জামা দান করেন। তিনি রাজ্যের প্রধান প্রধান শহরের পুরাতন মসজিদগুলির সংস্কার সাধন করেন। প্রতি বছর কাবা শরীফে খলিফার তরফ হতে একটি মূল্যবান গেলাফ পাঠাবার ব্যবস্থা করেন। এ ব্যবস্থা তাঁর পরবর্তী খলিফাদের আমলেও চালু ছিল। তিনি মদীনা হতে ৫০০ জন আনসারকে বাগদাদে নিয়ে আসেন এবং তাঁদেরকে দেহরক্ষীর পদে নিযুক্ত করেন। এ সব লোকের ভরণ-পোষণের জন্য তিনি তাঁদেরকে জমি দান করেন। তিনি কুষ্ঠরোগগ্রস্ত লোকদের জন্য ভাতার ব্যবস্থা করেন এবং ঋণের দায়ে কারারুদ্ধ লোকদেরকে সাহায্য দান করেন। তাঁর পুত্র হারুনূর-রশীদের সময় বাগদাদ ব্যবসা-বাণিজ্য ও জ্ঞান-বিজ্ঞানের ক্ষেত্রে যে চরম উন্নতি লাভ করে, তাঁর খিলাফতের সময়েই তার সূচনা হয়। এ সময়েই বাগদাদের সাথে পৃথিবীর

বিভিন্ন স্থানের বাণিজ্যিক যোগসূত্র স্থাপিত হয় এবং সঙ্গীত, কাব্য, সাহিত্য ও দর্শনের চর্চা আরম্ভ হয়।

মাহ্দীর মহিষী খায়জুরান দরবারে বিশেষ প্রতিপত্তির অধিকারিণী ছিলেন। তিনি শেষ উমাইয়া খলিফা মারওয়ানের স্ত্রী মাজুনাকে রাজপ্রাসাদে তাঁর পদমর্যাদার উপযোগী বাসস্থান নির্ধারিত করে দেন এবং খলিফার পরিবারের সবাই তাঁর প্রতি সম্মানসূচক ও সৌজন্যমূলক আচরণ প্রদর্শন করেন। খায়জুরান রাজকার্যে স্বামীর ওপর বিশেষ প্রভাব খাটাতেন। খলিফা মনসুরের ভ্রাতুষ্পুত্র ঈসা মাহ্দীর পরে খিলাফতের দাবিদার ছিলেন। কিন্তু খায়জুরান আপন পুত্রদের অনুকূলে ঈসাকে খিলাফতের দাবি প্রত্যাহার করতে বিশেষ চাপ প্রয়োগ করেন। অতঃপর মাহ্দী বিনা বাধায় তাঁর পুত্র হাদী ও হারুনকে পর পর উত্তরাধিকারী মনোনীত করেন।

মাহ্দীর খিলাফতের প্রধান ঘটনা খুরাসানের নাস্তিকতাবাদী ধর্ম সম্প্রদায়সমূহের মূলোৎপাটন। কুৎসিত চেহারার অধিকারী এক ধর্মনেতা একটি সোনালি মুখোশ পরে থাকত বলে তার নাম দেয়া হল মুকান্না বা আবৃত। সে অবতারবাদে বিশ্বাস করত এবং প্রচার করত যে, বিশ্বস্রষ্টা মানুষের মধ্যে আদম, নূহ, আবু মুসলিম ইত্যাদি রূপ ধরে আবির্ভূত হন। সে তার অনুচরদেরকে অনেক গর্হিত কাজে উৎসাহিত করত। এরা খলিফার প্রাধান্য অস্বীকার করে একে একে বহু সরকারি সেনাদলকে পরাজিত করে। অবশেষে পরাজয় নিশ্চিত মনে করে আপন দলবলসহ অগ্নিকুণ্ডে আত্মাহুতি দান করে। মুকান্নার অনুচরগণ শ্বেতবর্ণ পোশাক পরিহিত ছিল বলে এদেরকে মুবাইয়েজা বা শ্বেতাম্বর বলা হত। অচিরেই কাস্পিয়ান সাগরের তীরবর্তী গুর্গাও নামক স্থানে মুহাম্মিরা বা রক্তাম্বর নামক অপর একদল নাস্তিক অনুরূপ মতবাদ প্রচার করে বিদ্রোহী হয়। এরা 'জিনদিক' নামে অভিহিত হয়। এদের ভাবধারা প্রাচীন মজদক ও মনী নামক পারসিক প্রচারক ও ধর্মনেতার ভাবধারায় প্রভাবান্বিত হয়েছিল। প্রথমোক্ত জন বল্গাহীন সমাজবাদের পক্ষপাতী ছিলেন, আর দ্বিতীয়জন ছিলেন দার্শনিক। এ সব ভাবধারায় পুষ্ট 'জিনদিক' মতবাদ সামাজিক বন্ধন শিথিল করে দিয়েছিল এবং মানুষের নিচ প্রবৃত্তি ও কামনা-বাসনাকে অবাধ প্রশ্রয় দিয়েছিল। এর ফলে জনসাধারণ রাষ্ট্রীয় সংস্থার প্রয়োজনীয়তার প্রতি সন্দিগ্ধভাব পোষণ করতে লাগল। খলিফা মাহদী এ সব নাস্তিকদের দমনের জন্য একজন উচ্চপদস্থ কর্মচারীর অধীনে একটি কার্যবিভাগ খোলেন। এই কর্মচারীর নাম দেয়া হল সাহিবুজ-জানাদিকা অর্থাৎ জিনদিকদের দমনের জন্য নিযুক্ত বিশেষ অফিসার। এ সব নাস্তিককে কঠোর হাতে দমন করা হয়।

মাহ্দীর রাজত্বকালে বাইজান্টাইনদের সাথে বহু যুদ্ধ-বিগ্রহ সংঘটিত হয়। মাহ্দী স্বয়ং বাইজান্টাইন আক্রমণ প্রতিহত করবার জন্য এক লক্ষ সৈন্যের এক বিরাট বাহিনীসহ ফুরাত নদী অতিক্রম করে আলেপ্পো শহরে সামরিক দফতর স্থাপন করলেন। সেখান থেকে তিনি তাঁর পুত্র হারুনকে বস্‌ফোরাসের দিকে প্রেরণ করলেন। হারুনের উপদেষ্টা ও অভিভাবক হিসেবে তাঁর সাথে খালিদ বারমাকীকে প্রেরণ করা হল এবং সঙ্গে ছিল অনেক প্রসিদ্ধ আব্বাসী সেনাপতি। এ সময় রাণী আইরিনী তাঁর পুত্র ষষ্ঠ কনস্টান্টাইনের অভিভাবক হিসেবে বাইজান্টাইন সাম্রাজ্যের শাসনকার্য চালাচ্ছিলেন। বাইজান্টাইন সৈন্যবাহিনী পরাজিত হল এবং বসফোরাসের তীর থেকে আরব শিবিরের আলোকমালা রাণীমাতার মনে ভীতির সঞ্চার করল। আরব বাহিনী অচিরেই কনস্টান্টিনোপলের প্রাচীর প্রান্তে উপনীত হল। আইরিনী বহু কর দানের প্রতিশ্রুতিতে সন্ধি ভিক্ষা করলেন। এ যুদ্ধে হারুনের কৃতিত্বের পুরস্কার স্বরূপ মাহ্দী তাঁকে 'আর-রশীদ' উপাধি দান করে তাঁর ভ্রাতা হাদীর পরেই তাঁকে উত্তরাধিকারী মনোনীত করলেন।

হারুন পিতা ও মাতা উভয়ের এত প্রিয়পাত্র ছিলেন যে, মৃত্যুর কিছুদিন আগে মাহ্দী হারুনকেই উত্তরাধিকারী মনোয়ন করার কথা চিন্তা করে হাদীকে তাঁর খিলাফতের দাবি প্রত্যাহার করতে বললেন। এ উদ্দেশ্যে গুর্গাওঁয়ে যুদ্ধরত হাদীকে রাজধানীতে ডেকে পাঠান হল। হাদী এতে ভ্রূক্ষেপ না করায় মাহ্দী হারুনকে নিয়ে গুর্গাওঁয়ে যাত্রা করলেন। পথিমধ্যে তাঁর মৃত্যু হয় (৪ আগস্ট, ৭৮৫ খ্রিঃ)। মৃত্যুকালে মাহ্দীর বয়স ছিল ৪৩ বছর। এভাবে খিলাফতে হাদীর উত্তরাধিকার অপরিবর্তিত থেকে যায়।

আল-হাদী (৭৮৫ — ৭৮৬ খ্রিস্টাব্দ)

হাদী চব্বিশ বছর বয়সে খলিফা হলেন এবং এক বছরের অধিককাল উক্ত পদে অধিষ্ঠিত ছিলেন। হারুন ভ্রাতার আনুগত্য স্বীকার করে পিতার সিলমোহর ও রাজদণ্ড গুর্গাওঁয়ে হাদীর নিকট পাঠিয়ে দিলেন। তাঁর রাজত্বকালের প্রধান ঘটনা মক্কা ও মদীনায় আলীর (রা) বংশধরদের বিদ্রোহ। এ বিদ্রোহ কঠোর হাতে দমন করা হয়। এ বিদ্রোহের সময় ইদ্রিস নামক ইব্রাহীম ও মুহম্মদের এক ভ্রাতা মিসর হয়ে তাঞ্জীরে পলায়ন করেন এবং সেখানে ইদ্রিসীবংশের রাজত্ব প্রতিষ্ঠা করেন। এটাই আলাবীদের প্রথম স্বাধীন রাষ্ট্র।

হাদীর রাজত্বকালে তাঁর মাতা খায়জুরান রাষ্ট্রীয় কাজকর্মে পূর্বের ন্যায় প্রভাব বিস্তার করতে চেয়েছিলেন। কিন্তু হাদী মাতার এ অনধিকার চর্চা পছন্দ করতেন না। সেজন্য তিনি দরবারের আমীর-উমরাকে তাঁর অনুগ্রহ ভিক্ষা করতে নিষেধ করেন। এভাবে খায়জুরানের ক্ষমতা ও প্রতিপত্তি খর্ব করা হয়।

হারুন ভ্রাতার আনুগত্য স্বীকার করলেও হাদী তাঁকে বিশেষ সুনজরে দেখতেন না। এমন কি, হারুনের উত্তরাধিকার পরিবর্তন করে তিনি আপন পুত্র জাফরকে ভাবী খলিফা মনোনয়ন করতে প্রয়াসী হলেন। এ উদ্দেশ্যে হাদী হারুনের ওস্তাদ ও উপদেষ্টা ইয়াহিয়া ইবনে খালিদ বারমাকী ও হারুনের অন্যান্য কর্মচারীকে কারারুদ্ধ করেন। এ প্রসঙ্গ নিয়ে রাণীমাতা খায়জুরানের সাথেও হাদীর মনোমালিন্য হয়। হারুন ভ্রাতার ব্যবহারে উত্যক্ত হয়ে দরবার ছেড়ে অজ্ঞাতবাসে চলে যান। অচিরেই মসুলের নিকট পীড়িত হয়ে হাদীর মৃত্যু হয় (৭৮৬ খ্রিস্টাব্দ)। হারুন ভ্রাতার মৃত্যুসংবাদ পেয়ে দ্রুত দরবারে উপস্থিত হলেন এবং ভ্রাতার অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া সমাধা করে খলিফার পদ অলংকৃত করলেন।

২৬

বাগদাদের স্বর্ণযুগ ঃ হারুনুর রশীদ

(৭৮৬ — ৮০৯ খ্রিস্টাব্দ)

রূপকথার রাজা, আরব্যোপন্যাসের বহু রোমাঞ্চকর কাহিনীর নায়ক, ঐন্দ্রজালিকের যাদুর স্পর্শে উত্থিত স্বপ্নপুরী বাগদাদের একচ্ছত্র অধিপতি খলিফা হারুনুর রশীদ পৃথিবীর সর্বযুগের সর্বদেশের প্রথম শ্রেণীর রাজা-বাদশাহদের সমপর্যায় ভুক্ত। তাঁর রাজত্বকাল এশিয়ার ইতিহাসে এক গৌরবময় অধ্যায় সংযোজন করেছে। অলীক গল্প ও কাহিনী-উপাখ্যানের কথা বাদ দিলেও ইতিহাসের প্রকৃত বিচারে হারুনুর রশীদকে পৃথিবীর অন্যতম শ্রেষ্ঠ সম্রাট বলে মেনে নেয়া যায়। ধর্মীয় আচার অনুষ্ঠান পালনে তাঁর ঐকান্তিক নিষ্ঠা, তাঁর বদান্যতা, দরবারের জাঁকজমক এবং সর্বোপরি তাঁর ব্যক্তিত্ব তৎকালীন সমাজে অভূতপূর্ব প্রভাব বিস্তার করে তাঁকে যুগে যুগে অবিস্মরণীয় করে রেখেছে। কথিত আছে, তিনি দৈনিক একশত রাকাত নামাজ আদায় করতেন এবং এক হাজার দিরহাম দান করতেন। খিলাফতের প্রথম বছর তিনি হজ্ব পালন করেন এবং পরবর্তীকালে আরও নয়বার হজ্বযাত্রায় গমন করেন। প্রতিবারই তিনি বহু হজ্বযাত্রীকে নিজ ব্যয়ে মক্কায় নিয়ে যেতেন এবং সেখানেও বহু গরিব-দুঃখীকে তিনি অকাতরে দান করতেন। ৮০২ খ্রিস্টাব্দের হজ্বযাত্রায় মহিষী জুবায়দাও হারুনুর রশীদের সাথে মক্কায় যান এবং মক্কাবাসিদের পানীয় জলের কষ্ট দেখে ত্রিশ লক্ষ দীনার ব্যয়ে মক্কা হতে পঁচিশ মাইল দূরে অবস্থিত এক নির্ঝরিণী থেকে পয়ঃপ্রণালীর সাহায্যে পানি সরবরাহের ব্যবস্থা করেন। অদ্যাবধি এ পয়ঃপ্রণালী তাঁর নামের স্বাক্ষর বহন করছে। হারুনুর রশীদ সুদক্ষ সমরনায়ক হিসেবে বহুবার স্বয়ং যুদ্ধক্ষেত্রে আবির্ভূত হয়েছিলেন; বহুবার রাজ্যের বিভিন্ন স্থানে বিদ্রোহ ও গোলযোগ প্রশমিত করতে অথবা জনসাধারণের অবস্থা স্বচক্ষে দেখতে তিনি ছুটে যেতেন। প্রত্যন্ত প্রদেশে শত্রুর হামলার মুকাবিলা করতে কিংবা সীমান্তের রক্ষা ব্যবস্থা পর্যবেক্ষণ করতে তাঁর শৈথিল্য ছিল না। রাজ্যের সর্বত্র তিনি মসজিদ, মাদ্রাসা, হাসপাতাল, সরাইখানা, রাস্তাঘাট, খালবিল ও সেতু নির্মাণ করে দিয়েছিলেন। এ সব কাজ জনকল্যাণে তাঁর আগ্রহের পরিচয় দেয়। যে পরিপূর্ণ নিরাপত্তার সাথে বণিক-ব্যবসায়ী, পরিব্রাজক, তীর্থযাত্রী এবং জ্ঞানপিপাসু পণ্ডিত ব্যক্তিগণ রাজ্যের এক প্রান্ত হতে অন্যপ্রান্ত পর্যন্ত অবলীলাক্রমে পরিভ্রমণ করে

বেড়াত, তা তাঁর শাসন ক্ষমতা ও সাংগঠনিক নৈপুণ্যের পরিচায়ক। বিদ্বজ্জনের সমাদর ও পৃষ্ঠপোষকতায় কেবল তাঁর সুযোগ্য পুত্র মামুনই তাঁকে ছাড়িয়ে গিয়েছিলেন, কিন্তু হারুন নানাভাবে পুত্রের এ অভাবনীয় কৃতকার্যতার পথ সুপ্রশস্ত করে দিয়েছিলেন।

হারুনুর রশীদের সুনাম ও সুখ্যাতি প্রাচ্য ও প্রতীচ্যের সর্বত্র ছড়িয়ে পড়েছিল। নবম শতাব্দীর প্রারম্ভে দু'জন যশস্বী রাজপুরুষের নাম জগৎজোড়া খ্যাতি অর্জন করেছিল। এঁদের একজন ছিলেন পাশ্চাত্যের ফ্রাঙ্কদের সম্রাট শার্লিম্যান (Charlemagne) এবং অপরজন প্রাচ্যের খলিফা হারুনুর রশীদ। সমপরিমাণ সুনাম ও সুখ্যাতির অধিকারী হলেও একথা সর্বজনবিদিত যে, হারুন জ্ঞান-বিজ্ঞান ও শিক্ষা-সংস্কৃতিতে তাঁর পাশ্চাত্য-দেশীয় সমসাময়িকের চেয়ে অনেক শ্রেষ্ঠ ছিলেন। এ দু কীর্তিমান রাজপুরুষ পরস্পর বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্ক স্থাপনে আগ্রহী ছিলেন। বলাবাহুল্য, উভয় সম্রাট নিছক ব্যক্তিগত স্বার্থে পরস্পরের সাথে মৈত্রী স্থাপন করতে বাধ্য হয়েছিলেন। বাইজান্টাইন সম্রাটের সাথে শার্লিম্যানের সম্পর্ক ভাল ছিল না। অন্যপক্ষে স্পেনের উমাইয়া শাসকগণ হারুনুর রশীদের শত্রু ছিলেন। তাই শার্লিম্যান বাইজান্টাইন সম্রাটের বিরুদ্ধে হারুনকে মিত্ররূপে পেতে এবং হারুন শার্লিম্যানকে স্পেনের উমাইয়া শাসকদের বিরুদ্ধে বন্ধু হিসেবে ব্যবহার করতে চেয়েছিলেন। উভয়ের উদ্দেশ্যে ছিল যে, তাঁরা আপন আপন মিত্রপক্ষের সুবিধার জন্য শত্রুভাবাপন্ন প্রতিবেশীর অসুবিধার সৃষ্টি করবেন এবং প্রতিবেশিগণ তাঁদের ভয়ে সন্ত্রস্ত থাকবেন। দু সম্রাটের মধ্যে দূত বিনিময় ও উপঢৌকন আদান-প্রদান ঘটে। একজন ফ্রাঙ্ক লেখকের বিবরণ মতে শার্লিম্যানের দূতগণ হারুনের কাছ থেকে কারুকার্যখচিত কাপড়, গন্ধদ্রব্য, একটি হস্তী এবং একটি ঘড়ি সমেত বহু উপহার দেশে নিয়ে যান। ৭৯৭ এবং ৮০৬ খ্রিস্টাব্দের মধ্যে এ দূত বিনিময় ঘটে। কিন্তু আশ্চর্যের বিষয় এই যে, মুসলমান লেখকগণ এ দূত বিনিময়ের বিষয় কিছুই উল্লেখ করেন নি। তবে কোন এক 'ভারতের রাজা' কর্তৃক হারুনের নিকট উপঢৌকন প্রেরণের বিষয় এক মুসলমান লেখক উল্লেখ করেছেন। চীনদেশের এক সম্রাটও হারুনের নিকট দূত প্রেরণ করেছিলেন।

বৈদেশিক সম্পর্ক

হারুনের রাজত্বকালের প্রধান ঘটনা বাইজান্টাইনদের সাথে তাঁর যুদ্ধ। সম্রাজ্ঞী আইরিনীর নিকেফোরাস নামক উত্তরাধিকারী যুদ্ধ-বিরতি চুক্তি ও সন্ধি মানতে অস্বীকার করে হারুনুর রশীদের কাছে এক অসম্মানসূচক লিপি প্রেরণ করেন ঃ

বাইজান্টাইনদের সাথে যুদ্ধ

রোমক সম্রাট নিকেফোরাসের কাছ থেকে আরবদের রাজা হারুনের কাছে—
আমার পূর্ববর্তী সম্রাজ্ঞী তোমাকে 'কিস্‌তীর' *মর্যাদা দান করে নিজেকে 'বোড়ের'* আসনে বসিয়েছিলেন এবং তাঁর প্রচুর ধনৈশ্বর্য তোমার কাছে প্রেরণ করেছিলেন। এসবই রমণীসুলভ দুর্বলতা ও নির্বুদ্ধিতার জন্যই হয়েছে। এখন আমার এ পত্র পাঠমাত্র তাঁর কাছ থেকে গৃহীত সমুদয় অর্থ প্রত্যর্পণ কর; অন্যথায় অসিই তোমার ও আমার মধ্যে মীমাংসক হবে।

ঐতিহাসিক বলেন, হারুন এ পত্র পাঠমাত্র ক্রোধে এত উত্তেজিত হলেন যে, তাঁর সাথে কথা বলা দূরের কথা, কেউ তাঁর মুখের দিকে তাকাতেও সাহস করল না। তাঁর সভাসদগণ ভয়ে ছত্রভঙ্গ হয়ে পড়লেন এবং অমাত্যবর্গ নির্বাক হয়ে মন্ত্রণাদানে বিরত রইলেন।

হারুন অতঃপর গ্রীক সম্রাটের পত্রের উল্টা পৃষ্ঠায় লিখলেন ঃ

বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহীম।

আমীরুল মুমিনীন হারুনের কাছ থেকে গ্রীকদের কুকুর নিকেফোরাসের কাছে —

কাফির মায়ের পুত্র, আমি তোমার পত্র পাঠ করেছি। এর উত্তর কানে শুনবে না, চোখে দেখবে। সালাম।

হারুন আপন প্রতিজ্ঞানুযায়ী তৎক্ষণাৎ তাঁর সামরিক ঘাঁটি রাক্কা হতে একের পর এক অভিযান প্রেরণ করে নিকেফোরাসকে ব্যতিব্যস্ত করে তুললেন। এ সব অভিযানের ফলে নিকেফোরাস বার বার পরাজিত হয়ে সন্ধি স্থাপন করতে বাধ্য হলেন, কিন্তু বার বার সন্ধিভঙ্গ করে হারুনের ক্রোধের উদ্রেক করলেন। অবশেষে ৮০৬ খ্রিস্টাব্দের যুদ্ধে খলিফা ১৩৫,০০০ সৈন্য নিয়ে হেরাক্লিয়া ও টায়ানা দখল করলেন এবং নিকেফোরাসকে কর প্রদানে এবং তাঁর ও তাঁর পরিবারবর্গকে জিযয়া দানে বাধ্য করলেন। পর বছর গ্রীকগণ আবার সীমান্তবর্তী অঞ্চলে আবির্ভূত হয়ে মুসলিম রাজ্য আক্রমণ করল। এভাবে বার বার সন্ধির শর্ত ভঙ্গ করে গ্রীকগণ বিশ্বাসঘাতকতার চরম পরাকাষ্ঠা প্রদর্শন করল।

---

* 'কিস্‌তী ও বোড়ে'র দ্বারা হারুন কর্তৃক অধুনা প্রবর্তিত দাবা খেলার প্রতি ইঙ্গিত করা হয়েছে।

হারুন কঠোরহস্তে সাম্রাজ্যের বিভিন্ন অঞ্চলে বিদ্রোহ দমন করেন। তবে আফ্রিকা ক্রমশ আব্বাসীয়দের হাত থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে যাচ্ছিল। আগে উল্লেখ করা হয়েছে যে, তাঞ্জীরে ইদ্রিসী বংশের রাজত্ব প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল। উত্তর আফ্রিকার বহু উত্থান-পতনের পর হারুনের বিশ্বস্ত সেনাপতি হারসামা শাসনকর্তা নিযুক্ত হয়েছিলেন। পরিশেষে জিয়াদাতুল্লাহ্ আল-আগলাব নামক এক দুঃসাহসিক ব্যক্তি হারুনের কাছে প্রস্তাব করে পাঠালেন, তাঁকে ও তাঁর বংশধরগণকে বাৎসরিক করদানের বিনিময়ে আফ্রিকার শাসন কর্তৃত্ব দেয়া হোক। হারসামাও হারুনকে এ প্রস্তাব গ্রহণ করতে রাজি করালেন। অচিরে আফ্রিকায় আগলাবী বংশের রাজত্ব স্থাপিত হয়।

বিদ্রোহ

হারুনের রাজত্বকালে সিরিয়ায় হিময়ার ও মুদার বংশীয় আরবদের মধ্যে কলহ আরম্ভ হয়। হারুন উভয় সম্প্রদায়ের কলহ দূর করে শান্তি স্থাপনের চেষ্টা করেন। মসুলে এক বিদ্রোহ দেখা দিলে তা কঠোর হাতে প্রশমিত হয়। কিন্তু সর্বাপেক্ষা উল্লেখযোগ্য বিদ্রোহ নাসিবিনে খারিজী অভ্যুত্থান। খারিজী নেতা ওয়ালীদ ইবন তায়িফের নেতৃত্বে খারিজিগণ আর্মিনিয়া ও আজারবাইজান লুণ্ঠন করে দজলা নদী পার হয়ে ইরাকে সন্ত্রাসের রাজত্ব কায়েম করে। হারুন খারিজীদের এ বিদ্রোহ দমন করেন এবং তাদের নেতা ওয়ালীদ যুদ্ধে পরাজিত ও নিহত হন। লায়লা নাম্নী ওয়ালীদের এক ভগ্নীর নেতৃত্ব গ্রহণ ও পুরুষের বেশে যুদ্ধে যোগদানের জন্য এ যুদ্ধ বিশেষ প্রসিদ্ধি লাভ করে। পুরুষের বেশে যুদ্ধ পরিচালনার সময় খলিফার সৈন্যদলে নিযুক্ত একজন সৈনিক বালিকাকে চিনতে পারায় লায়লা আবার তাঁর নারীসুলভ জীবনে ফিরে যান। লায়লা ভ্রাতার মৃত্যুতে একটি শোকগাথাও রচনা করেছিলেন।

আরব জোয়ান অব আর্ক

ইমাম হাসানের বংশধর ইব্রাহীম ও মুহম্মদের আর এক ভ্রাতা ইয়াহিয়া কাস্পিয়ান সাগরের তীরবর্তী দায়লাম অঞ্চলে একটি স্বাধীন ও শক্তিশালী রাজ্যের প্রতিষ্ঠা করেন। হারুন বারমাকী বংশের ফযলকে ইয়াহিয়ার বিরুদ্ধে প্রেরণ করলেন। বারমাকিগণ শিয়া ছিলেন এবং আলাবীদের প্রতি সহানুভূতিসম্পন্ন ছিলেন। ফযলের সাথে আলোচনার পর স্থির হল যে, ইয়াহিয়া খলিফা কর্তৃক সদ্ব্যবহারের অঙ্গীকারে হারুনুর রশীদের সাথে দরবারে দেখা করবেন। যথারীতি অঙ্গীকারপত্রে স্বাক্ষরের পর ইয়াহিয়াকে বাগদাদে সম্মানের সাথে সম্বর্ধনা জ্ঞাপন

আলীর (রা) বংশধরদের প্রতি বিশ্বাসঘাতকতা

করা হয়, কিন্তু অচিরেই অঙ্গীকারপত্রের একটি ক্রটির অজুহাতে তাকে নাকচ করে ইয়াহিয়াকে কারারুদ্ধ করা হয়।

হারুনুর রশীদ তাঁর রাজত্বের প্রথমভাগে তাঁর পুত্র আল-আমীনকে উত্তরাধিকারী মনোনীত করেন। আমীন ছিলেন জুবায়দার পুত্র। কয়েক বছর

উত্তরাধিকারী মনোনয়ন

পর হারুনের পারসিক পত্নীর গর্ভজাত অপর পুত্র আল-মামুনকে পরবর্তী উত্তরাধিকারী মনোনয়ন করা হয়। আল-মামুনকে জাফর বারমাকীর অভিভাবকত্বে খুরাসান ও পূর্বাঞ্চলের শাসনভার দেয়া হয়। ৮০২ খ্রিস্টাব্দে হারুন যখন মক্কায় হজ্ব করতে যান, তখন তিনি উভয় পুত্রকে ১০ লক্ষ দীনার উপঢৌকন দেন এবং দুটি দলিল উজীরদের উপস্থিতিতে সম্পাদন করে কাবা শরীফে রেখে দেন; এ দুটি দলিলে উভয় পুত্রের উত্তরাধিকারের বিষয় লিখিত হয়। হারুন তাঁর তৃতীয় পুত্র কাসিমকে মেসোপটেমিয়া ও গ্রীক সীমান্তের শাসনভার দান করেন। এসঙ্গে তিনি এটাও বলে দেন যে, আমীন ইচ্ছা করলে কাসিমকে উক্ত অঞ্চলে স্বাধীনভাবে শাসন করবার ক্ষমতা দিতে পারেন। কয়েক বছর পর যখন হারুন সাম্রাজ্যের পূর্বাঞ্চলে পরিভ্রমণ করছিলেন, তখন তিনি উইল করে যান যে, তাঁর সঙ্গের সেনাবাহিনী ও যুদ্ধাস্ত্র মামুনের ভাগে পড়বে। এভাবে খলিফা হারুন মৃত্যুর আগে তাঁর সাম্রাজ্য পুত্রদের মধ্যে ভাগাভাগি করে গৃহ-বিবাদের বীজ বপন করে গিয়েছিলেন।

বারমাকী বংশের সংক্ষিপ্ত বিবরণ

হারুনুর রশীদের রাজত্বকালের বর্ণনা বারমাকী বংশের একটি বর্ণনা ছাড়া নিতান্তই অসম্পূর্ণ থেকে যায়। কারণ হারুনের কৃতকার্যতা ও কৃতিত্ব বহুলাংশে এ যশস্বী পরিবারের সহযোগিতা ও আনুগত্যের ওপর নির্ভরশীল ছিল। তাঁরা একদিকে যেমন খলিফার রাজ্যের শ্রীবৃদ্ধি ও উন্নতির প্রধান সহায়ক ছিলেন, অন্যদিকে তাঁদের শাসনক্ষমতা, জ্ঞান-বিজ্ঞানের পৃষ্ঠপোষকতা ও বদান্যতার জন্য পরিশেষে তাঁরা সুদূরপ্রসারী যশোগৌরবের অধিকারী হয়ে উঠেছিলেন। খালিদ এ বংশের প্রতিষ্ঠাতা। মধ্য-এশিয়ার বিজয়ী সৈন্যাধ্যক্ষ কুতায়বা খালিদকে বন্দী অবস্থায় বলখ থেকে নিয়ে আসেন। খালিদের পিতা ছিলেন বলখের একটি বৌদ্ধ মন্দিরের পুরোহিত। আব্বাসীয় আন্দোলনের সময় উমাইয়াদের বিরুদ্ধে যুদ্ধে খালিদ আব্বসীয়গণকে সাহায্য করেছিলেন। খলিফা মনসুরের রাজত্বকালে

খালিদ তাবারিস্তানের শাসনকর্তা নিযুক্ত হয়েছিলেন। বৃদ্ধ বয়সে তিনি একটি বাইজান্টাইন দুর্গ অধিকার করে খ্যাতি অর্জন করেন। খলিফা মনসুর খালিদকে তাঁর প্রধান উপদেষ্টা নিযুক্ত করেছিলেন। তিনি উজীর উপাধি না পেলেও বিখ্যাত বারমাকী উজীর পরিবারের প্রতিষ্ঠা করে যান এবং তাঁর বংশধরগণ আব্বাসীয় শাসনামলে প্রথম উজীর পদে উন্নীত হন। খলিফা মাহ্দী তাঁর পুত্র হারুনের শিক্ষার ভার খালিদের পুত্র ইয়াহিয়ার ওপর ন্যস্ত করেন। হারুন ইয়াহিয়াকে যথেষ্ট সম্মান প্রদর্শন করতেন এবং তাঁকে পিতা বলে সম্বোধন করতেন। হাদীর রাজত্বকালে তিনি হারুনকে খিলাফতের উত্তরাধিকার থেকে বঞ্চিত করতে চেষ্টা করলে ইয়াহিয়া তাতে বাধা দেন। সেজন্য হাদী ইয়াহিয়াকে কারারুদ্ধ করেন। হারুন খলিফা হয়ে ইয়াহিয়া বারমাকীকে তাঁর সততা ও বিশ্বস্ততার জন্য অসীম ক্ষমতাসম্পন্ন উজীর হিসেবে নিযুক্ত করেন। এভাবে পারসিক শাসনব্যবস্থার অনুকরণে সর্বপ্রথম মুসলিম রাজ্যে উজীর নিযুক্ত হয় এবং একটি পারসিক পরিবারই উক্ত পদ লাভ করেন।

ইয়াহিয়ার দুই পুত্র ফযল ও জাফর হারুনের অধীনে বিভিন্ন রাজকার্যে নিযুক্ত হয়েছিলেন। এঁরা ৭৪৮ খ্রিষ্টাব্দ হতে ৮০৩ খ্রিষ্টাব্দ পর্যন্ত দীর্ঘ ১৭ বছর সাম্রাজ্যের সব দণ্ডমুণ্ডের কর্তা ছিলেন। সাম্রাজ্যের পূর্ব ও পশ্চিমাঞ্চল যথাক্রমে ফযল ও ইয়াহিয়ার কর্তৃত্বাধীনে ছিল। এর পর হারুন প্রথমে ফযলকে এবং পরে জাফরকে উজীর নিযুক্ত করেন। খলিফা যখন জাফরকে উজীর নিযুক্ত করার সিদ্ধান্ত করেন, তখন তিনি ইয়াহিয়াকে লিখে পাঠালেন যে, তিনি "তাঁর অঙ্গুরীয় দক্ষিণ হাত থেকে বাম হাতে অপসারণ করছেন।" জাফর হারুনের অন্তরঙ্গ বন্ধু ছিলেন এবং খলিফার নৈশ বিহারের সঙ্গী ছিলেন। তিনি বহুকাল যাবৎ উজীর ছিলেন।

পূর্ব-বাগদাদে অবস্থিত এবং জাফরের নামানুসারে 'জাফরী' নামে অভিহিত সুরম্য প্রাসাদে বারমাকিগণ জাঁকজমকের সাথে বসবাস করতেন। দজলার তীরে অবস্থিত এ প্রাসাদ সুপ্রশস্ত উদ্যানে সুশোভিত ছিল। উচ্চ রাজকার্যে অধিষ্ঠিত এ পরিবারের সদস্যগণ অপরিসীম ধনরত্নের অধিকারী ছিলেন। তাঁরা খলিফার সাথে বদান্যতায় প্রতিযোগিতা করতেন এবং তাঁদের আশ্রিত ব্যক্তি, চারণ অথবা সমর্থকদলকে সচরাচর যা দান করতেন, তা এসব গ্রহীতাকে বিত্তবান করে তুলত। তাঁদের বদান্যতা আরবি ভাষাভাষী অঞ্চলে তাঁদের নামকে চিরস্মরণীয় করে রেখেছে। রূপকথার হাতিমের মত 'বারমাকী' দানশীল শব্দের প্রতিশব্দ

হিসেবে ব্যবহৃত হয় এবং "বদান্যতায় জাফরের মত" আরবি ভাষায় ব্যবহৃত একটি অতি পরিচিত উপমা। বহু খাল ও মসজিদ নির্মাণ এবং জনহিতকর কাজ বারমাকীদের প্রচেষ্টা ও বদান্যতার ফলে সম্ভব হয়েছিল। ফযল সর্বপ্রথম রমযান মাসের রাত্রিতে মসজিদে প্রদীপ জ্বালাবার প্রথা চালু করেন। জাফর তাঁর বাগ্মিতা, সাহিত্যিক দক্ষতা ও লিখন ক্ষমতার জন্য প্রসিদ্ধ ছিলেন। তাঁর এ সব গুণের জন্যই ঐতিহাসিকগণ বারমাকিগণকে 'আহলুল কলম' বা কলমধারী উপাধিতে ভূষিত করেছেন। জাফর উপরন্তু বেশভূষায় নেতৃস্থানীয় ছিলেন এবং উঁচু গ্রীবাবন্ধনী পরিধান করার রেওয়াজ প্রবর্তন করেন।

৮০৩ খ্রিস্টাব্দে হঠাৎ হারুনুর রশীদ জাফরের মৃত্যুদণ্ড এবং ফযল ও ইয়াহিয়ার কারাবাসের আদেশ জারি করলেন। এর পর হতে এ বংশের চিহ্নমাত্র দেখতে পাওয়া যায় না। এ বংশের লোকেরা বহু বছর আব্বাসীয়গণের খিদমত করে এবং শুধুমাত্র হারুনুর রশীদের রাজত্বকালে সতের বছর পর্যন্ত অকুণ্ঠ ও বিশ্বস্তভাবে চাকরি করে রাজনৈতিক রঙ্গমঞ্চ হতে চিরতরে বিদায় গ্রহণ করলেন। এঁদের পতন সম্বন্ধে ঐতিহাসিকদের মধ্যে মত-বিরোধের অন্ত নেই। কোন কোন ঐতিহাসিক উল্লেখ করেছেন যে, জাফরের সাথে হারুনের ভগ্নী আব্বাসার অনভিপ্রেত প্রণয় হারুনের এ ক্রোধের কারণ। কিন্তু সূক্ষ্মদর্শী ঐতিহাসিকগণ এ কাহিনীকে সম্পূর্ণ অলীক বলে উড়িয়ে দিয়েছেন। একজন আধুনিক ঐতিহাসিক জুরজী জায়দানের মতে বার্মাকীরা শিয়া ছিল এবং তাঁদের ঊর্ধ্বতন পুরুষ খালিদ আলাবীদের প্রতি আনুগত্যের শপথ গ্রহণ করেছিলেন। তাঁরা গোপনে আলাবীদের প্রতি সহানুভূতিসম্পন্ন ছিলেন অথচ হারুন আলাবিগণকে কঠোরহস্তে দমন করতেন। বাগদাদের আলাবী সমর্থক দল জাফরের প্রাসাদে সমবেত হয়ে হারুনের কাজকর্মের সমালোচনা করতেন এবং এ সব আলোচনার কথা খলিফার কর্ণগোচর হলে তিনি খুব রাগান্বিত হতেন। তা ছাড়া পারসিক বার্মাকীদের কর্তৃত্ব ও প্রভুত্ব বহু আরব গোত্রের লোকদের ঈর্ষার উদ্রেক করেছিল। তারা বার্মাকীদের কর্তৃত্বের অবসান ঘটাবার জন্য তাঁদের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্রে লিপ্ত হল এবং নানা কুৎসা রটিয়ে খলিফার মনকে তাঁদের বিরুদ্ধে বিষিয়ে তুলল। প্রখ্যাত ঐতিহাসিক ইবন খলদুনের মতে—তাঁদের পতনের কারণ তাঁরা রাষ্ট্রে সব ক্ষমতা দখল করে ও রাজকোষের সম্পূর্ণ কর্তৃত্ব তাঁদের হাতে পেয়ে খলিফাকেও সামান্য অর্থের জন্য নানাভাবে নাজেহাল করতেন। "সকল মুখ তাঁদের দিকে ঘুরে দাঁড়াল, সব মাথা তাঁদের সম্মুখে হেঁট হল, সব আবেদনকারী ও প্রার্থীর আশাভরসা কেবল তাঁদের উপরেই ন্যস্ত হল।"

এ সব কারণ সত্য হলেও তাঁদের প্রতি হারুনের নিষ্ঠুরতম আচরণ কোনক্রমেই ন্যায়সঙ্গত মনে করা যায় না। এ ঘটনা তাঁর রাজত্বকে এক কলঙ্ক-কালিমায় লিপ্ত করেছে। হারুন তাঁর রাজত্বের শেষের দিকে খুরাসানে যাত্রা করেছিলেন। কাসিমকে রাক্কায় ও আমীনকে বাগদাদে রেখে তিনি পূর্বাঞ্চলে রওয়ানা হলেন। মামুন তাঁর সঙ্গে ছিলেন। কিছুদূর যাওয়ার পর মামুন একদল

হারুনের মৃত্যু ৮০৯ খ্রিঃ

সৈন্যসহ মার্ভের দিকে গমন করলেন। খলিফা অসুস্থ ছিলেন এবং তুস নগরীর উপকণ্ঠে পৌঁছামাত্র তাঁর রোগ গুরুতর আকার ধারণ করে। এখানে তাঁর মৃত্যু হয়। মাত্র ৪৭ বছর বয়সে তেইশ বছর রাজত্ব করার পর তাঁর জীবনাবসান ঘটে।

শাসক ও সমরনায়ক হিসেবেই যে হারুনুর রশীদ কৃতিত্বের অধিকারী ছিলেন, তা নয়, জ্ঞান-বিজ্ঞানের উন্নতি বিধানে ও জ্ঞানী-গুণীর পৃষ্ঠপোষকতায় সে যুগে কেউই তাঁর জুড়ী ছিল না। মার্জিত আমোদ-আহলাদে তাঁর উৎসাহ, জ্ঞানী ব্যক্তিদের সান্নিধ্যে তাঁর সরস ও বুদ্ধিদীপ্ত আলোচনা এবং সর্বোপরি তাঁর রাজসিক বদান্যতা সে যুগের প্রতিভাকে তাঁর প্রীতি আকৃষ্ট ও আবিষ্ট করেছিল।

জ্ঞান-বিজ্ঞানের পৃষ্ঠপোষকতা

উজীর, আইনজ্ঞ, বক্তা, মোহাদ্দেস, কবি, গায়ক ও সঙ্গীতজ্ঞগণ দূর-দূরান্ত হতে বাগদাদে এসে এ সমৃদ্ধিশালী নগরীকে জ্ঞান-বিজ্ঞান এবং শিক্ষা ও সংস্কৃতির ক্ষেত্রে গৌরবের আসন দান করে। তাঁর রাজত্বকালে যে-সব গুণী ব্যক্তির অপূর্ব সমাবেশ ঘটেছিল, তারমধ্যে ব্যাকরণবিদ আসমায়ী, সঙ্গীতজ্ঞ ইব্রাহীম মসুলী এবং চিকিৎসক গাব্রিয়েলের নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। পিতামহ মনসুর কর্তৃক আরব্ধ অনুবাদ কার্যও তাঁর সময় অব্যাহত থাকে এবং গ্রীক গ্রন্থ আরবিতে অনূদিত হয়। বিখ্যাত কবি আবু নুয়াস তাঁর সভাকবি ছিলেন। তিনিও জাফরের মত হারুনের অন্তরঙ্গ বন্ধু ছিলেন এবং নৈশ-ভ্রমণে তাঁর সাথী ছিলেন। তাঁর কবিতায় হারুনুর রশীদের দরবারের জাঁকজমকপূর্ণ ও বিচিত্র দৃশ্য নিখুঁতভাবে চিত্রিত হয়েছে। হারুনুর রশীদের ধর্মনিষ্ঠা তাঁর খিলাফত আমলে খলিফার ধর্মীয় ভূমিকাকে বিশেষ প্রাধান্য দান করেছিল। তিনি ধর্মাচরণে নিষ্ঠাবান ছিলেন। কি নামায-রোযায়, কি হজ্বযাত্রায়, কি সাধু-সজ্জনদের আর্থিক সহায়তা দানে তিনি অসীম আগ্রহী ছিলেন। তিনি

সীমান্তে অমুসলমানদের সাথে জিহাদ পরিচালনা করতেন। কিন্তু ধর্মের ক্ষেত্রে তাঁর রাজত্বের সর্বাপেক্ষা উল্লেখযোগ্য অবদান হানাফী মাজহাবের উৎপত্তি। যদিও এ মতবাদকে ইমাম আবু হানীফার নামানুসারে হানাফী মতবাদ বলে আখ্যায়িত করা হয়, তথাপি তাঁর প্রধান বিচারপতি আবু ইউসুফের নেতৃত্বে সুযোগ্য আইনবিদদের সহায়তায় হানাফী মতবাদ এ সময় সুস্পষ্ট আকার ধারণ করতে থাকে। ইমাম আবু হানীফার শিষ্য হিসেবে আবু ইউসুফ তাঁর বিখ্যাত কিতাবুল খারাজ গ্রন্থে আপন শিক্ষকের মতবাদগুলি সুবিন্যস্তভাবে সন্নিবেশিত করেন। কিয়াস (সাদৃশ্য) ও ইসতিহ্সান (সুবিচার) এ মতবাদের নীতিবিশেষ।

গ্রন্থনির্দেশ

১. পি. কে. হিট্টি ঃ *হিস্ট্রি অব দি এয়ারবস্।*

২. উইলিয়াম ম্যুর ঃ *কলিফেট।*

৩. সৈয়দ আমীর আলী ঃ *হিস্টি অব দি সারাসেনস্।*

২৭

গৃহযুদ্ধ ঃ আমীন

(৮০৮ — ৮১৩ খ্রিষ্টাব্দ)

হারুন যেভাবে সাম্রাজ্যকে পুত্রদের মধ্যে ভাগ করে দিয়েছিলেন, তার মধ্যে গৃহবিবাদের বীজ লুকানো ছিল। তাঁর মৃত্যুর সময় আমীন ছিলেন রাজধানী বাগদাদে, মামুন ছিলেন খুরাসানের রাজধানী মার্ভে এবং কাসিম ছিলেন রাক্কায়। পিতার ইচ্ছানুসারে আমীন খলিফা হলেন। হারুন উইল করে গিয়েছিলেন যে, তিনি খুরাসানে যে সৈন্যদল ও কোষাগার নিয়ে এসেছিলেন, মামুন তার মালিক হবেন। কিন্তু পিতার মৃত্যুর আশঙ্কা করে আমীন পূর্বাহ্নেই গুপ্তচর পাঠিয়ে সৈন্যবাহিনী ও সমুদয় অস্ত্রশস্ত্র খুরাসান হতে বাগদাদে নিয়ে যাওয়ার ব্যবস্থা করলেন। এভাবে প্রথম থেকেই দু ভ্রাতার মধ্যে সম্পর্ক তিক্ততর হতে থাকে।

গৃহযুদ্ধের অপর প্রধান কারণ রাজ্যে আরব-অনারবের বিরোধ। বারমাকীদের প্রভাব-প্রতিপত্তি কিভাবে দরবারের আরবগণকে ঈর্ষান্বিত করে তুলেছিল, তা আমরা দেখেছি। এবার আমীন ও মামুনকে কেন্দ্র করে আরব-অনারব বিরোধ আবার মাথাচাড়া দিয়ে ওঠে। আমীন ছিলেন আরবমাতা জুবায়দার পুত্র, আর মামুন ছিলেন পারসিক মহিলার পুত্র। সাম্রাজ্ঞী যুবায়দার নেতৃত্বে আরব সভাসদগণ আমীনের পক্ষাবলম্বন করেন। অন্যপক্ষে মার্ভে মামুনের শাসন, রাজ্যের পারসিকগণের পছন্দনীয় ছিল। তাঁর মাতা পারসিক হওয়ায় খুরাসানের লোকেরা তাঁকে 'ভগিনীর পুত্র' বলে সমাদর করত। আমীনের উজীর ছিলেন ফযল ইবন রাবি নামক একজন আরব সভাসদ। অপরপক্ষে মামুনের উজীর ছিলেন একজন পারসিক; তাঁর নাম ছিল ফযল ইবন সহল্। একথা বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য যে, তিনি অধুনা পতিত বার্মাকীদের আশ্রিত ছিলেন। কাজেই দেখা যাচ্ছে যে, আমীন ও মামুন উভয়েই যথাক্রমে রাজ্যের আরব ও অনারব দলের নেতা বলেই পরিগণিত হলেন।

দু ভ্রাতার পার্থক্য পরস্পরের বিরোধকে আরও ত্বরান্বিত করেছিল। বাগদাদের রাজকীয় পরিবেশে শ্রেষ্ঠ জ্ঞানী ব্যক্তিগণের তত্ত্বাবধানে শিক্ষাপ্রাপ্ত হয়েও চরিত্রগত পার্থক্যের কারণে আমীন ও মামুন হারুনের দরবারের দুই পৃথক ভাবধারা আয়ত্ত করেছিলেন। আমীনের চঞ্চল ও আমোদপ্রিয় মন দরবারের বাহ্যিক চাকচিক্য, জাগতিক আরাম-আয়েশ ও নানা বিলাস-ব্যসনে রাজকীয়

জীবনের চরম সার্থকতা খুঁজে পেয়েছিল। তিনি গায়ক-গায়িকা, নর্তক-নর্তকী, বিদূষক, তোষামোদকারী, ঐন্দ্রজালিক ও জ্যোতিষিগণ কর্তৃক পরিবেষ্টিত হয়ে জীবনযাপন করতে ভালবাসতেন। দূর-দূরান্ত থেকে অনুপমা সুন্দরী নর্তকী ও খ্যাতিসম্পন্না গায়িকাগণকে দরবারে ডেকে পাঠান হল। অন্তঃপুরে খোজা প্রহরী নিযুক্ত হল। দজলায় প্রমোদ বিহারের উদ্দেশ্যে তিনি সিংহ, হস্তী, ঈগল, সর্প ও অশ্বাকৃতি পাঁচখানা স্বর্ণখচিত ও সুশোভিত বজরা তৈরি করিয়েছিলেন। গায়ক-গায়িকা এবং নর্তক-নর্তকী সমভিব্যাহারে পানোৎসবে আকণ্ঠ নিমজ্জিত হয়ে সমগ্র রাজকার্যের ভার তিনি উজীর ফযল ইবন রাবির হাতে ন্যস্ত করে দিয়েছিলেন। নৃত্যগানের অনুষ্ঠানের জন্য তিনি একটি উৎসবগৃহকে মনোরম গালিচা, গদী ও ঝালরে সুশোভিত করেছিলেন। এ উৎসব-গৃহে অনুষ্ঠিত একটি উপভোগ্য ও উপাদেয় নৃত্যের বর্ণনা বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। একশত সুন্দরী বালিকা মুক্তা-খচিত ও হীরকশোভিত চমকপ্রদ পোশাকে সুসজ্জিত হয়ে মৃদু সঙ্গীত লহরীর তালে তালে নৃত্য করতে করতে খর্জুরপত্র দুলিয়ে একবার সম্মুখে আসত, আবার পশ্চাতে চলে যেত। তারপর ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র দলে বিভক্ত হয়ে বারংবার গোলকধাঁধার সৃষ্টি করত এবং বার বার গমনাগমন ও পার্শ্ব পরিবর্তন করত এবং অঙ্গভঙ্গি করত—যেন আলোর ও রঙের পরিমণ্ডল। অপরপক্ষে মামুন তৎকালীন জ্ঞান-বিজ্ঞান ও দর্শন পুরাপুরি আয়ত্ত করেছিলেন। তাঁর সুযোগ্য শাসনে খুরাসানের জনসাধারণ তাঁর প্রতি প্রসন্ন ছিল। তিনি ফযল ইবন সহল নামক সুযোগ্য পরামর্শদাতার সাহায্য ও সহযোগিতা প্রাপ্ত হয়েছিলেন। বিখ্যাত সেনাপতি হারসামা ও তাহির তাঁর পক্ষাবলম্বন করেছিলেন। তাঁর অনাড়ম্বর জীবনযাত্রা, কর্তব্য পরায়ণতা ও উদার রাজস্বনীতি তাঁকে জনপ্রিয় করে তুলেছিল।

পরিশেষে এ গৃহযুদ্ধের প্রত্যক্ষ কারণ হিসেবে রাজকার্যে আমীনের উদাসীনতা, উজীর ফযল ইবন রাবির প্রভাবে পড়ে মামুনের প্রতি তাঁর অসদাচরণ এবং অর্থব্যয়ে আমীনের অপরিণামদর্শিতার কথা উল্লেখ করতে হয়। আমীন সৈন্যদেরকে সন্তুষ্ট করবার জন্য তাদেরকে দুই মাসের বেতন অগ্রিম দিয়ে দিলেন। তাঁর বিলাস-ব্যসন ও জাঁকজমকের জন্য রাজকোষ হতে প্রচুর অর্থ অকাতরে ব্যয়িত হত। হারুন যখন মৃত্যুর পূর্বে খুরাসানে অবস্থান করছিলেন, তখন ফযল ইবন রাবি তাঁর সঙ্গে ছিলেন। তিনি মামুনের প্রতি বিশ্বাসঘাতকতা করে সৈন্যদল, যুদ্ধাস্ত্র ও টাকা-পয়সা বাগদাদে নিয়ে গিয়েছিলেন। এখন মামুনকে খিলাফতের উত্তরাধিকার হতে সম্পূর্ণরূপে বঞ্চিত করবার জন্য তিনি আমীনকে নানাভাবে প্ররোচিত করতে লাগলেন। আমীন প্রথম এ ধরনের পরামর্শ

কানে তুললেন না, কিন্তু অন্যান্য সভাসদগণের কুপরামর্শে পড়ে তিনি মামুনকে বাগদাদে আসবার জন্য পরওয়ানা পাঠালেন। মামুন তাঁর এ দূরভিসন্ধিমূলক আহ্বানে সাড়া না দেয়ায় আমীন তাঁকে খুরাসানের শাসনকর্তার পদ থেকে বরখাস্ত করলেন। তিনি কাসিমকেও পশ্চিমাঞ্চলের শাসনকর্তার পদ হতে বঞ্চিত করলেন।

মামুনের উত্তরাধিকারের দাবি অস্বীকার করে আমীন তাঁর শিশুপুত্র মুসাকে উত্তরাধিকারী মনোনীত করলেন। কাবাগৃহ থেকে আমীন ও মামুনের উত্তরাধিকার সম্পর্কিত দলিলগুলি অপসারণ করে ছিন্ন-ভিন্ন করে ফেলা হল। আলী ইবন ঈসার নেতৃত্বে পঞ্চাশ হাজার সৈন্যের একটি দল রাইয়ে প্রেরিত হল। মামুন পূর্বাহ্ণেই তাঁর রাজ্যের পশ্চিম সীমান্তে সৈন্যবাহিনী মোতায়েন করেছিলেন। তাঁর সেনাপতি তাহিরের হাতে আলী ইবন ঈসা শোচনীয়ভাবে পরাজিত ও নিহত হলেন (৮১১ খ্রিঃ)। বাগদাদ হতে প্রেরিত আরও কয়েকটি সৈন্যদল তাহির কর্তৃক পরাজিত হল। তাহির হারসামাকে হুলওয়ানে রেখে আহওয়াজের দিকে রওয়ানা হলেন। এখন মামুন আমীরুল মুমিনীন উপাধি গ্রহণ করলেন এবং সাম্রাজ্যের পূর্বাঞ্চলে খলিফা বলে স্বীকৃত হলেন। মামুন ফযল ইবন সহলকে সকল সামরিক ও বেসামরিক ক্ষমতা দিয়ে প্রধানমন্ত্রী নিযুক্ত করলেন। 'হামাদান হতে তিব্বত এবং কাস্পিয়ান সাগর হতে পারস্যোপসাগর পর্যন্ত' অঞ্চলে তাঁর অধিকার প্রতিষ্ঠিত হল।

ফযল ইবন রাবি পূর্বাঞ্চলের এ সব ঘটনার কথা শুনে আমীনকে এ বিপদের সময় সক্রিয় হবার জন্য উপদেশ দিলেন, কিন্তু আমীন তাঁর গলগ্রহ ও অনুগ্রহপুষ্ট লোকদের কথার তুবড়ীতে মেতে ছিলেন। অবশেষে পরাজয়ের গ্লানির প্রতিশোধ নেবার জন্য তিনি খলিফা হারুন কর্তৃক মামুনকে প্রদত্ত এক লক্ষ দিরহাম বাজেয়াপ্ত করলেন। আমীনের চাঁইগণ তাঁকে পরামর্শ দিল যে, বাগদাদে অবস্থানরত মামুনের দুই পুত্রকে যেন হত্যা করা হয়। কিন্তু ভ্রাতার সাথে যত শত্রুতাই থাকুক না কেন, আমীন এ রকম উপদেশ-দানকারিগণকে কারারুদ্ধ করে শাস্তি প্রদান করতেও কুণ্ঠাবোধ করেননি।

ঠিক এ সময় সিরিয়ায় আলী ইবন আবদুল্লাহ নামক মু'আবিয়ার এক বংশধর, যিনি মাতার দিক থেকে আলীর (রা) বংশের সাথেও সম্পর্কযুক্ত ছিলেন, বিদ্রোহী হলেন এবং দুই-তিন বছর পর্যন্ত সিরিয়ায় গোলযোগ চলতে থাকে। সিরিয়ায় বিদ্রোহ দমনের জন্য প্রেরিত হুসায়ন নামক একজন সেনাপতি (নিহত আলী ইবন ঈসার পুত্র) বাগদাদে ফিরে আসলে আমীন তাঁকে মধ্যরাত্রিতে তলব

করলেন। সেনাপতি খলিফার এ আদেশ শুধু প্রত্যাখ্যানই করলেন না, বরং বলে পাঠালেন যে, তিনি ভাঁড় কিংবা গায়ক নন, কাজেই রাত্রিতে খলিফার সাথে দেখা করতে তিনি অপারগ। প্রত্যুষে এ সেনাপতি আমীন ও তাঁর মাতাকে বন্দী করে মামুনকে খলিফা বলে ঘোষণা করলেন। কিন্তু তাঁর এ সাফল্য ক্ষণস্থায়ী হয়েছিল। বাগদাদের জনসাধারণ বিদ্রোহী হয়ে আমীনকে আবার খিলাফতে অধিষ্ঠিত করল এবং হুসায়নকে বন্দী করল। পরম পরিতাপের বিষয় এই যে, উজীর ফযল ইবন রাবিও হুসায়নের সাথে ষড়যন্ত্রে লিপ্ত হয়েছিলেন। এখন তিনি আত্মগোপন করলেন।

রাজধানীতে যখন এ সব ঘটনা আমীনকে বিপর্যস্ত ও পর্যুদস্ত করে তুলেছিল, তখন মামুনের সেনাপতি তাহির দজলা নদী পার হয়ে ওয়াসিত দখল করলেন। ইতিমধ্যে জনৈক আলীর (রা) বংশধর মক্কার শাসনকর্তা আমীনের কার্যকলাপের নিন্দা করে, বিশেষত আমীন কর্তৃক কাবা শরীফে রক্ষিত দলিলগুলির অমর্যাদার তীব্র সমালোচনা করে মার্ভে মামুনের কাছে চলে যান। ওয়াসিতের পর কুফা, বসরা ও মসুল পর্যন্ত সমগ্র ভূভাগ মামুনের বশ্যতা স্বীকার করল। কেবল রাজধানী বাগদাদই আমীনের হাতে রইল। এবার বিপদের গুরুত্ব উপলব্ধি করে আমীন অনেক টাকা-পয়সা ঢেলে লোকজনকে তাঁর পক্ষে যুদ্ধ করতে প্ররোচিত করতে প্রয়াসী হলেন। অচিরে তাহির বাগদাদের আনবার ফটকের সম্মুখে শিবির সংস্থাপিত করলেন। সেনাপতি হারসামা দজলার অপর তীরে অপেক্ষা করতে লাগলেন। পূর্ণ এক বছর বাগদাদ নগরী অবরুদ্ধ হয়ে রইল। এ সময় বাগদাদবাসীদের দুঃখের অন্ত ছিল না। তাদের খাদ্যসামগ্রী সরবরাহ বন্ধ হয়ে গেল। লক্ষ লক্ষ মুদ্রা ব্যয়ে নির্মিত সুরম্য অট্টালিকাসমূহ ধূলিসাৎ হয়ে গেল এবং যে নগরী বিগত অর্ধ-শতাব্দী ধরে সমগ্র পৃথিবীর ধনরত্ন আহরণ করে সমৃদ্ধ হয়েছিল, এ যুদ্ধের ফলে তা ধ্বংসস্তূপে পরিণত হল।

নগরীর একাংশ যখন তাহিরের দখলে চলে গেল, তখন আমীনের সেনাপতিগণ একে একে দলত্যাগ করে তাহিরের শিবিরে ভিড়লো। আমীন বৃথাই তাঁর রাজকোষ খালি করে দিলেন এবং পরিশেষে স্বর্ণ ও রৌপ্যপাত্র গলিয়ে নগর রক্ষার শেষ চেষ্টা করলেন। কিন্তু কিছুতেই কিছু হল না। তাহির আমীনের প্রধান সেনাপতিগণের সহযোগিতায় বিপুল শক্তি সঞ্চয় করে নগরীর অনধিকৃত অংশ আক্রমণ করলেন। আমীন তাঁর মাতা ও পরিবারবর্গসহ মনসুর কর্তৃক নির্মিত দুর্গে আশ্রয় গ্রহণ করলেন। এখন আত্মসমর্পণ ছাড়া আমীনের আর কোন উপায় রইল না। কিন্তু আমীন তাহিরের কাছে আত্মসমর্পণে অনিচ্ছুক ছিলেন।

অবশেষে বহু আলাপ-আলোচনার পর স্থির হল যে, আমীন হারসামার কাছে আত্মসমর্পণ করবেন, কিন্তু রাজদণ্ড, সিলমোহর এবং রাজকীয় বেশভূষা তাহিরের কাছে প্রেরিত হবে। তদনুসারে হারসামা তাঁর নৌকায় করে আমীনকে দজলার পূর্ব তীরে নিয়ে যেতে রাজি হলেন। অশ্রুবিগলিত নেত্রে দুই পুত্রকে পক্ষপুটে নিয়ে হতভাগ্য আমীন নদীর তীরে উপস্থিত হলেন। হারসামা তাঁকে যথোচিত মর্যাদার সাথে নৌকোয় উঠিয়ে যাত্রা শুরু করলেন। কিন্তু সেনাপতি তাহিরের অনুচরগণ নৌকোটি আক্রমণ করে নিমজ্জিত করে ফেলল। আমীন সাঁতরিয়ে একটি গৃহে আশ্রয় নিলেন। কিন্তু রাত্রিতে একদল পারসিক তাঁকে হত্যা করল। (সেপ্টেম্বর, ৮১৩ খ্রিঃ)।

আগেই উল্লেখ করা হয়েছে যে, আমীন ও মামুনের গৃহবিবাদকে কেন্দ্র করে রাজ্যের আরব ও অনারবদের মধ্যে এক ভীষণ শক্তি পরীক্ষা হল। আমীনের পরাজয় আরবদের পরাজয় ও মামুনের জয় অনারব ও পারসিকদের বিজয় সূচিত করে। আমীনের পরাজয়ের জন্য তাঁর অপরিণামদর্শিতা, বিলাস-ব্যসনে কালক্ষেপ ও তাঁর পরামর্শদাতাগণের দূরভিসন্ধিই দায়ী। বাগদাদের জনসাধারণ আমীনকে খুবই ভালবাসত এবং তারা শেষ পর্যন্ত আমীনের জন্য মরিয়া হয়ে লড়েছিল; কারণ তারা খুরাসানীদের কর্তৃত্ব ও মামুনের পারসিক প্রীতি পছন্দ করত না। কিন্তু আমীনের যোগ্য কোন সেনাপতি ছিল না। আলী ইবন ঈসার মৃত্যুর পর যারা তাঁর দলে ছিল, তারা তাহিরের সম্মুখে টিকে থাকতে না পেরে ক্রমশ মামুনের ক্রমবর্ধমান ক্ষমতার সম্মুখে মস্তক অবনত করল।

গ্রন্থনির্দেশ

১. উইলিয়াম মুর : *খলিফেট।*

২. সৈয়দ আমীর আলী : *হিস্ট্রি অব দি সারাসেনস্।*

২৮
মামুন
(৮১৩ — ৮৩৩ খ্রিঃ)

মামুন সর্ববিষয়ে ভ্রাতা আমীনের বিপরীতধর্মী ছিলেন। তাঁর জীবনযাত্রা সব অমিতাচার হতে মুক্ত ছিল। ইসলাম বিরোধী কোন কার্যকলাপ তাঁর দরবারে বা সান্নিধ্যে কখনও অনুষ্ঠিত হত না। তাঁর রাজত্বকাল প্রশংসনীয়, ন্যায়ানুগ ও গৌরবময় ছিল। তিনি রাজ্যের পূর্বাঞ্চলে অবস্থান করে বাগদাদের বস্তুতান্ত্রিক ও ইন্দ্রিয়সর্বস্ব জীবনের প্রতি অশ্রদ্ধা পোষণ করতে আরম্ভ করলেন। অধিকন্তু উজীর ফযল ইবন সহল নিজ স্বার্থে মামুনকে বাগদাদে যেতে দিতে চাইতেন না। তিনি মার্ভে খলিফার ওপর সকল প্রকার কর্তৃত্ব খাটাতেন এবং বাগদাদে গিয়ে তাঁর এ কর্তৃত্ব ক্ষুণ্ন হতে পারে, এ ভয়ে মামুনকে মার্ভে রেখে তিনি রাজ্যের পশ্চিম. ঞ্চলের সমস্ত ঘটনা তাঁর নিকট গোপন করলেন। মার্ভে থেকে মামুন একদিকে যেমন ফযলের খপ্পরে পড়লেন, অন্যদিকে তেমনি আলীর (রা) বংশধরদের প্রতি সহানুভূতিসম্পন্ন হয়ে উঠলেন। আলাবীদের প্রতি তাঁর এ দুর্বলতা শুধু যে কেবল রাজধানী বাগদাদের জনসাধারণের ঘৃণার কারণ ছিল তাই নয়, তাঁর এ সব ধ্যান-ধারণা আব্বাসীয় বংশের ভবিষ্যৎকে বিপন্ন করে তুলল। তাই তাঁর রাজত্বের প্রথম ছয় বছর বাগদাদের ও পশ্চিমাঞ্চলের বিদ্রোহ ও অরাজকতা রাজ্যের ভিত্তিমূল পর্যন্ত কাঁপিয়ে তুলল। আমীনের মৃত্যুর পরেই বাগদাদে না এসে তিনি মারাত্মক ভুল করলেন।

বাগদাদে ও রাজ্যের পশ্চিমাঞ্চলে যে অরাজকতা ও বিদ্রোহ চলছিল, এখানে তার একটি সংক্ষিপ্ত বিবরণ দেয়া আবশ্যক। প্রথমে বাগদাদের জনসাধারণ ও

বিদ্রোহ

স্থানীয় সৈন্য বাগদাদের শাসনকর্তা তাহিরের বিরুদ্ধে বিদ্রোহী হল। আমীনের হত্যা ও সম্রাজ্ঞী জুবায়দার নির্বাসনের জন্য তারা তাহিরের বিরোধিতা করল। তখন উজীর ফযলের ভ্রাতা হাসানকে বাগদাদে প্রেরণ করা হল এবং তাহিরকে সিরিয়ার শাসনকর্তা করে রাক্কায় পাঠান হল। নাসর ইবন সাবাহ নামক এক ব্যক্তি মেসোপটেমিয়ায় বিদ্রোহী হয়ে পাঁচ বছর বাগদাদ হতে প্রেরিত সেনাদলকে ঠেকিয়ে রেখেছিল। আবু সারাইয়া নামক একজন দুর্ধর্ষ তস্কর কুফা অধিকার করে সেখানে ইবন তাবাতাবা নামক একজন আলীর (রাঃ) বংশধরকে খলিফা বলে ঘোষণা করল। সেনাপতি হারসামা আবু সারাইয়াকে

পরাজিত করলেন। রাজ্যের এ শোচনীয় পরিস্থিতিতে মর্মাহত হয়ে হারসামা মার্ভে খলিফার নিকট গিয়ে সব অবস্থা অকপটে বলবার জন্য ব্যাকুল হয়ে উঠলেন। উজীর ফযলের সব চক্রান্ত খলিফার সম্মুখে উদঘাটিত করতে মনস্থ করে তিনি মার্ভে যাত্রা করলেন। দুষ্টমতি ফযল হারসামার আগমনের উদ্দেশ্য অনুমান করে পূর্বাহ্ণেই খলিফার মনকে হারসামার বিরুদ্ধে বিষিয়ে তুলেছিল। খলিফার সান্নিধ্যে কিছু বলবার আগেই উজীরের নির্দেশে তাঁকে বন্দী করা হল এবং পরে হত্যা করা হল। হারসামার মৃত্যু সংবাদে বাগদাদে আবার বিদ্রোহ দেখা দিল। সৈন্যগণ হাসানকে 'অগ্নি উপাসকের পুত্র অগ্নি উপাসক' বলে গালাগাল করল এবং খলিফা মাহদীর এক পুত্র মনসুরকে হাসানের পরিবর্তে শাসনকর্তা নিযুক্ত করল। ঠিক এমন সময় মামুনের এক অচিন্তনীয় অবিমৃষ্যকারিতার ফলে বাগদাদে ও পশ্চিমাঞ্চলে আবার বিদ্রোহের আগুন দাউ দাউ করে জ্বলে উঠল।

মামুন আলীর (রা) বংশধরগণের প্রতি অত্যন্ত সহানুভূতিশীল ছিলেন। এ সহানুভূতির বশবর্তী হয়ে তিনি ৮১৭ খ্রিস্টাব্দে শিয়াদের অষ্টম ইমাম আলী আর-রিজাকে মার্ভে ডেকে তাঁকে খিলাফতের উত্তরাধিকারী বলে ঘোষণা করলেন। পরিতাপের বিষয়, উজীর ফযলও খলিফার এ মারাত্মক সিদ্ধান্তে সায় দিলেন। মামুন রাজ্যের সর্বত্র আলীর প্রতি আনুগত্যের শপথ গ্রহণ করারও নির্দেশ দিলেন এবং আব্বাসীয় কৃষ্ণবর্ণের পরিবর্তে ফাতিমীয়গণের সবুজবর্ণকে রাজকীয় পোশাকের বর্ণ হিসেবে গ্রহণ করলেন। মামুনের এ সব আদেশে বাগদাদের আব্বসীয়গণ প্রমাদ গুণল। যে শিয়াগণকে তারা বরাবর ঘৃণার চোখে দেখত, তাদের কর্তৃত্ব আসন্ন মনে করে তারা বিরাট আক্রোশে ফেটে পড়ল। তারা এখন মাহদীর অপর পুত্র ইব্রাহীমকে খলিফা বলে ঘোষণা করল। বাগদাদ ও এর পার্শ্ববর্তী অঞ্চলে অরাজকতা দেখা দিল। দস্যু-তস্করেরা প্রকাশ্য দিবালোকে বাগদাদের রাজপথে লুণ্ঠন ও অত্যাচার আরম্ভ করল। নগরবাসীরা নিজেদের নিরাপত্তার জন্য শান্তিরক্ষা বাহিনী গঠন করল। দক্ষিণ ইরাক এবং হিজাযেও সেরকম শোচনীয় পরিস্থিতির উদ্ভব হল। ফযলের স্বার্থপর নীতি ও সাম্রাজ্যের প্রকৃত অবস্থা সম্বন্ধে মামুনের অজ্ঞতা মুসলিম সাম্রাজ্যকে খণ্ড-বিখণ্ড করে ফেলবার উপক্রম করল। ইমাম আলী আর-রিজা তখন মার্ভে অবস্থান করছিলেন। তিনি রাজ্যের এ পরিস্থিতি লক্ষ্য করে স্বেচ্ছাপ্রণোদিত হয়ে মামুনের কাছে গমন করলেন এবং প্রকৃত অবস্থা সম্বন্ধে তাঁর

আলী আররিজা উত্তরাধিকারী ঘোষিত ৮১৭ খ্রিঃ

নিকট সবকিছু অকপটে ব্যক্ত করলেন। আমীনের শোচনীয় মৃত্যুর পর হতে ক্রমান্বয়ে কিভাবে পশ্চিমাঞ্চলে অবস্থার অবনতি ঘটেছে, তা তিনি প্রকাশ করলেন। উজীরের সত্য গোপন, বাগদাদে ইব্রাহীমের নির্বাচন এবং খিলাফতে তাঁর মনোনয়নের ফলে উদ্ভূত পরিস্থিতি সবই তিনি বর্ণনা করলেন। হাসান ও তাঁর ভ্রাতা ফযলের কুশাসনে কিভাবে দেশ রসাতলে যাচ্ছে, যোগ্য সেনাপতি তাহিরকে কিভাবে কোণঠাসা করে সিরিয়ায় প্রেরণ করা হয়েছে এবং প্রভুভক্ত হারসামাকে কি অন্যায়ভাবে উজীরের চক্রান্তে হত্যা করা হয়েছে, এ সব কথা শুনে মামুনের জ্ঞান-চক্ষু উন্মোচিত হল। দরবারের অন্যান্য নেতৃস্থানীয় লোকজন উজীরের প্রতিশোধ হতে নির্ভয় হবার ব্যাপারে খলিফার আশ্বাসপ্রাপ্ত হয়ে এবার মুখ খুললেন এবং আলী আর-রিজার প্রতিটি কথার যথার্থতা প্রতিপাদন করলেন। মামুনের মনে আর কোন প্রকার সন্দেহ রইল না যে, বাগদাদে যাওয়াই এ সব গোলযোগ ও দুরবস্থার একমাত্র প্রতিকার। তিনি অবিলম্বে বাগদাদ যাত্রার আদেশ দিলেন। যে-সব লোক খলিফার কাছে আলী আর-রিজার সমর্থনে কথা বলেছিল, প্রতিহিংসাপরায়ণ উজীর তাদের অনেককে নানাভাবে নাজেহাল করল। খলিফা মার্ভে হতে একদিনের পথে সাররাখ নামক স্থানে পৌঁছলে শত্রুদের প্ররোচনায় উজীর তাঁর হাম্মামখানায় আততায়ী কর্তৃক নিহত হলেন। পথিমধ্যে মামুন তুস নগরীতে কিছুকাল বিশ্রাম করবার জন্য থামলেন। এখানে দুর্ভাগ্যক্রমে আলী আর-রিজার মৃত্যু হয়। মামুন তাঁর এ আকস্মিক মৃত্যুতে বিহ্বল হয়ে পড়লেন এবং তাঁর সমাধির ওপর স্মৃতিসৌধ নির্মাণের আদেশ দিলেন। এ স্থান শিয়াদের বিখ্যাত তীর্থ এবং মাশহাদ নামে পরিচিত। নাহরাওয়ানে এসে মামুন আবার থামলেন। বাগদাদের গণ্যমান্য ব্যক্তিগণ, আব্বাসীয় বংশের লোকেরা এবং অন্যান্য আরও অনেকে এখানে এসে মামুনের সাথে মিলিত হলেন। রাক্কা হতে তাহিরও আসলেন। এখানে সকলের অনুরোধক্রমে সবুজ পোশাকের পরিবর্তে আবার আব্বাসীয় কৃষ্ণবর্ণ পোশাক সরকারি বলে বিধিবদ্ধ হয়। মামুন সভাসদগণকে কৃষ্ণবর্ণ পোশাক উপহার দিলেন।

এর পর মামুন বাগদাদের দিকে যাত্রা করলেন। ইব্রাহীমের শাসনে সবাই অসন্তুষ্ট ছিল। মামুনের সেনাবাহিনীর আগমনে ইব্রাহীম পলায়নপর হলেন। আট বছর পর তিনি একটি কবিতায় মামুনের প্রশস্তি লিখে তাঁর অনুগ্রহভাজন হয়েছিলেন।

পরিশেষে ৮১৯ খ্রিস্টাব্দের আগস্ট মাসে মামুন বিজয়ীবেশে বিনা বাধায় বাগদাদে প্রবেশ লাভ করলেন। উৎসব-মুখরিত রাজধানীতে বহুদিন পর শান্তির ছায়া নেমে আসল। সব বিশৃঙ্খলা থেমে গেল এবং সুসজ্জিত রাজপথে লোকজন উত্তম বেশভূষায় সজ্জিত হয়ে বের হয়ে আসল। মামুন বিদ্রোহী নগরীর প্রতি অসীম ক্ষমা ও সহনশীলতার পরিচয় দিলেন। ভ্রাতার উজীর ফযল ইবন রাবি, ইব্রাহিমের উজীর ঈসা ও অন্যান্য বিপক্ষীয় লোকগণকে মামুন উদার ও মহানুভব ব্যবহারের সাহায্যে বশীভূত করে ফেললেন। তিনি নগরীর ধ্বংস সংস্কারে ও শাসনব্যবস্থা পুনর্গঠনে আত্মনিয়োগ করলেন। বিদ্রোহকালীন বাগদাদের অবস্থা সম্পর্কে মামুনের মন্তব্য বিশেষ প্রণিধানযোগ্য। তিনি বলেছিলেন ঃ বাগদাদে তিন শ্রেণীর লোক আছে—এক শ্রেণীর লোক মজলুম (অত্যাচারিত), এক শ্রেণী জালিম (অত্যাচারী), আর তৃতীয় শ্রেণী উপরোক্ত কোন দলের অন্তর্ভুক্ত নয় এবং এরাই সব অনিষ্টের মূল। অরাজকতার সময় সাধারণ লোকের নিষ্ক্রিয়তা ও উদাসীনতা সম্পর্কে মামুনের উক্তি যে-কোন যুগেই সমভাবে প্রযোজ্য।

মামুনের বাগদাদে প্রবেশ ও শাসনের সুব্যবস্থা

বাগদাদে শান্তি পুনঃপ্রতিষ্ঠার পর মামুন রাজ্যের অন্যান্যস্থানে উপযুক্ত শাসনকর্তা নিযুক্ত করলেন। মক্কা ও মদীনার শাসনভার একজন আলীর (রা) বংশধরের ওপর ন্যস্ত হল। কুফা ও বসরার শাসনভার খলিফার দুই ভ্রাতাকে দেয়া হল। তাহিরকে আবার বাগদাদের শাসনকর্তা নিযুক্ত করা হল এবং তাহিরের পুত্র আবদুল্লাহকে রাক্কার শাসনভার দেয়া হল। কিছুদিন পর তাহিরকে রাজ্যের পূর্বাঞ্চলের রাজপ্রতিনিধি নিযুক্ত করা হল। দু বছর পর তাহিরের মৃত্যু হলে তাঁর আর এক পুত্র তান্হা পিতার স্থলাভিষিক্ত হলেন।

অন্যান্য স্থানের শাসনের সুব্যবস্থা

আবদুল্লাহ্ নাসর ইবন সাবার বিদ্রোহ দমন করলেন এবং মেসোপটেমিয়ায় শান্তি স্থাপন করলেন। তখন মিসরেও বিদ্রোহ চলছিল। আবদুল্লাহ নাসরকে দমন করার পর মিসরের বিদ্রোহীদেরকে পরাজিত করে সেখানেও শান্তি স্থাপন করলেন। এ সময় স্পেন থেকে বহু মুসলমান পরিবার বিতাড়িত হয়ে মিসরে এসে পৌঁছল। তারা মিসরে শান্তিভঙ্গ করলে তাদেরকে মিসর ত্যাগ করতে আদেশ করা হল। এ সব লোক ক্রীট দ্বীপে গিয়ে তা দখল করল। ইতিমধ্যে উত্তরআফ্রিকার জিয়াদতুল্লাহ্ আগলাব সিসিলি দ্বীপ অধিকার করেন। ইয়ামনে ও

খুরাসানেও বিদ্রোহ প্রশমিত হয়। সর্বত্রই বিদ্রোহিগণ মামুনের কাছে উদার ব্যবহার প্রাপ্ত হন।

মামুন ফযল ইবন সহলের ভ্রাতা হাসানকে উজীরের পদে উন্নীত করলেন। ফযলের শোচনীয় হত্যাকাণ্ডের পর মামুন হাসানকে এ পদোন্নতির প্রতিশ্রুতি দান করেছিলেন এবং তাঁর কন্যা বুরানের সাথে মামুনের বিবাহ স্থির হয়। ২১০ হিজরীর রমজান মাসে বাগদাদে বিশেষ আড়ম্বর ও ধুমধামের সাথে এ বিবাহ অনুষ্ঠিত হয়। এ বিবাহের আড়ম্বর হতে তৎকালীন বাগদাদের জাঁক-জমক সম্বন্ধে ধারণা করা যায়। উজীর তাঁর বাসস্থানে বরযাত্রীকে সতরদিন ধরে মহা সমারোহে আপ্যায়িত করেন। রাজমাতা জুবায়দা ও রাজপরিবারের অন্যান্য মহিষী এ উৎসবে উপস্থিত ছিলেন। তাঁদের অনুপম রূপমাধুরী ও পরিচ্ছেদের পরিপাট্য কবিদের কাব্যস্পৃহা জাগিয়েছিল। অপূর্ব রূপ-লাবণ্যময়ী বধূ সকলের সেরা সুন্দরী ছিলেন। বধূর দাদীমা একটি স্বর্ণের বারকোষ হতে এক সহস্র মুক্তার দানা বর-কনের ওপর বর্ষণ করেন; তারপর এগুলিকে খুঁজে নিয়ে মালা তৈয়ার করা হয় এবং তা নবপরিণীতার কণ্ঠ শোভিত করে। একমণ আম্বর দিয়ে প্রস্তুত একটি বাতি স্বর্ণের শামাদানে প্রজ্বলিত করে বাসরসগৃহ আলোকিত করা হয়। বরযাত্রী যখন বিদায় গ্রহণ করছিল, তখন উজীর তাদেরকে খিলাত (পোশাক) উপহার দিলেন এবং তাদের ওপর মৃগনাভির গোলা বর্ষণ করেন। প্রতিটি গোলার ভেতরে একটি উপঢৌকনের নাম লিখিত ছিল। লোকেরা ঐ লেখা অনুযায়ী কেউ একটি জায়গীর, একটি ক্রীতদাস অথবা অন্য কোন সম্পত্তি পেল। এ বিবাহের ব্যয় নির্বাহের জন্য খলিফা উজীরকে ফারিস ও আহওয়াজের এক বছরের রাজস্ব দান করলেন। বুরান কেবল যে তাঁর সৌন্দর্যের জন্য বিখ্যাত ছিলেন, তা নয়, তিনি বিবিধ গুণে গুণান্বিতা ছিলেন এবং রাজকার্যে তাঁর স্বামীর ওপর যথেষ্ট প্রভাব বিস্তার করতেন। তিনি বদান্যতার জন্যও বিশেষ সুখ্যাতি অর্জন করেছিলেন এবং মামুনের মৃত্যুর পরেও পঞ্চাশ বছর পর্যন্ত জীবিত থেকে সাম্রাজ্যের গৌরবময় যুগই প্রত্যক্ষ করেননি, এর পতনোন্মুখ অবস্থাও অবলোকন করেছিলেন।

বুরানের সাথে বিবাহ ৮২৫ খ্রিঃ

মামুনের রাজত্বের প্রথম ভাগে যখন চতুর্দিকে বিদ্রোহ ও অরাজকতা বিরাজ করছিল, তখন বাবক নামক এক তস্কর কাম্পিয়ানের তীরে অবস্থিত মাজান্দারানের দুর্গম পার্বত্যঅঞ্চলে ঘাঁটি নির্মাণ করে পার্শ্ববর্তী অঞ্চলে অবাধ

নাস্তিক বাবক

লুঠতরাজ চালাচ্ছিল। সে খুররামী সম্প্রদায়ের অন্তর্ভুক্ত ছিল এবং পুনর্জন্ম ও অন্যান্য অদ্ভুত মতবাদে বিশ্বাসী ছিল। সে দলবলসহ পাশের অঞ্চলে নরহত্যা ও লুণ্ঠন করেই ক্ষান্ত হত না, বরং স্ত্রীলোকদেরকে বন্দী করে তার ঘাঁটিতে আটক রাখত। বাগদাদ হতে প্রেরিত বহু সেনাবাহিনী একের পর এক হয় ব্যর্থ হয়ে ফিরে আসল, না হয় পার্বত্য অঞ্চলে নিশ্চিহ্ন হয়ে গেল। এভাবে বহু বছর পর্যন্ত সে উক্ত অঞ্চলে সন্ত্রাসের রাজত্ব কায়েম করেছিল। মামুনের সময় তাকে দমন করার সব প্রচেষ্টা ব্যর্থ হল। অধিকন্তু বাবক গ্রীকদের সাথে সহযোগিতা করে তাদেরকে মুসলিম রাজ্য আক্রমণে উৎসাহিত করতে লাগল। মামুন ৮৩০ খ্রিস্টাব্দে টরসাস অঞ্চলে গমন করে গ্রীকদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ

গ্রীকদের সাথে যুদ্ধ

পরিচালনা করলেন এবং তাদেরকে পরাজিত করে সন্ধি স্থাপন করতে বাধ্য করলেন। পৌনঃপুনিক গ্রীক আক্রমণের বিরুদ্ধে স্থায়ী ব্যবস্থা গ্রহণের উদ্দেশ্যে মামুন সীমান্তে টায়ানা নামক স্থানে একটি সুবিশাল সুরক্ষিত সামরিক ঘাঁটির নির্মাণ কার্য আরম্ভ করেন। এ ঘাঁটির প্রাথমিক প্রস্তুতি সমাপ্ত করে তিনি পুত্র আব্বাসকে এর তত্ত্বাবধানের ভার দিয়ে টরসাসে প্রত্যাবর্তন করেন। শরতের এক গরমের দিনে ভ্রাতা আবু ইসহাকের সাথে তিনি পার্বত্য অঞ্চলে একটি নির্ঝরিণীর পার্শ্বে বসে এর স্বচ্ছ শীতল জলে পদ সিক্ত করছিলেন। সেখানে উভয় ভ্রাতা প্রাণ ভরে সদ্য আনীত টাটকা খেজুর খেলেন এবং বরফ-শীতল পানি পান করলেন। রাত্রেই তাঁরা জ্বরে আক্রান্ত হলেন। মামুন এ জ্বর হতে আর উঠলেন না। পীড়িতাবস্থায় ভ্রাতা আবু ইসহাককে 'মুতাসিম' উপাধি দান করে উত্তরাধিকারী মনোনীত করলেন। ৮৩৩ খ্রিস্টাব্দের ৯ আগস্ট টরসাসে তিনি শেষ নিশ্বাস ত্যাগ করেন। মৃত্যুকালে তাঁর বয়স হয়েছিল ৪৮ বছর। পাঁচ বছর খুরাসানের শাসনকর্তা হিসেবে কাজ করার পর তিনি বিশ বছর খলিফা পদে অধিষ্ঠিত ছিলেন।

মামুনের রাজত্বকালের ঘটনাবলি গতানুগতিক ও বৈচিত্র্যহীন। তারমধ্যে প্রথম আট বছর রাজ্যের পশ্চিমাঞ্চলে ঘোরতর অরাজকতা বিরাজমান ছিল। কিন্তু তাঁর রাজত্বকাল দুটি বিষয়ের জন্য ইসলামের ইতিহাসে গুরুত্বপূর্ণ স্থান অধিকার করে রয়েছে। প্রথমত, মামুন কর্তৃক মুতাজিলা মতবাদ সমর্থন ও দ্বিতীয়ত, তাঁর রাজত্বকালে জ্ঞান-বিজ্ঞানের অভূতপূর্ব উন্নতি। এ উভয় বিষয়ে মামুনের সক্রিয় ভূমিকা বিশেষ উল্লেখযোগ্য। মামুন উদার মনোভাবের জন্য

প্রসিদ্ধি লাভ করেছিলেন। তিনি তাঁর দরবারে ভিন্ন ভিন্ন মতের ধর্মীয় নেতাগণকে ডেকে তাঁদের সাথে আলাপ-আলোচনা করতে ভালবাসতেন। গ্রীক দর্শনের প্রভাবে এ যুগে মুসলমানদের মনে যে আলোড়নের সৃষ্টি হয়েছিল, খলিফা মামুন তা দ্বারা প্রভাবান্বিত হয়ে মানব মনের বহু জিজ্ঞাসার উত্তর খুঁজে বের করতে চেষ্টিত হলেন। যে অবিচলিত নিষ্ঠা ও প্রজ্ঞা সহকারে তিনি পণ্ডিত ব্যক্তিদের আলোচনায় অংশ গ্রহণ করতেন এবং তাঁদের সূক্ষ্ম ও জটিল মতবাদের গুরুত্ব উপলব্ধি করতেন, এতে তাঁর বিদ্যাবত্তা ও মনের প্রসারতার পরিচয় পাওয়া যায়। আলোচনার প্রধান বিষয়-বস্তুর মধ্যে ছিল স্রষ্টার সাথে মানুষের সম্পর্ক এবং স্রষ্টার প্রকৃতি। এ সব আলোচনার শেষে মামুন সচরাচর প্রচলিত সনাতন মতবাদের বিরোধিতা করে মুতাজিলা মতবাদে দীক্ষিত হলেন। এ মতবাদ অনুযায়ী মানুষ নিজের ইচ্ছানুযায়ী কাজকর্ম করতে পারে, এটা পূর্ব হতে নির্ধারিত নয়। আল্লাহর গুণাবলি তাঁর সত্তা হতে পৃথক নয়। কুরআন সৃষ্ট বস্তু। এ সব মতবাদে মামুনের বিশ্বাস ক্রমশ দৃঢ় হতে দৃঢ়তর হতে থাকে। পরিশেষে মুক্তবুদ্ধি ও যুক্তিবাদী আন্দোলনের সমর্থক মামুন স্বীয় মতবাদ প্রচারে ও প্রসারে অসহিষ্ণু মনোভাবের প্রদর্শন করলেন এবং সরকারি ক্ষমতার অপপ্রয়োগ করে তিনি জোরপূর্বক জনসাধারণের ওপর বিশেষ করে নেতৃস্থানীয় উলামা ও কাজীদের ওপর এ মত চাপিয়ে দেয়ার চেষ্টা করলেন। তিনি যখন সীমান্তে যুদ্ধরত ছিলেন, তখন বাগদাদের শাসনকর্তার কাছে এ মর্মে এক ফরমান পাঠালেন যে, তিনি যেন প্রধান পণ্ডিতগণকে উপরোক্ত মতবাদ সম্পর্কে প্রশ্ন করে তাঁদের উত্তরগুলি খলিফার অবগতির জন্য পাঠিয়ে দেন (৮৩৩ খ্রিঃ)। বাগদাদের অধিকাংশ পণ্ডিত ও কাজিগণ বিশ্বাসবলেই হোক অথবা সুবিধার খাতিরেই হোক, খলিফার মতে মত প্রকাশ করে বিপদমুক্ত হলেন। কিন্তু কেউ কেউ নিজ নিজ মতবাদে অটুট রইলেন এবং সরকারি নীতি মেনে নিতে অস্বীকার করেন। শেষোক্ত দলের মধ্যে ছিলেন ইমাম আহমদ ইবন হাম্বল। সনাতন ধর্মের জন্য তাঁর ত্যাগ স্বীকার ও সব নির্যাতনের মুখে স্বীয় মতে অবিচলিত আস্থা ইতিহাসের এক চমকপ্রদ অধ্যায়। ইসলামের যে অন্তর্নিহিত সহনশীলতা মুতাজিলা মতবাদের জন্ম দিয়েছিল এবং যার বলে মামুন উক্ত মতবাদকে বেছে নিতে সক্ষম হয়েছিলেন, মামুনের শেষ বয়সের কার্যকলাপ তারই কণ্ঠরোধ করে চিন্তায় স্বাধীনতার পথে বিঘ্ন সৃষ্টি করল।

মামুনের রাজত্বকাল মুসলিম জ্ঞান সাধনায় শ্রেষ্ঠ যুগ। সাহিত্য, দর্শন ও বিজ্ঞানের বিভিন্ন শাখায় এ সময় অভূতপূর্ব উন্নতি সাধিত হয়। মামুন এ সব

জ্ঞানবিজ্ঞানের উন্নতি

প্রতিভাবান লোকদের জন্য বিশেষ ভাতা ও পুরস্কারের বন্দোবস্ত করেন। তিনি নিজে কবি ছিলেন এবং কবির সমাদর করতেন। তাঁর সময় বহুকাল ধরে অবহেলিত পারস্য সাহিত্যেরও উন্নতি হয়। পারসিক কবি আব্বাস তাঁর রাজত্বকালে আর্বিভূত হয়েছিলেন। কবি, ভাষাবিদ ও ব্যাকরণবিদ ছাড়াও বিখ্যাত হাদিস সংগ্রাহক ইমাম বুখারী, হযরত রসূলুল্লার (স) জীবনী লেখক বিখ্যাত ঐতিহাসিক আল-ওয়াফিদী এবং দুটি সুন্নী মতবাদের স্থাপয়িতা ইমাম শাফিয়ী ও ইবন হাম্বল এ যুগের লোক। মামুন ইহুদি ও খ্রিস্টান পণ্ডিত ও ভাষাবিদগণকে সমাদরে তাঁর দরবারে স্থান দিতেন। ৮৩০ খ্রিস্টাব্দে তিনি বাগদাদে 'বায়তুল হিকমা' নামক একটি প্রতিষ্ঠান স্থাপন করলেন।

অনুবাদ সংস্থা ৮৩০ খ্রিঃ

এটা একাধারে একটি পাঠাগার, জ্ঞানচর্চার কেন্দ্র ও সর্বোপরি তর্জমা প্রতিষ্ঠান ছিল। ইতিপূর্বে মনসুর ও হারুনের রাজত্বকালে কিছু কিছু বিদেশী ভাষার গ্রন্থ আরবিতে অনূদিত হয়েছিল। কিন্তু অনুবাদের কাজ ধীরগতিতে ও ব্যক্তি বিশেষের খেয়াল-খুশীমত চলত। মামুনের সময় হতে এ প্রতিষ্ঠানের মাধ্যমে তর্জমার কাজ ত্বরান্বিত ও সুবিন্যস্ত হয়। মামুন সিরিয়া, এশিয়া মাইনর ও মিসরের বিভিন্ন খ্রিস্টান সন্ন্যাসাশ্রম হতে পুরাতন গ্রীক দর্শন, ইতিহাস ও বিজ্ঞানের গ্রন্থমালা তন্ন তন্ন করে আহরণ করলেন এবং এ সব গ্রন্থ আরবিতে অনুবাদ করার ব্যবস্থা করেন। এ সব অনুবাদক বিখ্যাত পণ্ডিত ব্যক্তি ছিলেন এবং তাঁরা প্রাচীন গ্রন্থসমূহের আক্ষরিক ও হুবহু অনুবাদ করেই ক্ষান্ত হলেন না, অচিরেই তাঁরা নিজেদের মৌলিক গবেষণার ফল এর সাথে সংযোজিত করে জ্ঞান-বিজ্ঞানের ভাণ্ডারে মহামূল্য অবদান রেখে গিয়েছেন। তর্জমার ক্ষেত্রে কোন কোন সময় গ্রীক ও সিরীয় ভাষায় অভিজ্ঞ লোক প্রথমত, গ্রীক হতে সিরীয় ভাষায় অনুবাদ সম্পন্ন করতেন এবং পরবর্তী পর্যায়ে অন্য লোক সিরীয় ভাষা হতে আরবিতে অনুবাদ করতেন।

মামুনের অনুবাদ সংস্থার পণ্ডিত ব্যক্তিদের মধ্যে প্রধান ছিলেন হুনায়ন ইবন ইসহাক। তিনি ইবাদী বা নেস্টোরীয় খ্রিস্টান ছিলেন। ইবন মাসাওয়াইহ্ নামক

অনুবাদকগণের কাজ

একজন চিকিৎসকের কম্পাউন্ডার হিসেবে তিনি কর্মজীবন আরম্ভ করেন। তাঁর প্রভু তাঁকে একজন অপদার্থ মনে করে বাজারে টাকা বদলের কাজে আত্মনিয়োগ করতে বলেন। এতে মনঃক্ষুণ্ন হয়ে তিনি প্রথমে বিখ্যাত জ্যোতির্বিদ মুসা ইবনে শাকিরের তিন পুত্রের সহকারী হিসেবে গ্রীক-ভাষাভাষী অঞ্চলে পুরাতন হস্ত-লিখিত পুঁথির অনুসন্ধানে চলে যান। পরে তিনি

মামুনের চিকিৎসক জিব্রিল ইবন বখতীয়ুর অধীনে চাকরি গ্রহণ করেন। অতঃপর মামুন তাঁকে বায়তুল হিকমার তত্ত্বাবধায়ক নিযুক্ত করেন। হুনায়ন গ্রীক বিজ্ঞানের পুঁথি-পুস্তক তর্জমার ব্যাপারে নেতৃস্থানীয় ভূমিকা গ্রহণ করেন। এ কাজে বহু শিক্ষার্থী ও সহকারী তাঁর সহযোগিতা করত। হুনায়নের পুত্র ইসহাক এবং ভ্রাতুষ্পুত্র হুনায়ন ইবনুল হাসানও তাঁর প্রধান সহযোগী ছিলেন। সাধারণত হুনায়ন প্রথমে গ্রীক পুস্তক সিরীয় ভাষায় অনুবাদ করতেন এবং পরে তাঁর সহযোগীরা সিরীয় ভাষা হতে সেগুলিকে আরবি ভাষায় তর্জমা করতেন। এভাবে যে-সব পুস্তক ঐ সময় আরবি রূপ লাভ করে, তারমধ্যে গ্যালেনের এ্যানাটমী (*Anatomy*), প্ল্যাটোর রিপাবলিক (*Republic*), এ্যারিস্টটলের ক্যাটেগরীজ (*Categories*), ফিজিকস (*Physics*) ও ম্যাগনা মোরেলিয়া (*Magna Moralia*) প্রসিদ্ধ। এ সব জ্ঞান-বিজ্ঞানের বই আরবি ভাষায় অনূদিত হয়ে সুরক্ষিত না হলে পৃথিবীর জ্ঞানভাণ্ডার হতে এ অমূল্য সম্পদ মানুষের অজ্ঞাতে হারিয়ে যেত। অনুবাদকগণ তাঁদের কাজের জন্য প্রচুর পারিশ্রমিক পেতেন। হুনায়ন যখন শকিরের পুত্রগণের অধীনে কাজ করতেন, তখন তিনি ও অন্যান্য অনুবাদকগণ প্রতি মাসে ৫০০ দীনার পেতেন। মামুনের দরবারে হুনায়নের বিশেষ সম্মান ও প্রতিপত্তি ছিল। তিনি যেসব বই তর্জমা করতেন, তার সমান ওজনের স্বর্ণ তাঁকে দেয়া হত। হাজ্জাজ ইবন ইউসুফ ইবন মাতার নামক অপর বৈজ্ঞানিক টলেমীর আল-মাজেস্ট (*almagest*) তর্জমা করেন। এর পর হুনায়নও এ বইয়ের একটি তর্জমা তৈরি করেন।

মামুন বাগদাদের শাম্মাসিয়া ফটকের কাছে একটি জ্যোতির্বিদ্যা বিষয়ক মানমন্দির নির্মাণ করেন। এ মানমন্দিরের পরিচালক ছিলেন সিন্দ ইবন আলী ও ইয়াহিয়া ইবন আবি মনসুর। এখানে খলিফার জ্যোতির্বিদগণ গ্রহ-নক্ষত্রের গতিবিধিই লক্ষ্য করতেন না, বরং আলমাজেস্টের সূত্রগুলিও পরীক্ষা করে দেখতেন। এ সব সূত্রের মধ্যে দিবারাত্রির সমতা ও সৌর বছরের দৈর্ঘ্য প্রধান। এ প্রসঙ্গে যে সব যন্ত্রপাতি ব্যবহৃত হত, তারমধ্যে বৃত্তের চতুর্থাংশ (*Qudrant*) এস্ট্রলেব, সূর্যঘড়ি ও ভূগোলক বিশেষ উল্লেখযোগ্য। মামুনের জ্যোতির্বিদগণ পৃথিবীর আকৃতি ও এর পরিধি নির্ভুলভাবে নিরূপণ করেন। তাঁরা প্রথমে মধ্যরেখার (*Meridian*) মাত্রা নিরূপণ করে পৃথিবীর পরিধি ও ব্যাস নির্ণয় করেন। এখানে উল্লেখযোগ্য, এ সব বৈজ্ঞানিক পৃথিবী গোল, এ মৌলিক ধারণার ওপর ভিত্তি করে সব পরীক্ষা চালাতেন। অথচ এর বহু পরের যুগেও ইউরোপে ও পৃথিবীর অন্যান্য স্থানে পৃথিবীকে চ্যাপ্টা মনে করা

মানমন্দির নির্মাণ

হত। এ পরীক্ষায় বৈজ্ঞানিকগণ প্রায় আধুনিক কালের পরিমাপের কাছাকাছি পৌঁছেছিলেন। ইবন শাকিরের পুত্রগণ এ পরীক্ষায় অংশ গ্রহণ করেছিলেন। মামুনের মানমন্দির ছাড়াও শাকিরের পুত্রগণ তাঁদের বাগদাদস্থ বাসস্থানে নিজস্ব মানমন্দির নির্মাণ করেছিলেন। বিখ্যাত অঙ্কশাস্ত্রবিদ আল খওয়ারিজমীও এ যুগের লোক। তিনি এ্যালজেব্রার জনক। আবুল হাসান নামক বৈজ্ঞানিক দূরবীন আবিষ্কার করেছিলেন। জ্ঞান ও বিজ্ঞানের ক্ষেত্রে এ সব মূল্যবান অবদানের জন্য মামুনের রাজত্বকাল ইসলামের ইতিহাসে চিরস্মরণীয় হয়ে রয়েছে।

গ্রন্থনির্দেশ

১. সৈয়দ আমীর আলী ঃ *হিস্ট্রি অব দি সারাসেন্‌স্।*

২. উইলিয়াম ম্যুর ঃ *কলিফেট।*

৩. পি. কে. হিট্টি ঃ *হিস্ট্রি অব দি এরাব্‌স্।*

মুতাসিম ও মুতাওয়াক্কিল

তাসিম (৮৩৩ — ৮৪২ খ্রিঃ)

মামুনের ইচ্ছানুযায়ী তাঁর ভ্রাতা আবু ইসহাক 'মুতাসিম' উপাধি ধারণ করে খলিফা হলেন। সৈন্যগণ প্রথমে মামুনের পুত্র আব্বাসকে খলিফা নির্বাচিত করতে চাইল। কিন্তু মুতাসিম আব্বাসকে টায়ানা হতে টরসাসে ডেকে আনলেন এবং আব্বাস পিতৃব্যের প্রতি আনুগত্যের শপথ গ্রহণ করলে সৈন্যবাহিনীও তাঁর দৃষ্টান্ত অনুসরণ করল। খলিফা হয়েই মুতাসিম টায়ানার সামরিক ঘাঁটি ছেড়ে দিতে সিদ্ধান্ত করলেন। তিনি টায়ানা হতে টরসাসে যাবতীয় সেনাবাহিনী, অস্ত্রশস্ত্র এবং মালপত্র গুটিয়ে নিয়ে আসলেন। এ ছাড়া তিনি তুর্কীদের সমন্বয়ে একটি সৈন্যবাহিনী গঠন করলেন। এ সব সৈন্য তাদের নিজ সৈন্যাধ্যক্ষ দ্বারা পরিচালিত হত। কালক্রমে এরা এতই শক্তিশালী হয়ে পড়ল যে, তারা রাজ্যে অশান্তি সৃষ্টি করত এবং খেয়াল-খুশীমত খলিফাকে সিংহাসনে বসাত ও সিংহাসনচ্যুত করত। এদের অত্যাচারে বাগদাদবাসীদের জান-মাল বিপন্ন হল। অনন্যোপায় হয়ে খলিফা বাগদাদের উত্তর-পশ্চিমে অবস্থিত সামাররা নামক স্থানে রাজধানী স্থানান্তরিত করলেন। অর্ধ শতাব্দীরও অধিককাল (৮৩৬—৮৯৪ খ্রিঃ) সাতজন খলিফার সময়ে রাজধানী সামাররায় ছিল।

সামাররায় রাজধানী স্থানান্তরিত

খলিফা হয়েই মুতাসিম গ্রীকদের সাথে সন্ধিস্থাপন করে বন্দী বিনিময় করলেন। এ সময় নিম্ন মেসোপটেমিয়া অঞ্চলে জাঠগণ গোলযোগ আরম্ভ করে এবং বাগদাদের সব সরবরাহ বন্ধ করে দেয়। উজায়ফ নামক একজন আরব সেনাপতি কয়েক সহস্র জাঠকে বন্দী করে বাগদাদে নিয়ে আসেন। এদেরকে এশিয়া-মাইনরে নির্বাসিত করা হয় এবং সেখান থেকে ইউরোপে গিয়ে এরা জিপসী নামে পরিচিত হয়।

যুদ্ধ-বিগ্রহ ও বিদ্রোহ

নাস্তিক বাবকের কথা আগেই বলা হয়েছে। তাকে দমন করার উদ্দেশ্যে মুতাসিম আফসীন নামক তুর্কী সেনাপতিকে প্রেরণ করেন। দুই বছর পর্যন্ত ক্রমাগত যুদ্ধ চালিয়ে আফসীন বাবকের ঘাঁটিসমূহ দখল করতে সক্ষম হন। বাবক আর্মিনিয়ায় পলায়ন করে একজন আর্মিনীয়

বাবক

সর্দার কর্তৃক ধৃত হয়ে আফসীনের হাতে সমর্পিত হয়। প্রায় বিশ বছর যাবৎ দোর্দণ্ড প্রতাপে কাস্পিয়ানের তীরবর্তী অঞ্চলে ত্রাসের রাজত্ব চালাবার পর এ তস্করপ্রধান ধৃত হল। আফসীন তার আড্ডা হতে বিপুল ধনসম্পদ উদ্ধার করেন এবং সাত হাজার খ্রিস্টান ও মুসলমান স্ত্রীলোককে মুক্তি দান করে নিজ নিজ গৃহে প্রেরণ করেন। আফসীন বাবক ও তার অনুচরগণকে বন্দী করে সামাররায় নিয়ে আসলে খলিফা আফসীনকে রাজকীয় সম্বর্ধনা দান করেন। বাবকসহ বন্দীদেরকে হাতীর পিঠে রাজপথে প্রদর্শন করা হয় এবং পরে হত্যা করা হয়।

আফসীন যখন বাবকের সাথে যুদ্ধে ব্যাপৃত ছিলেন, তখন বাইজান্টাইন সম্রাট সীমান্ত অঞ্চল আক্রমণ করেন। ইতিমধ্যে মুতাসিম টায়ানা হতে সামরিক ঘাঁটি প্রত্যাহার করেছিলেন। গ্রীকগণ নগর ও জনপদ লুণ্ঠন ও অগ্নিদগ্ধ করে পুরুষদেরকে বন্দী করে এবং স্ত্রীলোক ও বালক-বালিকাগণকে বন্দী করে। মুতাসিমের জন্মস্থান জিবাত্রায় (Zapetron) বর্বরতার সাথে মানুষকে নির্যাতিত ও নিহত করা হয়। মুতাসিম গ্রীকদের বিরুদ্ধে অগ্রসর হয়ে তাদের সম্রাট থিওফিলাসকে পরাজিত করেন এবং প্রতিশোধমূলক ব্যবস্থা হিসেবে থিওফিলাসের জন্মস্থান এ্যামরিয়ন (Amorion) ধূলিসাৎ করেন। এ বিজয়-মুহূর্তে খলিফার শিবিরে এক মারাত্মক ষড়যন্ত্র আবিষ্কৃত হয়। কয়েকজন আরব সেনাপতি তুর্কীদের প্রতিপত্তিতে ঈর্ষান্বিত হয়ে এবং খলিফার ব্যবহারে বিরক্ত হয়ে তাঁকে হত্যা করবার জন্য ষড়যন্ত্র আরম্ভ করল। এরা আব্বাসকে তাদের দলে টেনে খলিফা করবার প্রতিশ্রুতি দিল। মুতাসিম থিওফিলাসের সাথে সন্ধি করে সামাররায় প্রত্যাবর্তন করেন এবং বিদ্রোহীদের প্রতি কঠোর শাস্তি বিধান করেন।

বাইজান্টাই-নদের সাথে যুদ্ধ ৮৩৮ খ্রিঃ

আরব দলপতিদের ষড়যন্ত্র ব্যর্থ হওয়ায় এবং তাদের অনেকে ক্ষমতাচ্যুত ও শাস্তিপ্রাপ্ত হওয়ায় তুর্কীদের দৌরাত্ম্য বেড়ে গেল। খলিফা এখন তাদের হাতের ক্রীড়নক হয়ে পড়লেন। এদের ক্ষমতার লিপ্সা, বিশ্বাসঘাতকতা ও ন্যাক্কারজনক ব্যবহার দিন দিন বেড়ে যেতে লাগল। তুর্কী সেনাপতি আফসীন মাজিয়ার নামক তাবারিস্তানের একজন দলপতি বিদ্রোহী হলে গোপনে তাকে উৎসাহ দিতে থাকেন। আফসীনের বিরুদ্ধে তহবিল তসরুপের অভিযোগও আনয়ন করা হল। আফসীন পলায়নের চেষ্টা করে ধৃত

তুর্কীনেতা আফসীন

হলেন। এর পর নাস্তিকতার অভিযোগেও তাকে অভিযুক্ত করা হয়; কারণ তাঁর নিকট অগ্নি উপাসকদের ধর্মপুস্তক ও নানা দেবদেবীর মূর্তি পাওয়া গিয়েছিল। এর পর কারারুদ্ধ অবস্থায় আফসীনের মৃত্যু হয়।

মুতাসিম ৮৪২ খ্রিষ্টাব্দের জানুয়ারি মাসে পরলোক গমন করেন। তিনি তাঁর কয়েকটি নীতি ও কর্মের সাহায্যে আব্বাসীয় সাম্রাজ্যের অধোগতির পথ সুগম করেছিলেন। তুর্কী সৈন্য ও সেনাপতিদের প্রতি তাঁর পক্ষপাতিত্ব তাঁর নিজের ও বংশের ভবিষ্যৎকে বিপন্ন করে তুলেছিল। তিনি আরব নেতাদের মনস্তুষ্টি বিধান করে তাঁদের সাহায্যে তুর্কী ও অন্যান্য উপজাতীয় লোকদের ক্রমবর্ধমান ক্ষমতা খর্ব করতে পারতেন। তাঁর সময়ে মামুনের ধর্ম সম্বন্ধীয় নীতি নিষ্ঠার সাথে পালন করা হয়। তিনি ভ্রাতার মত জ্ঞান-বিজ্ঞানেরও পৃষ্ঠপোষকতা করেন। তবে মামুনের মতই মুতাজিলা মতবাদ ছাড়া অন্য কোন মত বরদাশত করা হত না। মুতাসিমের সময় আবার ইবন হাম্বলকে বন্দী করা হয় এবং তার ওপর শারীরিক নির্যাতন চালান হয়। পক্ষান্তরে মুতাসিমের দয়া ও মহানুভবতার দৃষ্টান্ত হিসেবে একটি ক্ষুদ্র অথচ প্রাণস্পর্শী ঘটনার উল্লেখ রয়েছে। এক দরিদ্র বৃদ্ধ কৃষক একদা তার মাল বোঝাই গর্দভসহ পথের পাশে পানি ও পঙ্কে পতিত হল। খলিফা তাঁর অশ্ব হতে অবতরণ করে রাজকীয় পোশাকে কাদামাটি মেখে বৃদ্ধকে সাহায্য করবার জন্য এগিয়ে আসলেন।

মুতাসিমের মৃত্যুর পর তাঁর পুত্র ওয়াসিক খলিফা হলেন। তাঁর রাজত্বকালে বাইজান্টাইনদের সাথে মুসলমানদের বন্দী বিনিময় হয়। এ বন্দী বিনিময়ের ফলে

ওয়াসিক
৮৪২—৮৪৭
খ্রিঃ

৫০০০ মুসলিম নরনারী মুক্তিলাভ করে। ওয়াসিকের সময় তাঁর পিতা ও পিতৃব্যের মুতাজিলা সমর্থন ও বিপরীতপন্থীদের নির্যাতন নীতি অক্ষুণ্ন থাকে। বাগদাদের জনসাধারণ মুতাজিলাবাদের প্রতি বিরূপভাবাপন্ন ছিল। আহমদ ইবন নাসর নামক একজন সুফীর নেতৃত্বে বাগদাদে এক বিপুল জনতা সরকারের ধর্মনীতির বিরুদ্ধে প্রতিবাদ জানাবার জন্য শোভাযাত্রার দিন ধার্য করল। কিন্তু এর আগেই আহমদকে খলিফার নিকট সামাররায় বন্দী করে নিয়ে যাওয়া হয়। সেখানে তাঁকে মুতাজিলা মতবাদ সম্পর্কে প্রশ্ন করা হয় এবং তিনি মুতাজিলাদের প্রতিটি নীতির বিরোধিতা করলে কাজীদের বিচারে তাঁকে মৃত্যুদণ্ড দেয়া হয়।

ওয়াসিকের রাজত্বকালে আর উল্লেখযোগ্য বিশেষ কোন ঘটনাই নেই। তাঁর সময়েও তুর্কীদের প্রাধান্য অপ্রতিহত থাকে। তাঁর মৃত্যুর সঙ্গে সঙ্গে আব্বসীয়দের গৌরবময় যুগের অবসান হয়।

হলেন। এর পর নাস্তিকতার অভিযোগেও তাকে অভিযুক্ত করা হয়; কারণ তাঁর নিকট অগ্নি উপাসকদের ধর্মপুস্তক ও নানা দেবদেবীর মূর্তি পাওয়া গিয়েছিল। এর পর কারারুদ্ধ অবস্থায় আফসীনের মৃত্যু হয়।

মুতাসিম ৮৪২ খ্রিস্টাব্দের জানুয়ারি মাসে পরলোক গমন করেন। তিনি তাঁর কয়েকটি নীতি ও কর্মের সাহায্যে আব্বাসীয় সাম্রাজ্যের অধোগতির পথ সুগম করেছিলেন। তুর্কী সৈন্য ও সেনাপতিদের প্রতি তাঁর পক্ষপাতিত্ব তাঁর নিজের ও বংশের ভবিষ্যৎকে বিপন্ন করে তুলেছিল। তিনি আরব নেতাদের মনস্তুষ্টি বিধান করে তাঁদের সাহায্যে তুর্কী ও অন্যান্য উপজাতীয় লোকদের ক্রমবর্ধমান ক্ষমতা খর্ব করতে পারতেন। তাঁর সময়ে মামুনের ধর্ম সম্বন্ধীয় নীতি নিষ্ঠার সাথে পালন করা হয়। তিনি ভ্রাতার মত জ্ঞান-বিজ্ঞানেরও পৃষ্ঠপোষকতা করেন। তবে মামুনের মতই মুতাজিলা মতবাদ ছাড়া অন্য কোন মত বরদাশত করা হত না। মুতাসিমের সময় আবার ইবন হাম্বলকে বন্দী করা হয় এবং তার ওপর শারীরিক নির্যাতন চালান হয়। পক্ষান্তরে মুতাসিমের দয়া ও মহানুভবতার দৃষ্টান্ত হিসেবে একটি ক্ষুদ্র অথচ প্রাণস্পর্শী ঘটনার উল্লেখ রয়েছে। এক দরিদ্র বৃদ্ধ কৃষক একদা তার মাল বোঝাই গর্দভসহ পথের পাশে পানি ও পঙ্কে পতিত হল। খলিফা তাঁর অশ্ব হতে অবতরণ করে রাজকীয় পোশাকে কাদামাটি মেখে বৃদ্ধকে সাহায্য করবার জন্য এগিয়ে আসলেন।

মুতাসিমের মৃত্যুর পর তাঁর পুত্র ওয়াসিক খলিফা হলেন। তাঁর রাজত্বকালে বাইজান্টাইনদের সাথে মুসলমানদের বন্দী বিনিময় হয়। এ বন্দী বিনিময়ের ফলে ৫০০০ মুসলিম নরনারী মুক্তিলাভ করে। ওয়াসিকের সময় তাঁর পিতা ও পিতৃব্যের মুতাজিলা সমর্থন ও বিপরীতপন্থীদের নির্যাতন নীতি অক্ষুণ্ণ থাকে। বাগদাদের জনসাধারণ মুতাজিলাবাদের প্রতি বিরূপভাবাপন্ন ছিল। আহমদ ইবন নাসর নামক একজন সুফীর নেতৃত্বে বাগদাদে এক বিপুল জনতা সরকারের ধর্মনীতির বিরুদ্ধে প্রতিবাদ জানাবার জন্য শোভাযাত্রার দিন ধার্য করল। কিন্তু এর আগেই আহমদকে খলিফার নিকট সামাররায় বন্দী করে নিয়ে যাওয়া হয়। সেখানে তাঁকে মুতাজিলা মতবাদ সম্পর্কে প্রশ্ন করা হয় এবং তিনি মুতাজিলাদের প্রতিটি নীতির বিরোধিতা করলে কাজীদের বিচারে তাঁকে মৃত্যুদণ্ড দেয়া হয়।

ওয়াসিক
৮৪২—৮৪৭
খ্রিঃ

ওয়াসিকের রাজত্বকালে আর উল্লেখযোগ্য বিশেষ কোন ঘটনাই নেই। তাঁর সময়েও তুর্কীদের প্রাধান্য অপ্রতিহত থাকে। তাঁর মৃত্যুর সঙ্গে সঙ্গে আব্বসীয়দের গৌরবময় যুগের অবসান হয়।

তাঁর রাজত্বে ইহুদি ও খ্রিস্টানদের প্রতি নানা বিধি-নিষেধ আরোপ করা হয়। তাদের জন্য অশ্বারোহণ নিষিদ্ধ করা হয়। তাদের পোশাক-পরিচ্ছদে ও বাড়ির দরজায় বিশেষ চিহ্ন ব্যবহার করতে হত। অধিকন্তু তাদেরকে রাজকার্যে নিযুক্ত করা হত না।

তাঁর সময়ে রাজ্যের বিভিন্ন স্থানে বিদ্রোহ ও অরাজকতা দেখা দেয়। সিজিস্তানে সাফ্ফারীয় বংশ তাহিরীয় বংশের শাসনাবসান ঘটাল। আজরবাইজানে বিদ্রোহ দেখা দিল। মিসরে আলীবাবা নামক স্থানীয় নেতার অধীনে বিদ্রোহ দেখা যায়। এ বিদ্রোহ পরে প্রশমিত হয়। আর্মিনিয়ায় বিদ্রোহ দেখা দিলে বোগা নামক সেনাপতি কর্তৃক বিদ্রোহ দমন করা হয়। এশিয়া-মাইনরে গ্রীকগণ প্রচণ্ড আক্রমণ চালিয়ে হাজার হাজার লোককে বন্দী করল এবং সম্রাজ্ঞী থিওডোরার আদেশে কয়েক সহস্র বন্দীকে হত্যা করা হল। কেবল যারা খ্রিস্টধর্মে দীক্ষিত হল, তাদেরকে হত্যা করা হয়নি।

এ খলিফা বার বছর সামাররায় অবস্থান করে দামিস্কে রাজধানী সরাতে মনস্থ করলেন। তিনি ভেবেছিলেন যে, সেখানে গিয়ে তিনি সিরীয়াবাসীদের বন্ধুত্ব অর্জন করবেন এবং তুর্কী সেনাবাহিনীর দৌরাত্ম্য হতে মুক্তিলাভ করবেন। কিন্তু দামিস্কে দুই মাস অবস্থান করে তিনি সেখানকার আবহাওয়া পছন্দ করতে পারলেন না এবং আবার সামাররায় ফিরে আসলেন। মুতাওয়াক্কিল তাঁর রাজত্বের শেষভাগে সামাররার নিকটে বহু অর্থ ব্যয়ে নদীর তীরে জাফরিয়া নামক একটি নগর নির্মাণ করে সেখানে 'মোতি' প্রাসাদ এবং 'আনন্দ ভবন' নির্মাণ করেন। এর চতুর্দিকে সুরম্য বাগান ও জলস্রোত তৈরি করা হয় এবং এখানে গান-বাজনা ও আমোদ-প্রমোদের ব্যবস্থা করা হয়।

মুতাওয়াক্কিলের জ্যেষ্ঠপুত্র মুন্তাসির পিতার ব্যবহারে সন্তুষ্ট ছিলেন না। কারণ খলিফা তাঁর দ্বিতীয়পুত্র মুতাজের প্রতি পক্ষপাতিত্ব প্রদর্শন করে তাঁকেই উত্তরাধিকারী মনোনীত করেছিলেন। এর ফলে মুন্তাসির তুর্কী সেনাপতিদের সাথে চক্রান্ত করে পিতাকে হত্যা করেন (৮৬১ খ্রিঃ)।

গ্রন্থনির্দেশ

১. উইলিয়াম ম্যুর : *কলিফেট।*
২. সৈয়দ আমীর আলী : *হিস্ট্রি অব দি সারাসেন্‌স্।*

৩০

শেষ আব্বাসীয় খলিফাগণ ঃ মুন্তাসির হতে মুত্তাকী পর্যন্ত

(৮৬১ — ৯৪৪ খ্রিঃ)

মুতাওয়াক্কিলের পুত্র মুন্তাসির (৮৬১—৬২ খ্রিঃ) তাঁর ছয় মাস শাসনের সময় হাসান ও হুসায়নের সমাধিতে তীর্থযাত্রার নিষেধাজ্ঞা প্রত্যাহার করে অনেকের প্রশংসা অর্জন করেন। তাঁর মৃত্যুর পর তুর্কী দলপতিগণ মুতাসিমের এক পৌত্র মুস্তায়ীনকে (৮৬২—৮৬৬ খ্রিঃ) খলিফা মনোনীত করেন। মুস্তায়ীন তুর্কী দেহরক্ষীদের নির্যাতন সহ্য করতে না পেরে বাগদাদে পলায়ন করেন। তুর্কীরা মুতাওয়াক্কিলের দ্বিতীয় পুত্র মু'তাজকে খলিফা বলে ঘোষণা করে। মু'তাজ (৮৬৬—৮৬৯ খ্রিঃ) তুর্কী সৈন্যদের বেতনের দাবি মিটাতে না পারায় তারা খলিফার সচিব ও উজীরদের বন্দী করে। কিন্তু রাজকোষ শূন্য হওয়ায় নিরাশ হয়ে পুনরায় খলিফার কাছে ৫০,০০০ দীনার দাবি করল। খলিফা রাজমাতার কাছে এ অর্থ চেয়ে নিরাশ হলেন। এ সময় রাজমাতার কাছে বহু অর্থ ও মূল্যবান অলংকারাদি ছিল। পরিশেষে তুর্কী সেনাদল অর্থের জন্য খলিফাকে অপদস্ত করে সিংহাসনচ্যুত করে। অবশেষে কারাগারে তাঁর মৃত্যু হয়। মু'তাজের সিংহাসনচ্যুতির পর তুর্কী সর্দারগণ ওয়াসিকের এক পুত্রকে মুহতাদিবিল্লাহ (৮৬৯—৮৭০ খ্রিঃ) উপাধি দিয়ে খিলাফতের আসনে বসাল। তিনিও এক বছরকাল রাজত্ব করার পর সিংহাসনচ্যুত হলেন এবং কারাগারে প্রাণ ত্যাগ করলেন।

মুহতাদির সিংহাসনচ্যুতির পর নেতৃস্থানীয় সভাসদগণ মুতাওয়াক্কিলের জীবিত পুত্রদের মধ্যে জ্যেষ্ঠজনকে মু'তামিদ (৮৭০—৮৯২ খ্রিঃ) উপাধি দিয়ে খলিফার পদে অধিষ্ঠিত করেন। তিনি নিজে দুর্বল হলেও তাঁর ভ্রাতা মুওয়াফফাক বিশেষ দক্ষতা ও সামরিক প্রতিভার পরিচয় দেন। তিনিই প্রকৃত শাসন ক্ষমতা পরিচালনা করেন। মুতামিদের রাজত্বকালের প্রধান ঘটনা দক্ষিণ ইরাক ও দক্ষিণ-পশ্চিম পারস্যের নিগ্রো বিদ্রোহ। এ বিদ্রোহ জাঞ্জ বিদ্রোহ নামে খ্যাত। মুতাজের রাজত্বকালে আরম্ভ হয়ে এ ভয়াবহ বিদ্রোহ প্রায় পনর বছরকাল স্থায়ী হয়েছিল। আফ্রিকা থেকে আগত এ সব নিগ্রো ক্রীতদাস দক্ষিণ ইরাকের জলাভূমি অঞ্চলে লবণ তৈরির কাজে নিয়োজিত হয়েছিল। হাজার হাজার নিগ্রো শ্রমিক নিতান্ত অস্বাস্থ্যকর

জাঞ্জ বিদ্রোহ (৮৬৯—৮৮৩ খ্রিঃ)

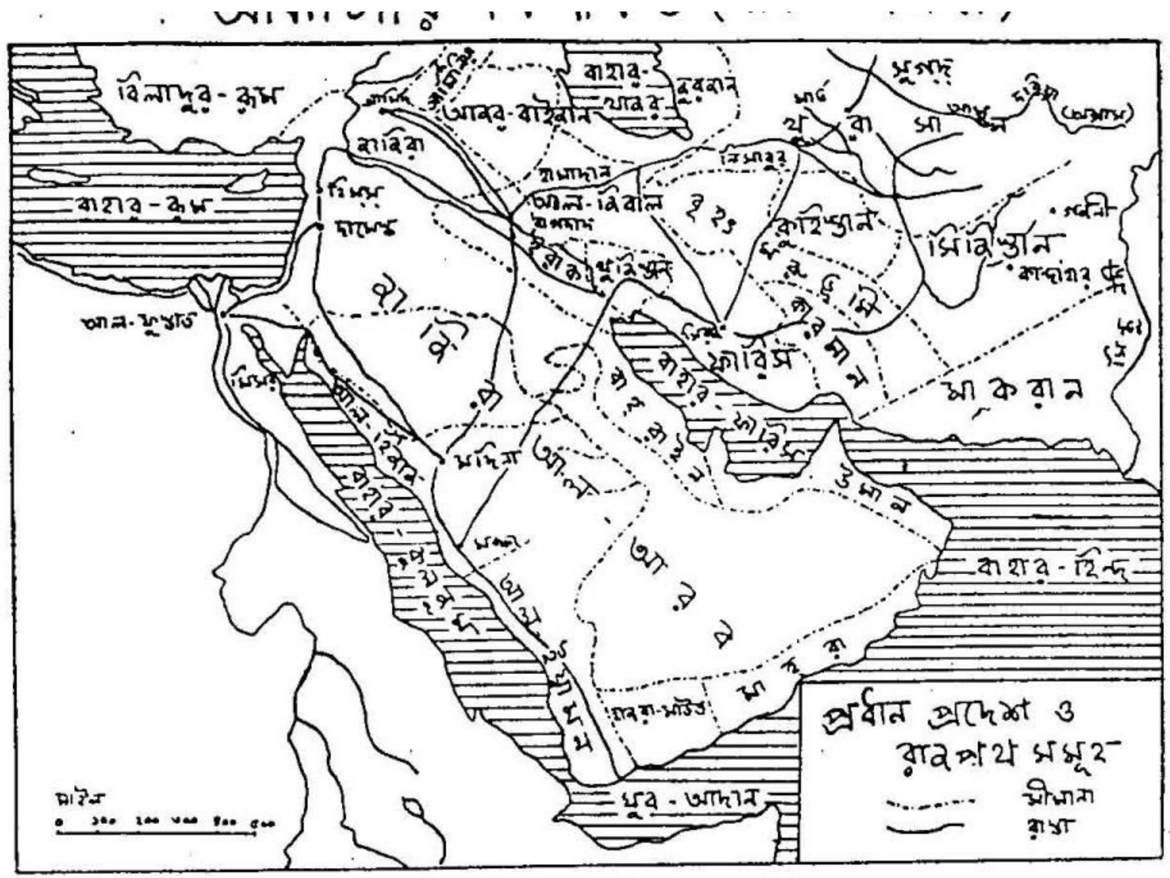

আব্বাসীয় খিলাফত (নবম শতাব্দী)

পরিবেশে ও সামান্য আটা, সুজি ও খেজুরের বিনিময়ে কঠোর পরিশ্রম করত। আলী ইবন মুহম্মদ নামক একজন পারসিক হযরত আলীর (রা) বংশধর বলে নিজেকে পরিচয় দিলেন এবং বসরার লবণ কারখানায় নিগ্রো ক্রীতদাসদের মধ্যে প্রচারণা আরম্ভ করলেন। তিনি ক্রীতদাসগণকে তাদের শোচনীয় অবস্থা স্মরণ করিয়ে দিয়ে নিজেদের ভাগ্যোন্নয়নের জন্য যুদ্ধ করতে উৎসাহিত করলেন। দূর-দূরান্ত থেকে ক্রীতদাসগণ এসে তাঁর দলে যোগদান করল। তাঁর আন্দোলন কোন নীতি দ্বারা পরিচালিত হয়নি বরং তাঁর অনুচরগণ যথেচ্ছ ব্যবহার ও অনাচারের অনুমতি প্রাপ্ত হওয়ায় প্রতিপক্ষগণ তাঁর নাম দিয়েছিল 'খবীস' বা পিশাচ। ৮৬৯ খ্রিস্টাব্দে তারা বসরা আক্রমণ করে ব্যর্থ হয়। অতঃপর তারা জলা অঞ্চলে 'মুখতারা' নামক একটি নতুন ঘাঁটি নির্মাণ করে। ৮৭০ খ্রিস্টাব্দে তারা প্রধান সামুদ্রিক বন্দর উবুল্লা দখল করে। অচিরে তারা দক্ষিণ-পশ্চিম পারস্য অঞ্চলে ছড়িয়ে পড়ে এবং আহওয়াজ শহর দখল করে। তারা খলিফা কর্তৃক প্রেরিত একের পর এক সেনাবাহিনীকে পরাজিত করে বন্দীদেরকে দাসত্ব-শৃঙ্খলে আবদ্ধ করে এবং নানা দ্রব্যসম্ভারে, বিশেষত অস্ত্রশস্ত্রে সমৃদ্ধ হয়। দক্ষিণ ইরাক ও দক্ষিণ পশ্চিম পারস্যের বহু শহর তাদের অধিকারে আসে। তারা বসরা ও ওয়াসিত লুণ্ঠন করে বাগদাদের সতর মাইলের মধ্যে পৌঁছে যায়। খলিফার ভ্রাতা মুওয়াফফাক বহু অর্থব্যয়ে এক বিরাট সেনাবাহিনী গঠন করে বিদ্রোহীদের বিরুদ্ধে অগ্রসর হলেন। ৮৮১ খ্রিস্টাব্দের ফেব্রুয়ারি মাসের মধ্যে মুওয়াফফাক জাঞ্জগণকে বিতাড়িত করে মুখতারায় আশ্রয় নিতে বাধ্য করেন। দীর্ঘদিন অবরোধের পর ৮৮৩ খ্রিস্টাব্দের ১১ আগস্ট মুখতারা অধিকৃত হয় ও বিদ্রোহী নেতা আলী নিহত হন। অগণিত স্ত্রীলোককে উদ্ধার করে নিজ নিজ গৃহে প্রেরণ করা হয়।

৮৯২ খ্রিস্টাব্দে মুতামিদের মৃত্যুর পর মুওয়াফফাকের পুত্র মুতাদিদ (৮৯২—৯০২ খ্রিঃ) খলিফা হলেন। তাঁকে দ্বিতীয় সাফ্‌ফাহ বলা হয়; কারণ তিনি দুর্বল ও ক্ষয়িষ্ণু আব্বাসীয় সাম্রাজ্যকে পুনরুজ্জীবিত করার চেষ্টা করেন। তাঁর আমলে আহমদ ইবন তুলুনের পুত্র খুমারা ওয়াইহ্‌ বার্ষিক একলক্ষ দীনার কর দানের বিনিময়ে মিসরের রাজপ্রতিনিধি নিযুক্ত হন। তাঁর কন্যা কাতরুন-নাদাকে খলিফা উদ্বাহ বন্ধনে আবদ্ধ করেন। তাঁর সময় রাজধানী পুনরায় সামাররা হতে বাগদাদে স্থানান্তরিত হয় (৮৯৪ খ্রিঃ)। তিনি রাজস্ব আদায়ের সুবিধার জন্য সৌর বছরের

হিসাব মত আন-নওরোজ-আল মুতাদিদী বা মুতাদিদী নববর্ষের প্রবর্তন করেন। তাঁর রাজত্বকালে আফ্রিকায় ফাতিমীয়গণের অভ্যুত্থান ঘটে এবং

কারমাতী সাম্যবাদী কারমাতীদের আবির্ভাব হয়। কারমাতিগণ সমগ্র আরব, সিরিয়া ও ইরাক লুণ্ঠন করে মুসলিম জগতে ধ্বংস ও বিপর্যয় আনয়ন করল। এদের নেতা ছিলেন হামদান কারমাত। তিনি ৮৯০ খ্রিস্টাব্দে কুফার কাছে দারুল হিজরা নামক একটি আড্ডা তৈরি করেন। কৃষক ও শ্রমিকদের মধ্যে তিনি প্রচারণা আরম্ভ করেন। সাম্য ও স্ত্রী জাতিসহ সব সম্পত্তির সমভোগবাদের ওপর স্থাপিত এ গুপ্ত সম্প্রদায় বিরুদ্ধবাদীদের রক্তপাত করতে কুণ্ঠা বোধ করত না। আবু সাঈদ আল-হাসান আল-জান্নাবী নামক হামদানের এক শিষ্যের নেতৃত্বে তারা পারস্যোপসাগরের পশ্চিম তীরে বাহ্‌রাইনে একটি স্বাধীন রাষ্ট্রের প্রতিষ্ঠা করে (৮৯৯ খ্রিঃ)। আল আহসায় তাদের রাজধানী স্থাপিত হয়। এ স্থান হতে তারা পার্শ্ববর্তী অঞ্চলে লুঠতরাজ ও ধ্বংসাত্মক কার্যকলাপে লিপ্ত হয়। ৯০০ খ্রিস্টাব্দে বসরার কাছে তারা খলিফার একটি সেনাবাহিনীকে নিশ্চিহ্ন করে দেয়।

মুতাদিদের মৃত্যুর পর তাঁর পুত্র মুকতাফী (৯০২—৯০৮ খ্রিঃ) খলিফা হলেন। তাঁর রাজত্বকালে মিসর সরাসরি খলিফার অধীনে আসে। গ্রীকদের সাথে যুদ্ধেও তিনি কৃতকার্য হন এবং কারমাতীদের সাথেও তাঁর রাজত্বকালে একাধিক যুদ্ধ হয়। জিক্‌রাওয়াইহ নামক তাদের নেতা কুফা ও বসরার মধ্যবর্তী অঞ্চলে ওঁৎ পেতে হজ্বযাত্রীদেরকে হত্যা করত। খলিফা তুর্কী নেতা ওয়াসিফকে তাদের বিরুদ্ধে প্রেরণ করে তাদেরকে শোচনীয়ভাবে পরাজিত করেন। জিকরাওয়াইহ গুরুতররূপে আহত হয়ে বন্দী হল এবং বাগদাদে পৌঁছবার পূর্বে মৃত্যুমুখে পতিত হল। মুকতাফীর মৃত্যুর পর তাঁর ভ্রাতা মুকতাদির খলিফা হলেন।

মুকতাদিরের পঁচিশ বছরের রাজত্বকালে (৯০৮—৯৩২ খ্রিঃ) তেরজন উজীরের উত্থান-পতন ঘটে। এদের কয়েকজনকে হত্যাও করা হয়। ইবন মুকলা নামক একজন উজীর আরবি খুশখতের (Calligraphy) জন্মদাতা। অপর উজীর আলী ইবন ঈসা দুভাবে পাঁচ বছরের জন্য উজীর নিযুক্ত হয়েছিলেন। সেই দুর্নীতি ও অত্যাচারের যুগে তিনিই উন্নত চরিত্র ও যোগ্যতার পরিচয় দিয়েছিলেন। তিনি মিতব্যয়িতার সাহায্যে রাজ্যের অর্থনৈতিক অবস্থার উন্নতি করেন। তাঁর রাজত্বকালে ফাতিমীয় শাসক উবায়দুল্লাহ্ উত্তর আফ্রিকায় ও উমাইয়া শাসক তৃতীয় আব্দুর রহমান স্পেনে খলিফা উপাধি গ্রহণ করেন। এভাবে সর্বপ্রথম একই সঙ্গে মুসলিম জগতে তিনজন খলিফা পরস্পরের প্রতিদ্বন্দ্বী হিসেবে নিজ নিজ অঞ্চলে খলিফা বলে স্বীকৃত হন। দুর্বল ও অযোগ্য খলিফা

মুকতাদির তাঁর দেহরক্ষীদের প্রধান মুনিসের হাতে রাজ্যের সমুদয় ক্ষমতা ছেড়ে দিয়ে তাঁকে 'আমীরুল উমারা' উপাধি দান করেন। মুনিস একজন খোজা ছিলেন। ৯১৭ খ্রিস্টাব্দে বাইজান্টাইন সম্রাজ্ঞী জো (Zoe) মুকতাদিরের দরবারে দুজন দূত প্রেরণ করেন। এ দূতগণকে সাড়ম্বরে ও জাঁকজমকের সাথে অভ্যর্থনা করা হয়। একটি যুদ্ধ-বিরতি চুক্তি স্বাক্ষর ও মুসলমান বন্দীদের মুক্তি এ দূতগণের মাধ্যমে স্থির হয়। মুনিসের তত্ত্বাবধানে সীমান্তে ১২০০০০ দীনার ব্যয়ে মুসলমান বন্দীদেরকে মুক্তিদান করা হয়। এর পর বছর বাগদাদে মুকতাদিরিয়া হাসপাতালের উদ্বোধন করা হয়। কিন্তু তা সত্ত্বেও রাজ্যের অর্থনৈতিক অবস্থা বিশেষ ভাল ছিল না; কারণ ঐ বছরই খলিফা তাঁর উজীর ইবন ফুরাতকে সৈন্যদের বেতনের সংস্থান করতে না পারায় কারারুদ্ধ করেন। মুকতাদিরের রাজত্বের শেষ ভাগে তাঁর মাতাও রাজকার্যে হস্তক্ষেপ করতেন। তিনি ফরমান ও আইন-কানুন জারি করতেন এবং শুক্রবার দিন কাজী ও সভাসদগণকে নিয়ে দরবারে বসতেন। কিন্তু মুনিসের ক্ষমতা দিন দিন বেড়ে যায়। একবার খলিফা মন্ত্রীদের প্ররোচনায় মুনিসের বিরুদ্ধাচরণ করলে মুনিসের লোকেরা খলিফাকে হত্যা করে (৯৩২ খ্রিঃ)।

মুকতাদিরের মৃত্যুর পর সভাসদগণ তাঁর এক ভ্রাতা কাহিরকে খলিফা করলেন। তিনি নিষ্ঠুর ও দুশ্চরিত্র ছিলেন। তাঁর রাজত্বকালে দুই দলের সভাসদগণের মধ্যে কলহের ফলে মুনিস নিহত হন এবং পরে সভাসদগণ খলিফাকেও অন্ধ করে কারাগারে নিক্ষেপ করেন। পরবর্তী জীবনে কাহিরকে বাগদাদের রাস্তায় ভিক্ষা করে জীবিকা নির্বাহ করতে দেখা যায়। এর পর তুর্কী আমীরগণ মুকতাদিরের পুত্র আর-রাদী বিল্লাহকে (৯৩৪—৪০ খ্রিঃ) খলিফা মনোনীত করেন। তাঁর রাজত্বকালে প্রদেশগুলি একের পর এক স্বাধীন হতে থাকে। প্রদেশসমূহ হতে রাজস্ব আমদানি বন্ধ হয়ে যায়। উজীরগণ অর্থাভাবে শাসনকার্য চালাতে অক্ষম হন। তাঁর রাজত্বকালের ৩২৪ হিজরীর (৯৩৫ খ্রিস্টাব্দের) ঘটনাবলি বর্ণনা করতে গিয়ে ঐতিহাসিক বলেন ঃ

"ফারস আলী ইবন বুওয়াইহের অধীনে চলে যায়, ইস্পাহান ও জিবাল হাসান ইবন বুওয়াইহের হাতে, জজিরা হামদানীদের হাতে, মিসর ও সিরিয়া ইখশীদিগণের হাতে, আন্দালুস উমাইয়া আবদুর রহমানের অধীনে, খুরাসান সামানীদের অধীনে এবং তাবারিস্তান ও দায়লাম দায়লামীদের অধীনে চলে যায়। কেবল মদীনাতুস-সালাম খলিফার হাতে রইল।"*

* ইবনুজ জওযী।

কিন্তু মদীনাতুস-সালাম বা বাগদাদেও খলিফার কর্তৃত্ব অব্যাহত রইল না কারণ ঐ বছরই উজীরগণ অর্থাভাবে শাসনকার্য চালাতে অপারগ হলে খলিফ মুহম্মদ ইবন রাইক নামক বসরা ও ওয়াসিতের শাসনকর্তাকে বাগদাদে আহ্বা করেন এবং তাঁকে 'আমীরুল-উমরা' উপাধি দিয়ে সৈন্যবাহিনী ও রাজস্বের ওপ সর্বক্ষমতা দান করেন। অধিকন্তু এখন হতে খুৎবায় খলিফার নামের সাথে তাঁর নামও যুক্ত হল। ৯৪০ খ্রিস্টাব্দে আর-রাদীর মৃত্যু হয়। তাঁকে শেষ প্রকৃত খলিফ বলা হয়। কারণ তিনি জুমার খুৎবা স্বয়ং পড়তেন, আলিম-উলামার সঙ্গে সমস্যাবলি আলোচনা করতেন, গরিব-দুঃখীদের মধ্যে দান-খয়রাত করতেন এবং অত্যাচারী কর্মচারীদের নিষ্ঠুরতা লাঘব করবার চেষ্টা করতেন। তিনিই শেষ খলিফা, যাঁর কবিতা রক্ষিত হয়েছে। এ সব কবিতায় গভীর ধর্মভাব, পার্থিব সব বস্তুর নশ্বরতা ও মানবীয় পদ-মর্যাদার স্থিতিহীনতা প্রকাশ পেয়েছে। তাঁর মৃত্যুর সঙ্গে সঙ্গে খলিফার পদ-মর্যাদা ও প্রতিপত্তি সম্পূর্ণরূপে বিলুপ্ত হয়। এখন হতে আমীরুল-উমরো সব কাজে সর্বেসর্বা হলেন এবং ইচ্ছামত খলিফাকে সিংহাসনে বসাতে ও সিংহাসনচ্যুত করতে লাগলেন।

রাদীর মৃত্যুর পর তাঁর ভ্রাতা মুত্তাকী খলিফা হলেন। তাঁর সময় আমীরুল উমারা পদ লাভের জন্য বহু লোকের মধ্যে প্রতিযোগিতা আরম্ভ হয়; কারণ আমীরুল উমারা হওয়ার অর্থ খলিফাকে হাতের মুঠোতে রেখে যাবতীয় ক্ষমতা দখল করা। নিষ্ঠুর তুর্কী আমীরুল উমারা তুজুন মুত্তাকীকে অন্ধ ও সিংহাসনচ্যুত করেন (৯৪৪ খ্রিঃ)। অতঃপর তুজুন মুত্তাকীর ভ্রাতা মুস্তাকফীকে খলিফার পদে অধিষ্ঠিত করলেন।

স্বাধীন রাজবংশের উদ্ভব ঃ (১) পশ্চিমাঞ্চলে

আব্বাসীয় যুগে সমগ্র মুসলিম সাম্রাজ্যে খলিফার ক্ষমতা প্রতিষ্ঠিত হয়নি। প্রথম হতেই সাম্রাজ্যের বিভিন্ন অংশ বিচ্ছিন্ন হতে থাকে। সাম্রাজ্যের পশ্চিমাঞ্চলে যে-সব রাজবংশের উদ্ভব হয়, সেগুলি ছিল প্রধানত আরব। অনুরূপ সাম্রাজ্যের পূর্বাঞ্চলেও বহু ছোট-বড় স্বাধীন রাজ্যের উৎপত্তি হয়। এগুলি পারসিক অথবা তুর্কী বংশের লোকদের দ্বারা প্রতিষ্ঠিত হয়। আমরা প্রথমে পশ্চিমাঞ্চলের স্বাধীন রাজবংশগুলির উল্লেখ করব।

আব্বাসীয়গণের দামিস্ক অধিকারের (২৬ এপ্রিল, ৭৫০ খ্রিঃ) ঠিক ছয় বছর পরে (১৪ মে, ৭৫৬ খ্রিঃ) পতিত উমাইয়া রাজবংশের একজন যুবরাজ স্পেনে স্বাধীন রাজ্য স্থাপন করেন। আমরা ৪১ অধ্যায়ে এ রাজবংশ সম্বন্ধে আলোচনা করব। এভাবে আব্বাসীয় বংশের জন্মকাল হতেই বিকেন্দ্রণ আরম্ভ হয়।

স্পেন

ইদ্রিস ইবন আবদুল্লাহ নামক হাসানের এক প্রপৌত্র ৭৮৫ খ্রিস্টাব্দে মদীনায় বিদ্রোহী হয়ে মরক্কোতে পলায়ন করেন এবং সেখানে একটি রাজ্য প্রতিষ্ঠা করেন। এই বংশই ইতিহাসে প্রথম শিয়া রাজবংশ। দুই শতাব্দী ধরে (৭৮৮—৯৭৪ খ্রিঃ) ইদ্রিসীবংশ নামে অভিহিত এ রাজবংশ ফাস (ফেজ) হতে রাজত্ব করতে থাকে। স্পেনের খলিফা দ্বিতীয় হাকামের আমলে এ বংশের পতন ঘটে।

ইদ্রিসী বংশ

উত্তর আফ্রিকার পশ্চিমাঞ্চলে যেমন ইদ্রিসী বংশের রাজত্ব প্রতিষ্ঠিত হচ্ছিল, সেরকম এর পূর্বাঞ্চলে সুন্নিগণ আগলবী বংশের প্রতিষ্ঠা করে স্বাধীনভাবে রাজত্ব করছিল। প্রথমে হারুনুর রশীদ ইব্রাহীম ইবন আগলবকে ৮০০ খ্রিস্টাব্দে ইফ্রিকিয়ার গভর্নর নিযুক্ত করেন। ইবন আগলব স্বাধীনভাবেই ইফ্রিকিয়া শাসন করতে থাকেন। এ বংশের শাসনকর্তাগণ আমীর উপাধি গ্রহণ করেই সন্তুষ্ট ছিলেন। তাঁরা তাঁদের রাজধানী কায়রোয়ান হতে এক শতাব্দীর অধিককাল (৮০০—৯০৯ খ্রিঃ) ভূমধ্যসাগরের মধ্যবর্তী অঞ্চলে প্রভুত্ব বিস্তার করে সুগঠিত নৌবহরের সাহায্যে ইটালি, ফ্রান্স, কর্সিকা ও সার্ডিনিয়ার উপকূলে নিজেদের ক্ষমতা প্রদর্শন করেন। ৯০২ খ্রিস্টাব্দে এঁরা সিসিলি অধিকার করেন। এ যুগে দুঃসাহসিক মুসলমানগণ মাল্টা ও সার্ডিনিয়া অধিকার করে।

আগলবী বংশ

এথেন্সে প্রাপ্ত তিনটি লিপি হতে জানা যায় যে, সেখানেও একটি আরব উপনিবেশ স্থাপিত হয়েছিল। এ বংশের জিয়াদাতুল্লাহ ও তাঁর পুত্র দ্বিতীয় ইব্রাহীম কায়রোয়ানের বিখ্যাত মসজিদ নির্মাণ করেন। আগলবী শাসনামলে ইফ্রিকিয়া লাটিন-ভাষাভাষী খ্রিস্ট দেশ হতে আরবি ভাষাভাষী মুসলমান দেশে রূপান্তরিত হয়। আগলবী বংশের তৃতীয় জিয়াদাতুল্লাহ ৯০৯ খ্রিস্টাব্দে ফাতিমীয়দের আগমনের ফলে পলায়নপর হলেন। তিনিই শেষ আগলবী আমীর।

এ বংশের প্রতিষ্ঠাতা আহমদ ইবন তুলুন তুর্কী ছিলেন। ৮৬৮ খ্রিস্টাব্দে তিনি মিসরের গভর্নরের সহকারী হিসেবে বাগদাদ হতে মিসরে গমন করেন।

তুলুনী বংশ

শীঘ্রই তিনি সেখানে স্বাধীনভাবে শাসন করতে আরম্ভ করেন। ৮৭৭ খ্রিস্টাব্দে সিরিয়ার গভর্নরের মৃত্যু হলে আহমদ বিনা বাধায় সিরিয়া দখল করেন। তখন হতে বহু শতাব্দী ধরে সিরিয়া মিসরের অধীন থাকে। আহমদ সেচ ব্যবস্থার উন্নতি বিধান করেন এবং রাজধানী ফুস্তাতকে সুরম্য অট্টালিকায় সুশোভিত করেন। তাঁর নির্মিত বিমারিস্তান (হাসপাতাল) ও জামে মসজিদ বিখ্যাত। আহমদের পুত্র খুমারাওয়াইহ একটি 'সুবর্ণ ভবন' নির্মাণ করে প্রাচীরগাত্রে তাঁর নিজের ও পরিবারের অন্যান্য লোকের পূর্ণাঙ্গ ছবি দ্বারা সুসজ্জিত করেন। এ প্রাসাদের চতুর্দিকে ছিল সুগন্ধী ফুলের বাগান। তিনি একটি পশুশালা ও পক্ষীশালা স্থাপন করেছিলেন। তিনি খলিফা মুতাদিদের সাথে তাঁর মেয়ে কাতরুন্নাদার (শিশির কণা) বিবাহ দিয়েছিলেন। এ বংশের চতুর্থ শাসক শায়বানের সময় মিসর আবার আব্বাসীয়দের শাসনাধীনে চলে যায়।

এর পর মিসর ও সিরিয়ায় ইখশীদী নামক অপর একটি তুর্কী বংশের শাসন প্রতিষ্ঠিত হয়। এ বংশের স্থাপয়িতা মুহম্মদ ইবন তুগজ ৯৩৯ খ্রিস্টাব্দে খলিফা

ইখশীদী বংশ

রাদীর কাছ থেকে ইরানী 'ইখশীদ' উপাধি প্রাপ্ত হন। ইখশীদ অতঃপর সিরিয়া ও প্যালেস্টাইনের ওপর নিজের প্রাধান্য প্রতিষ্ঠিত করেন। এর পর তিনি মক্কা ও মদীনা শহরদ্বয় তাঁর রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত করেন। মুহম্মদ ইবন তুগজ ইখশীদের উত্তরাধিকারী দু পুত্রের শাসনামলে হাবশী খোজা কাফুরই সব ক্ষমতার মালিক হলেন। তিনি মিসর ও সিরিয়াকে হামদানীদের আক্রমণ থেকে রক্ষা করেন। শেষ ইখশীদী শাসক আবুল ফাওয়ারিস আহমদ ৯৬৯ খ্রিস্টাব্দে ফাতিমীয় সেনাপতি জওহরের হাতে পরাজিত হলে তাঁর রাজ্য ফাতিমীয়দের অধীনে চলে যায়।

হামদানী বংশ প্রথমে উত্তর মেসোপটেমিয়ায় স্থাপিত হয়। তখন এঁদের রাজধানী ছিল মসুলে। এঁরা শিয়া ছিলেন। ৯০৪ খ্রিস্টাব্দে আবদুল্লাহ ইবন হামদান মসুলের গভর্নর নিযুক্ত হন। তখন হতে এ বংশের ক্ষমতা বৃদ্ধি পেতে থাকে। এ বংশের আরও অনেকে উত্তর মেসোপটেমিয়া অঞ্চলে ছোটখাট জায়গার শাসনভার প্রাপ্ত হন। আবদুল্লাহ্ তাঁর পুত্র হাসানকে মসুলে তাঁর সহকারী নিযুক্ত করেছিলেন। হাসান মসুলসহ দিয়ার রাবিয়া ও দিয়ার বকর শাসন করতে থাকেন। তাঁর ভ্রাতা আলী ৯৪৪ খ্রিস্টাব্দে ইখশীদিগণের কাছ থেকে আলেপ্পো ও হিমস্ দখল করে সেখানে প্রায় স্বাধীনভাবে রাজত্ব করতে থাকেন। বাগদাদে বুওয়াইহী শাসন প্রতিষ্ঠিত হওয়ার অব্যবহিত পূর্বে বিভিন্ন দুঃসাহসিক ব্যক্তির মধ্যে যে ক্ষমতার যুদ্ধ আরম্ভ হয়েছিল, তখন হাসান ও আলী বাগদাদ দখল করে সেখানে তাঁদের প্রভুত্ব স্থাপন করতে প্রয়াসী হয়েছিলেন। ৯৪১ খ্রিস্টাব্দে তাঁরা বাগদাদ দখল করেন এবং খলিফা মুত্তাকী হাসানকে আমীরুল উমারা নিযুক্ত করেন। তিনি হাসানকে নাসিরুদ্দৌল্লাহ্ ও আলীকে সায়ফুদ্দৌলাহ্ উপাধিতে ভূষিত করেন। কিন্তু তুর্কী আমীর তুজুন হামদানী ভ্রাতৃদ্বয়কে বাগদাদ হতে বিতাড়িত করেন। ৯৭৯—৮০ খ্রিস্টাব্দে দিয়ার বকর, দিয়ার রবীয়া ও দিয়ার মুদার বুওয়াইহী আদুদুদ্দৌলা কর্তৃক অধিকৃত হয় এবং সায়ফুদ্দৌলার পৌত্র সাঈদুদ্দৌলা ফাতিমীয়গণের অধীনতা স্বীকার করেন (১০০৩ খ্রিঃ)।

হামদানী বংশ

এ বংশের সায়ফুদ্দৌলা গ্রীকদের সাথে যুদ্ধে খ্যাতি অর্জন করেন। কিন্তু তিনি কবি, দার্শনিক ও সাহিত্যিকদের পৃষ্ঠপোষক হিসেবে সমধিক প্রসিদ্ধ। দার্শনিক আল-ফারাবী, সাহিত্যিক আবুল ফারাজ আল-ইস্পাহানী ও ইবন নুবাতা, কবি মুতানাব্বী ও হামদানী তাঁর দরবার অলংকৃত করেছিলেন। ইস্পাহানী তাঁর বিখ্যাত গ্রন্থ কিতাবুল-আগানী সায়ফুদ্দৌলার জন্যই রচনা করেছিলেন।

স্বাধীন রাজবংশের উদ্ভব ঃ (২) পূর্বাঞ্চলে

পূর্বাঞ্চলে প্রথম প্রায়-স্বাধীন রাজ্য স্থাপিত হয় মামুনের বিশ্বস্ত সেনাপতি তাহির ইবন হুসায়ন কর্তৃক খুরাসানে। তাহির একচক্ষু বিশিষ্ট ছিলেন, কিন্তু তিনি তাঁর উভয় হাত যুদ্ধের সময় এত নিপুণতার সাথে ব্যবহার করতেন যে, খলিফা মামুন তাঁকে 'সব্যসাচী' বলে অভিহিত করেন এবং ৮২০ খ্রিস্টাব্দে তাঁকে বাগদাদের পূর্ববর্তী সব অঞ্চলের শাসনকর্তা নিযুক্ত করেন। তাঁর উত্তরাধিকারিগণ পাক-ভারত সীমান্ত পর্যন্ত রাজ্য বিস্তার করে নিশাপুর হতে খলিফার নিয়োগপত্রের বলে কার্যত স্বাধীনভাবে রাজত্ব করতে থাকেন। ৮৭২ খ্রিস্টাব্দে সাফফারী বংশের ইয়াকুব তাঁদের রাজ্য অধিকার করে নেন।

তাহিরী বংশ

এ বংশের স্থাপয়িতা ইয়াকুব সিজিস্তানের (সিস্তানে) গভর্নর নিযুক্ত হন। তিনি ছিলেন কর্মকার (সাফফারঃ তাম্রকার)। তিনি সিজিস্তানে একদল দস্যুশ্রেণীর লোকের নেতা হিসেবে তার দুঃসাহসিকতা ও সংগঠনী প্রতিভার পরিচয় প্রদান করেন এবং সিজিস্তানের গভর্নর কর্তৃক সৈন্যাধ্যক্ষ নিযুক্ত হন। পরে তিনি গভর্নরপদে নিযুক্ত হন এবং হিরাত ও ফারস(শিরাজসহ) স্বীয় অধিকারভুক্ত করেন। ৮৭২ খ্রিস্টাব্দে ইয়াকুব খুরাসান দখল করেন। তিনি তাবারিস্তানে একটি যুদ্ধাভিযান প্রেরণ করে আলীর (রা) বংশের হাসান ইবন জায়দকে পরাজিত করে খলিফা মুতামিদের বিরুদ্ধে প্রকাশ্য বিদ্রোহ ঘোষণা করেন। তিনি শিরাজ ও আহওয়াজ অতিক্রম করে বাগদাদের দিকে অগ্রসর হন। কিন্তু খলিফার ভ্রাতা মুওয়াফফাক কর্তৃক পরাজিত হন। ৮৭৮ খ্রিস্টাব্দে ইয়াকুবের মৃত্যু হয়। তাঁর ভ্রাতা ও উত্তরাধিকারী আমর খলিফা কর্তৃক খুরাসান, ফারস, কুর্দিস্তান ও সিজিস্তানের শাসনকর্তা হিসেবে স্বীকৃতি লাভ করেন। কিন্তু তাঁর ক্রমবর্ধমান শক্তি বৃদ্ধিতে শঙ্কিত হয়ে খলিফা সামানী বংশের ইসমাঈলকে তাঁর রাজ্য আক্রমণ করতে প্ররোচিত করেন (৯০০ খ্রিঃ)। এর ফলে আমর পরাজিত ও বন্দী হন। এর পর সাফফারিগণের শাসন সিজিস্তানেই সীমাবদ্ধ থাকে।

সাফফারী বংশ

বলখের অধিবাসী সামান নামক একজন সম্ভ্রান্ত ব্যক্তি অগ্নি উপাসকের ধর্ম পরিত্যাগ করে ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করেন। তাঁর বংশধরগণ কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত এ

সামানী বংশ

বংশ ১২৫ বছর পর্যন্ত ট্রান্সঅক্সিয়ানা ও পারস্যে প্রায় স্বাধীনভাবে রাজত্ব করেন। সামানের পৌত্র নাসর (৮৭৪—৮৯২ খ্রিঃ) এ রাজবংশের প্রতিষ্ঠাতা। এঁরা সুন্নী মতাবলম্বী ছিলেন। নাসরের ভ্রাতা ইসমাঈল (৮৯২--৯০৭ খ্রিঃ) সাফফারীয়গণের কাছ থেকে খুরাসান দখল করেন এবং 'দাশত কবীর (বৃহৎ পারসিক মরুভূমি) হতে পারস্যোপসাগর পর্যন্ত পাক-ভারত সীমান্ত হতে বাগদাদের নিকট পর্যন্ত' অঞ্চলে তাঁর ক্ষমতা বিস্তার করেন। দ্বিতীয় নাসরের সময় (৯১৩—৪৩ খ্রিঃ) গুরগান, তাবারিস্তান এবং রাই অঞ্চলেও সামানীদের অধিকার স্থাপিত হয়। সামানিগণ খলিফার আনুগত্য স্বীকার করলেও কার্যত স্বাধীন ছিলেন। সামানীদের সময় তাঁদের রাজধানী বুখারা ও প্রবীণ নগরী সমরকন্দ মুসলিম সভ্যতার গৌরবময় কেন্দ্রে পরিণত হয় এবং জ্ঞান-বিজ্ঞানের বাগদাদকেও ম্লান ও নিষ্প্রভ করে ফেলে। এ অঞ্চলে আরবি ও ফারসীর চর্চা সমভাবে চলতে থাকে। বিখ্যাত চিকিৎসাবিদ আর-রাজী এ বংশের একজন যুবরাজ আবু সালিহ মনসুরের নামে তাঁর গ্রন্থ *'আল্‌মনসুরী'* উৎসর্গ করেন। খ্যাতনামা মনীষী ইবন সীনা এ বংশের শাসক দ্বিতীয় নূহ (৯৭৬—৯৭ খ্রিঃ) কর্তৃক বুখারায় আহূত হয়ে তথাকার সুবিশাল গ্রন্থাগারে আপন জ্ঞান-পিপাসা নিবৃত্ত করেন।

সামানীদের রাজ্যের পশ্চিমে ও পশ্চিম-দক্ষিণে বুওয়াইহীদের শাসন প্রতিষ্ঠিত হওয়ার পর সামানী বংশের ক্ষমতা খর্ব হয়। অন্যপক্ষে পারসিক সামানিগণ ক্রমাগত তুর্কী সৈনিকদের ওপর নির্ভরশীল হয়ে পড়েন। যক্ষু নদীর দক্ষিণ তীরবর্তী অঞ্চলে ৯৯৪ খ্রিস্টাব্দে গজনবী শাসন প্রতিষ্ঠিত হয়। ৯৯২ খ্রিস্টাব্দে তুর্কীস্তানের ইলক খান বুখারা দখল করলেন এবং নয় বছর পরে যক্ষু নদীর উত্তরাঞ্চলেও সামানী বংশের শাসনাবসান ঘটালেন।

জিয়ারী বংশ

এই শিয়া বংশের প্রতিষ্ঠাতা মারদাবীজ ইবন জিয়ার কাস্পিয়ান সাগরের দক্ষিণে তাবারিস্তান ও গুর্গাওঁয়ে একটি স্বাধীন রাজ্য প্রতিষ্ঠা করে রায়, হামাদান ও ইস্পাহান দখল করেন। বুওয়াইহী ভ্রাতৃদ্বয় আলী ও হাসান (যাঁরা পরে খলিফা কর্তৃক ইমাদুদ্দৌলাহ ও রুকনুদ্দৌলাহ্ উপাধি প্রাপ্ত হয়েছিলেন) মারদাবীজের অধীনে চাকরিতে নিযুক্ত হন। মারদাবীজকে তাঁর ক্ষমতা ও প্রতিপত্তি রক্ষার জন্য একাধারে সামানিগণের বিরুদ্ধে ও খলিফার বিরুদ্ধে যুদ্ধ করতে হয়েছিল। মারদাবীজের স্বপ্নসাধ ছিল খলিফার রাজধানী বাগদাদ দখল করে পুরাতন পারস্য সাম্রাজ্য পুনঃ প্রতিষ্ঠা করা। কিন্তু তাঁর অগণিত তুর্কী সেনাবাহিনী তাঁর ব্যবহারে উত্যক্ত হয়ে তাঁকে 'হাম্মামখানায়' হত্যা করে (৯৩৪ খ্রিঃ)। তাঁর ভ্রাতা ও উত্তরাধিকারী ওয়াশমাগীর সামানিগণের বশ্যতা স্বীকার করে তাঁদের সাহায্যে বুওয়াইহীদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করেন, কিন্তু তাঁর রাজ্য তাবারিস্তান ও গুর্গাওঁয়ে সীমাবদ্ধ হয়। ওয়াশমাগীরের পুত্র বিস্তুন বুওয়াইহী আদু-

দুদ্দৌলাহের কাছে আপন কন্যার বিবাহ দিয়ে তাঁদের সাথে মৈত্রী স্থাপন করেন। বিস্তুনের পুত্র কাবুস বুওয়াইহীদের নিকট পরাজিত হয়ে খুরাসানে সামানী রাজ্যে আশ্রয় গ্রহণ করেন। আঠার বছর পর তিনি গুর্গাওঁয়ে পুনঃপ্রবেশ করেন। সামানী আমীর আল-মুন্তাসির ইলক খান কর্তৃক বিতাড়িত হয়ে কাবুসের কাছে আশ্রয় প্রার্থনা করেন। কাবুস পুত্র মিনুচিহরের নিকট শাসনভার দিয়ে অবসর গ্রহণ করেন, কিন্তু তিনিও বিক্ষুব্ধ সেনাদলের হাতে নিহত হন (১০১২)। কাবুস আরবি ভাষায় সুপণ্ডিত ছিলেন। গদ্যে ও পদ্যে তিনি সমভাবে দক্ষ ছিলেন। বিখ্যাত মনীষী আবু রায়হান আল-বিরুনী কাবুসের পৃষ্ঠপোষকতা লাভ করেছিলেন এবং তাঁর বিখ্যাত গ্রন্থ আল-আসার কাবুসের নামে উৎসর্গ করেছিলেন। কাবুসের পুত্র মিনুচিহর এবং পৌত্র আনুশিরওয়ান গজনীর সুলতান মাহমুদের বশ্যতা স্বীকার করে গুর্গাওঁয়ে ও তাবারিস্তানে রাজত্ব করতে থাকেন। মিনুচিহর সুলতান মাহমুদের এক কন্যার পাণিগ্রহণ করেন। সলজুকদের শাসন উক্ত অঞ্চলে প্রতিষ্ঠিত হওয়ার পর এ বংশের শাসকগণ গুর্গাওঁয়ের পার্বত্য অঞ্চলে সামান্য একটি ক্ষুদ্র রাজ্যের শাসক হিসেবে ১৩৯০ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত রাজত্ব করেন। ঐ বছর হাসান সাবা কর্তৃক এ বংশের অবসান ঘটে। এ বংশের কায়কাউস নামক একজন শাসক তার পুত্র গিলান শাহের জন্য একখানি উপদেশ গ্রন্থ *'কবুসনামা'* লিপিবদ্ধ করেন (১০৮২ খ্রিঃ)। এ গ্রন্থে পিতার উপদেশের মাধ্যমে তৎকালীন সামাজিক ও নৈতিক অবস্থা বিস্তারিত জানা যায়।

যে সব তুর্কী মামলুক (ক্রীতদাস) সামানীদের অধীনে উচ্চপদে নিযুক্ত হয়েছিলেন, তারমধ্যে আলপ্তগীন বিখ্যাত ছিলেন। তিনি সামানীদের দেহরক্ষী হিসেবে প্রথমে নিযুক্ত হয়েছিলেন। তিনি দেহরক্ষী হিসেবে প্রথম নিযুক্ত হয়ে শীঘ্রই দেহরক্ষীদের প্রধান ও পরে খুরাসানের শাসনকর্তার পদে উন্নীত হন।

গজনবী বংশ

কিন্তু প্রভুর বিরাগভাজন হয়ে ৯৬২ খ্রিস্টাব্দে আফগানিস্তানের গজনী অধিকার করেন এবং সেখানে একটি স্বাধীন রাজ্যের প্রতিষ্ঠা করেন। গজনবী বংশের প্রকৃত স্থাপয়িতা ছিলেন আলপ্তগীনের মমলুক (দাস) ও জামাতা সবুক্তগীন। এ বংশের পরবর্তী ষোলজন উত্তরাধিকারী সবাই সবুক্তগীনের অধস্তন পুরুষ। এ বংশের সর্বশ্রেষ্ঠ ছিলেন সবুক্তগীণের পুত্র মাহমুদ (৯৯৯—১০৩০ খ্রিঃ)।

মাহমুদ সুন্নী মতাবলম্বী ছিলেন। তিনি দিগ্বিজয়ী বীর, সুশাসক ও জ্ঞান-বিজ্ঞানের পৃষ্ঠপোষক ছিলেন। তিনি যক্ষু নদীর দক্ষিণ তীরে সামানীদের কর্তৃত্বের অবসান ঘটালেন এবং বুওয়াইহীদের নিকট হতে রায় দখল করেন এবং গুর্গাওঁয়ের জিয়ারী শাসককে তাঁর বশ্যতা স্বীকার করতে বাধ্য করেন। অন্যপক্ষে তিনি বাগদাদের খলিফা আল-কাদির বিল্লাহের কাছে আনুগত্য প্রকাশক পত্রাদি

প্রেরণ করে তাঁর নিকট থেকে 'ইয়ামীনুদ্দৌলাহ ও আমীনুল মিল্লাহ' উপাধি প্রাপ্ত হন। মাহমুদ ১০০১ ও ১০২৪ খ্রিস্টাব্দের মধ্যবর্তী সময়ে পাক-ভারত উপমহাদেশে সতরবার যুদ্ধাভিযানে আসেন এবং পাঞ্জাব ও উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত অঞ্চলে গজনী শাসন প্রতিষ্ঠিত করেন। তিনি বিশ্বের খ্যাতনামা সমরনায়কদের সমপর্যায়ভুক্ত। তাঁর রাজ্য পূর্বে পাঞ্জাব, পশ্চিমে রায়, গুর্গাও, উত্তরে খুরাসান, বলখ ও ট্রান্সঅক্সানিয়ার অংশ বিশেষ এবং দক্ষিণে সিজিস্তান নিয়ে গঠিত ছিল। তিনি গজনীকে সুরম্য প্রাসাদে সুশোভিত করেছিলেন এবং সেখানে একটি বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপন করেছিলেন। তাঁর দরবারের শান-শওকত ও রাজসিক বদান্যতায় আকৃষ্ট হয়ে এশিয়ার বিভিন্ন অঞ্চল থেকে কবি ও পণ্ডিতগণ রাজধানী গজনীতে সমবেত হন। ঐতিহাসিক বায়হাকী ও উৎবী, দার্শনিক আল-ফারাবী, এবং কবি আসজাদী ও ফাররুকী তাঁর দরবার অলংকৃত করেছিলেন। 'শাহনামা' রচয়িতা কবিশ্রেষ্ঠ ফেরদৌসী এবং বিখ্যাত মনীষী আল-বিরুনী মাহমুদের পৃষ্ঠ-পোষকতা লাভ করেছিলেন। তাঁর রাজ্যে সুখ-শান্তি বিরাজমান ছিল এবং খুরাসান হতে লাহোর পর্যন্ত পণ্যবাহী কাফেলা নির্বিঘ্নে যাতায়াত করত। তিনি বিশ্বের নেতৃস্থানীয় রাজা-বাদশাহদের অন্যতম। কালক্রমে সলজুকদের অভ্যুত্থানের ফলে মধ্য-এশিয়ায় গজনবী বংশের ক্ষমতার অবসান ঘটে। পূর্বাঞ্চলে আফগানিস্তানের গোরবংশীয়গণের অভ্যুত্থানের সাথে সাথে আফগানিস্তানও তাদের হাত থেকে চলে যায়। ১১৮৬ খ্রিস্টাব্দে শেষ গজনবী শাসক খসরু মালিক মুহম্মদ গোরীর কাছে পরাজিত ও রাজ্যচ্যুত হন। দুইশত বছরের অধিককাল গজনবিগণ বর্তমান পাকিস্তানে রাজত্ব করেন।

গ্রন্থনির্দেশ

[৩০ ও ৩১ অধ্যায়ের জন্য]

১. পি. কে. হিট্টি : *হিস্ট্রি অব দি এরাব্‌স্।*

২. মফীজুল্লাহ্ কবীর : *দি বুওয়াইহিদ ডায়নাষ্টি অব বাগদাদ।*

৩. লেইনপুল : *দি মোহাম্মাডান ডায়ন্যাষ্টিজ।*

৪. মফীজুল্লাহ্ কবীর : *হিষ্ট্রি অব দি জিয়ারিদ্‌স্ অব তাবারিস্তান এণ্ড গুর্গান,* জার্নেল অব দি এশিয়াটিক সোসাইটি অব পাকিস্তান, ১৯৬০।

৫. মফীজুল্লাহ্ কবীর : *এ শর্ট হিস্ট্রি অব পাকিস্তান, বুক টু।*

৩৩

বুওয়াইহী বংশ

(৯৪৬ — ১০৫৫ খ্রিঃ)

পূর্ববর্তী দুই অধ্যায়ে আব্বাসীয় সাম্রাজ্যের পশ্চিমাঞ্চলে ও পূর্বাঞ্চলে উদ্ভূত স্বাধীন রাজবংশসমূহ সম্বন্ধে আলোচনা করা হয়েছে। এভাবে উভয়দিক থেকে যখন সাম্রাজ্য ভেঙ্গে পড়ছিল, তখন খলিফা মুস্তাকফীর আমলে শিয়া মতাবলম্বী বুওয়াইহিগণ বাগদাদে এসে খলিফার ওপর নিজেদের কর্তৃত্ব স্থাপন করেন। সুন্নী খলিফা শিয়া আমীরদের হাতের ক্রীড়নক হয়ে পড়লেন। এক শতাব্দীর অধিককাল বাগদাদে বুওয়াইহী অধিকার অক্ষুণ্ন থাকে। বুওয়াইহিগণ ছিলেন কাস্পিয়ান সাগরের তীরে অবস্থিত দায়লমের অধিবাসী। প্রথম যে তিনজন বুওয়াইহী ভ্রাতা ইতিহাসে প্রসিদ্ধি লাভ করেন, তাঁরা ছিলেন আবু শুজা বুওয়াইহ্ নামক একজন সাধারণ মৎস্যজীবীর পুত্র। পরবর্তীকালে বুওয়াইহিগণ প্রাচীন সাসানীয় রাজা বাহরাম গোরের বংশধর বলে দাবি করতেন।

দশম শতাব্দীর প্রারম্ভে কাস্পিয়ান সাগরের দক্ষিণে কয়েকজন দুঃসাহসিক দায়লমী ও গীলানী সমরনেতার আবির্ভাব হয়। এঁরা একদিকে বাগদাদের খলিফা ও অপরদিকে খুরাসান ও ট্রান্সঅক্সানিয়ার সামানীদের সাথে আপন আপন শক্তি ও ক্ষমতা বৃদ্ধির জন্য যুদ্ধে ব্যাপৃত ছিলেন। প্রথম দু বুওয়াইহী ভ্রাতা, আলী ও হাসান, জিয়ারী বংশের মারদাবীজের অধীনে চাকরি গ্রহণ করেন। কালক্রমে আলী ফারসে এবং হাসান রায় ও ইস্পাহানে প্রাধান্য স্থাপন করেন। তাঁদের তৃতীয় ভ্রাতা আহমদ আহওয়াজ (খুজিস্তান) অধিকার করে ওয়াসিতের দিকে অগ্রসর হন। ওয়াসিতের শাসনকর্তা আহমদকে বাগদাদ অধিকার করার জন্য উৎসাহিত করেন। আহমদ ৯৪৬ খ্রিস্টাব্দের ১৮ জানুয়ারি বিনা বাধায় বাগদাদে প্রবেশ করেন। যে-সব তুর্কী সৈন্য বাগদাদে গোলযোগের সৃষ্টি করছিল, তারা বাগদাদ ত্যাগ করল। খলিফা মুস্তাকফীও ভয়ে আত্মগোপন করলেন। পরে তিনি আহমদকে 'মুইজুদ্দৌলাহ্' উপাধি দিয়ে আমীরুল উমারা নিযুক্ত করলেন এবং তাঁর ভ্রাতা আলী ও হাসানকে যথাক্রমে সম্মানসূচক 'ইমাদুদ্দৌলাহ্' ও 'রুকনুদ্দৌলাহ্' উপাধিতে ভূষিত করেন। ইতিপূর্বে আমীরুল উমারাদের হাতে পড়ে খলিফার কি শোচনীয় অবস্থা হয়েছিল, তা আমরা দেখেছি। এখন শিয়া

বুওয়াইহিগণ বংশানুক্রমে বাগদাদে আমীরুল উমারা নিযুক্ত হয়ে খলিফার যাবতীয় রাজনৈতিক ক্ষমতার অবসান ঘটালেন। তাঁরা ধর্মত আব্বাসীয় খলিফাদের প্রতি আনুগত্য প্রদর্শনে বাধ্য ছিলেন না। এমন কি, মুইজুদ্দৌলাহ্ একবার আব্বাসীয় খলিফাকে অপসারিত করে একজন আলাবীকে উক্ত পদে নিযুক্ত করার কথাও চিন্তা করেছিলেন। কিন্তু তাঁর হিতাকাঙ্ক্ষী বন্ধুগণ তাঁকে উপদেশ দিলেন যে, বর্তমান খলিফার প্রতি তাঁর ও তাঁর অনুচর বর্গের বশ্যতা স্বীকার ধর্মত বাধ্যতামূলক নয়; কাজেই তাঁর অনুচরদের দ্বারা তিনি খলিফার প্রতি যদৃচ্ছা ব্যবহার করতে পারবেন; এমন কি, খলিফাকে হত্যা করতে বললেও তারা তা শুনবে। কিন্তু কোন আলাবীকে খলিফা নিযুক্ত করলে উক্ত খলিফা ঐ সব অনুচরদেরকে প্ররোচিত করে মুইজুদ্দৌলাকেই হত্যা করতে পারে। অধিকন্তু বাগদাদে ও রাজ্যের অন্যান্য স্থানে সুন্নীদের সংখ্যাই ছিল অনেক বেশি এবং আব্বসীয়দের খিলাফতের দাবি সহজে অগ্রাহ্য করা যেত না।

যে যাই হোক, খলিফাকে নামেমাত্র রেখে দিলেও তাঁর মানমর্যাদা ক্রমাগত লোপ পেতে থাকে। বুওয়াইহী আমীরগণ যাঁকে ইচ্ছা, খলিফার আসনে বসাতেন এবং যখন ইচ্ছা, তাঁকে পদচ্যুত করতেন। বাগদাদে প্রবেশের মাত্র এগার দিন পর মুইজুদ্দৌলাহ্ খলিফা মুস্তাকফীকে পদচ্যুত করে মুতা'লিল্লাহ্‌কে খলিফা করলেন। খলিফা মাত্র একজন বেতনভুক কর্মচারি হয়ে রইলেন। আমীরুল উমারা ইচ্ছা করলে এ বেতনও বন্ধ করে দিতে পারতেন। খলিফার নামের সাথে আমীরের নাম মুদ্রায় অঙ্কিত হল। খুৎবায়ও খলিফার নামের সাথে আমীরের নাম উল্লেখ করতে হত। খলিফার প্রাসাদ-দ্বারে যেমন নহবৎ বাজান হত, আমীরের প্রাসাদ দ্বারেও সেরকম নহবৎ বাজাবার প্রথা চালু হল। বুওয়াইহী আমীর আদুদুদ্দৌলাহ্ প্রাচীন সাসানীয় 'শাহান শাহ্' উপাধি গ্রহণ করতেও বিন্দুমাত্র কুণ্ঠাবোধ করেননি।

বুওয়াইহীদের শাসনামলে ইরাক ও পারস্যে রাজনৈতিক স্থিতিশীলতা পুনঃ প্রতিষ্ঠিত হয়। এ বংশের সর্বশ্রেষ্ঠ আমীর ছিলেন আদুদুদ্দৌলাহ্ (৯৭৮—৯৮৩ খ্রিঃ)। তাঁর আমলে বুওয়াইহীদের ক্ষমতা চরমোৎকর্ষ লাভ করে। রুকনুদ্দৌলাহ্‌র পুত্র আদুদুদ্দৌলাহ্ প্রথমে তাঁর পিতৃব্য ইমাদুদ্দৌলাহ্ কর্তৃক ফারসের শাসনকর্তা নিযুক্ত হন। পরে তাঁর অপর পিতৃব্য মুইজুদ্দৌলাহ্‌র পুত্র বখতিয়ারকে পরাজিত করে তাঁর কাছ থেকে ইরাক দখল করেন। তাঁর ভ্রাতা মু'আইয়িদুদ্দৌলাহ্ তাঁর পক্ষে জিবাল, রায় ও ইস্পাহান শাসন করতেন। তিনি কুর্দিস্তানের বিদ্রোহী নেতাগণকে পরাজিত করে ঐ অঞ্চলে শান্তি স্থাপন করেন। তিনি হামদানী বংশের

কাছ থেকে মসুল, দিয়ার বকর ও দিয়ার রাবিয়া অধিকার করেন। এভাবে উত্তরে কাম্পিয়ান সাগরের তীর হতে দক্ষিণে পারস্যোপসাগর পর্যন্ত এবং পূর্বে বৃহৎ পারসিক মরুভূমি (দাশ্ত কবীর) হতে পশ্চিমে ফুরাত নদীর অপর পার্শ্ব পর্যন্ত অঞ্চলে তিনি ক্ষমতা প্রতিষ্ঠিত করেন। ইয়ামন ও সিজিস্তানের শাসকগণ তাঁর বশ্যতা স্বীকার করতেন এবং সুদূর সিন্ধু অঞ্চলে তাঁর নামে খুৎবা পাঠ করা হত। পূর্বেই উল্লেখ করা হয়েছে যে, আদুদ মুসলমান শাসকদের মধ্যে সর্ব প্রথম প্রাচীন পারসিক 'শাহান শাহ' উপাধি গ্রহণ করেন। তাঁর সমসাময়িক মুসলমান অমুসলমান রাজবাদশাহরা তাঁর সাথে দূত বিনিময় করেছিলেন। মিসরের ফাতিমীবংশের খলিফা আল-আজীজ এবং বাইজান্টাইন সম্রাট, বাসিল ও কনস্টান্টাইন, তাঁর দরবারে দূত প্রেরণ করেছিলেন। এ সব দূতকে বহু জাঁকজমক ও আড়ম্বরের সাথে সম্বর্ধনা জানান হয়। ফাতিমী খলিফা আল-আজীজের দূত বাগদাদে আসলে আদুদুদ্দৌলাহ্ এক বিশেষ দরবারের আয়োজন করেন এবং খলিফা আততায়ী আদুদকে রাষ্ট্রের সর্ব ক্ষমতা সমর্পণ করেন। খলিফা বলেন, "আল্লাহ্ আমার হাতে যে-সব কর্তব্য ন্যস্ত করেছেন, তার সমুদয় আমি আপনাকে সমর্পণ করতে সিদ্ধান্ত করেছি অর্থাৎ পৃথিবীর পূর্বে ও পশ্চিমে আমার প্রজাগণের সব ব্যাপার এবং আমার ব্যক্তিগত সম্পত্তি, মালমাত্তা ও গৃহাভ্যন্তরের জিনিসপত্র ছাড়া সমুদয় রাজ্যের ব্যবস্থাপনা।" এ ঘোষণা হতে স্পষ্টই প্রমাণ হয় যে, রাষ্ট্রের প্রকৃত কোন ক্ষমতাই খলিফার হাতে রইল না। আদুদ তাঁর এক কন্যাকে খলিফার কাছে বিবাহ দিয়েছিলেন এবং আশা করেছিলেন যে, এ মেয়ের ঘরে কোন ছেলে সন্তান জন্ম গ্রহণ করলে তাকে খলিফা করে বুওয়াইহী বংশের সাথে আব্বাসীয় বংশের সংযোগ ঘটাবেন।

আদুদ রাজ্যের সমুদয় কাজ মনোযোগ সহকারে লক্ষ্য করতেন। বড় বড় রাজা-বাদশাহ্দের মত তিনি একটি সুনির্দিষ্ট সময়-তালিকা অনুসারে গুরুতর রাষ্ট্রীয় দায়িত্বের সাথে চিত্তবিনোদনকারী লঘু আনন্দ-উৎসবের সমতা বিধান করতেন। তিনি দানশীল ছিলেন। তাঁর দরবারে বহু জ্ঞানী ও গুণী ব্যক্তির অপূর্ব সমাবেশ ঘটেছিল। যে-সব পণ্ডিত তাঁর দরবার অলংকৃত করেছিলেন, তন্মধ্যে ব্যাকরণবিদ আবু আলী আলফারসী, জ্যোতির্বিদ আবদুর রহমান সুফী, জ্যোতিষী শরীফ 'ইবনুল-আলাম, অঙ্কশাস্ত্রবিদ আবুল কাসিম এবং বিখ্যাত চিকিৎসা বিজ্ঞানী আলী ইবন আব্বাস (হালী আব্বাস) সমধিক প্রসিদ্ধ। আলী ইবন আব্বাস আদুদের জন্য তাঁর বিখ্যাত চিকিৎসা বিষয়ক গ্রন্থ *কিতাবুল-মালিকী* (Latin Liber Regius) রচনা করেন। আদুদ বাগদাদে 'বিমারিস্তান-ই-আদুদী'

নামক একটি হাসপাতাল প্রতিষ্ঠা করেন এবং সেখানে রাজ্যের বিভিন্ন অংশ হতে চব্বিশজন খ্যাতনামা চিকিৎসাবিদকে নিযুক্ত করেন। শিরাজে তিনি একটি বিরাট গ্রন্থাগার প্রতিষ্ঠা করেছিলেন এবং প্রত্যেক বিষয়ে লিখিত যাবতীয় পুস্তক সেখানে সংগ্রহ করার পরিকল্পনা গ্রহণ করেছিলেন। বিখ্যাত কবি মুতানাব্বী আদুদের প্রশস্তি রচনা করেছিলেন। তাঁর সভাকবি আস-সালামী ইরাকের সমসাময়িক কবিদের প্রধান বলে বিবেচিত হতেন। বিখ্যাত ঐতিহাসিক আবু আলী মিসকাওয়াইহ্ আদুদের সভা অলংকৃত করেছিলেন। তাঁর *'তাজাবিরুল উমাম'* বুওয়াইহী আমলের বিখ্যাত ইতিহাস গ্রন্থ। অপর ঐতিহাসিক ইব্রাহীম ইবন হিলাল আস-সাবী *'কিতাবুত-তাজী'* নামক বুওয়াইহী বংশের একখানা ইতিহাস রচনা করেছিলেন। এ পুস্তকটি এখন আর পাওয়া যায় না; তবে পূর্ববর্তী যুগের অনেক ঐতিহাসিক এ গ্রন্থ হতে বহু উদ্ধৃতির ব্যবহার করেছিলেন। ইব্রাহীম আদুদের দবীর ছিলেন এবং তাঁর লিখিত ঐতিহাসিক চিঠিপত্রের সংগ্রহ হতে তাঁর ভাষার পারিপাট্য ও লিখনভঙ্গির নিদর্শন পাওয়া যায়।

আদুদ নিজেও যথেষ্ট পড়াশুনা করতেন। তিনি ইউক্লিড ও আবু আলীর ব্যাকরণ বই মনোযোগ সহকারে অধ্যয়ন করতেন। আবুল ফারাজ ইস্পাহানীর *'কিতাবুল আগানী'* ঘরে-বাইরে তাঁর চির সহচর ছিল। তিনি পণ্ডিত ব্যক্তিগণের সাথে আলোচনায় অংশ গ্রহণ করতেন। তিনি কবিতা রচনা করতেন এবং তাঁর কবিতার নমুনা *'ইয়াতিমা'* নামক গ্রন্থে সংরক্ষিত রয়েছে।

তিনি স্থাপত্য শিল্পে বিশেষ আগ্রহী ছিলেন। বাগদাদের বাড়িঘর ও রাস্তাঘাট তাঁর আদেশে পুনর্নির্মিত হয়। লোকজনকে তাদের বাড়িঘর সুন্দর করে নির্মাণের জন্য ঋণ দান করা হত। পূর্ব-বাগদাদে তিনি এক কোটি দিরহাম ব্যয়ে একটি নতুন রাজপ্রাসাদ নির্মাণ করেছিলেন। ভৌগোলিক মুকাদ্দাসীর মতে, শিরাজ শহরে নির্মিত আদুদের প্রাসাদ প্রাচ্যে ও প্রতীচ্যে অতুলনীয় ছিল। এতে ৩৬০টি প্রকোষ্ঠ ছিল এবং গঠন নৈপুণ্যে অথবা সাজ-সজ্জায় যে-কোন দুটি প্রকোষ্ঠ একই রকম ছিল না। তিনি শিয়া ইমামদের সমাধি সৌধগুলির সংস্কার সাধন করেন। আলী (রা) ও হুসায়নের সমাধি এবং সপ্তম, নবম, দশম ও একাদশ ইমামদের সমাধি তাঁর চেষ্টায় নতুনভাবে নির্মিত হয়।

তিনি হজ্বযাত্রীদের সুযোগ-সুবিধার জন্য রাস্তা-ঘাটের সংস্কারে মনোযোগ দেন। তীর্থ যাত্রীদের ওপর যে-সব অন্যায়-কর ধার্য হত, তা তিনি তুলে দেন। পথে পানির ব্যবস্থা করা হয়। আদুদ কাবা-শরীফের জন্য অনেক উপঢৌকন পাঠাতেন এবং মক্কা ও মদীনার সম্ভ্রান্ত, পরিবারসমূহের জন্য ও সেখানকার দরিদ্র

জনসাধারণের জন্য অনেক টাকা-পয়সা পাঠাতেন। এছাড়া মসজিদে আশ্রয় গ্রহণকারী দরিদ্র ও আগন্তুক ব্যক্তিগণের জন্য এবং মসজিদের মুয়াজ্জিন, ইমাম ও কারীদের জন্য তিনি অকাতরে দান করতেন। আদুদ তাঁর খ্রিস্টান প্রজাদের প্রতি সহানুভূতিশীল ছিলেন। তাঁর উজীর নসর ইবন হারুন ও সেনাপতি আবুল আলা উবায়দুল্লাহ্ খ্রিস্টান ছিলেন। তিনি তাঁর উজীর নসরকে আদেশ দিয়েছিলেন যে, খ্রিস্টানদের যে-সব গির্জা ও মঠ পুরাতন ও জীর্ণ হয়ে গিয়েছে, সেগুলির যেন সংস্কার করা হয়। খ্রিস্টানদের মধ্যে যারা দরিদ্র ও অভাবগ্রস্ত, তাদের মধ্যেও অর্থ সাহায্য বিতরণ করার জন্য তিনি আদেশ করেছিলেন।

আদুদ বাগদাদ ও ইরাকের সমুদয় সেচ ব্যবস্থা ও নদীনালা সংস্কার করেন। নগরীর বহু খাল-বিল ভরাট হয়ে গিয়েছিল। বাঁধগুলি ভেঙ্গে গিয়েছিল এবং তার ফলে বন্যার সময় লোকদের অপরিসীম কষ্ট ও দুর্দশা হত। আদুদ এ সব বাঁধ সংস্কার করেন, নতুন বাঁধ নির্মাণ করেন এবং খাল-বিলগুলির পুনর্নির্মাণে মনোনিবেশ করেন। ইরাকের সাওয়াদ এলাকা এর ফলে পরিপূর্ণ সমৃদ্ধি লাভ করল। আদুদ ইস্তাখর নামক স্থানে একটি লেক নির্মাণ করেন এবং শিরাজের কাছে বন্দ-ই-আমীর নামক একটি বাঁধ নির্মাণ করেন। এ দুটি কাজ তখনকার দিনের ইঞ্জিনিয়ারিং কৌশলের পরাকাষ্ঠা বলে মনে করা হয়। আদুদের এ কীর্তি একটি পারসিক প্রবাদের জন্মদান করেছে। বলা হয় যে, "তিনি সাগরে একটি পর্বত নির্মাণ করেছিলেন এবং পর্বতে একটি সাগর খনন করেছিলেন।"

বুওয়াইহী যুগের উজীরগণ বড় বড় বিদ্বান ছিলেন এবং বিদ্বানের সমাদর করতেন। মুইজুদ্দৌলাহ্র উজীর মুহাল্লাবী, রুকনুদ্দৌলাহ্র উজীর আবুল ফজল ইবনুল আমীদ, মুয়াইয়িদুদ্দৌলাহ্ ও ফখরুদ্দৌলাহ্র উজীর সাহিব ইবন আব্বাস ও বাহাউদ্দৌলাহ্র উজীর ফখরুল মুলক ও সাবুর সকলেই সাহিত্যিক ছিলেন এবং বিদ্বান ও পণ্ডিত ব্যক্তির সমাদর করতেন। সাবুর বাগদাদে একটি জ্ঞানকেন্দ্র ও গ্রন্থাগার স্থাপন করে সেখানে ১০,৪০০ বই সংগ্রহ করেন। আদুদের পুত্র শরফুদ্দৌলাহ্ বাগদাদে একটি মানমন্দির নির্মাণ করেছিলেন। সেখানে তাঁর জ্যোতির্বিদ ইবন রুস্তম আল-কুহী গ্রহ-নক্ষত্রাদি অবলোকন করতেন। শরফুদ্দৌলাহ্র দরবারে খ্যাতনামা অঙ্কশাস্ত্রবিদ আবুল ওয়াফাও ছিলেন। বিখ্যাত বুদ্ধিজীবী গোষ্ঠী 'ইখওয়ানুস সাফা' এ যুগে বসরায় প্রসিদ্ধি লাভ করেন। বুওয়াইহী আমীর জালালুদ্দৌলাহ্র সময় রাষ্ট্রবিজ্ঞান বিষয়ক দুটি গ্রন্থ মাওয়ারদী ও ইবন আবী ইয়া'লা কর্তৃক লিখিত হয়। উভয় গ্রন্থকারের পুস্তকের নাম

'আহকামুস-সুলতানিয়া'। এ গ্রন্থে খলিফা ও অন্যান্য রাজ-কর্মচারীদের কর্তব্য সম্পর্কে লিখিত হয়েছে।

শতাব্দীর অধিক কাল বাগদাদে বুওয়াইহী শাসন সুন্নিগণকে অসন্তুষ্ট ও উত্যক্ত করে তুলেছিল। বুওয়াইহী শাসকগণও দুর্বল ও শক্তিহীন হয়ে পড়েছিলেন। বুওয়াইহিগণ বাগদাদে দুটি শিয়ী ধর্মীয় অনুষ্ঠান চালু করেন ঃ একটি হল ১০ মুহররমের শোকানুষ্ঠান। একে 'আশুরা' বলা হয়। অপরটি হল গাদীবের আনন্দোৎসব। জিলহজ্ব মাসে এ উৎসব পালন করা হয়। শিয়াদের মতে ঐ দিবসে হযরত মুহম্মদ (স) হযরত আলীকে (রা) তাঁর উত্তরাধিকারী মনোনয়ন করেছিলেন। এ দুই অনুষ্ঠানকে কেন্দ্র করে প্রতি বছর বাগদাদে শিয়ী-সুন্নী দাঙ্গা বেধে যেত। খলিফা আল-কায়িম অবশেষে সলজুকদের নেতা তুগ্রিলবেগকে বাগদাদে আসতে আহ্বান করলেন। ১০৫৫ খ্রিস্টাব্দে তুগ্রিলবেগ বাগদাদে এসে শেষ বুওয়াইহী আমীর মালিকুর-রহীমকে পদচ্যুত ও বন্দী করে বাগদাদে শিয়ী-বুওয়াইহী শাসনের অবসান ঘটালেন।

গ্রন্থনির্দেশ

১. মফীজুল্লাহ্ কবীর ঃ *দি বুওয়াইহীদ ডায়ন্যাস্টি অব বাগদাদ।*

২. মফীজুল্লাহ্ কবীর ঃ *আউটলাইন অব ইসলামিক হিস্ট্রি।*

৩৪

সলজুক বংশ

সলজুক বংশের অভ্যুত্থান ইসলামের ইতিহাসের এক গুরুত্বপূর্ণ অধ্যায়। একাদশ শতাব্দীর প্রারম্ভে মুসলিম সাম্রাজ্য খণ্ড-বিখণ্ড হয়ে ভেঙ্গে পড়ছিল। বুওয়াইহী ও গজনবী বংশের ক্ষমতা দুর্বল হয়ে পড়েছিল এবং তাদের স্থানে বহু ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র স্বাধীন রাজ্যের উদ্ভব হল। স্পেনে উমাইয়াগণ, মিসর ও উত্তর-আফ্রিকায় ফাতিমীয়গণ বহু পূর্ব হতে স্বাধীনভাবে রাজত্ব করছিল। উত্তর সিরিয়ায় ও মেসোপটেমিয়ায় বহু বিদ্রোহী-আরব নেতার আবির্ভাব হয়েছিল। এঁরা কয়েকটি স্বাধীন রাজ্যেরও প্রতিষ্ঠা করেছিলেন। পারস্যে বুওয়াইহী বংশের বিভিন্ন শাখা ও অন্যান্য বংশের ছোট-খাট রাজ্য স্থাপিত হয়েছিল। এই শতধা-বিচ্ছিন্ন ও বহুধা-বিভক্ত খলিফার রাজ্যে এক নতুন রাজশক্তির আবির্ভাব হল। এরাই সলজুক নামে অভিহিত।

সলজুকগণ জাতিতে তুর্কোমান ছিল এবং তাদের নেতা সলজুকের নামানুসারে তাদেরকে সলজুক (বা সলজুকীয়) বলা হয়। সলজুক তাঁর তুর্কোমান দলবলসহ তুর্কীস্তানের কিরগিজ অঞ্চল হতে দশম শতাব্দীর মাঝামাঝি বুখারায় এসে বসতি স্থাপন করেন। এখানে সলজুকগণ সুন্নী মতে ইসলাম ধর্মে দীক্ষিত হয়। কালক্রমে সলজুক ও তাঁর পুত্রগণ ইলকখান ও সামানীদের রাজ্যের মধ্য দিয়ে নিজেদের পথ করে নিচ্ছিলেন। সলজুকের পৌত্র তুগ্রিলবেগ ও চাগরীবেগ প্রচুর শক্তি সঞ্চয় করে খুরাসানের ওপর আপতিত হলেন এবং একের পর এক যুদ্ধে গজনবী বংশের আমীরগণকে পরাজিত করে খুরাসানের প্রধান নগরসমূহ অধিকার করলেন। ১০৩৭ খ্রিস্টাব্দে চাগরীবেগের নামে মার্ভের মসজিদসমূহে খুৎবা পঠিত হয় এবং তাঁর ভ্রাতা তুগ্রিলবেগের নামে নীশাপুরে খুৎবা পঠিত হয়। অচিরেই সলজুকগণ বলখ, গুর্গাওঁ, তাবারিস্তান এবং খাওয়ারিজম অধিকার করে। জিবাল, হামদোন, দিনাওয়ার, হুলওয়ান, রায় এবং ইস্পাহানও অবিলম্বে তাদের অধীনে আসে। শতাধিক বছরের পুরাতন বুওয়াইহী বংশ তাদের বিজয়াভিযানের সম্মুখে ধুলায় লুণ্ঠিত হয়ে পড়ল। পরিশেষে ১০৫৫ খ্রিস্টাব্দের ডিসেম্বর মাসে খলিফা আলকায়িম তুগ্রিলবেগকে বাগদাদে আসতে আহ্বান করলেন। শেষ বুওয়াইহী আমীর মালিকুর-রহীমের প্রধান সেনাপতি ছিলেন একজন শিয়ী। তাঁর নাম ছিল বাসাসীরী। তুগ্রিলের আগমনে বাসাসীরী রাহবা নামক স্থানে গিয়ে ফাতিমী খলিফা মুস্তানসিরের নামে খুৎবা পড়লেন।

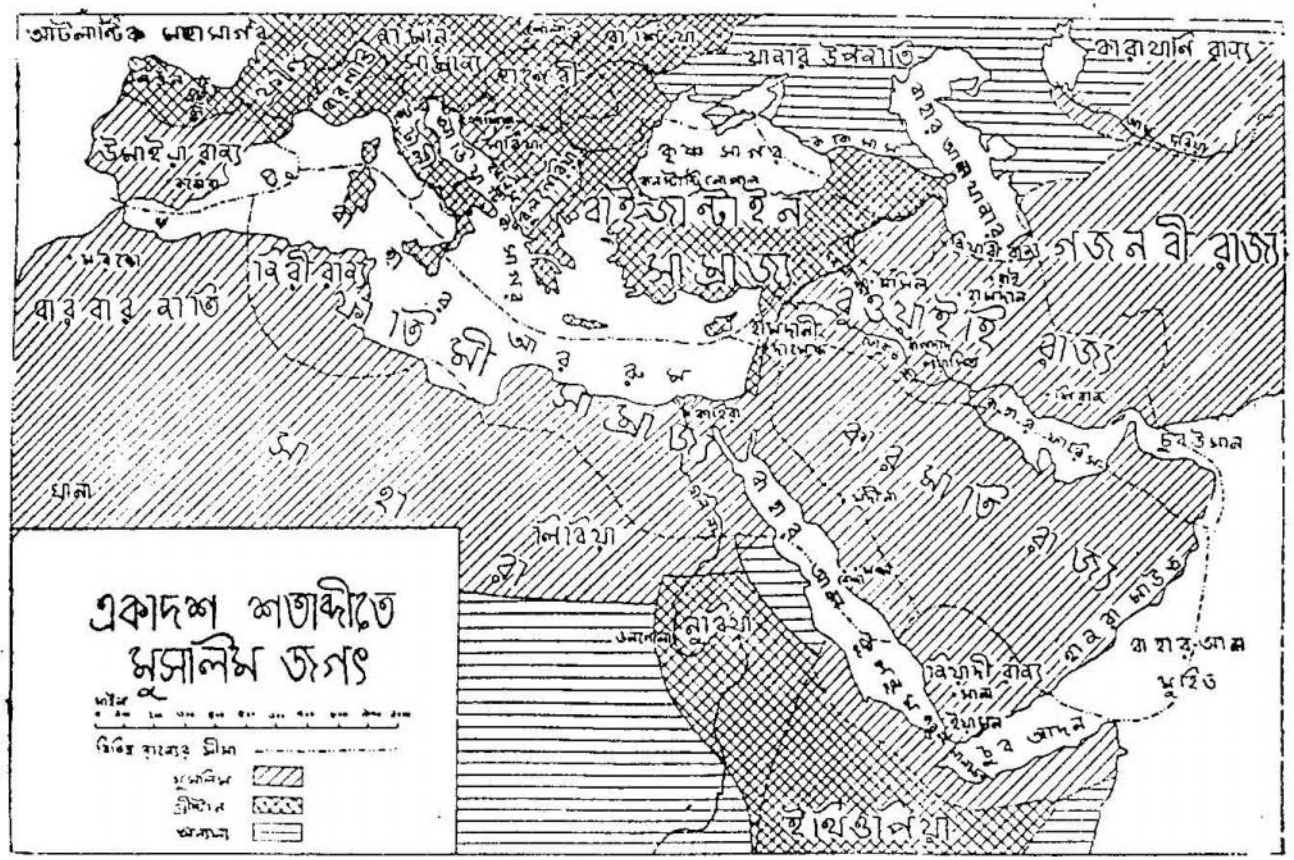

একাদশ শতাব্দীতে মুসলিম জগৎ

তুগ্রিলবেগ খলিফার আহ্বানে সাড়া দিয়ে তাঁর আনুগত্য প্রকাশ করে পত্র লিখলেন এবং খলিফা মসজিদের খতীবদের নিকট আদেশ জারি করে পাঠালেন যে, খুৎবায় যেন খলিফার নামের পরে এবং মালিকুর রহীমের নামের পূর্বে তুগ্রিলের নাম পড়া হয়। খলিফার উজীর তুগ্রিলের সম্বর্ধনার জন্য গণ্যমান্য ব্যক্তিদের সাথে নগরীর বাইরে গেলেন এবং ৪৪৭ হিজরীর ২৫ রমজান (ডিসেম্বর, ১০৫৫ খ্রিঃ) সলজুক বাহিনী বাগদাদে প্রবেশ করল। তুগ্রিলের বাগদাদ প্রবেশের কিছুদিন পরেই জনসাধারণ তুর্কোমান সৈন্যদের বিরুদ্ধে বিদ্রোহী হল। এতে মালিকুর-রহীমের হাত আছে, এ অজুহাতে তাঁকে বন্দী করা হল। তখন তাঁর নামে খুৎবা পাঠ বন্ধ করে দেয়া হল। তিনি বন্দী অবস্থায় ১০৫৮—৫৯ খ্রিষ্টাব্দে মৃত্যুমুখে পতিত হন।

এর পর তুগ্রিল কিছুদিন বাইরে অবস্থান করে বাগদাদে ফিরে আসলেন। এবার তাঁর সম্মানে রাজকীয় সম্বর্ধনার আয়োজন করা হল। খলিফা হযরত রসূলুল্লাহ্‌র (স) পোশাক পরে ও লাঠি নিয়ে যবনিকার অন্তরালে আসন গ্রহণ করলেন। তুগ্রিলের আগমনে এ পর্দা উত্তোলিত হল। তুগ্রিল আসন গ্রহণ করে দো-ভাষীর মধ্যস্থতায় খলিফার সাথে কথোপকথন করলেন। খলিফা তুগ্রিলকে "প্রাচ্য ও প্রতীচ্যের রাজা" বলে সম্বোধন করলেন এবং তাঁকে 'সুলতান' উপাধি দান করলেন।

তুগ্রিল বেগ তাঁর ভ্রাতা ইব্রাহীম ইনালের বিদ্রোহ দমন করবার জন্য বাগদাদের বাইরে গেলে ১০৫৮ খ্রিষ্টাব্দের ডিসেম্বরে শিয়ী সেনাপতি বাসাসীরী বাগদাদে প্রবেশ করেন এবং বাগদাদের সব মসজিদে ফাতিমী খলিফা মুস্তানসিরের নামে খুৎবা প্রবর্তিত করলেন। আব্বাসীয় খলিফা আল-কায়িমকে খিলাফতের সব দাবি পরিহার করে খিলাফতের নিদর্শনসমূহ, যথা—পোশাক, পাগড়ি ও মিম্বর, কায়রোতে ফাতিমীয় খলিফার নিকট প্রেরণ করতে হল। বাসাসীরী বাগদাদের প্রধান কাজী এবং আলাবী ও আব্বাসীয় নেতাগণকে মুস্তানসিরের প্রতি আনুগত্যের শপথ গ্রহণ করতে বাধ্য করলেন। খলিফা কায়িমকে বন্দী করে রাখা হল। এক বছর পর্যন্ত বাগদাদে ফাতিমীয় খলিফার নামে শাসন চলল। অবশেষে ১০৫৯ সালের ডিসেম্বরে তুগ্রিল বেগ বাগদাদে প্রত্যাবর্তন করেন। তিনি বাসাসীরীকে যুদ্ধে পরাজিত ও নিহত করেন এবং খলিফা আল-কায়িমের শাসন পুনঃপ্রতিষ্ঠিত করেন। সলজুকদের শাসনাধীনে পূর্বে আফগানিস্তানের সীমান্ত হতে পশ্চিমে এশিয়া-মাইনরের গ্রীক রাজ্যের সীমান্ত এবং মিসরের ফাতিমীয় রাজ্যের সীমান্ত পর্যন্ত বিস্তৃত সমগ্র পশ্চিম-এশিয়া

আব্বাসীয় খলিফার আনুগত্যে পুনর্মিলিত হয়। এদের সামরিক কার্যকলাপের ফলে মুসলিম জগতের পূর্বাঞ্চলে রাজনৈতিক ঐক্য স্থাপিত হয় এবং এ রাজনৈতিক ঐক্যের ফলে ধর্ম ও সংস্কৃতির ক্ষেত্রে এক নতুন যুগের সূচনা হয়। তুগ্রিলের সময় (১০৩৭—৬৩ খ্রিঃ) হতে আরম্ভ করে তাঁর ভ্রাতুষ্পুত্র আলপ্ আরসালান (১০৬৩—৭২) ও আলপ্ আরসালানের পুত্র মালিক শাহের রাজত্বকাল পর্যন্ত (১০৭২—৯২ খ্রিঃ) সলজুক শাসনের গৌরবময় যুগ।

গ্রীকগণ খিলাফতের ক্রমবর্ধমান দুর্বলতার সুযোগ গ্রহণ করে খলিফার রাজ্যে তাদের ক্ষমতা বৃদ্ধি করছিল। এর ফলে দশম শতাব্দীর শেষভাগে বাইজান্টাইন সাম্রাজ্য দক্ষিণে এন্টিয়ক ও পূর্বে আর্মিনিয়া পর্যন্ত বিস্তৃত হল।

আলপ্ আরসালান (১০৬৩-৭২ খ্রিঃ)

১০৬০ খ্রিস্টাব্দে সুলতান তুগ্রিলবেগ বাইজান্টাইনদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করে তাদেরকে কাপাডোসিয়া ও ফ্রিজিয়া হতে বিতাড়িত করলেন। কিন্তু তাঁর ভ্রাতুষ্পুত্র ও উত্তরাধিকারী আলপ্ আরসালান এ সব অঞ্চল স্থায়ীভাবে জয় করেন। সুলতান তুগ্রিলের মৃত্যুর পর আলপ্ আরসালান সলজুকদের সর্বাধিনায়কত্ব প্রাপ্ত হলেন। তিনি মহানুভব, ন্যায়পরায়ণ, জ্ঞানী, ধার্মিক, সাহসী ও বিক্রমশীল ছিলেন। তিনি জর্জিয়া ও আর্মিনিয়া চূড়ান্তভাবে জয় করার পর আজারবাইজানের খোই নামক স্থানে অবস্থানকালে সংবাদ পেলেন যে, গ্রীক সম্রাট রোমানাস ডায়োজিনিস অধুনা বাইজান্টাইন সিংহাসনে আরোহণ করে দুই লক্ষ্য সৈন্যের এক বিশাল বাহিনী নিয়ে বাগদাদ নগরী ধ্বংস ও সমগ্র পশ্চিম-এশিয়া গ্রীকদের পদানত করবার উদ্দেশ্যে এশিয়া-মাইনর আক্রমণ করেছেন। কনস্টান্টিনোপল হতে ইতিপূর্বে এত বৃহৎ ও সুসজ্জিত সৈন্যবাহিনী আর কখনও বের হয়নি। বিশাল বাইজান্টাইন বাহিনীর অগ্রগমনের সঙ্গে সঙ্গে মুসলমানগণ পশ্চাদপসরণ করে মালাজকার্দে সৈন্য সমাবেশ করল। যুদ্ধে মুসলমানগণ গ্রীকদের সংখ্যাধিক্যে অভিভূত হয়ে পড়ল, কিন্তু বীর বিক্রমে বহুক্ষণ ধরে যুদ্ধ করার পর তারা গ্রীক সৈন্যবাহিনীকে সম্পূর্ণ পরাজিত করে সম্রাট ডায়োজিনিসকে সভাসদসহ বন্দী করল। আলাপ-আলোচনার পর স্থির হল যে, রোমানাস তাঁর কন্যাগণকে আলপ্ আরসালানের পুত্রদের সাথে বিবাহ দিবেন এবং বন্দীদের উদ্ধারের জন্য দশ লক্ষ এবং বাৎসরিক রাজস্ব স্বরূপ তিন লক্ষ ষাট হাজার স্বর্ণমুদ্রা দান করে সন্ধি স্থাপন করবেন। দুর্ভাগ্যের বিষয়, রোমানাস কনস্টান্টিনোপলের দিকে প্রত্যাবর্তন করবার পূর্বে পদচ্যুত হলেন এবং গ্রীকগণ তাঁকে বন্দী ও অন্ধ করে পরে নিহত করে। মালাজকার্দের যুদ্ধ এশিয়ায় বাইজান্টাইন ক্ষমতার অবসান ঘটাল। এশিয়া-

মাইনরের মালভূমি এখন স্থায়ীভাবে 'দারুল ইসলামের' অন্তর্ভুক্ত হল এবং এর জন্য সমস্ত কৃতিত্ব আলপ্ আরসালানের। আলপের পিতৃব্যপুত্র সুলায়মান ইবন কুলতুমিশ এশিয়া-মাইনরের জায়গীর প্রাপ্ত হলেন। তিনি ১০৭৭ খ্রিস্টাব্দে রুমে সলজুকদের সুলতানাত প্রতিষ্ঠা করেন। প্রথমে তাঁর রাজধানী ছিল নাইসিয়া শহরে। প্রথম ক্রুসেডের সময় মুসলমানগণ ঐ শহর হতে বিতাড়িত হলে রাজধানী আইকোনিয়ামে (কোনিয়ায়) স্থানান্তরিত হয়। সিরিয়ায় আলপের পুত্র তুতুশের শাসনাধীনে আরও একটি রাজ্য স্থাপিত হয়। আলপ্ স্বয়ং আলেপ্পো অধিকার করেন। তিনি ফাতিমীয়দের অগ্রগতি রোধ করেন এবং তাদের নিকট হতে মক্কা ও মদীনা উদ্ধার করেন।

১০৭৩ খ্রিস্টাব্দে আলপ্ আরসালানের মৃত্যু হয়। তাঁর শাসন ন্যায়-পরায়ণ ও জনকল্যাণকর ছিল। তাঁর রাজত্বকালে নিজামুল-মুল্ক উপাধিধারী বিখ্যাত খাজা হাসান তাঁর উজীর ছিলেন। বে-সামরিক শাসনের সমুদয় ক্ষমতা উজীরের হাতে ন্যস্ত ছিল। আলপ্ আরসালানের মৃত্যুর পর তাঁর পুত্র মালিক শাহ্ জালালুদ্দৌলাহ উপাধি গ্রহণ করে সুলতান হলেন।

প্রথম দুইজন সলজুক সুলতান বাগদাদে বসবাস করতেন না। তাঁরা একজন সামরিক শাসনকর্তার সাহায্যে বাগদাদ শাসন করতেন। তুগ্রিলবেগ মার্ভে থাকতেন। আলপ্ আদৌ কখনও বাগদাদে আসেননি। তিনি ইস্পাহানে থেকে রাজ্যশাসন করতেন। মালিক শাহ্ তাঁর রাজত্বের শেষ ভাগে বাগদাদে রাজধানী স্থানান্তরিত করেন। খলিফা ক্রমান্বয়ে সুলতানের হাতের ক্রীড়নক হয়ে পড়লেন। পূর্ববর্তী বুওয়াইহী যুগের সাথে সলজুক যুগের পার্থক্য এই যে, এ যুগে সুলতানগণ সুন্নী ছিলেন এবং তাঁরা খলিফাকে যথাযোগ্য সম্মান প্রদর্শন করতেন। তবে রাজনৈতিক ক্ষমতা বলতে তাঁর আর কিছুই বাকি রইল না। সলজুক শক্তি দুর্বল হয়ে পড়লে খলিফা তাঁর লুপ্ত ক্ষমতা পুনরুদ্ধারের জন্য চেষ্টা করতে লাগলেন।

মালিক শাহ্
(১০৭২-১০৯২খ্রিঃ)
সলজুক শক্তির চরম উৎকর্ষ

মালিক শাহের রাজত্বকালে সলজুক ক্ষমতা চরম উন্নতি লাভ করে। "তাঁর রাজ্য দৈর্ঘ্যে তুর্কীস্তানের শেষ প্রান্তে অবস্থিত কাশগড় হতে জেরুজালেম পর্যন্ত এবং প্রস্থে কনস্টান্টিনোপল হতে কাস্পিয়ান সাগর পর্যন্ত বিস্তৃত ছিল।" মালিক শাহের রাজত্বের প্রথম ভাগে কয়েকটি বিদ্রোহের ফলে রাজ্যে গোলযোগ দেখা দেয়। তাঁর ভ্রাতার নেতৃত্বেও একটি বিদ্রোহ সংঘটিত হয়েছিল। ইবন খাল্লিকান বর্ণিত এ সময়ের একটি কাহিনী হতে মালিক শাহের চরিত্র সম্বন্ধে সুস্পষ্ট ধারণা করা যায়। তুস নগরীতে উজীর নিজামুল-মুলক সমভিব্যাহারে তিনি একটি

মসজিদে নামাজ পড়েন ও প্রার্থনা করেন। প্রার্থনার শেষে তিনি উজীরকে জিজ্ঞেস করলেন যে, তিনি কি প্রার্থনা করেছেন। উজীর উত্তর করলেন যে, তিনি আল্লাহ্‌র নিকট প্রার্থনা করেছেন, যেন তিনি সুলতানকে বিদ্রোহী ভ্রাতার ওপর জয়দান করেন। কিন্তু মালিক শাহ্ বললেন, "আমি এ জন্য প্রার্থনা করিনি। আমি আল্লাহ্‌র নিকট চেয়েছি যে, আমাদের দুজনের মধ্যে যে মুসলমানদেরকে শাসন করবার জন্য বেশি উপযুক্ত এবং যার শাসন প্রজাগণের জন্য বেশি উপকারী, তিনি যেন তাকেই জয়ী করেন।"

মালিক শাহ্ শুধু যে বিশাল সাম্রাজ্যের অধিকারী ছিলেন, তাই নয়, তিনি বহু জনহিতকর কাজ করে ইসলামের ইতিহাসে চিরস্মরণীয় হয়ে রয়েছেন। তিনি মসজিদ, মাদ্রাসা, রাস্তাঘাট, পয়ঃপ্রণালী, হাসপাতাল নির্মাণ করেছিলেন। হজ্বযাত্রীদের সুবিধার জন্য তিনি রাস্তার পার্শ্বে অসংখ্য সরাইখানা নির্মাণ করে দিয়েছিলেন। তিনি দ্বাদশবার বিশাল সাম্রাজ্যের এক প্রান্ত হতে অন্য প্রান্ত পর্যন্ত পরিভ্রমণ করে অভাব-অভিযোগ শ্রবণ করতেন এবং এর প্রতিকারের চেষ্টা করতেন। মৃগয়ায় তাঁর বিশেষ আসক্তি ছিল। মৃগয়া বা প্রমোদ ভ্রমণের সময়েও তিনি অভাবগ্রস্তদের মধ্যে প্রচুর অর্থ বিতরণ করতেন। তাঁর বিশাল সাম্রাজ্যের সর্বত্র শান্তি ও শৃঙ্খলা বিরাজমান ছিল। ট্রান্সঅক্সিয়ানা হতে সিরিয়া পর্যন্ত বাণিজ্য কাফেলা, এমন কি দু-একজন পথযাত্রীও নির্বিঘ্নে চলাফেরা করতে পারত। এ সব কারণে শিল্প ও বাণিজ্যের প্রভূত উন্নতি সাধিত হয়। এ সময় বাগদাদে জনস্বাস্থ্যের উন্নতির জন্য কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ ব্যবস্থা প্রবর্তন করা হয়। শহরের হাম্মামখানাগুলি হতে ময়লা পানি নিষ্কাশনের জন্য বিশেষ নালার ব্যবস্থা করা হয়। মাছের আঁশ ছাড়াবার জন্যও বিশেষ স্থান নির্দিষ্ট করে দেয়া হয়।

সলজুকদের সময় সাহিত্য ও জ্ঞান-বিজ্ঞানের উন্নতি হয়। মালিক শাহ্ বিদ্বজ্জনের সমাদর করতেন। তাঁর উজীর নিযামুল-মুলক একজন খ্যাতনামা সাহিত্যিক ছিলেন। মালিক শাহ্ ১০৭৪—৭৫ খ্রিস্টাব্দে পারসিক পঞ্জিকার সংশোধনের জন্য জ্যোতির্বিদগণের এক সম্মেলন আহ্বান করেন। এ সংশোধিত পঞ্জিকার নাম দেয়া হল "জালালী পঞ্জিকা"। জালালুদ্দীন মালিক শাহের নামানুসারে এ নামকরণ করা হয়। বিখ্যাত জ্যোতির্বিদ উমর খইয়াম এ সম্মেলনে সভাপতিত্ব করেছিলেন। উমর খইয়ামসহ এ সব জ্যোতির্বিদ মালিক শাহ্ কর্তৃক স্থাপিত একটি মানমন্দিরে গবেষণারত ছিলেন। এ পঞ্জিকা গ্রীগরীয় পঞ্জিকা হতে অধিকতর বিশুদ্ধ। গ্রীগরীয় পঞ্জিকায় ৩৩৩০ বছরে ১ দিন ভুল হয়, আর জালালী পঞ্জিকায় ৫০০০ বছরে এক দিনের প্রমাদ ঘটে। জ্যোতির্বিদ ও গাণিতিক ছাড়াও উমর খইয়াম কবি এবং দার্শনিকও ছিলেন।

সুপণ্ডিত নিজামুল-মুলক বিদ্বান ও বিদ্বানের পৃষ্ঠপোষক ছিলেন। একবার মালিক শাহ্ রাষ্ট্রীয় শাসন পদ্ধতি সম্বন্ধে পুস্তক রচনার জন্য পণ্ডিত লোকদের মধ্যে এক প্রতিযোগিতা আহ্বান করেছিলেন। এ বিষয়ে লিখিত গ্রন্থগুলির মধ্যে নিজামুল-মুলক রচিত *'সিয়াসতনামা'* সর্বশ্রেষ্ঠ বলে বিবেচিত হয়। ৫০ অধ্যায়ে সমাপ্ত এ পুস্তকে রাষ্ট্র পরিচালনার বিভিন্ন ক্ষেত্রে বাদশাহের জন্য ঐতিহাসিক দৃষ্টান্ত সম্বলিত উপদেশাবলি লিপিবদ্ধ করা হয়েছিল। এ পুস্তকের শেষভাগে নিজামুল-মুলক চরমপন্থী ও নাস্তিক্যবাদী ধর্ম সম্প্রদায়, বিশেষ করে বাতিনী ও কারমাতী সম্প্রদায়সমূহের রাষ্ট্রদ্রোহী কার্যকলাপ সম্বন্ধে বিরূপ মন্তব্য করেছেন এবং কঠোর সতর্কবাণী উচ্চারণ করেছেন।

নিজামুল-মুলক ইসলামের ইতিহাসে তাঁর আর একটি উল্লেখযোগ্য কীর্তির জন্য বিখ্যাত। তিনি বলখ, মার্ভ, ইস্পাহান, বসরা এবং বাগদাদে মাদ্রাসা ও উচ্চ শিক্ষায়তন প্রতিষ্ঠা করেছিলেন। এ সব মাদ্রাসা নিজামুল-মুলকের উপাধি অনুসারে নিজামীয়া নামে খ্যাত। এদের মধ্যে বাগদাদের নিজামীয়া সর্বাপেক্ষা প্রসিদ্ধ। এটা বর্তমান যুগের বিশ্ববিদ্যালয়ের সাথে তুলনীয়। ১০৬৫-৬৭ খ্রিস্টাব্দে স্থাপিত হয়ে এ শিক্ষা প্রতিষ্ঠান শাফিয়ী মাজহাব ও আশআরী মতবাদ প্রচারের কেন্দ্র হিসেবে মুসলিম জগতে বিশেষ খ্যাতি অর্জন করেছিল এবং ১৩৯৩ খ্রিস্টাব্দে মুস্তানসিরীয়া নামক মাদ্রাসার সাথে মিশে গিয়েছিল। ১০৯১ হতে ১০৯৫ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত চার বছর ইমাম গাজ্জালী (র) এ নিজামীয়ার অধ্যাপক ছিলেন। ইসলামের প্রতি এ মনীষীর দান অপরিসীম। এ যুগের অন্যান্য লেখকের মধ্যে নাসির-ই-খসরুর নাম সমধিক প্রসিদ্ধ। তিনি বিখ্যাত পরিব্রাজক ও ইসমাঈলী প্রচারক ছিলেন। তাঁর 'সফরনামায়' তদানীন্তন মুসলিম জগতের রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক ও সামাজিক চিত্র নিখুঁতভাবে অঙ্কিত হয়েছে।

মালিক শাহের রাজত্বের শেষভাগে নাস্তিকতাবাদী ঘাতক সম্প্রদায়ের (Assassin) আবির্ভাব ঘটে। নিজামুল-মুলকের সহপাঠী হাসান সাবাহ্ কর্তৃক এ দল গঠিত হয়েছিল। ব্যক্তিগত জীবনে হাসান সাবাহ্ উচ্চ রাজকার্যে নিযুক্ত হওয়ার সুযোগে বঞ্চিত হয়ে হিংসা ও ধ্বংসাত্মক কার্যকলাপে লিপ্ত হয়েছিলেন। তাঁর সম্প্রদায়ের লোকেরা বিষ ও ছোরার সাহায্যে যন্ত্রচালিতের মত নেতার আদেশক্রমে বিরুদ্ধবাদীদেরকে ঘায়েল করত। এরা মজান্দারনের পার্বত্য অঞ্চলে দুর্ভেদ্য আলামুত দুর্গে ঘাঁটি স্থাপন করেছিল। মালিক শাহ্ এদের শক্তি খর্ব করতে ব্যর্থকাম হন। ১০৯২ খ্রিস্টাব্দে এদের জনৈক গুপ্তঘাতক কর্তৃক নিজামুল-মুলক নিহত হন। এর অল্পকাল পরে মালিক শাহেরও মৃত্যু হয়।

নিজামুল-মুলক ও মালিক শাহের মৃত্যুর সঙ্গে সঙ্গে সলজুকদের গৌরবের যুগের অবসান ঘটে। মালিক শাহের উত্তরাধিকারীদের মধ্যে গৃহযুদ্ধের ফলে কেন্দ্রীয় সরকার দুর্বল হয়ে পড়ে। গৃহযুদ্ধ ছাড়া অন্যান্য কারণেও সলজুক সাম্রাজ্য ছিন্ন-বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ে। ১০৮৭ খ্রিস্টাব্দে সলজুকগণ সামরিক সামন্ত প্রথা প্রবর্তন করে। এই প্রথানুযায়ী সামন্তগণ নিজ নিজ অঞ্চলে বংশানুক্রমিক শাসন ক্ষমতা লাভ করেন। এর ফলে বিভিন্ন অঞ্চলে স্বাধীন বা অর্ধ-স্বাধীন বংশ গড়ে ওঠে। এরা কালক্রমে পারস্যের কেন্দ্রীয় সলজুক শাখার সাথে সব সম্পর্ক ছিন্ন করে। এ বিভিন্ন স্বাধীন শাখার নাম যথাক্রমে ইরাক ও কুর্দীস্তানের শাখা, কিরমানের শাখা, সিরিয়ার শাখা এবং রুমের শাখা। রুমের শাখা (Iconium) ১৩০০ খ্রিস্টাব্দের দিকে উসমানী তুর্কিদের দ্বারা পরাজিত ও বিতাড়িত হয়। উসমানী তুর্কিগণ ইসলামের বিজয় বৈজয়িন্তী ইউরোপে উড্ডীন করে।

বাগদাদের খলিফাগণের ওপর সলজুক কর্তৃক ১০৫৫ খ্রিস্টাব্দে খলিফা আল-কায়িমের আমলে আরম্ভ হয়ে খলিফা আন-নাসিরের আমলে ১১৯৪ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত স্থায়ী হয়।

গ্রন্থনির্দেশ

১. পি. কে. হিট্টি : *হিস্ট্রি অব দি এরাবস্।*
২. লেনপুল : *মুহম্মাডান ডায়ন্যাস্টিজ।*
৩. উইলিয়াম ম্যুর : *কলিফেট।*
৪. সৈয়দ আমীর আলী : *হিস্ট্রি অব দি সারাসেনস্ ।*
৫. ব্রাউন : *লটারারি হিস্ট্রি অব পার্সিয়া।*
৬. লেম্বটন : *ল্যাও এণ্ড পিজেন্ট ইন পার্সিয়া।*

৩৫
খিলাফতের গৌরবোদ্ধারের শেষ প্রচেষ্টা ঃ খলিফা আন্-নাসির লি দীনিল্লাহ্

(১১৮০—১২২৫ খ্রিঃ)

খিলাফতের পতনের যুগে ৩৪-তম আব্বাসীয় খলিফা আবুল আব্বাস আহমদ 'আন-নাসির লি দীনিল্লাহ' খিলাফতের পূর্ব-গৌরব পুনঃপ্রতিষ্ঠিত করবার জন্য বদ্ধপরিকর হলেন। এ হৃতগৌরবের মধ্যে ছিল খলিফার পার্থিব ক্ষমতা। শিয়া, বুওয়াইহী ও সুন্নী সলজুকদের শাসনামলে খলিফা কেবল নামেমাত্রই খলিফা রইলেন। রাজ্য-রাজত্ব, যুদ্ধ-বিগ্রহ, সন্ধি, অর্থ-সম্পদ ও শান-শওকত, সবকিছুরই মালিক ছিলেন বুওয়াইহী আমীর ও সলজুক সুলতানগণ। সলজুক শক্তি যখন গৃহ-বিবাদ ও আত্মকলহে ধ্বংসোন্মুখ, তখন সুযোগ বুঝে খলিফা ক্ষমতার সংগ্রামে ঝাঁপিয়ে পড়লেন। কিন্তু সলজুক ক্ষমতা খর্ব করবার জন্য তিনি প্রথমে সলজুকদের সামন্ত খাওয়ারিজম শাহের সাথে সহযোগিতা করলেন। আবার খাওয়ারিজম শাহের শক্তি যখন তাঁর আয়ত্তের বাইরে চলে গেল, তখন তিনি তাঁর বিরুদ্ধে মোঙ্গলগণকে উস্কিয়ে দিয়ে পরিশেষে নিজের বংশের পতন ত্বরান্বিত করলেন।

খলিফা নাসিরের প্ররোচনায় খাওয়ারিজম শাহ্ তাকাশ ইরাক-ই-আজমের শাসনকর্তা সুলতান দ্বিতীয় তুগ্রিলকে ১১৯৪ খ্রিস্টাব্দে আক্রমণ করেন এবং পরাজিত ও নিহত করেন। নাসির মনে করেছিলেন যে, সলজুকদের সমস্ত রাজ্য তিনিই দখল করবেন। কিন্তু তাকাশ তাঁর রাজ্য বৃদ্ধির এ সুযোগ ছাড়বার পাত্র ছিলেন না। তিনি এখন নিজেকে সলজুকদের স্থলবর্তী মনে করে খিলাফতের যাবতীয় পার্থিব ক্ষমতার উত্তরাধিকারী হতে চাইলেন। তিনি বাগদাদ অধিকার করে সলজুকদের মত খলিফার সব কর্তৃত্ব নিজের হাতে নিতে চাইলেন এবং খলিফাকে নামেমাত্র খলিফা করে রাখতে চেষ্টা করলেন। তাকাশ তখন পূর্বাঞ্চলে যুদ্ধে ব্যাপৃত ছিলেন, সেই সুযোগে খলিফা তাঁর উজীরের সাহায্যে খুজিস্তান ও অন্যান্য অঞ্চল দখল করে নিলেন (১১৯৬ খ্রিঃ)। কিন্তু তাকাশ ফিরে এসে খলিফার সৈন্যদলকে পরাজিত করে খুজিস্তান ব্যতীত আর অন্যান্য স্থান পুনরাধিকার করলেন। তাকাশের পুত্র ও উত্তরাধিকারী আলাউদ্দীন মুহম্মদের আমলেও খলিফার সাথে এ ক্ষমতার দ্বন্দ্ব অব্যাহত থাকে। খাওয়ারিজম শাহ আলাউদ্দীন মুহম্মদ পারস্যের সমগ্র অঞ্চল দখল করে বুখারা ও সমরকন্দ অধিকার

দ্বাদশ শতাব্দীতে
মুসলিম জগৎ
বিভিন্ন রাজ্যের সীমা
মুসলিম
খৃষ্টান
অন্যান্য
সেলজুক সাম্রাজ্য
বাহার আর রুম
মুরাবিত বংশ
লিবিয়া
নুবিয়া
বাহার ফারিস
বাহার আল মুহিত

করলেন (১২১০ খ্রিঃ)। ১২১৪ সালে তিনি আফগানিস্তানে প্রবেশ করে গজনী দখল করলেন। এর পর তিনি আব্বাসীয় খিলাফতের অবসান ঘটিয়ে একজন আলাবীকে খলিফার পদে নিযুক্ত করতে সিদ্ধান্ত করলেন। তিনি তাঁর আলিমদের দ্বারা একটি ফতোয়া জারি করে নাসিরকে খিলাফতের অনুপযুক্ত ঘোষণা করলেন এবং তিরমিজের আলাউল মুলক্ নামক একজন আলাবীকে খলিফা বলে ঘোষণা করলেন। এ নতুন খলিফার নামে খুৎবা পাঠ করা হল এবং মুদ্রায় তাঁর নাম অঙ্কিত হল। খলিফা নাসির আপোষের আলাপ-আলোচনা চালিয়ে ব্যর্থ হলেন। তখন তিনি মোঙ্গল নেতা চেঙ্গিজ খানকে খাওয়ারিজম শাহের রাজ্য আক্রমণ করবার জন্য আহ্বান করলেন।

ইতিমধ্যে আলাউদ্দীন মুহম্মদ হামাদান হতে বাগদাদের দিকে যাত্রা করলেন এবং আব্বাসীয় খিলাফতকে ধ্বংস করার পরিকল্পনা বাস্তবায়িত করতে অগ্রসর হলেন। তাঁকে বাধা দানের কোন ক্ষমতাই খলিফার ছিল না, কিন্তু নিয়তি তাঁর সহায় হলেন। কঠোর শীতের আবির্ভাবে খাওয়ারিজম শাহ্ বাধ্য হয়ে খুরাসানে প্রত্যাবর্তন করলেন এবং পর বছর আবার বাগদাদ অধিকারের সংকল্প করলেন।

ইতিমধ্যে চেঙ্গিজ খানের নেতৃত্বে মোঙ্গলগণ গোবী মরুভূমির উত্তরাঞ্চলে অবস্থিত মঙ্গোলিয়া হতে বহির্গত হয়ে মুসলিম জগতের ওপর আপতিত হল। তাদের আক্রমণের সম্মুখে বিখ্যাত শিক্ষা ও সংস্কৃতির কেন্দ্রসমূহ ধূলিসাৎ হয়ে পড়ল। বলখ, বুখারা, হিরাত ও সমরকন্দ ধ্বংসস্তূপে পরিণত হল। অগণিত নর-নারী, শিশু ও বৃদ্ধ নিহত হল। মানুষের রক্তস্রোতে ধরিত্রী রঞ্জিত হয়ে উঠল। ৬০,০০০ মোঙ্গলদের প্রচণ্ড আক্রমণের সম্মুখে খাওয়ারিজম শাহ্ আলাউদ্দীন মুহম্মদ পরাজিত হয়ে কাস্পিয়ানের একটি দ্বীপে আশ্রয় গ্রহণ করলেন। সেখানেই শোচনীয়ভাবে তাঁর মৃত্যু হয় (১২২০ খ্রিঃ)।

মোঙ্গলগণ কিছুকালের জন্য চলে গেলে খাওয়ারিজম শাহ্ আলাউদ্দীনের পুত্র ও উত্তরাধিকারী জালালুদ্দীন মংবারনী খলিফা নাসিরকে আক্রমণ করে তাঁর নিকট হতে খুজিস্তান ছিনিয়ে নিলেন। খলিফা নাসির সর্বক্ষণ পূর্বাঞ্চলে মনোনিবেশ করায় সাম্রাজ্যের পশ্চিমাঞ্চলের ঘটনাবলির প্রতি তিনি চরম উপেক্ষা প্রদর্শন করেছিলেন। বিশ্ববিশ্রুত মুসলিম বীর সালাহুদ্দীন এ সময়ে ক্রুসেডারদের সাথে যুদ্ধে ব্যাপৃত ছিলেন। খলিফার কাছে আকুল আবেদন করেও তিনি নিতান্ত অকিঞ্চিৎকর সাহায্যপ্রাপ্ত হলেন। খলিফা নাসির মতবাদের দিক থেকে ইমামী শিয়া সম্প্রদায়ের প্রতি উদার ভাবাপন্ন ছিলেন এবং আলাবিগণকে তাঁর দরবারে ডেকে আব্বাসী ও আলাবী বংশের সমঝোতার চেষ্টা করেছিলেন। চারশত বছর পূর্বে খলিফা মামুন অনুরূপ চেষ্টা করে ব্যর্থ হয়েছিলেন। তিনি আলামুতের ঘাতক সম্প্রদায়ের সাথে রাজনৈতিক স্বার্থ সিদ্ধির উদ্দেশ্যে সমঝোতায় পৌঁছেছিলেন।

(১২১১—১২) খ্রিস্টাব্দে ঘাতক সম্প্রদায়ের প্রধান গুরু তৃতীয় হাসান খলিফার আনুগত্য স্বীকার করেছিলেন।

নাসির ফতুওয়া নামক একটি ভ্রাতৃসংঘের প্রতিষ্ঠা করেন। বহু রাজা-বাদশাহ্ ও সম্ভ্রান্ত বংশীয় লোকেরা এর মাধ্যমে খলিফাকে তাঁদের নেতা বলে স্বীকার করে নিয়েছিলেন। বিশেষ অনুষ্ঠানের মাধ্যমে ও বিশেষ পোশাক পরিধান করিয়ে নতুন সদস্যকে দীক্ষিত করা হত। এ ভ্রাতৃসংঘে নাসির অবাধে হযরত আলীর (রা) বংশধরগণকে গ্রহণ করতেন। কাজেই এ ভ্রাতৃসংঘ প্রতিষ্ঠায় খলিফার রাজনৈতিক উদ্দেশ্য সিদ্ধিই যে প্রধান উদ্দেশ্য ছিল, তা স্পষ্ট বুঝা যাচ্ছে।

সত্তর বছর বয়সে ১২২৫ খ্রিস্টাব্দে নাসিরের মৃত্যু হয়। তিনি আব্বাসীয় খলিফাদের মধ্যে সর্বাপেক্ষা দীর্ঘ সময় খিলাফতের পদে অধিষ্ঠিত ছিলেন। তাঁর ৪৭ বছরের দীর্ঘ খিলাফত দুর্যোগপূর্ণ ও সংকটবহুল ছিল। খিলাফতের গৌরব পুনঃপ্রতিষ্ঠার চেষ্টায় তিনি না-কাম হয়েছিলেন। কারণ তাঁর সামরিক শক্তি ও অর্থবল তৎকালীন অন্যান্য রাজা-বাদশাহদের তুলনায় নগণ্য ছিল। এর ফলে তাঁর উদ্দেশ্য সিদ্ধির জন্য তিনি যে কূটনীতির আশ্রয় গ্রহণ করেছিলেন, তার সফলতার সম্ভাবনা ছিল খুব কম। এ নীতি অনুসরণ করে তিনি মোঙ্গলগণকে আহ্বান করে আব্বাসীয় খিলাফতের পতনই ত্বরান্বিত করেছিলেন। তবুও তাঁর সময়ে বাগদাদে শান্তি বিরাজমান ছিল। জ্ঞানচর্চা অব্যাহত ছিল। তিনি মাদ্রাসা-মক্তব ও কুতুবখানা (লাইব্রেরি) প্রতিষ্ঠায়, দরিদ্রের প্রতি বদান্যতায় ও জনহিতকর কাজে মনোযোগী ছিলেন। তাঁর সময়ে স্থাপত্যকার্যের দুটি নির্দশন বিশেষ উল্লেখযোগ্য। তার মধ্যে একটি বাগদাদের 'তাবিজ ফটক' ও অপরটি সামাররায় প্রতিষ্ঠিত 'মাহদীর অদৃশ্য স্থান'। তাবিজ ফটকের উপরে দুটি ড্রাগনের মধ্যস্থলে খলিফার প্রতিমূর্তি রয়েছে। খলিফা তাদের চোয়াল বিযুক্ত করে জিহ্বা ধরে আছেন। সম্ভবত ড্রাগন দুটি আলামুতের প্রধান গুরু তৃতীয় হাসান ও খাওয়ারিজম শাহ্ আলাউদ্দীনকে বুঝাচ্ছে। প্রথমোক্তজন খলিফার প্রতি আনুগত্যের শপথ গ্রহণ করেছিলেন এবং শেষোক্তজন খলিফার বিরোধিতা করে অবশেষে মোঙ্গলগণ কর্তৃক বিতাড়িত হয়ে কাস্পিয়ানের একটি দ্বীপে মৃত্যুবরণ করেছেন।

গ্রন্থনির্দেশ

১. : *এনসাইক্লোপেডিয়া অব ইসলাম।*

২. পি. কে. হিট্টি : *হিস্ট্রি অব দি এরাবস্।*

৩. লেনপুল : *মোহামেডান ডায়ন্যাস্টিজ।*

৩৬

বাগদাদের পতন

সাফফাহ কর্তৃক ৭৫০ খ্রিষ্টাব্দে প্রতিষ্ঠিত খিলাফত ১২৫৮ খ্রিষ্টাব্দে দুর্ধর্ষ মোঙ্গল নেতা হালাকু খানের আক্রমণে বিধ্বস্ত হয়ে গেল। কিন্তু পাঁচশত বছরের অধিককাল স্থায়ী ও সাঁইত্রিশজন খলিফা দ্বারা শাসিত এ রাজ্যে বহুকাল পূর্বে ভাঙ্গন ধরেছিল। পূর্ববর্তী অধ্যায়সমূহে আমরা এ রাজ্যের অধোগতির কথা বিস্তারিত আলোচনা করেছি। হালাকু খানের আক্রমণ ও বাগদাদের পতন বহু শতাব্দীর অভ্যন্তরীণ দুর্বলতা ও বহুধাবিভক্ত রাজ্যের শেষ পরিণতি মাত্র। এক শতাব্দীকাল পূর্ণ শক্তিতে ও পূর্ণ গৌরবে রাজত্ব করার পর মনসুরের বংশধরগণ দুর্বল হয়ে পড়লেন। বিখ্যাত ঐতিহাসিক ও সমাজবিজ্ঞানী ইব্‌ন খলদুনের মতে, একক ব্যক্তিভিত্তিক বংশানুক্রমিক শাসন শতাব্দীর অধিককাল পূর্ণতেজে চলতে পারে না। একই বংশ হতে উদ্ভূত শাসকগণের মধ্যে বিলাস ও আরাম-আয়েশের ফলে দুর্বলতার সঞ্চার হয়। অষ্টম শতাব্দীর মাঝামাঝি আব্বাসীয় খিলাফত প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল। নবম শতাব্দীর মাঝামাঝি আমরা খলিফাগণকে সামাররায় তুর্কী সৈন্যদের হাতের ক্রীড়নক হিসেবে দেখতে পাই। দশম শতাব্দীর মাঝামাঝি শিয়া দায়লামী সম্প্রদায় বাগদাদে এসে খলিফার ওপর কর্তৃত্ব স্থাপন করল। তারা যাকে ইচ্ছা খলিফা করত, যাকে ইচ্ছা সিংহাসন হতে টেনে নামাত। ইতিমধ্যে সাম্রাজ্যের পূর্বে ও পশ্চিমে বহু স্বাধীন ও অর্ধ-স্বাধীন রাজ্যের উদ্ভব হল। এরাও পরস্পর অন্তর্দ্বন্দ্বে ও আত্মকলহে লিপ্ত ছিল এবং পরস্পরের সাথে যুদ্ধে নিজেদের শক্তি ক্ষয় করছিল। খিলাফতের এ সব অভ্যন্তরীণ দুর্বলতা এর পতনকে আসন্ন করে তুলেছিল। ১২৫৮ খ্রিষ্টাব্দের হালাকুর আক্রমণ ছিল একটি উপলক্ষ মাত্র।

বিভিন্ন স্বাধীন রাজ্যের উদ্ভব এবং তাদের মধ্যে ক্ষমতার লড়াই অভ্যন্তরীণ দুর্বলতার একটি দিক মাত্র। খলিফার সাম্রাজ্যে মুসলমান ও অমুসলমানদের মধ্যে এবং মুসলমানদের পরস্পরের মধ্যে কোন ঐক্যের বন্ধন ছিল না। যে ধর্ম বিশ্বজনীন ভ্রাতৃত্বের আদর্শ প্রচার করে জাতি ও বর্ণ নির্বিশেষে মানবীয় মর্যাদাবোধ প্রতিষ্ঠিত করতে চেয়েছিল, সেই ধর্মের অনুসারিগণ পরস্পর ঘৃণা ও বিদ্বেষে লিপ্ত হল। আরবগণ উত্তর ও দক্ষিণ এই দু শাখায় বিভক্ত হয়ে পরস্পর আত্মকলহে লিপ্ত হত। পারসিকগণ, তুর্কিগণ এবং উত্তর আফ্রিকার বার্বারগণ আরবগণের সাথে মিলিত হয়ে মুসলিম ঐক্যের বন্ধন সুদৃঢ় করতে চেষ্টা করেনি।

ইরানের প্রাচীন ধর্ম ও সংস্কৃতি যুগে যুগে বিভিন্ন বিচ্ছিন্নতাবাদী আন্দোলনের জন্ম দিয়েছিল। সিরিয়াবাসিগণ উমাইয়াদের প্রতি তাদের প্রাণের টান কখনও ভুলতে পারেনি। এসব জাতিগত ও বর্ণগত বিরোধের সাথে ধর্মীয় বিরোধ যুক্ত হয়ে ধর্মের ক্ষেত্রেও বিভিন্ন সম্প্রদায়ের সৃষ্টি করল। এদের মধ্যে শিয়া, কারমাতী, ইসমাঈলী ও এসাসিন (ঘাতক) প্রভৃতি সম্প্রদায় প্রধান। এ সব ধর্মসম্প্রদায়ের উন্মেষ, বিস্তার ও কার্যকলাপ মনোযোগ সহকারে লক্ষ্য করলে বোঝা যাবে যে, এদের অনেকেই পুরাতন জাতীয়তাবাদের পুনরুত্থান সূচিত করে কিংবা সামাজিক ও অর্থনৈতিক অসন্তোষের বহিঃপ্রকাশ বুঝায়।

সামাজিক ও নৈতিক অধোগতি আব্বাসীয় রাজবংশের পতনের অপর কারণ। খলিফাগণ অপূর্ব বিলাস-ব্যসনে ও আরাম-আয়েশে জীবন যাপন করতেন। তাঁরা তাঁদের অন্তঃপুরে অসংখ্য দাস-দাসী রাখতেন। অসংখ্য খোজা-প্রহরী অন্তঃপুর পাহারা দিত। আরব-অনারব রক্তের সংমিশ্রণে রাজশক্তি ক্রমাগত দুর্বল হয়ে পড়ল। খলিফাগণের মদ্যপান, সঙ্গীতানুরাগ ও রাজকার্যে অনাসক্তি সুযোগ সন্ধানী সামরিক নেতাদের মধ্যে ক্ষমতার দ্বন্দ্বের সৃষ্টি করল। খলিফার দরবার এ সব দ্বন্দ্বের ফলে বিভিন্ন প্রতিদ্বন্দ্বীর কলহের ক্ষেত্রে পরিণত হল। এর সাথে যুক্ত হল উত্তরাধিকারের জন্য সুনির্দিষ্ট নিয়মের অভাব। আব্বাসীয় শাসনের শেষের দিকে খলিফা প্রথমে তুর্কী সৈন্যদের পরে শিয়া দায়লামীদের এবং সর্বশেষে সুন্নী সলজুকগণের হাতের ক্রীড়নক হয়ে পড়েছিলেন।

সাম্রাজ্যের অর্থনৈতিক অবস্থাও ক্রমাগত শোচনীয় হতে থাকে। প্রদেশসমূহ স্বাধীন হয়ে যাওয়ার পর খলিফার কোষাগারে ঘাটতি দেখা দেয়। প্রাদেশিক বংশগুলির মধ্যে অনেকেরই উদ্দেশ্য ছিল জনসাধারণের কাছ থেকে যত খুশি রাজস্ব আদায় করা। নতুন নতুন রাজবংশের অভ্যুত্থানের ফলে প্রজাসাধারণের অবস্থা ক্রমাগত শোচনীয় হতে থাকে। বিভিন্ন রাজবংশের মধ্যে যুদ্ধের ফলে দেশের অর্থনৈতিক অবস্থা সম্পূর্ণ ভেঙ্গে পড়ে। তদুপরি দাজলা-ফুরাত উপত্যকা অঞ্চলে প্রায়ই বন্যা লেগেই ছিল। দুর্ভিক্ষে বহুলোক মারা যেত। বিভিন্ন প্রকারের অসুখ, ব্যাধি ও মহামারীর সম্মুখে সেই যুগের মানুষ নিতান্ত অসহায় ছিল। মুসলিম বিজয়ের প্রথম চার শতাব্দীর মধ্যে ন্যূনপক্ষে চল্লিশটি মহামারীর কথা ঐতিহাসিকগণ উল্লেখ করেন। রাজধানী বাগদাদে বছরের পর বছর ধরে বন্যা ও প্রাকৃতিক দুর্যোগের ফলে খাদ্যদ্রব্যের অগ্নিমূল্য ও জনসাধারণের শোচনীয় দুর্গতি এবং খাদ্যাভাবে মৃত্যু প্রভৃতি ঐতিহাসিকদের ঘটনাপঞ্জীতে বছরের পর বছর উল্লেখিত হতে থাকে।

এ সব রাজনৈতিক, সামাজিক, অর্থনৈতিক ও ধর্মীয় বিপর্যয়ের ফলে মুসলমানদের সৃষ্টিধর্মী প্রতিভা খর্ব ও নিস্তেজ হতে থাকে। এ জরাজীর্ণ সমাজ-ব্যবস্থা ও এ প্রাণহীন রাষ্ট্রীয়-সংস্থা বাইরে থেকে সামান্য আঘাতে চূর্ণ-বিচূর্ণ হয়ে

পড়বে, এতে কোন সন্দেহ নেই। মোঙ্গল আক্রমণ এ আধোগতির চূড়ান্ত পরিণতি মাত্র। হিট্টি বলেন, "রুগ্ন ব্যক্তি পূর্বেই মৃত্যুশয্যায় শায়িত ছিল; তখন সিঁধেল চোরেরা দরজা ভেঙ্গে ঢুকল এবং রাজকীয় উত্তরাধিকার হতে তাদের অংশটুকু ছিনিয়ে নিয়ে গেল।"

চেঙ্গিজ খানের পৌত্র হালাকুখান ১২৫৩ খ্রিষ্টাব্দে এক বিশাল মোঙ্গলবাহিনী নিয়ে মঙ্গোলিয়া হতে পুনরায় ধ্বংসযজ্ঞের উদ্দেশ্যে যাত্রা করলেন। হালাকু শেষ আব্বাসী খলিফা মুস্তাসিমকে (১২৪২—১২৫৮খ্রিঃ) ইসমাঈলী এসাসিনদের বিরুদ্ধে যুদ্ধে সহযোগিতা করার আহ্বান জানিয়ে পত্র লিখলেন। ১২৫৬ খ্রিষ্টাব্দে মোঙ্গলগণ এসাসিনদের আলামুতের প্রধান ঘাঁটি-সমেত সব পার্বত্যকেন্দ্রগুলি দখল করে এদের সন্ত্রাসজনক কার্য-কলাপের অবসান ঘটালেন। পর-বছর হালাকুখান খলিফাকে একটি চরমপত্র প্রেরণ করে বাগদাদ নগরীর বহিঃপ্রাচীর ভেঙ্গে দেবার দাবি জানালেন। ১২৫৮ খ্রিষ্টাব্দের জানুয়ারি মাসে বাগদাদ আক্রমণ করা হল। উজীর ইবনুল কামী একদল প্রতিনিধিসহ হালাকুর দর্শন প্রার্থনা করে ব্যর্থমনোরথ হলেন। মুসলমানদের মধ্যে খিলাফত সম্পর্কে যে-অন্ধ বিশ্বাস বহুকাল ধরে প্রচলিত ছিল, হালাকু খানকে তা বলা হল,—"যদি খলিফাকে হত্যা করা হয়, তা হলে সমগ্র বিশ্ব বিশৃঙ্খলায় ভরে উঠবে, সূর্য তার মুখ লুকাবে, বৃষ্টিপাত বন্ধ হবে এবং গাছপালা আর গজাবে না।" কিন্তু ধ্বংসযজ্ঞের নায়ক এতে ভীত হবার পাত্র ছিলেন না। ফেব্রুয়ারির ১০ তারিখে মোঙ্গলবাহিনী নগরীর অভ্যন্তরে প্রবেশ লাভ করল। খলিফা তাঁর তিনশত কর্মচারিসহ হালাকুর নিকট আত্মসমর্পণ করলেন। কিন্তু তাঁদেরকে নৃশংসভাবে হত্যা করা হল। নগরীতে লুঠতরাজ ও অগ্নিসংযোগ চলতে লাগল। খলিফার পরিবারবর্গসহ নগরীর অধিকাংশ জনসাধারণ ধরাপৃষ্ঠ হতে নিশ্চিহ্ন হয়ে গেল। মুসলিম জগতের ইতিহাসে এ সর্বপ্রথম এমন অবস্থার সৃষ্টি হল যে, জুমার খুৎবায় উচ্চারণের নিমিত্ত কোন খলিফাই রইলেন না। আব্বাসীয় খিলাফতের অবসানের সঙ্গে সঙ্গে খিলাফতের প্রাথমিক অধ্যায় সমাপ্ত হল।

গ্রন্থনির্দেশ

১. পি. কে. হিট্টি : *হিষ্ট্রি অব দি এরাবস্।*
২. উইলিয়াম মুর : *কলিফেট।*

৩৭

আব্বাসীয় শাসনপদ্ধতি

আব্বাসীয় খলিফাগণ যে-শাসনপদ্ধতি প্রবর্তন করেন, তা পরবর্তী যুগে বিভিন্ন মুসলিম রাষ্ট্রে আদর্শ হিসেবে গ্রহণ করা হয়। এ শাসন পদ্ধতির বিবর্তনে ইসলামের অনুশাসন, বিভিন্ন খলিফার ব্যক্তিগত চরিত্র এবং বিশেষ করে শাসনকার্যে নিযুক্ত প্রতিভাবান ব্যক্তিগণের প্রচেষ্টা কার্যকরী হয়েছিল। এ ছাড়া আব্বাসীয় যুগে অনারব মুসলমানদের মধ্য থেকে বহু রাজনৈতিক প্রতিভার আর্বিভাব ও রাষ্ট্রের গুরুত্বপূর্ণ পদে এদের নিযুক্তির ফলে বহু পারসিক ও অনারব প্রথাও আব্বাসীয় শাসনপদ্ধতির অন্তর্ভুক্ত হয়। সব কিছুর সমন্বয়ে যে শাসন ব্যবস্থা গড়ে ওঠে, তার সুদূরপ্রসারী প্রভাব আব্বাসীয় খিলাফতের পতনের পরেও বিভিন্ন দেশে মুসলিম শাসনকে প্রভাবিত করেছিল।

রাষ্ট্রের প্রধান ছিলেন খলিফা। তিনি বে-সামরিক, সামরিক ও বিচার বিভাগীয় কার্য তিনজন উচ্চপদস্থ কর্মচারীর ওপর ছেড়ে দিয়েছিলেন। এঁরা হলেন উজীর, প্রধান সেনাপতি ও কাজীউল কুজাত। খলিফার দুজন ব্যক্তিগত কর্মচারী ছিলেন। একজনের নাম হাজিব। তিনি দূত বা অন্য দর্শনার্থীদেরকে খলিফার সান্নিধ্যে হাজির করতেন। অপরজনের নাম জল্লাদ। ইনি প্রাণদণ্ডে দণ্ডিত লোকদেরকে মৃত্যুদণ্ড দিতেন। খলিফার দেহরক্ষীদের প্রধানও রাষ্ট্রে বিশেষ প্রভাবশালী ছিলেন।

খলিফার পরেই রাষ্ট্রে সর্বাপেক্ষা শক্তিশালী ব্যক্তি ছিলেন উজীর। এ পদটি পারসিক শাসনব্যবস্থা হতে গৃহীত হয়েছিল। খলিফা হারুনুর রশীদের সময়

উজীর

পারসিক বারমাকী বংশের ইয়াহিয়া সর্বপ্রথম উজীর পদে নিযুক্ত হয়েছিলেন। আল-মাওয়ারদী উজীরকে দুই শ্রেণীতে বিভক্ত করেছেন। যাঁরা সর্বক্ষমতার অধিকারী, তাঁদেরকে উজীর-তাফবীজ এবং যাঁরা সীমিত ক্ষমতার অধিকারী, তাঁদেরকে উজীর-তানফিদ বলা হত। কিন্তু এ শ্রেণীবিভাগ বাস্তবধর্মী নয়। কারণ খলিফা ও উজীরের মধ্যে কি সম্পর্ক হবে, তা কোন নিযুক্তিপত্রে নির্ধারিত করে দেয়া সম্ভব ছিল না। খলিফা শক্তিশালী

হলে উজীরের ক্ষমতা সীমিত হতে বাধ্য ছিল, কিন্তু খলিফা অমনোযোগী বা দুর্বল হলে উজীরগণ অপরিসীম ক্ষমতার অধিকারী হতে পারতেন। উজীরের প্রধান কাজ ছিল, সকল বিভাগীয় প্রধানদের কার্যের তদারক করা। এ বিভাগীয় প্রধানগণ প্রায়শ উজীর কর্তৃক নিযুক্ত হতেন। কোন কোন সময় এ বিভাগীয় প্রধানগণকেও উজীর আখ্যায়িত করা হত; কিন্তু প্রকৃতপক্ষে তাঁরা উজীর ছিলেন না।

সরকারি কার্য বিভাগ বা দীওয়ান

আব্বাসীয় শাসন বিভাগকে দীওয়ান বলা হত। এ সব দীওয়ানের মধ্যে নিম্নলিখিতগুলি প্রধান ঃ (১) দীওয়ানুল-খারাজ—রাজস্ববিভাগ, (২) দীওয়ানুল নাফাকাহ্ — ব্যয়-নির্বাহবিভাগ, (৩) দীওয়ানুল-জুনদ—সৈন্যবিভাগ, (৪) দীওয়ানুল মাওয়ারী ওয়াল গিলমান—ক্রীতদাস ও মুক্তিপ্রাপ্ত দাস-সংক্রান্ত বিভাগ, (৫) দীওয়ানুল-বির ওয়াস-সাদাকাত—বদান্যতা বিভাগ, (৬) দীওয়ানুত-তওকী —নালিশ বিভাগ, (৭) দীওয়ানুন-নাজর ফিল-মাজালিস—নালিশের বিচার বিভাগ, (৮) দীওয়ানুল-বারীদ, ওয়াল-আখবার—ডাক ও গুপ্তচরবিভাগ, (৯) দীওয়ানুশ-শুরতা—পুলিশবিভাগ, (১০) দীওয়ানুল-ফদ ওয়াল খাতাম—পত্রাদির সিলমোহর-করা ও খোলারবিভাগ, (১১) দীওয়ানুজ জিমাম বা আজিম্মা—হিসাব-পরীক্ষাবিভাগ।

দীওয়ানুল খারাজ বা রাজস্ববিভাগ

আব্বাসীয় যুগে রাজস্ব-বিভাগ খুবই গুরুত্বপূর্ণ ছিল। এ বিভাগের প্রধানকে সাহিব দীওয়ানুল খারাজ বা সাহিবুল খারাজ বলা হত। উজীরের পরে তিনিই রাষ্ট্রে সর্বাপেক্ষা উল্লেখযোগ্য ব্যক্তি। বস্তুত রাজস্ব ব্যতীত খলিফার শাসন চলতে পারত না, কাজেই উজীরের প্রধান কাজ ছিল রাজস্ব-সচিবের সহযোগিতায় রাষ্ট্রীয় তহবিল পূর্ণ করা। রাজস্ব পূর্ববর্তী উমাইয়া যুগের মত জাকাত, জিয়্য়া, খারাজ হতে সংগৃহীত হত। জাকাত মুসলমানদের জন্য অবশ্য দেয়। এটা আবাদী জমি, গৃহপালিত পশু, স্বর্ণ, রৌপ্য এবং পণ্য-দ্রব্যের ওপর ধার্য হত। এ উপায়ে সংগৃহীত অর্থ মুসলমানদের মধ্যে দরিদ্র, ইয়াতীম, নিরাশ্রয় ও ধর্মযুদ্ধে যোগদানকারী স্বেচ্ছা-সেবকদের জন্য ব্যয়িত হত। মুসলমান দাস-দাসী ও যুদ্ধবন্দীদের মুক্তির জন্যও এ অর্থ ব্যয় করা হত। অমুসলমানদের কাছ থেকে

জিয্য়া ও ভূমি-রাজস্ব আদায় করা হত। এছাড়া যুদ্ধবিরতির শর্ত হিসেবে এককালীন অর্থও আদায় করা হত। তবে ভূমি-রাজস্বই (খারাজ) ছিল আয়ের অন্যতম প্রধান উৎস।

ভূমি রাজস্ব প্রধানত তিন পদ্ধতিতে সংগৃহীত হত। এদের নাম মুকাতামা, মিসাহা ও মুকাসামা। মুকাতামা বড় বড় জমার ক্ষেত্রে জমিদার বা তৎসমতুল্য জোতদারগণের কাছ থেকে গৃহীত রাজস্বের নাম। মিসাহা প্রকৃত চাষকৃত জমির ওপর মাপের পদ্ধতিতে গৃহীত রাজস্বের নাম। মুকাসামা প্রকৃত চাষকৃত জমির ওপর ফসলের অংশবিশেষ (যেমন $\frac{১}{৪}$, $\frac{১}{৩}$ বা $\frac{১}{২}$) হিসেবে ধার্য কর। এটা ফসল মাড়াইয়ের সময় ফসলের সাহায্যে কিংবা ফসলের মূল্য দ্বারা পরিশোধ্য ছিল।

আব্বাসীয় যুগের প্রথম দিকে শিল্প ও বাণিজ্যের প্রসারের ফলে রাজস্ব আদায়ের নতুন নতুন কর চালু হয়। এ সব কর অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে নতুন বলে এদেরকে ধর্মানুমোদিত মনে করা হত না। তাই এ সব করকে ধর্মীয় ভাষায় মুকুস বা বে-আইনী কর বলে ধরা হত। খলিফাদের একাধিক অনুশাসনে এ সব করকে বে-আইনী বলে ঘোষণা করা হলেও রাষ্ট্রীয় করের তালিকায় এ সব করের পুনরাবৃত্তি এ-কথাই প্রমাণিত করে যে, ব্যবহারিক জীবনে এ সব কর সব সময় আদায় করা হত এবং ভূমি-রাজস্বের পর এ জাতীয় কর হতে আদায়কৃত অর্থের পরিমাণই খুব বেশি ছিল। এ সব করের মধ্যে সর্বপ্রধান ছিল অভ্যন্তরীণ ও বহির্বাণিজ্যের ওপর ধার্য শুল্ক। এ শুল্কের নাম ছিল 'মাআসির'। এ নামের উৎপত্তি শিকল বা রজ্জু হতে। নদীতে নৌকা ইত্যাদি যাতে কর ফাঁকি দিয়ে পার হয়ে যেতে না পারে, তজ্জন্য স্থানবিশেষে এগুলিকে আগলিয়ে রাখার জন্য যে-শিকল বা রজ্জু ব্যবহার করা হত, তার নাম মা'সার। পরে এ করকেই এ নাম দেয়া হয়েছে। এ ধরনের আর একটি করের নাম ছিল জলকর। নদীর যে-কোন রকমের ব্যবহারের জন্য এ কর ধার্য করা হত। দোকান বা ঘর-বাড়ির ওপর যে-কর ধার্য হত, তার নাম ছিল মুস্তাগাল্লাত। বিভিন্ন শিল্পজাত দ্রব্যের ওপর আবগারী শুল্ক ধার্য হত। বিক্রিত দ্রব্যের ওপর বিশেষত কাপড়ের ওপর বিক্রয় কর বসান হত। বিভিন্ন খনির ওপর এবং বনের ওপরও কর বসান হত। মালুল-জাহবাজা নামক এক প্রকার অতিরিক্ত কর রাজস্ব আদায়ের খরচ কিংবা অপূর্ণ অথবা ভাঙ্গাচোরা মুদ্রার সাহায্যে রাজস্ব দেয়ার সময় ক্ষতি-পূরণ বাবদ গৃহীত হত। এ সব নিয়মিত কর ছাড়া রাষ্ট্রের অনিয়মিত আয়ের মধ্যে প্রধান ছিল

মৃতলোকের পরিত্যক্ত লাওয়ারিশ সম্পত্তি এবং উজীর ও অন্যান্য উচ্চপদস্থ সরকারি কর্মচারির মৃত্যুর পর তাঁদের বাজেয়াপ্তকৃত সম্পত্তি। এ সব কর্মচারির পদচ্যুতির পর তাঁদের সম্পত্তি প্রায়শ বাজেয়াপ্ত করা হত। প্রয়োজনবোধে ধনাঢ্য ব্যক্তিগণের কাছ থেকে জোরপূর্বক অর্থ আদায় করা হত। শান্তিভঙ্গের জন্য কোন বিশেষ এলাকার ওপর পাইকারী জরিমানা ধার্যের দৃষ্টান্তও এ যুগে দেখা যায়। আব্বাসীয় যুগের বিভিন্ন সময়ে সমগ্র সাম্রাজ্যের মোট রাজস্বের একটি তালিকা পাদটীকায় দেয়া হল।*

রাষ্ট্রের আয়ের সম্বন্ধে যেমন মোটামুটি ধারণা করা যায়, ব্যয় সম্বন্ধে তেমন ধারণা করা সম্ভব নয়। বিশেষ বিশেষ উৎসব অথবা অনুষ্ঠান উপলক্ষে খলিফা, তাঁর উচ্চপদস্থ কর্মচারী কিংবা অন্যান্য শাসকগণের বদান্যতার বহু দৃষ্টান্ত ঐতিহাসিকগণের বর্ণনায় পাওয়া যায়। বিবাহ-শাদী উপলক্ষেও বিপুল অর্থ ব্যয়িত হত। দরবারের শান-শওকতে, দালান-কোঠা নির্মাণে ও আসবাবপত্র এবং সাজ-সজ্জায় বহু অর্থ খরচ হত। বাইজান্টাইনদের সাথে যুদ্ধে ও বিদ্রোহ দমনে প্রচুর টাকা-পয়সা ব্যয় করা হত। আব্বাসীয়গণের শাসন-বিভাগ ও এদের কর্মচারির সংখ্যা ছিল বিপুল। এ সব কাজেও অনেক অর্থের প্রয়োজন হত, এতে কোন সন্দেহ নেই। এতদসত্ত্বেও প্রাথমিক যুগের খলিফাগণ মৃত্যুর সময় রাজকোষে প্রচুর অর্থ জমা রেখে যেতে পারতেন। মনসুরের মৃত্যুর সময় রাজকোষে ৬০,০০,০০,০০০ দিরহাম এবং ১,৪০,০০,০০০ দীনার ছিল; হারুনুর রশীদের তহবিলে ৯০,০০,০০,০০০ দিরহাম পাওয়া যায় এবং মুকতাফীর মৃত্যুর সময় (৯০৮ খ্রিঃ) এ সংখ্যা ছিল ১০,০০,০০,০০০ দীনার।

অন্যান্য শাসন বিভাগের মধ্যে নালিশের বিচার-বিভাগ (নজর ফিল মাজালিম), পুলিশ-বিভাগ (দীওয়ানুশ-শুরতা), ডাক ও গুপ্তচর-বিভাগ (দীওয়ানুল

* শাসকের নাম অথবা সময়	মোট রাজস্ব
হারুনুর রশীদ	৫৩০,৩১২,০০০ দিরহাম (ক্রেমার)।
মামুন	৩৩১.৯২৯,০০৮ দিরহাম (ইবনখলদুন)।
মুতাসিম	৩৮৮,২৯১,৩৫০ দিরহাম (কুদামা)।
মুকতাদির	১৪,৫০১,৯০৪ দীনার (ক্রেমার)।
৯১০ খ্রিঃ — ৯৬৩ খ্রিঃ	২৯০,০৩৮,০৮০ দিরহাম
	২৯৯,২৬৫,৩৪০ দিরহাম (ইবনখুরদাজবিহ)।
বুওয়াইহী আদুদুদ্দৌলা	৩৬০,০০০,০০০ দিরহাম (ইবনুল-জওজী)।

বারীদ ওয়াল আখবার) এবং বিচার-বিভাগ প্রধান। 'নজর-ফিল-মাজালিম' সরকারি কর্মচারিদের বিরুদ্ধে খলিফার কাছে সরাসরি নালিশের ভিত্তিতে এ সব

অভিযোগ-বিভাগ

বিষয়ে খলিফার রায় প্রদানের নাম। উমাইয়া খলিফা আবদুল মালিক প্রজাসাধারণের নালিশ শুনবার জন্য নির্দিষ্ট দিনে দরবারে বসতেন। খলিফা দ্বিতীয় উমরও এ রীতি চালু রেখেছিলেন। আব্বাসীয় খলিফাদের মধ্যে মাহদী প্রথম এ প্রথা চালু করেন। হাদী, হারুন ও মামুন এ রীতি অনুসারে জনসাধারণের কাছ থেকে অভিযোগ শ্রবণ করতেন। খলিফা মুহতাদীর সময় (৮৬৯—৭০ খ্রিঃ) পর্যন্ত এ প্রথা চালু ছিল। নরম্যান রাজা দ্বিতীয় রগার (Roger) সিসিলিতে এ প্রথা প্রবর্তনের পর এটা ইউরোপে প্রসার লাভ করে।

পুলিশের কর্তাকে সাহিবুশ-শুরতা বলা হত। প্রত্যেক শহরেই পুলিশবাহিনী থাকত। পুলিশের প্রধানগণ রাজ্যে বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করতেন।

পুলিশ-বিভাগ

আইন-শৃঙ্খলা রক্ষায় তাঁর দায়িত্ব ছিল অপরিসীম। ধর্মীয় বিধি-নিষেধ, যথা—জুয়াখেলা, সুদ গ্রহণ, মদ্যপান ইত্যাদি নিষিদ্ধ কাজ থেকে লোকজনকে বিরত রাখা, বাজারে সঠিক ওজন বলবৎ করা প্রভৃতি কাজের ভারপ্রাপ্ত অন্য বিশেষ পুলিশের নাম ছিল মুহতাসিব। জনসাধারণের নৈতিক মান উঁচু রাখা ও গর্হিত কাজ বারণ করা তাঁর প্রধান কাজ। আব্বাসীয় যুগে ডাক বিভাগের প্রভূত উন্নতি সাধিত হয়।

ডাক-বিভাগ

এ বিভাগের প্রধানকে সাহিবুলবারীদ বলা হত। উমাইয়া যুগে মু'আবিয়া এবং আবদুল মালিক ডাক বিভাগের বুনিয়াদ কায়েম করেন। আব্বাসীয় খলিফাদের মধ্যে হারুনুর-রশীদ ডাক-বিভাগের সম্প্রসারণ করেন। রাজধানীকে সাম্রাজ্যের বিভিন্ন শহরের সাথে রাস্তা-ঘাটের সাহায্যে সংযুক্ত করে দেয়া হত। এ সব পথে ঘোড়া, গাধা ও খচ্চর অদল-বদল করে ডাক আদান-প্রদানের ব্যবস্থা করা হত। পারস্যে গাধা ও ঘোড়ার প্রচলন ছিল বেশি, আর সিরিয়ায় ও আরবদেশে উটের সাহায্যে ডাক আনা-নেয়া হত। সরকারি কাজেই ডাক-বিভাগের ব্যবহার বেশি হত; তবে সাধারণ লোকেরাও চিঠিপত্র এবং অন্যান্য জিনিসপত্র পাঠাবার জন্য মাশুল দিয়ে সীমিতভাবে এ বিভাগের সুযোগ-সুবিধা ভোগ করতে পারত।

চিঠিপত্র আদান-প্রদানের জন্য পোষমানা কবুতরের ব্যবহার এ যুগে জানা ছিল। নাস্তিক বাবকের পরাজয় ও বন্দী হওয়ার সংবাদ বাগদাদে খলিফা মুতাসিমের নিকট কবুতরের সাহায্যে প্রেরণ করা হয়।

আব্বাসীয় যুগে বাগদাদে ডাক-বিভাগের সদর দফতরে সাম্রাজ্যের বিভিন্ন অঞ্চলে রাস্তা-ঘাট, যাত্রীদের সুবিধার জন্য স্থাপিত স্টেশন ও দুই স্টেশনের মধ্যকার দূরত্ব ইত্যাদি বিষয়ে প্রামাণ্য বিবরণ রেখে দেয়া হত। এ সব বিবরণীর দ্বারা পথচারী, সওদাগর ও তীর্থযাত্রীদের বিশেষ উপকার হত। এ সব বিবরণের ওপর ভিত্তি করে ভৌগোলিকগণ অনেক পুস্তক রচনা করে গিয়েছেন। 'আল-মাসালিক ওয়াল মামালিক' নামক গ্রন্থ রচয়িতা ইবন খুরদাজবিহ্ একজন পোস্ট-মাস্টার (সাহিবুল-বারীদ) ছিলেন এবং সরকারি রিপোর্টের ওপর ভিত্তি করে তাঁর পুস্তক প্রণয়ন করেছিলেন। এ সব পুস্তক হতে তদানীন্তন আব্বাসীয় সাম্রাজ্যের প্রধান প্রধান পথ-ঘাটের সম্বন্ধে ধারণা করা যায়। সর্বাপেক্ষা উল্লেখযোগ্য পথ ছিল খুরাসান পথ। এ পথ বাগদাদ হতে হামাদান, রায়, নিশাপুর, তুস, মার্ভ, বুখারা, সমরকন্দ হয়ে চীনের সীমান্ত পর্যন্ত চলে গিয়েছিল। এ রাজপথের ওপর অবস্থিত প্রধান প্রধান শহর ও নগর হতে উত্তরে ও দক্ষিণে বহু শাখাপথ চলে গিয়েছিল। আর একটি প্রধান পথ বাগদাদ হতে দাজলার তীর ধরে দক্ষিণ-পূর্ব দিকে অগ্রসর হয়ে ওয়াসিত, বসরা ও খুজিস্তানের মধ্য দিয়ে শিরাজে চলে গিয়েছে। এ রাজপথ হতে বহু শাখা পশ্চিমে ও পূর্বে চলে গিয়েছে। এ সব পথে তীর্থযাত্রী ও বাণিজ্য কাফেলা যাতায়াত করত। তীর্থযাত্রীদের জন্য ও পথচারী মুসাফিরদের জন্য রাস্তার পার্শ্বে বহু সরাইখানা, পানির ফোয়ারা ও কূপের বন্দোবস্ত করে দেয়া হত। তৃতীয় প্রধান রাজপথ বাগদাদকে উত্তর-পশ্চিমের শহর মসুর, আমিদ এবং অন্যান্য সীমান্তবর্তী এলাকার সাথে সংযুক্ত করেছিল। বাগদাদ হতে আর একটি রাজপথ পশ্চিমে আনবার ও রাক্কা হয়ে দামিস্ক পর্যন্ত চলে গিয়েছে।

ডাকব্যবস্থার তত্ত্বাবধান ছাড়াও প্রধান পোস্ট-মাস্টারের আর একটি গুরুত্বপূর্ণ কর্তব্য ছিল। তিনি গুপ্তচর বিভাগেরও প্রধান ছিলেন। প্রাদেশিক পোস্ট-মাস্টারগণ হয় তাঁর নিকট কিংবা খলিফার নিকট সরাসরি স্থানীয় সরকারি কর্মচারিদের কাজ-কর্ম ও আচার-ব্যবহার সম্পর্কে রিপোর্ট দাখিল করতেন। এঁরা গভর্নরের আচার-ব্যবহার সম্পর্কেও রিপোর্ট পাঠাতেন। গুপ্তচর-বৃত্তির জন্য সওদাগর, ফেরিওয়ালা কিংবা ভ্রমণকারীর বেশে লোক নিযুক্ত করা হত। মামুনের গোয়েন্দা-বিভাগে বহু বর্ষিয়সী রমণী কাজ করতেন।

মুসলিম রাজ্যে ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠা একটি ধর্মীয় কর্তব্য বলে বিবেচিত হত। এজন্য খলিফা ফকীহ্ (আইনজ্ঞ) শ্রেণীর লোকদের মধ্য থেকে কাজী নিযুক্ত করতেন। এ বিভাগের প্রধানকে কাজীউল-কুজাত বলা হত। বিখ্যাত আইনজ্ঞ ইমাম আবু ইউসুফ সর্বপ্রথম কাজীউল কুজাত

বিচার-বিভাগ

উপাধিপ্রাপ্ত হন। তিনি মাহ্দী ও তাঁর দুই পুত্র হাদী ও হারুনের সময় উক্ত পদ অলংকৃত করেন। কাজীর যোগ্যতা ও গুণাবলির মধ্যে কুরআন ও সুন্নার জ্ঞান, ইজমা অর্থাৎ সাধারণ সম্মতির অবগতি এবং ব্যক্তিগত ব্যাখ্যার যোগ্যতার (ইজতিহাদ) ওপর বিশেষ জোর দেয়া হয়েছে। এতদ্ব্যতীত কাজীকে পুরুষ, প্রাপ্তবয়স্ক, সুস্থ-মস্তিষ্ক, স্বাধীন (গোলাম নয়), মুসলমান চরিত্রবান, দৃষ্টি ও শ্রবণ শক্তিসম্পন্ন হতে হবে। অমুসলমানগণ সাধারণত তাদের ধর্মীয় গুরু বা ধর্মীয় সংস্থার আওতাধীন ছিল। আল-মাওয়ারদী দুই প্রকার বিচারকের মধ্যে পার্থক্য করেছেন—সাধারণ ও ব্যাপক ক্ষমতাপ্রাপ্ত (কাজী মতলক) এবং বিশেষ ও নির্ধারিত কার্যে নিযুক্ত কাজী (কাজী খাস)। প্রথম শ্রেণীর কাজিগণের কর্তব্যের মধ্যে বিরোধ নিষ্পত্তি, ধর্মীয় বিধিনিষেধ লংঘনের জন্য শাস্তি বিধান (হুদুদ), দাতব্য প্রতিষ্ঠানসমূহের তত্ত্বাবধান, মৃতের উইল ইত্যাদি যথাযথ প্রতিপালনের ব্যবস্থা, ইয়াতীম, নাবালক ও অন্যান্য অসহায়দের তত্ত্বাবধান ইত্যাদি প্রধান। কাজিগণ তাঁদের কার্য নির্বাহের জন্য নায়েব (সহকারি) নিযুক্ত করতে পারতেন। এ ছাড়া তাঁর একজন কাতিব (দবীর), হাজিব এবং একজন খাজিন (কোষাধ্যক্ষ) থাকত। এঁরা সকলেই সরকারি বেতনভুক ছিলেন। এ যুগের ফকীহ্দের মধ্যে সরকারের অধীনে কাজী পদে নিযুক্ত হওয়ার বিরুদ্ধে একটি সাধারণ অনিচ্ছা দেখা যায়। অধিকাংশ ফকীহ কাজী হতে চাইতেন না। যদিও-বা কেউ অনেক অনুরোধ-উপরোধের পর রাজি হতেন, তবে তিনি এই শর্তে রাজি হতেন যে, তিনি সরকারি তহবিল থেকে কোন বেতন গ্রহণ করবেন না এবং তাঁকে কোন শরীয়ত বিরোধী কাজ করতে বাধ্য করা হবে না। এদের কেউ কেউ খেলাতাদি (উপঢৌকন, পোশাক ইত্যাদি) গ্রহণ করতেও পরাঙ্মুখ ছিলেন।

আব্বাসীয় যুগে খলিফাদের দেহরক্ষী-বাহিনী খুব শক্তিশালী ছিল। এরা প্রথমে খুরাসানী, পরে তুর্কী ও দায়লমী ছিল। দেহরক্ষীর প্রধান খুব ক্ষমতাশালী

সৈন্যবিভাগ

ছিলেন। সৈন্যবাহিনী দুই প্রকারের ছিল। যারা নিয়মিত চাকরিতে ছিল এবং সরকারি তহবিল থেকে বেতনপ্রাপ্ত হত, তাদেরকে বলা হত 'মুরতাজিকা'। আর যারা যুদ্ধের সময় সৈন্য-বিভাগে যোগদান করত এবং রেশন ও ভাতাপ্রাপ্ত হত, তাদেরকে বলা হত 'মুতাতাওইয়া' অর্থাৎ স্বেচ্ছাবাহিনী। দেহরক্ষীবাহিনী ভাল বেতন পেত এবং উত্তম সাজে সজ্জিত থাকত। আব্বাসীয় যুগের প্রথমদিকে একজন পদাতিকের বেতন ছিল বাৎসরিক ৯৬০ দিরহাম। এ ছাড়া সে রেশন ও অন্যান্য ভাতা পেত। অশ্বারোহী সৈন্য পদাতিকের দ্বিগুণ বেতন পেত। খলিফা মামুনের সময় ইরাকের সৈন্যবাহিনীর সংখ্যা ছিল ১,২৫,০০০। সৈনিকদের বেতন অন্য লোকের বেতনের তুলনায় খুব

বেশিই ছিল। দৃষ্টান্তরূপে বলা যায় যে, মনসুরের সময় একজন ভাল রাজমিস্ত্রীর বেতন ছিল দৈনিক এক দিরহাম এবং একজন শ্রমিকের বেতন ছিল মাত্র $\frac{১}{৩}$ দিরহাম।

নিয়মিত সেনাবাহিনীর মধ্যে পদাতিক (হারবিয়া), ধানুকী (রামিয়া) এবং অশ্বারোহী (ফুরসান) এ তিন প্রকার সৈন্য ছিল। পদাতিকগণ বর্শা, ঢাল ও তরবারি দ্বারা সজ্জিত ছিল। ধানুকিগণ ঢাল-তরবারির সাথে তীর-ধনুক রাখত। অশ্বারোহিগণ শিরস্ত্রাণ ও উরস্ত্রাণ পরিহিত থাকত এবং দীর্ঘ বর্শা ও সমর-কুঠার রাখত। ধানুকীদের সাথে অদাহ্য পোশাক পরিহিত একদল নেপথা-নিক্ষেপক (নাফফাতুন) থাকত। এরা শত্রুদের প্রতি নেপথা বা অগ্নিগোলা নিক্ষেপ করত। অবরোধ যন্ত্রপাতিসহ (যেমন মানজানিক) একদল ইঞ্জিনিয়ারও সেনাবাহিনীর সাথে যুদ্ধক্ষেত্রে গমন করত। এমন একজন বিখ্যাত ইঞ্জিনিয়ারের নাম ইয়াকুব ইবন সাবির আল-মানজানিকী। তিনি খলিফা আন-নাসিরের সময়কার ছিলেন। নিয়মিত সেনাদলে কর্মজীবন আরম্ভ করে তিনি পরে ইঞ্জিনীয়ারদের প্রধান হয়েছিলেন। যুদ্ধ-কৌশল সম্পর্কিত 'উমদাতুল মাসালিক' নামক একখানি পুস্তকের লেখক হিসেবে তাঁর যথেষ্ট খ্যাতি রয়েছে। এ পুস্তকে যুদ্ধের শ্রেণীবিন্যাস, দুর্গ দখল, দুর্গ নির্মাণ, অশ্বারোহণ কৌশল, কারিগরি বিদ্যা, দুর্গ অবরোধ, অশ্বের কুচকাওয়াজ, অস্ত্রশস্ত্রের ব্যবস্থা, সামরিক কলকব্জা প্রস্তুত, সম্মুখ যুদ্ধ, বিভিন্ন প্রকারের অশ্ব ও অশ্বারোহীর গুণাবলি প্রভৃতি বিষয় আলোচিত হয়েছে।

যুদ্ধক্ষেত্রে সেনাবাহিনীর সাথে একদল ডাক্তার এবং প্রয়োজনীয় ওষুধপত্রসহ একটি হাসপাতাল থাকত। এ হাসপাতালের সাথে উষ্ট্র-পৃষ্ঠে স্থাপিত শিবিকার আকৃতি এ্যাম্বুল্যান্সও থাকত। হারুনুর রশীদের সময় যুদ্ধক্ষেত্রে এ সব ব্যবস্থার প্রবর্তন করা হয়। তাঁর ও তাঁর পুত্র মামুনের সময় হাসপাতালের সাজ-সরঞ্জাম, যথা তাঁবু ইত্যাদি এবং ওষুধপত্র ও অন্যান্য প্রয়োজনীয় দ্রব্যসামগ্রী বহনের জন্য বহু উট ও খচ্চরের প্রয়োজন হত। এ প্রথা খিলাফতের পতনের যুগেও চালু থাকে এবং সেলজুক সুলতান মাহমুদের সময়ও হাসপাতালের জন্য ৪০টি উটের বোঝাই মালপত্রের প্রয়োজন হত। রাজকীয় সেনাবাহিনী ও দেহরক্ষীদল ছাড়া আরও এক প্রকার সেনাদলের কথা জানা যায়। এরা ছিল ভৃত্যের পর্যায়ভুক্ত এবং ক্রীতদাসগণের মধ্য থেকে অল্পবয়স্ক বালকদেরকে সুশিক্ষা দান করে এদেরকে

প্রাসাদে রেখে দেয়া হত। এরা 'সিবয়ানুদ্দার' বা 'গিলমানুদ্দার' নামে অভিহিত হত।

সেনাবাহিনীর বিভিন্ন স্তরবিন্যাস সম্পর্কে সব সময় একরকম নিয়ম প্রচলিত ছিল না। মাসউদীর মতে, দশজন লোকের ওপর একজন আরিফ, একশতজন লোকের ওপর একজন নকীব এবং দশজন নকীবের ওপর অর্থাৎ এক হাজার লোকের এক দলের ওপর একজন ফায়িদ থাকত। দশ হাজার লোকের একদল সেনাবাহিনী একজন আমীর দ্বারা পরিচালিত হত। সেনাবাহিনীর প্রধানকে রঈসুল- জায়শ, সাহিবুল-জায়শ কিংবা পরবর্তী যুগে ইসপাহসালার (সিপাহসালার) বলা হত।

সৈন্যদল গতানুগতিক পাঁচটি দলে বিভক্ত হয়ে যুদ্ধ করত—অগ্র, পশ্চাৎ, কেন্দ্র, ডান ও বাম। আরব সৈন্যদের যুদ্ধযাত্রার দৃশ্য দর্শককে বিস্ময়ে অভিভূত ও ভয়ে বিমূঢ় করে তুলত। সম্মুখভাগে অশ্বারোহীদল দ্রুত গমন করত, উভয় পার্শ্বে তীরন্দাজ বাহিনী তাদেরকে রক্ষা করে চলত। এরা ঘোড়ার সঙ্গে তাল রেখে দৌড়াতে পারত। পশ্চাতে অগণিত সংখ্যায় অপূর্ব নিয়ম-শৃঙ্খলার সাথে পদাতিকবাহিনী গমন করত। এদেরই মধ্যস্থলে খাদ্য, তাঁবু ও অস্ত্রশস্ত্র নিয়ে উটের সারি চলে যেত। পশ্চাভাগে চলত অগণিত উট, খচ্চর ও অশ্ব, এ্যাম্বুল্যান্স, ক্ষেপণাস্ত্র, প্রস্তর-নিক্ষেপক-অস্ত্র প্রভৃতি যন্ত্রপাতি ও মাল-মাত্তা নিয়ে। খলিফা অথবা শাহজাদাগণ যুদ্ধাভিযানে গমন করলে জাঁকজমক আরও বেড়ে যেত। দেহরক্ষীদের জমকাল ইউনিফরম, স্বর্ণখচিত রাজকীয় পতাকা, সেনাপতি ও সৈন্যাধ্যক্ষগণের জাঁকজমকপূর্ণ পরিচ্ছদ নয়নাভিরাম ও চিত্তাকর্ষক হত। অগ্রগামী সেনাদল নির্দিষ্ট স্থানে পৌছবামাত্র পরিখা খনন করে অতর্কিত আক্রমণের বিরুদ্ধে সতর্কতা অবলম্বন করত। এর পর মূল সৈন্যদল পৌছলে তাঁবুগুলিকে এমন সুবিন্যস্তভাবে সংস্থাপন করা হত, যেন সচরাচর শহরের মত রাস্তাঘাট, হাট-বাজার ও প্রাঙ্গণ থাকে। সমস্ত কাজ নিয়ম-শৃঙ্খলার সাথে সমাধা হত। তারপর রসদ বিতরণ করা হত, শিবিরাগ্নি প্রজ্জ্বলিত করা হত, উনুনে পাত্র চড়িয়ে দেয়া হত এবং সান্ধ্যভোজনের পর এশার নামাজ পাঠান্তে সৈন্যগণ চক্রাকারে সজ্জিত হয়ে যুদ্ধ বা দুঃসাহসিক অভিযানের গল্প শুনত কিংবা বীণা ও বাঁশীর সাথে গীত বা কবিতা পাঠ শ্রবণ করত।

শত্রুর মুকাবিলা করবার সময় পদাতিক সেনাবাহিনী বর্গক্ষেত্র গঠন করত এবং তাদের বর্শাফলক সম্মুখে বাঁকিয়ে মাটিতে প্রোথিত করত। তারপর হাঁটু গেড়ে মাটিতে ঢাল নামিয়ে শত্রুর মুকাবিলার জন্য প্রস্তুত থাকত। পদাতিকগণের

অব্যাবহিত পিছনেই ধনুর্ধর ও তীরান্দাজগণ থাকত। এদের উভয় পার্শ্বে অশ্বারোহীরা থাকত। শত্রুর আগমনের সঙ্গে সঙ্গে তীরন্দাজগণ ঝাঁকে ঝাঁকে অজস্রধারায় তীর নিক্ষেপ করত। পদাতিক দল তাদের স্বস্থানে থেকে বর্শার ব্যবহার করত। যুগপৎ অশ্বারোহীরা সম্মুখে অগ্রসর হয়ে শত্রুদেরকে আক্রমণ করত। যেই মুহূর্তে শত্রুগণ পশ্চাদপসরণের কোন নমুনা দেখাত, তৎক্ষণাৎ মূল বাহিনী কিংবা কোন বাহিনী সংরক্ষিত থাকলে তার সাহায্যে প্রচণ্ড আক্রমণ করা হত। শত্রু সৈন্যকে অনুসরণ করে বহুদূর যেতে হলে অশ্বারোহী বাহিনী এবং তীরন্দাজদের মধ্যে যারা অশ্বারোহী ছিল, তারাই এ কাজ সমাধা করত।

আরবগণের শ্রেষ্ঠত্ব শুধু যে কেবল তাদের উন্নত কলা-কৌশলের মধ্যেই নিহিত ছিল, তা নয়; আরবগণ অপেক্ষাকৃত দ্রুতবেগে স্থানান্তর গমন করতে পারত। গ্রীক বাহিনী খচ্চর, গাধা অথবা ঘোড়ার সাহায্যে মালপত্র টানত, কিন্তু আরবগণ এ উদ্দেশ্যে উটের ব্যবহার করত। সৈন্য, খাদ্যদ্রব্য, লটবহর ও যুদ্ধাস্ত্র উটের পিঠে দিয়ে আরবগণ অতি অল্প সময়ে একস্থান থেকে অন্য স্থানে গমন করত। পার্বত্য যুদ্ধেও আরবগণ পটু ছিল। বাবকের বিরুদ্ধে পরিচালিত যুদ্ধে আব্বাসীয় বাহিনী দক্ষতা ও নিপুণতার পরিচয় দেয়। অবরোধের অস্ত্রশস্ত্রের মধ্যে ছিল শর-নিক্ষেপক যন্ত্র, প্রস্তর নিক্ষেপক মানজানিক ও প্রাচীর ভাঙ্গবার দাব্বাবা।

প্রাথমিক যুগে আরব নৌ-বহর রাজ্য জয়ে উল্লেখযোগ্য ভূমিকা গ্রহণ করলেও আব্বাসীয়দের সময় নৌবহর অপেক্ষাকৃত কম গুরুত্বপূর্ণ ছিল। নৌবাহিনী ভূমধ্যসাগরের তীরবর্তী স্বাধীন মুসলিম রাজ্যগুলির একচেটিয়া হয়ে পড়ে। স্পেনের উমাইয়াগণ ও মিসরের ফাতিমী শাসকগণ উন্নতমানের নৌবাহিনীর অধিকারী ছিলেন। পাঁচ রকমের যুদ্ধ জাহাজের নাম এ যুগে বিশেষ প্রসিদ্ধি লাভ করে, যথা—(১) আশশুনা—বড় যুদ্ধ জাহাজ—এতে করে অস্ত্রশস্ত্র বহন করা যেত, (২) হাররাকা—এতে ন্যাপথা ও অন্যান্য বিস্ফোরক দ্রব্য বহন করা হত, (৩) তাবরাদা—ক্ষিপ্রগতি ছোট নৌকা, (৪) ইশারিয়াৎ ও (৫) সালান্দাৎ। নৌবাহিনীর প্রধানকে আমীরুল বাহর বলা হত। এ নাম থেকেই এ্যাডমিরাল (Admiral) শব্দের উৎপত্তি হয়েছে।

খলিফা মুকতাদিরের সময় আব্বাসীয়গণের সামরিক শক্তি হ্রাস পেতে থাকে। এ সময় থেকে সৈন্যগণ রাজকীয় কোষাগার থেকে সরাসরি বেতন পেত না। তারা প্রাদেশিক শাসনকর্তা অথবা আঞ্চলিক সৈন্যাধ্যক্ষের কাছে থেকে বেতন প্রাপ্ত হত। এ উদ্দেশ্যে উচ্চপদস্থ কর্মচারিগণকে জায়গীর হিসেবে বিভিন্ন অঞ্চল প্রদান করা হত। এ সময় কতকগুলি প্রদেশ থেকে কোন রাজস্ব আদায়

হত না। কোন কোন প্রদেশ থেকে পূর্ববর্তী রাজস্বের অংশ বিশেষ মাত্র আদায় হত। মুকতাদির তাঁর সভাসদগণকে এই শর্তে বিভিন্ন প্রদেশের শাসনভার প্রদান করলেন যে, তাঁরা যেন নিজ দায়িত্বে রাজস্ব আদায় করে যাবতীয় ব্যয় নির্বাহ করেন ও সৈন্যদের বেতন দান করেন এবং পরিশেষে একটি নির্দিষ্ট অঙ্ক বাগদাদে প্রেরণ করেন। এ প্রথা ইকতা (জায়গীর) নামে অভিহিত হয়। বুওয়াইহী আমীরগণ সৈন্যদেরকে বেতনের পরিবর্তে জায়গীর দানের প্রথা ব্যাপকভাবে চালু করেন। এ জায়গীর প্রথা সলজুকদের আমলে নিয়মিত প্রথা হিসেবে প্রবর্তিত হয়। এ সময় হতে গভর্নর ও সৈন্যাধ্যক্ষগণ শহর, অঞ্চল ও প্রদেশ পর্যন্ত জায়গীর হিসেবে শাসন করতে থাকেন। এঁরা প্রকৃত প্রস্তাবে স্বাধীনভাবে আপন আপন এলাকা শাসন করতে থাকেন। এ সামন্ত রাজগণ নির্দিষ্টহারে বাৎসরিক সুলতানকে কর দান করতেন এবং যুদ্ধের সময় নির্দিষ্ট সংখ্যক সৈন্য নিয়ে সুলতানের পতাকার নিচে যুদ্ধযাত্রা করতেন। এ সব সৈন্যের সাজ-সরঞ্জাম ও ভরণপোষণের সম্পূর্ণ দায়িত্ব তাঁদের ছিল।

প্রাদেশিক শাসন ঃ গভর্নর

উমাইয়া খলিফাদের সময় প্রাদেশিক বিভাগগুলি যেমন ছিল, আব্বাসীয়দের সময় তার বিশেষ কোন পরিবর্তন হয়নি। আব্বাসীয়গণের সময় প্রদেশের সীমানা মাঝে মাঝে কিছু কিছু রদবদল হত এবং ভৌগোলিকগণ কর্তৃক বর্ণিত নামের তালিকার সাথে রাজনৈতিক এলাকাগুলির হুবহু মিল সব সময় ছিল না বলে মনে হয়। তবে প্রাথমিক যুগের প্রদেশ বিভাগগুলির নাম মোটামুটি নিম্নরূপ ছিল ঃ

(১) আফ্রিকা ও সিসিলি, (২) মিসর, (৩) সিরিয়া-প্যালেস্টাইন, (৪) হিজায ও ইয়ামামা, (৫) ইয়ামন, (৬) বাহরাইন ও উমান, রাজধানী বসরা, (৭) সাওয়াদ বা ইরাক, (৮) জজীরা, (৯) আজরবাইজান, (১০) জিবাল (Media). (১১) খুজিস্তান, (১২) ফারস (শিরাজ), (১৩) কিরমান, (১৪) মাকরান, (১৫) সিজিস্তান বা সিস্তান, (১৬—২০) কুহিস্তান, কুমিস, তাবারিস্তান, গুর্গান ও আর্মিনিয়া, (২১) খুরাসান, উত্তর-পশ্চিম আফগানিস্তানসহ, (২২) খাওয়ারিজম, (২৩) সুগ্দ (বুখারা ও সমরকন্দ শহরসহ), (২৪) ফরগনা।

প্রাদেশিক শাসনকর্তা উজীরের সুপারিশক্রমে নিযুক্ত হতেন এবং উজীরের অপসারণের সঙ্গে অপসারিত হতেন। তাঁকে আমীর বলা হত এবং প্রদেশের সামরিক ব্যাপার, রাজস্ব আদায়, শান্তিরক্ষা, ধর্মীয় অনুশাসন কার্যকরীকরণ, পুলিশ বাহিনী গঠন ও জুমার নামাজের ইমামতি করা ইত্যাদি তাঁর কর্তব্যের

মধ্যে গণ্য হত। প্রদেশের শাসনকর্তাগণ খলিফার দুর্বলতার সুযোগে স্বাধীন হবার চেষ্টা করতেন এবং দূরবর্তী অঞ্চলের আমীরগণ এ শাসন কর্তৃত্ব নিজেদের পরিবারে বংশানুক্রমিক করবার চেষ্টা করতেন। বিচারবিভাগের মোটামুটি দায়িত্ব আমীরের হাতে থাকলেও কাজিগণ খলিফা কর্তৃক নিযুক্ত হতেন বলে মনে হয়। গভর্নরগণ প্রাদেশিক রাজস্ব হতে যাবতীয় ব্যয় নির্বাহের পর উদ্বৃত্ত অর্থ খলিফার কাছে রাজধানীতে প্রেরণ করতেন।

গ্রন্থনির্দেশ

১. পি. কে. হিট্টি : *হিস্ট্রি অব দি এরাব্‌স্।*

২. মফীজুল্লাহ কবীর : *দি বুওয়াইহিদ ডায়ন্যাস্টি অব বাগদাদ।*

৩. সৈয়দ আমীর আলী : *হিস্ট্রি অব দি সারাসেন্‌স্।*

৩৮

আব্বাসীয় যুগে সামাজিক ও অর্থনৈতিক জীবন

আব্বাসীয় যুগে পুরাতন রক্ষণশীল সামাজিক ব্যবস্থা বহুলাংশে পরিবর্তিত হয়েছিল। আব্বাসীয়গণ পারসিকদের ওঅনারবদের সহায়তায় ক্ষমতা দখল করেছিলেন। খলিফাগণ অনারব রমণীদের পাণিগ্রহণ করতে আরম্ভ করেন। এঁরা অনেকেই জাতিতে পারসিক, গ্রীক, তুর্কী ও আর্মিনীয় ছিলেন। খলিফাগণ দরবারে পারসিক ও তুর্কী দেহরক্ষী, পারসিক উজীর ও কর্মচারী পরিবেষ্টিত হয়ে কালাতিবাহিত করতেন। উমাইয়া যুগের পুরাতন অভিজাত শ্রেণী ক্ষমতাচ্যুত হল এবং তাদের স্থলে নতুন অনারব অভিজাত শ্রেণী ও শাসকমণ্ডলী গড়ে উঠল। অর্থনৈতিক পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে ধনিক ও বণিক শ্রেণী সমাজে বিশেষ প্রতিষ্ঠা অর্জন করল। এখনকার অভিজাত শ্রেণীর মধ্যে আমরা ধনাঢ্য ও পণ্ডিত ব্যক্তিগণকে দেখতে পাই। জীবনযাত্রার মান অনেক বেড়ে যায় এবং ধনী ব্যক্তিগণের বেশ-ভূষায়, সাজ-সরঞ্জামে, আসবাবপত্রে, খানাপিনায় ও বিলাস-ব্যসনে পূর্ববর্তী যুগ হতে বহু পার্থক্য পরিলক্ষিত হয়।

সমাজ

আব্বাসীয় খলিফাগণ মহা আড়ম্বরে ও জাঁকজমকে জীবন যাপন করতেন। চকমকে ইউনিফরম পরিহিত দেহরক্ষীরা তাঁদেরকে ঘিরে থাকত। খলিফা জানুর নিম্ন পর্যন্ত কাবা পরিধান করে মণিমুক্তা-খচিত কোমরবন্দ কোমরে বেঁধে, কাঁধের ওপর মূল্যবান চাদর জড়িয়ে কালান সুয়া নামক চোখা-মাথাবিশিষ্ট টুপি পরিধান করতেন। এই কালান্‌সুয়া মনসুর কর্তৃক প্রবর্তিত হয়। বিশেষ দরবার উপলক্ষে খলিফা সিংহাসনে উপবিষ্ট থাকতেন। দেহরক্ষিগণ খোলা তরবারি হাতে তাঁর চতুর্দিকে দণ্ডায়মান থাকত। উচ্চপদস্থ ব্যক্তি ও যুবরাজগণ সিংহাসনের ডানে ও বামে সারিবদ্ধ থাকতেন। খলিফা প্রথমে পর্দার অন্তরালে থাকতেন। পর্দা উত্তোলিত হলে উপস্থিত ব্যক্তিগণের নাম উচ্চারিত হত। তাঁরা অভিবাদন করে আসন গ্রহণ করতেন। এতদুপলক্ষে ভাবী উত্তরাধিকারী খলিফার পার্শ্বে একটি আসনে উপবিষ্ট থাকতেন। সভাসদগণ সিংহাসনের উভয় পার্শ্বে বংশ ও পদমর্যাদানুযায়ী দুই সারিতে উপবেশন করতেন। ঈদুল ফিতর উপলক্ষে খলিফা গণ্যমান্য ব্যক্তিগণকে ভোজে আপ্যায়িত করতেন।

খলিফাদের জীবনযাত্রা

অভিজাত ও সম্ভ্রান্ত ব্যক্তিগণ বেশ-ভূষায় খলিফার অনুকরণ করতেন। ধর্মনেতা ও আইনজ্ঞগণ মাথায় কাল পাগড়ি এবং 'তায়লাসান' নামক রুমাল পরিধান করতেন। এ যুগে ঢিলা পায়জামা (সারাউইল), কামিজ, নিচের জামা, জ্যাকেট (কুফতান), কাবা, সর্বোপরি পরিহিত আবা বা জুব্বা এবং কালানসুয়া টুপি ভদ্রলোকের সাধারণ পোশাক ছিল। অবস্থাপন্ন লোকেরা মোজা ব্যবহার করত। পুরুষেরা জুতা ও বুট-জুতা উভয়ই ব্যবহার করত।

এ যুগে রমনীদের বেশ-ভূষায় অনেক পরিবর্তন লক্ষিত হয়। ধনাঢ্য মহিলারা মণিমুক্তা-খচিত গুম্বজাকৃতি টুপি পরিধান করতেন। এ টুপির নিম্নভাগে মণি-বসানো বৃত্তাকার মালা থাকত। হারুনুর রশীদের বৈমাত্রেয় ভগ্নী উলাইয়া এ টুপির প্রচলন করেন। হাতে বালা (আসাবীয়) ও পায়ে মল (খলখল) সচরাচর ব্যবহৃত হত। গণ্ডদেশ ও ওষ্ঠ রঞ্জিত করার পদ্ধতি পারসিকদের কাছ থেকে গ্রহণ করা হয়েছিল। সৌন্দর্য বৃদ্ধির জন্য কৃত্রিম ফোঁটার ব্যবহার আরবদের মধ্যে বরাবর প্রচলিত ছিল। নুওয়াইরীর মতে আদর্শ সুন্দরীকে ঋজুদীর্ঘ দেহ, পূর্ণচন্দ্রের মত বদনমণ্ডল, ঘোর কৃষ্ণবর্ণ কেশ, তিল বিশিষ্ট গোলাপী গণ্ড, মৃগের মত ডাগর কাল চোখ, নিদ্রালু, চক্ষুপুট, ক্ষুদ্র মুখগহ্বরে মুক্তা সদৃশ সুসজ্জিত দন্তপাটি, উন্নত বক্ষ, প্রশস্ত নিতম্ব এবং ক্রমাগত ক্রীয়মান ও হেনারঞ্জিত-প্রান্ত অঙ্গুলীর অধিকারিণী হতে হবে।

আব্বাসীয় যুগের প্রথম দিকে স্ত্রীলোকগণ তাদের উমাইয়া ভগ্নীদের মতই অবাধে চলাফেরা করতে পারত। কিন্তু দশম শতাব্দীর শেষের দিকে ক্রমান্বয়ে

সমাজে নারীর স্থান

অবরোধ প্রথা চালু হতে থাকে। প্রাথমিক যুগে অভিজাত শ্রেণীর মহিলারা বিশেষত রাজপরিবারের মহিষী ও শাহজাদীগণ সমাজে বিশেষ সম্মানিতা ও সমাদৃতা ছিলেন। মনসুরের সময় দুজন শাহজাদী বর্ম পরিহিতা হয়ে বাইজান্টাইনদের সাথে যুদ্ধে গমন করেন। সাম্রাজ্ঞী জুবায়দা প্রতিভাশালিনী রমণী ও গুণসম্পন্না কবি ছিলেন। তাঁর জনহিতকর কার্যের কথা পূর্বেই বর্ণিত হয়েছে। তিনি হারুনুর রশীদের সময় ও পুত্র মামুনের সময় রাজকার্যে অংশ গ্রহণ করতেন। মামুনের পত্নী বুরানও গুণবতী ও দানশীলা ছিলেন। হারুনুর রশীদের মাতা খায়জুরান, তাঁর ভগ্নী উলাইয়া রাষ্ট্র ও সমাজে বিশিষ্ট ভূমিকা পালন করেন। মুকতাদিরের মাতা দরবারে বসে সভাসদ ও বৈদেশিক রাজদূতগণকে সাক্ষাৎকার প্রদান করতেন, দরখাস্তকারীদের আবেদন শ্রবণ করতেন এবং পুরুষের মত রাজকার্য নির্বাহ করতেন। সাধারণ আরব রমণীগণও যুদ্ধে যোগদান করতেন, সৈন্য পরিচালনা

করতেন, কবিতা কাব্যে পুরুষদের সাথে প্রতিযোগিতা করতেন এবং বিশেষ করে গান-বাজনায় সুনাম-সুখ্যাতি অর্জন করেছিলেন। খলিফা মুতাসিমের আমলে তবলাবিশারদ উবায়দা নিপুণ তবলাবাদিকা হিসেবে 'উবায়দা আত-তাবুরীয়া' উপাধি প্রাপ্ত হয়েছিলেন। তাঁর খ্যাতি সর্বজনবিদিত ছিল এবং তিনি সঙ্গীতও রচনা করতে পারতেন। মুতাওয়াকিলের আমলে ফযল নাম্নী এক কবি খ্যাতি অর্জন করেছিলেন। শায়খা শুহ্‌দা নাম্নী এক মহিলা দ্বাদশ শতাব্দীতে বাগদাদে ইতিহাস ও সাহিত্যে বক্তৃতা দান করতেন। তিনি খুশখতের জন্যও খ্যাতি অর্জন করেন। জয়নব উম্মুল মু'আইয়িদ আইন শিক্ষা লাভ করে যোগ্যতার সনদ লাভ করেছিলেন। তাকিয়াহ হাদিস-বিশারদ ও কবি ছিলেন।

মুসলিম সমাজে সর্ব যুগে বিবাহ একটি ধর্মীয় কর্তব্য এবং পারিবারিক জীবন-আদর্শ বলে বিবেচিত হত। সন্তানের জন্ম, বিশেষত পুত্র সন্তানের জন্ম আল্লাহর নিয়ামত বলে গ্রহণ করা হত। গৃহকর্ম, স্বামী ও সন্তানের পরিচর্যা স্ত্রী-জাতির প্রথম ও প্রধান কর্তব্য ছিল। সন্তানের প্রাথমিক শিক্ষার দায়িত্ব মাতার ওপর ন্যস্ত ছিল। মেয়েরা সুতা কেটে ও তাঁত বুনে অবসর বিনোদন করত।

ভদ্রলোক

আরব লেখকদের মতে, ভদ্রলোকের (জরীফ) সংজ্ঞা নিম্নরূপঃ তাঁর ব্যবহার নম্র, তিনি নির্ভীক ও সাহসী, তাঁর আচরণ মার্জিত, তিনি ঠাট্টা-পরিহাস থেকে বিরত থাকেন, সু-জনের সঙ্গ ভালবাসেন; তিনি সত্যকথনে অভ্যস্ত, প্রতিজ্ঞা পালনে দৃঢ়, গোপন কথা রক্ষায় যত্নবান; তিনি পরিচ্ছন্ন পোশাক পরিধান করেন, জীর্ণ পোশাক পরিহার করেন, খাওয়ার টেবিলে অল্প অল্প আহার মুখে তোলেন, অল্প কথা বলেন, অল্প হাসেন, খাবার ধীরে ধীরে চিবান, অঙ্গুলী লেহন করেন না, রসুন-পেঁয়াজ বর্জন করেন এবং সর্বসাধারণ্যে দন্তকীলক ব্যবহার পরিহার করেন।

ঘরের আসবাবপত্র

এ যুগে দীওয়ান বা সোফার প্রচলন হয়। এ সোফা কামরার তিন দিকে স্থাপিত হত। উমাইয়াদের সময় বসবার জন্য চেয়ারের প্রচলন হয়েছিল, কিন্তু চতুষ্কোণ গদী(কুশন) মেঝের ওপর রেখে এর ওপর আরামে বসাই বেশি জনপ্রিয় ছিল। ঘরের মেঝে কার্পেটে ঢাকা থাকত। দীওয়ান অথবা কুশনের সম্মুখে ছোট টেবিল রেখে তার ওপর পিতলের তৈরি বড় বড় গোল ট্রেতে খাবার দেয়া হত। অবস্থাপন্ন গৃহে ট্রে রৌপ্যের তৈরি হত এবং কাঠের টেবিল আবলুস, ঝিনুক অথবা কচ্ছপের খোল খচিত করে সুসজ্জিত করা হত।

চিনির পানিতে তৈরি মিষ্টি শরবৎ, ফলের সিরাপ কিংবা গোলাপ পানির সাহায্যে সুগন্ধযুক্ত করে পরিবেশন করা হত। কিসমিস বা খেজুর দ্বারা প্রস্তুত নবীজ

পানীয় নামক পানীয়ও প্রচলিত ছিল। মদ্যপান উচ্চস্তরের সমাজে প্রচলিত ছিল। খলিফা, উজীর, নাজীর, উচ্চপদস্থ কর্মচারী, সবাই মদ্যপান করতেন। সঙ্গীতের জলসায়, নাচগানের আসরে মদ্যপান বহুল-প্রচলিত ছিল। এসব জলসায় খলিফাগণের বিশেষ সহচর থাকতো, তাঁদেরকে কে 'নাদীম' বলা হত। কবিরা এ যুগে মধ্যপান সম্পর্কিত 'খামরীয়াৎ' রচনা করতেন।

এ যুগে মুসলিম সমাজে হাম্মামের প্রচলন খুব বেশি ছিল। সুবিখ্যাত ঐতিহাসিক খতীবের মতে মুকতাদিরের রাজত্বকালে (৯০৮–৩২ খ্রিঃ) বাগদাদে

হাম্মাম ২৭০০ সাধারণের ব্যবহারোপযোগী হাম্মামখানা ছিল। ঐ একই ঐতিহাসিকের মতে অন্য সময় এর সংখ্যা ৬০,০০০ পর্যন্ত ছিল। এ সংখ্যা অতিরঞ্জিত মনে হলেও এর দ্বারা হাম্মামের জনপ্রিয়তা সম্বন্ধে বেশ ধারণা করা যায়। হাম্মামখানা অনেকগুলি কামরা নিয়ে গঠিত ছিল। এর মেঝে মোজাইক করা এবং অভ্যন্তরীণ দেয়াল মার্বেল পাথরে মোড়া ছিল। অভ্যন্তরীণ প্রকোষ্ঠটি গুম্বজে ঢাকা থাকত এবং ঐ গুম্বজের রঙীন কাঁচ বা পাথরের মধ্য দিয়ে ঘরে আলোক প্রবেশ করতে পারত। এ কামরাটিকে উত্তপ্ত পানির বাষ্পের সাহায্যে গরম করা যেত। কোন কোন হাম্মামখানায় গরম ও ঠাণ্ডা উভয় রকম পানির ব্যবস্থা থাকত।

আব্বাসীয় আমলে পূর্ববর্তী উমাইয়া যুগের মতো খলিফা ও শাহজাদাগণের কাছে মৃগয়া অত্যন্ত প্রিয় ছিল। আমীন সিংহ শিকার করতে ভালবাসতেন। চিতার সাহায্যে শিকার মুতাসিমের খুব প্রিয় ছিল। বাজপাখির সাহায্যে বা পোষা

খেলাধুলা পাখির সাহায্যে অন্য পাখি শিকার পুরাতন পারসিক প্রথা। আরবদের মধ্যে এর বহুল প্রচলন ঘটে। শিক্ষাপ্রাপ্ত বাজপাখির সাহায্যে হরিণ, খরগোশ, বুনোহাঁস প্রভৃতি শিকার করা হত। বড় শিকারের জন্য বাজপাখির সাথে সাথে পোষা কুকুরের ব্যবহারও প্রচলিত ছিল। শিকারীরা সময় সময় কোন বিশেষ স্থানে বৃত্তাকার ব্যূহ রচনা করে শিকার করত। একে 'হালকা' বলা হত। মুতাসিম দজলা নদীর সাথে ঘোড়ার নালের আকৃতি দেয়াল তৈরি করিয়ে তার ভেতরে শিকারগুলিকে ঢুকিয়ে নিতেন। অন্যান্য বহির্দ্বার ক্রীড়ার মধ্যে ছিল তীর-ধনুক, পোলো, বর্শা নিক্ষেপ ও ঘোড়দৌড় ইত্যাদি। এ সময়ে কিছু গৃহাভ্যন্তরীণ খেলা জনপ্রিয়তা অর্জন করে। এদের মধ্যে দাবা ও পাশা খেলা প্রধান। হারুনুর রশীদই সর্বপ্রথম দাবা খেলা প্রবর্তন করেন। দাবা (শতরঞ্জ) একটি ভারতীয় খেলা। অভিজাত মহলে পাশার পরিবর্তে দাবা খেলা বিশেষ চালু

হয়। হারুনুর রশীদ শার্লিমানের কাছে যে উপঢৌকন প্রেরণ করেছিলেন, তার মধ্যে একটি দাবার বোর্ড ছিল।

অর্থনৈতিক অবস্থা ঃ বাণিজ্য

সাম্রাজ্যের প্রসার, জীবনযাত্রার মানোন্নয়ন, বিভিন্ন বিলাস সামগ্রীর প্রয়োজনীয়তা, আব্বাসীয় যুগে অপেক্ষাকৃত শান্তিপূর্ণ পরিবেশ এবং সাম্রাজ্যের বিভিন্ন অঞ্চলে প্রাপ্ত বিপুল উৎপন্ন দ্রব্য ও শিল্পজাত দ্রব্য দূর-দূরান্তের রাজ্যের সঙ্গে ক্রমবর্ধমান সম্পর্ক ও আন্তর্জাতিক বাণিজ্যের পথ সুপ্রশস্ত করেছিল। বাগদাদ, বসরা, সীরাফ, কায়রো এবং আলেকজান্দ্রিয়া জল ও স্থলপথের প্রধান বাণিজ্যকেন্দ্র ছিল। পাক-ভারত উপমহাদেশ ও চীন দেশের সঙ্গে বাণিজ্য সম্পর্কের বিষয়ে তৃতীয় মুসলিম শতাব্দীর মুসলমান বণিকদের সমুদ্রযাত্রা, যেমন সুলায়মান আত্তাজিরের সমুদ্রযাত্রার বিবরণ হতে জানা যায়। পারস্যোপসাগরের সামুদ্রিক বন্দর সীরাফ, বসরা ও উবুল্লা হতে এবং অপেক্ষাকৃত অল্প পরিমাণে আদন ও লোহিত সাগরের তীরে অবস্থিত বন্দরসমূহ হতে মুসলমান সওদাগরগণ সমুদ্রপথে পাক-ভারত উপমহাদেশ, সিংহল, পূর্ব-ভারতীয় দ্বীপপুঞ্জ ও চীনদেশে চলে যেত। স্থলপথে সমরকন্দ ও চীনা তুর্কিস্তান হয়ে যে বাণিজ্যপথ চলে গিয়েছিল, একে 'বৃহৎ রেশম পথ' বলা হত। চীনদেশের পণ্যদ্রব্যের মধ্যে রেশম প্রধান ছিল। এজন্য এ বাণিজ্যপথের নাম 'রেশম পথ' হয়েছিল। এ পথে বাণিজ্য কাফেলার অদল-বদল হত; কোন এক কাফেলা সারাপথ পরিভ্রমণ করত না। চীনদেশ হতে আনীত পণ্যদ্রব্যের মধ্যে ছিল রেশম, রেশমের তৈরি কাপড়, তৈজসপত্র, কাগজ, কালি, স্বর্ণ ও রৌপ্যের পাত্র ও দারুচিনি। পাক-ভারত উপমহাদেশ হতে আসত চন্দন কাঠ, আবলুস কাঠ, নারিকেল, চিতাবাঘের চামড়া এমন কি বাঘ, হাতী ও চিতাবাঘ। খ্রিস্টীয় অষ্টম শতাব্দীতে চীনদেশের সঙ্গে মুসলমানদের বাণিজ্য সম্পর্ক স্থাপিত হয়েছিল। মুসলমান সওদাগরগণ তাঁদের সঙ্গে নিয়ে যেতেন খেজুর, চিনি, সুতী ও পশমী বস্ত্র, ইস্পাতের যন্ত্রপাতি ও কাঁচের জিনিস।

স্ক্যাণ্ডিন্যাভিয়া অঞ্চলে বিশেষত সুইডেনে সপ্তম শতাব্দী হতে একাদশ শতাব্দীর তারিখ অঙ্কিত হাজার হাজার মুসলিম মুদ্রা পাওয়া গিয়েছে। এগুলি মুসলিম বাণিজ্য বিস্তারের পরিধি সূচিত করে। ভলগা নদীর তীরবর্তী অঞ্চলে বহু মুদ্রার প্রাপ্তি এ যুগের সাহিত্যে উল্লিখিত মুসলিম সাম্রাজ্যের সাথে বাল্টিক অঞ্চলের বাণিজ্য সম্পর্কে বিবরণী সত্য বলে প্রমাণিত করে। এ বাণিজ্যপথ কাস্পিয়ান সাগর, কৃষ্ণ সাগর ও রুশিয়ার মধ্য দিয়ে বাল্টিক সাগর অঞ্চলে চলে

যেত। এ সব অঞ্চল হতে আরবগণ চামড়া, পশম এবং আম্বর (সুগন্ধি) আনত। বার্নার্ড লুইস বলেন, সম্ভবত আরবগণ নিজেরা স্ক্যাণ্ডিন্যাভিয়া অঞ্চল পর্যন্ত যেত না। এ সব উত্তরাঞ্চলের লোকেরা রুশিয়ায় তাদের সঙ্গে সাক্ষাৎ করত। কিংবা ভল্গা অঞ্চলের খাজার ও বুলগারগণ উত্তরাঞ্চলের লোকদের সাথে আরবদের মধ্যস্থ হিসেবে কাজ করত। এ অঞ্চলে আরব বাণিজ্যের প্রভাব হিসেবে দুটি জিনিসের উল্লেখ করা হয়। সুইডেনের সর্বপ্রাচীন মুদ্রা আরবি দিরহামের ওজনে তৈরি হত এবং প্রাচীন আইসল্যাণ্ডের সাহিত্যে বহু আরবি শব্দ বিদ্যমান রয়েছে। আফ্রিকার সাথেও আরবগণ স্থলপথে ব্যাপক ব্যবসা-বাণিজ্য চালাত এবং এ অঞ্চল থেকে তারা স্বর্ণ ও ক্রীতদাস আমদানি করত। পশ্চিম ইউরোপের সাথেও আরবদের ব্যবসা-বাণিজ্য চলত। এ ব্যবসায়ে ইহুদিগণ মধ্যস্থ হিসেবে কাজ করত। এ ইহুদিরা আরবি, ফারসি, গ্রীক, ফ্রাঙ্ক, স্পেনীয় ও স্লাভ ভাষা জানত। এরা জল ও স্থল পথে পূর্ব হতে পশ্চিমে এবং পশ্চিম হতে পূর্বে যাতায়াত করত। পাশ্চাত্য হতে তারা খোজা, ক্রীতদাসী, ক্রীতদাস, ব্রকেড, পশম, তরবারি প্রভৃতি আমদানি করত। তারা পশ্চিম ভূমধ্যসাগরীয় অঞ্চল হতে জাহাজে মিসরের ফারামা নামক স্থানে অবতরণ করে উটযোগে লোহিত সাগর পর্যন্ত যেত; সেখান হতে আবার জাহাজযোগে সিন্ধু, দক্ষিণ ভারত ও চীনদেশে চলে যেত। আর এক দল পূর্ব-ভূমধ্যসাগরীয় অঞ্চলে এণ্টিয়কে অবতরণ করে স্থল পথে জাবিয়া নামক স্থানে গমন করে সেখান থেকে বাগদাদ ও উবুল্লা হয়ে উমান, সিন্ধু, দক্ষিণ-ভারত ও চীনদেশে চলে যেত।

সুদূরপ্রসারী ব্যবসা-বাণিজ্যের ফলে নবম শতাব্দীতে আরবদের মধ্যে ব্যাঙ্ক-ব্যবস্থা গড়ে ওঠে। রৌপ্য-মুদ্রা দিরহাম এবং স্বর্ণ-মুদ্রা দীনারের মধ্যে আনুপাতিক মূল্যের তারতম্য ঘটায় এক শ্রেণীর মুদ্রা বিনিময়কারীর (সাররাফ) উদ্ভব হয়। নবম শতাব্দীতে এরাই ব্যাপকভাবে ব্যাঙ্কের ভূমিকা পালন করতে আরম্ভ করে। বড় বড় ব্যবসায়িগণ তাদের মূলধন এদের নিকট জমা রাখত। এ সময়ে বাগদাদে প্রধান কেন্দ্র ও অন্যান্য শহরে শাখা অফিসসহ ব্যাঙ্ক গড়ে ওঠে। এ সব ব্যাঙ্ক হতে চেক ও ক্রেডিটপত্র (Letter of Credit) দেয়া হত। এ ব্যবস্থা এত সুচারুরূপে গড়ে উঠেছিল যে, বাগদাদ হতে একটি চেক নিয়ে মরক্কোতে তা ভাঙ্গানো যেত। বসরাতে ব্যাঙ্ক-ব্যবস্থা এত প্রসার লাভ করে যে, প্রত্যেক

সওদাগর ব্যাঙ্কে হিসাব খুলতেন এবং বাজারে চেকের সাহায্যে লেন-দেন করতেন, কখনও নগদ টাকার সাহায্যে লেনদেন করতেন না। দশম শতাব্দীতে আমরা বাগদাদে সরকারি ব্যাঙ্ক দেখতে পাই। এ ব্যাঙ্ক হতে সরকারকে অনাদায়ী রাজস্বের বিনিময়ে বহু নগদ অর্থ ধার দেয়া হত। মুসলমানদের মধ্যে সুদ গ্রহণ বে-আইনী হওয়ায় এ সব ব্যাঙ্কের পরিচালকগণ প্রায় সবাই ইহুদি ও খ্রিস্টান ছিলেন।

সেই যুগের বাণিজ্যিক সমৃদ্ধি তৎকালীন সাহিত্যে ও চিন্তাধারায় প্রতিফলিত হয়েছিল। এ যুগের সাহিত্যে আদর্শ সওদাগরের চিত্র অঙ্কিত হয়েছে। সমাজে সওদাগরদের স্থান বহু উচ্চে ছিল। পুরাতন আরব অভিজাত শ্রেণীর পরিবর্তে আমরা শাসকগোষ্ঠীর মধ্যে দুই শ্রেণীর লোক দেখতে পাই। এক শ্রেণী ধনিক ও বণিক, অপর শ্রেণী শিক্ষিত সম্প্রদায়। ধনিক সম্প্রদায়ের প্রাচুর্য সম্পর্কে ধারণা করতে হলে দু-একটি উদাহরণ দিতে হয়। বাগদাদে খলিফা মুকতাদিরের আমলে ইবনুল-জাস্‌সাস নামক এক জহুরীর ১৬,০০০,০০০ দীনার মূল্যের সম্পত্তি বাজেয়াপ্ত করার পরও তিনি বেশ ধনী ছিলেন। বসরার বিখ্যাত ব্যবসায়িগণের কয়েকজনের প্রত্যেকের বাৎসরিক আয় ১,০০০,০০০ দিরহামের অধিক ছিল। একজন মিল-মালিকের পক্ষে একশত দীনার দৈনিক দান-সদকায় ব্যয় করা সম্ভব ছিল। সীরাফে একজন সওদাগরের বাড়ি তৈরি করতে গড়ে ১০,০০০ দীনার লাগত। কারও বাড়ি ৩০,০০০, আবার কারও বাড়ি ৪,০০০,০০০ দীনারেরও ছিল। সীরাফের এ সব সওদাগর সারাজীবন সমুদ্রপথে কাটাত।

ব্যবসা-বাণিজ্যের এত ব্যাপক সম্প্রসারণ কখনও সম্ভব হত না, যদি সাম্রাজ্যের মধ্যে কৃষিজাত ও শিল্পজাত দ্রব্যের প্রাচুর্য না থাকত। শিল্পজাত দ্রব্যের মধ্যে কাপড়-চোপড় প্রধান ছিল। বয়নশিল্পে সর্বাপেক্ষা বেশি লোকজন খাটত এবং অন্যান্য শিল্পের তুলনায় এ শিল্পের উৎপাদনও বেশি ছিল। কাপড়-চোপড়ের মধ্যে কাটা-কাপড়, জামা-কাপড়, বুটিদার কাপড়, গৃহসজ্জার সামগ্রী, কুশন ও কার্পেট ইত্যাদি প্রধান ছিল। সুতী, সিল্কের তৈরি ও পশমী সব রকমের কাপড়ই তৈরি হত। মিসরে লিনেন কাপড় তৈরি হত। সুতা প্রথম পাক-ভারত উপমহাদেশ থেকে আমদানি হত। পরে পূর্ব পারস্য থেকে আরম্ভ করে পশ্চিমে স্পেন পর্যন্ত সমগ্র মুসলিম রাজ্যে তুলার চাষ হত। বাইজান্টাইন ও সাসানীয় আমল হতে পারস্যে সিল্কের কাপড় তৈরি হত। পারস্যের সিল্কের কাপড় 'টাফেটা' নামে ইউরোপে প্রসিদ্ধিলাভ করে। গুর্গাওঁ ও

শিল্প

সিস্তানে সিল্কের কাপড় বেশি তৈরি হত। কার্পেট সর্বত্র তৈরি হত, তবে তাবারিস্তান ও আর্মিনিয়ার কার্পেট সর্বোৎকৃষ্ট ছিল। বিভিন্ন স্থানে তৈরি বিশেষ বিশেষ কাপড় ঐসব স্থানের নামানুসারে পরিচিত হত। বাগদাদে তৈরি এক প্রকার ডুরিদার কাপড় বাগদাদের এক এলাকার নামানুসারে 'আত্তাবী' নামে অভিহিত হত। অনুরূপ কাপড় স্পেনে তৈরি হয়ে 'তাবী' নামে ইউরোপে বিশেষ প্রসার লাভ করে। কুফায় প্রস্তুত সিল্কের রুমাল এখনও কুফীয়া নামে পরিচিত। এ রুমাল মাথায় বাঁধা হয়। ফারসের বিভিন্ন শহরে কয়েকটি উচ্চমানের কারখানায় কার্পেট, এম্ব্রয়ডায়রী, ব্রকেড (দীবাজ) ও রাজ-রাজড়াদের জন্য সম্মানের পোশাকে (খিলাত) ব্যবহৃত কাপড় (তীরাজ) প্রস্তুত হত। তীরাজ কাপড়ে সুলতানের বা খলিফার নাম বা সংকেত লিখিত থাকত। এ তীরাজ কাপড় তৈরির জন্য অনেক সময় সরকারি কারখানাও থাকত। এসব কাপড় শাসকরা নিজে ব্যবহার করতেন এবং বিশেষ উৎসব উপলক্ষে পদস্থ অফিসার ও সেনাপতিগণকে যৌতুক দেয়া হত। খুজিস্তানে এক-প্রকার বুটিদার কাপড় প্রস্তুত হত, যা 'দামাস্ক' নামে পরিচিত ছিল। এ বুটিদার কাপড় প্রথমে দামিস্কে প্রস্তুত হত বলে এর এ নামকরণ করা হয়। বুখারা জায়নামাজের জন্য বিখ্যাত ছিল। সিডন, টায়ার ও অন্যান্য সিরীয় শহরে প্রাচীন ফিনিশীয় কাঁচ-শিল্প মুসলমানদের আমলে সূক্ষ্মতায় ও স্বচ্ছতায় বিশেষ উন্নতি লাভ করে। ক্রুসেডের সময় প্রাচ্য ও প্রতীচ্যের যোগাযোগের ফলে সিরিয়ার রঙীন কাঁচ ইউরোপে নীত হয়। পরে এ ধরনের রঙীন কাঁচ গির্জাসমূহে বহুল পরিমাণে ব্যবহৃত হতে থাকে। সিরিয়ার কাঁচ ও ধাতু-নির্মিত ফুলদান নিত্যব্যবহার ও শৌখীন উভয় প্রকারের উপাদান হিসেবে প্রসিদ্ধি লাভ করে। রঙীন অনুলিপি সমন্বিত কাঁচের ঝাড় মসজিদে ও প্রাসাদে শোভা পেত। পারস্যের কাশান অঞ্চলে রঙীন টালি নির্মিত হত বলে এ শিল্পকে 'কাশানী' বলা হত। দামিস্কে বহুকাল যাবৎ এ শিল্প সমৃদ্ধি লাভ করেছিল।

মুসলমানদের মধ্যে কাগজের ব্যবহার এবং ব্যাপক উৎপাদন বিশেষ ভাবে উল্লেখযোগ্য। অষ্টম শতাব্দীর মাঝামাঝি চীনদেশ হতে সমরকন্দে কাগজ আমদানি হয়। উক্ত শতাব্দীর অবসানের পূর্বেই বাগদাদে প্রথম কাগজের কল স্থাপিত হয়। এর পর হতে মুসলিম সাম্রাজ্যের সর্বত্র বহু কল স্থাপিত হয়। মিসরে ৯০০ খ্রিস্টাব্দে কিংবা তারও পূর্বে, মরক্কোতে ১১০০ খ্রিস্টাব্দে, স্পেনে ১১৫০ খ্রিস্টাব্দে কাগজের কল চালু হয় এবং সাদা ও রঙীন উভয় প্রকার কাগজ প্রস্তুত হতে থাকে। হল্যাণ্ডের বিখ্যাত লাইডেন বিশ্ববিদ্যালয়ের লাইব্রেরিতে

সংরক্ষিত ৮৬৬ খ্রিস্টাব্দের হস্তলিখিত পুস্তক 'গরীবুল-হাদীস' সর্বপ্রাচীন কাগজের নিদর্শন। ব্রিটিশ মিউজিয়ামে সংরক্ষিত আর একটি প্রাচীন পুস্তক একজন খ্রিস্টান লেখকের দ্বারা ৮৭৭ খ্রিস্টাব্দে লিখিত হয়েছিল। মুসলিম অধ্যুষিত স্পেন ও ইটালি হতে দ্বাদশ ও ত্রয়োদশ শতাব্দীতে কাগজ শিল্প ইউরোপে প্রসার লাভ করে এবং পঞ্চদশ শতাব্দীতে মুদ্রাযন্ত্রের আবিষ্কারের ফলে কাগজ সর্ব সাধারণের জ্ঞানার্জনের পথ প্রশস্ত করে। মুসলিম জগতে বিখ্যাত কাগজ উৎপাদনের কেন্দ্র ছিল সমরকন্দ, বাগদাদ, দামিস্ক, ত্রিপলী, কায়রো, ফেজ ও ভেলেন্সিয়া।

এ যুগে ধাতব শিল্পও বিশেষ উন্নতি লাভ করে। মুসলিম সাম্রাজ্যের বিভিন্ন অঞ্চলে ধাতুর খনি ছিল। পূর্বাঞ্চলের প্রদেশসমূহে, বিশেষত হিন্দুকুশ অঞ্চলে রৌপ্য পাওয়া যেত। নুবিয়া ও সুদান অঞ্চল হতে স্বর্ণ আসত; ইস্পাহানের কাছে তাম্রখনি ছিল। এ তাম্রখনি হতে ৫০০০ দিরহাম সরকারি রাজস্ব পাওয়া যেত। পারস্য, মধ্য-এশিয়া ও সিসিলিতে লৌহ পাওয়া যেত। পারস্যোপসাগর হতে মুক্তা এবং সাম্রাজ্যের বিভিন্ন অঞ্চল হতে মূল্যবান প্রস্তর সংগৃহীত হত। এ যুগে জহুরীর শিল্প বিশেষ নৈপুণ্য অর্জন করে। হীরা, মুক্তা, চুনি, পান্না ও নীলকান্তমণি রাজা-বাদশাহদের বড় প্রিয় ছিল। হারুনুর রশীদ একটি চুনি ৪০,০০০ দীনার ব্যয়ে অর্জন করেছিলেন। খলিফা মুকতাফীর ২০,০০০,০০০ দীনার মূল্যের অলংকার ও সুগন্ধিদ্রব্য ছিল।

কৃষি ও কৃষিজাত দ্রব্য

প্রথম যুগের আব্বাসীয়দের আমলে কৃষির বিশেষ উন্নতি সাধিত হয়। ইরাকের 'সাওয়াদ' নামে অভিহিত উর্বর পলিমাটি অঞ্চল কৃষির পক্ষে বিশেষ উপযোগী ছিল। আব্বাসীয় রাজধানী বাগদাদ এ অঞ্চলে অবস্থিত ছিল এবং এ অঞ্চলের সমৃদ্ধি রাষ্ট্রের নিয়মিত আয়ের পথ সুগম করেছিল। আব্বাসীয় খলিফাগণ দজলা-ফুরাত উপত্যকার নিম্ন অঞ্চলের কৃষির উন্নতির প্রতি বিশেষ যত্নবান ছিলেন। তারা এ এলাকায় পুরাতন খালের সংস্কার সাধন করেন এবং কোন কোন ক্ষেত্রে নতুন খাল খনন করেন। মনসুরের সময় সংশোধিত 'নহর-ঈসা' নামে অভিহিত একটি খাল ফুরাত ও দজলাকে আনবার ও বাগদাদের কাছে যুক্ত করেছে। অন্যান্য প্রধান খালের মধ্যে নহরে সরসর, নহর মালিক, নহর কুসা, নহর সারা, নহর দুজাইন ও নহর সিলাহের নাম উল্লেখ করা যেতে পারে। এ সব খাল দজলা-ফুরাত উপত্যকার নিম্নাঞ্চলকে স্বর্ণ-প্রসবিনী শস্য-শ্যামলা খাদ্য ভাণ্ডারে পরিণত করে। ইরাকের প্রধান উৎপন্ন শস্য ছিল বার্লি, গম, ধান, খেজুর, তুলা ইত্যাদি। সাওয়াদের উর্বর এলাকায় নানা রকমের ফল ও শাক-সজী উৎপন্ন হত

খুরাসানও কৃষির জন্য বিখ্যাত ছিল। বুখারার পার্শ্ববর্তী অঞ্চল উদ্যানের জন্য প্রসিদ্ধ ছিল। সমরকন্দ ও বুখারার মধ্যবর্তী অঞ্চলে অবস্থিত সুগ্‌দ্ উপত্যকার উদ্যানে খেজুর, আপেল, পীচ, খুবানী, লেবু, কমলালেবু, ডুমুর, আঙ্গুর, জলপাই, বাদাম, আনার প্রভৃতি ফল এবং মুলা, শশা, বেগুন প্রভৃতি তরকারি এবং গোলাপ, জাফরান প্রভৃতি সুগন্ধি ফুল জন্মাত। খাওয়ারিজমে বড় বড় তরমুজ উৎপন্ন হত। ফারস এবং আওয়াজে ইক্ষু চাষ হত। পরে সিরিয়ায় ইক্ষু চাষ প্রবর্তিত হয় এবং ক্রুসেড যুদ্ধে যোগদানকারীদের মাধ্যমে এর চাষ ইউরোপে ছড়িয়ে পড়ে।

ফল ও ফুলের বাগান শুধু শৌখিন লোকদের অঙ্গনই সুশোভিত করেনি, বরং ব্যবসায়ের উদ্দেশ্যে বড় বড় উদ্যানে বহু ফুলের চাষও করা হত। এ সব ফুল হতে সুগন্ধি অথবা নির্যাস তৈরি করা হত। গোলাপ, পদ্ম ও অন্যান্য ফুল হতে প্রস্তুত নির্যাস বা সুগন্ধি দামিস্ক, শিরাজ, জুর এবং অন্যান্য শহরে পাওয়া যেত। ফারিসের জুর এলাকা লাল গোলাপী আতরের জন্য বিখ্যাত ছিল। এ এলাকার গোলাপ-পানি পূর্বে চীনদেশ এবং পশ্চিমে মাগরিব পর্যন্ত রপ্তানি হত। বাগদাদের খলিফা ফারসের রাজস্বের সাথে ৩০,০০০ বোতল গোলাপের নির্যাস প্রাপ্ত হতেন। সাবুরে বিশ্ববিখ্যাত দশ প্রকার সুগন্ধি তেল প্রস্তুত হত।

এ যুগের কৃষির উন্নতির নিদর্শন স্বরূপ বিভিন্ন উদ্ভিদবিজ্ঞানে বহু পুস্তক লিখিত হয়। ইবন্ নাদিম তাঁর 'ফিহরিস্ত' নামক পুস্তকে আতর সম্বন্ধে লিখিত কয়েকটি পুস্তকের নাম করেছেন।

গ্রন্থনির্দেশ

১. পি. কে. হিট্টি : *হিস্ট্রি অব দি আরবস্।*
২. বার্নার্ড লিউইস : *দি আরবস্ ইন হিস্ট্রি।*
৩. সৈয়দ আমীর আলী : *হিস্ট্রি অব দি স্যারাসেনস্।*

জ্ঞান-বিজ্ঞান ও শিল্পকলা

উমাইয়া যুগে আরবদের জ্ঞান-বিজ্ঞানের উন্মেষের কথা বিংশ অধ্যায়ে আলোচিত হয়েছে। আব্বাসীয় যুগে এ জ্ঞান সাধনা নতুন পরিবেশে নতুন ভাবধারায় সিঞ্চিত হয়ে অসংখ্য শাখা-পল্লবে প্রসারিত হয়ে বিশ্ব-সভ্যতার এক স্মরণীয় অধ্যায় রচনা করেছে। আরবগণের জ্ঞান-পিপাসা, তাদের অনুসন্ধিৎসা এবং অন্তরের প্রসার জ্ঞানচর্চার ক্ষেত্র প্রস্তুত করেছিল। প্রাচীন সভ্যতার পীঠস্থল পাক-ভারত উপমহাদেশ, ইরান, গ্রীস এবং হেলেনীয় সভ্যতা অধ্যুষিত সিরিয়া ও মিসর এ যুগে মুসলমানদের ভাবধারাকে বিশেষভাবে প্রভাবিত করে জ্ঞানচর্চার ক্ষেত্রে নতুন দিগন্ত উন্মোচন করল। প্রাথমিক পর্যায়ে এক শতাব্দীকাল (৭৫০-৮৫০ খ্রিঃ) আরবগণ প্রাচীন সভ্যতার অমূল্য সম্পদ বিদেশী ভাষা হতে আরবি ভাষায় অনুবাদ করে আরবি ভাষাভাষী শিক্ষিত সমাজের কাছে তুলে ধরে। পারসিক, সংস্কৃত, সিরীয় ও গ্রীক ভাষায় লিখিত গ্রন্থ এ সময় আরবিতে অনূদিত হয়। আরবিতে রূপান্তর লাভ করার পর এ বিজাতীয় জ্ঞানের আত্মীকরণ ঘটে। এ্যারিস্টটলের দর্শন, নিও-প্লেটোনীয় ভাষ্যকারগণের রচনা, গ্যালেনের চিকিৎসাবিজ্ঞান, ভারতীয় জ্যোতিষ শাস্ত্র বিষয়ক গ্রন্থ 'সিদ্ধান্ত', ভারতীয় গণনা পদ্ধতি, পারস্যের সুকুমার সাহিত্যের আরবিরূপ, যেমন—'কালীলা ওয়া দিমনাহ' ইত্যাদি প্রাথমিক যুগে আরব জ্ঞান-চর্চার বহুমুখী ভাবধারার গোড়া পত্তন করেছিল। এর ফলে পরবর্তী তিন শতাব্দী কাল (৮৫০-১১৫০ খ্রিঃ) জ্ঞান-বিজ্ঞানের জটিল ও গুরুত্বপূর্ণ ক্ষেত্রে মুসলমানগণ স্বকীয় মৌলিক অবদান রেখে যান। কিন্তু তর্জমার যুগ ও মৌলিক অবদানের যুগের মধ্যে সুস্পষ্ট পার্থক্য দেখান সম্ভবপর নয়; কারণ তর্জমাকারীদের অনেকেই প্রতিভাশালী ছিলেন এবং তর্জমার সাথে নিজের ভাবধারা যুক্ত করে সৃষ্টিশীলতার পরিচয় দিয়ে গিয়েছেন।

তর্জমাকারিগণ ঃ প্রাথমিক যুগের তর্জমাকারীদের মধ্যে আবু ইয়াহিয়া ইবনুল বাত্রিক মনসুরের জন্য গ্যালেন ও হিপক্রেটিসের চিকিৎসা বিষয়ক গ্রন্থ অনুবাদ করেন। সিরীয় খ্রিষ্টান ইউহান্না হারুনুর-রশীদের জন্য বহু ডাক্তারি বই তর্জমা করেন। মামুনের সময়কার তর্জমাকারী হুনায়ন ইবন ইসহাকের কথা পূর্বে উল্লেখ করা হয়েছে। তিনি নেস্টরীয় খ্রিষ্টান ছিলেন। খলিফা মুতাদিদের সময় তারকাপূজারী ('সাবীয়ান') সাবিত ইবন কুররা গ্রীক গণিত ও জ্যোতিষ গ্রন্থ অনুবাদ করেন। সাবিতের পুত্র সিনান, পৌত্র সাবিত এবং ইব্রাহীম এবং প্রপৌত্র

আবুল ফারাজ একাধারে তর্জমাকারী ও বৈজ্ঞানিক ছিলেন। হাজ্জাজ ইবন ইউসুফ ইবন মাতার নামক পণ্ডিত ব্যক্তি ইউক্লিডের এলিমেন্টস্ এবং টলেমীর আলমাজেস্ট অনুবাদ করেন। তরজমার যুগ শেষ হবার পূর্বেই এ্যারিস্টটলের সমগ্র গ্রন্থাবলি তর্জমার মাধ্যমে আরবদের নাগালের মধ্যে এসে পড়ে। আরব লেখকগণ ন্যূনপক্ষে এ্যারিস্টটলের একশতটি গ্রন্থের উল্লেখ করে থাকেন। এ গুলির মধ্যে অবশ্য কিছু কিছু গ্রন্থ মেকী বলে প্রমাণিত হলেও গ্রীকদের এ দার্শনিকের ভাবধারার সংরক্ষণ ও সম্প্রসারণের সম্পূর্ণ কৃতিত্ব মুসলমানদের। ইউরোপ যখন অজ্ঞানতার অন্ধকারে নিমজ্জিত ছিল, তখন আরবগণ গ্রীক দর্শন ও বিজ্ঞানের লুপ্তপ্রায় সম্পদরাজিকে তাদের আপন ভাষায় রূপান্তরিত করে প্রাচীন জগতের জ্ঞানভাণ্ডারকে সযত্নে রক্ষা করেন। হিট্টি বলেন, 'যখন রশীদ ও মামুন গ্রীক ও পারসিক দর্শনের গভীরে প্রবেশ লাভ করছিলেন, তখন পাশ্চাত্যে তাঁদের সমসাময়িক শার্লিমান ও তাঁর সভাসদগণ দস্তখত লিখবার কায়দা আয়ত্ত করতে প্রয়াস পেয়ে ছিলেন বলে কথিত হয়।' গ্রীক দর্শন ও বিজ্ঞান সম্বন্ধে ইউরোপ তখন নিতান্ত অজ্ঞ ছিল। এ দীর্ঘ সুফলপ্রসূ তর্জমার যুগের পরবর্তী যুগ ছিল জ্ঞান-বিজ্ঞানে মৌলিক অবদানের যুগ। দশম শতাব্দীর মধ্যেই কুরআনের ভাষা বৈজ্ঞানিক চিন্তা ও দার্শনিক ভাবধারা প্রকাশের উপযুক্ত মাধ্যম বলে পরিগণিত হল। এ যুগে আরবি শুধু আরবদের ভাষাই রইল না। মুসলিম জগতের সব জাতি ও সম্প্রদায়ের লোকদের সাহিত্য ও সংস্কৃতির ভাষা হল আরবি। তাই এ যুগে মুসলমান, খ্রিস্টান, ইহুদি প্রভৃতি ধর্মাবলম্বী লোক, আরব, পারসিক, তুর্কী, আফ্রিকান, বার্বার প্রভৃতি জাতির লোক সমভাবে সমান উৎসাহে জ্ঞান-বিজ্ঞানের ভাণ্ডারকে সমৃদ্ধ করেছে। সকলেরই ভাবধারার বাহন ছিল আরবি।

দর্শন

আরবগণ গ্রীক ভাবধারায় অনুপ্রাণিত হয়ে দর্শনের (ফালসাফা) চর্চা আরম্ভ করেছিল। যাঁরা শুধু দর্শনের আলোচনা করতেন, তাঁদেরকে ফাইলসুফ বা দার্শনিক বলা হত; কিন্তু যাঁরা দর্শনকে ধর্মের সহায়ক হিসেবে ব্যবহার করতেন, তাঁদেরকে মুতাকাল্লিমীন (বা তার্কিক) বলা হত। এ যুগের দার্শনিকদের মধ্যে আল-কিন্দী, আল-ফারাবী এবং ইবন সীনা প্রধান।

কিন্দী

আবু ইউসুফ ইয়াকুব ইবন ইসহাক আল-কিন্দী নবম শতাব্দীর মাঝা-মাঝি কুফায় জন্মগ্রহণ করেন এবং বাগদাদে জ্ঞানচর্চা করেন। তিনি জাতিতে আরব ছিলেন বলে তাঁকে 'আরবদের দার্শনিক' বলা হয়। তিনি দর্শনে সমন্বয়বাদী ছিলেন এবং প্লেটো ও এ্যারিস্টটলের ভাবধারার সমন্বয় বিধানে প্রয়াসী ছিলেন। তিনি যে কেবল দার্শনিকই ছিলেন তা নয়, তখনকার যুগের অপরাপর মনীষীদের মত তিনি জ্যোতির্বিদ, রসায়নবিদ, চক্ষু-বিশেষজ্ঞ ও

সঙ্গীতবিশারদ ছিলেন। তিনি ২৬৫টি পুস্তক রচনা করেছিলেন বলে মনে করা হয়, কিন্তু এর অধিকাংশই বিস্মৃতির অতল গহ্বরে নিমজ্জিত হয়ে গিয়েছে। সঙ্গীতের মূল সূত্র সম্বন্ধে লিখিত তাঁর চারটি পুস্তক এখনও বিদ্যমান। দর্শন সম্বন্ধে তাঁর রচনা ল্যাটিন তর্জমায় পাওয়া যায়। 'থিওলোজিয়া' নামক এ্যারিস্টটলের পুস্তকের প্রথম অধ্যায় বলে কথিত একটি নিও-প্লেটোনীয় ভাষ্যের তর্জমার জন্য তিনি প্রাচ্য ও প্রতীচ্যে বিশেষ প্রসিদ্ধি লাভ করে ছিলেন এবং এ পুস্তক পরবর্তী যুগের ধর্মতত্ত্ব ও দর্শনের ওপর গভীর প্রভাব বিস্তার করেছিল। এ পুস্তকে তিনি আত্মা (নফ্স) আল্লাহ এবং বিশ্বজগৎ সম্বন্ধে আলোচনা করেছেন। তাঁর মতে, আত্মা অতীন্দ্রিয় এবং অবিনশ্বর। নশ্বরদেহ নষ্ট হয়ে গেলে আত্মা দেহ ত্যাগ করে চলে যায়। আল্লাহ সর্ববস্তুর আদি-কারণ।

হিট্টি বলেন, "গ্রীক দর্শনের সাথে ইসলামের সমন্বয় সাধন আরম্ভ হয় আল-কিন্দী কর্তৃক, তিনি ছিলেন একজন আরব। তুর্কী জাতীয় আলফারাবী এ সমন্বয় সাধনের কাজ এগিয়ে দেন এবং পূর্বাঞ্চলে পারসিক ইবন সীনা কর্তৃক এ কার্য সম্পূর্ণ হয়।"

ফারাবী

আল-ফারাবী ট্রান্সঅক্সিয়ানায় জন্মগ্রহণ করেন, বাগদাদে শিক্ষালাভ করেন এবং আলেপ্পোর সাইফুদ্দৌলাহ্র দরবার অলংকৃত করেন। ৯৫০ খ্রিস্টাব্দে দামিস্কে তাঁর মৃত্যু হয়। তিনি এ্যারিস্টটল ও প্লেটোর বহু গ্রন্থের ভাষ্য রচনা করেন। তিনি এ্যারিস্টটল ও প্লেটোর ভাবধারার সাথে সূফীবাদের সামঞ্জস্য বিধানের চেষ্টা করেন। তিনি আল্লাহর অস্তিত্ব প্রমাণের জন্য 'আদি কারণে'র মতবাদকে যুক্তিতর্ক সহকারে প্রতিষ্ঠিত করেন। তিনি আত্মা, আত্মার গুণাবলি এবং বুদ্ধি (আকল) সম্বন্ধে বিশদভাবে আলোচনা করেন। গ্রীক দার্শনিকদের ভাষ্য রচনা করা ছাড়াও তিনি মনস্তত্ত্ব, রাষ্ট্রনৈতিক চিন্তাধারা ও অধিবিদ্যা সম্পর্কিত বহু গ্রন্থ রচনা করেন। তিনি দ্বিতীয় শিক্ষক (আল-মুআল্লিমুস-সানী) উপাধি প্রাপ্ত হয়েছিলেন। "প্রথম শিক্ষক" বলতে আরবগণ এ্যারিস্টটলকে বুঝাত। রাষ্ট্রনৈতিক চিন্তাধারায়ও ফারাবীর অবদান রয়েছে। *'আল-মদীনাতুল ফাদিলা'* ও *'আস্-সিয়াসাতুল মাদানীয়া'* নামক গ্রন্থদ্বয়ে প্লেটোর রিপাবলিক ও এ্যারিস্টটলের পলিটিক্সের অনুকরণে তিনি একটি আদর্শ নগরীর শাসন পদ্ধতি সম্পর্কে একটি ফর্মূলা প্রণয়ন করেন। বুদ্ধিদীপ্ত ও আদর্শচরিত্র রাষ্ট্রপ্রধান এ রাষ্ট্রের অন্তর, অপরাপর কর্মকর্তাগণ এর হস্তপদ ও অন্যান্য অঙ্গ-

প্রত্যঙ্গের মত জনসাধারণের কল্যাণে রাষ্ট্র শাসন করবেন। ফারাবী চিকিৎসাবিজ্ঞান, অঙ্কশাস্ত্র এবং সঙ্গীতবিদ্যায় পারদর্শী ছিলেন। তাঁর পৃষ্ঠপোষক সাইফুদ্দৌলার সান্নিধ্যে তিনি এত নিপুণভাবে বাঁশী বাজাতেন যে, শ্রোতারা এর প্রভাবে অট্টহাস্যে ফেটে পড়ত, কিংবা অজস্রধারায় অশ্রুপাত করত অথবা নিদ্রার কোলে ঢলে পড়ত।

তৃতীয় প্রধান দার্শনিক **ইবন সীনা** (৯৮০-১০৩৭ খ্রিঃ) তাঁর দার্শনিক মতবাদের জন্য ফারাবীর নিকট ঋণী। পাশ্চাত্যে তিনি Avicenna নামে পরিচিত। তিনি বুখারায় জন্মগ্রহণ করেন এবং সমগ্র জীবন মুসলিম সাম্রাজ্যের পূর্বাঞ্চলেই অতিবাহিত করেন। আরবগণ তাঁকে 'আশ-শায়খুর-রঈস' নামে অভিহিত করে থাকে। তিনি সামানী সুলতান নূহ ইবন মনসুরকে আরোগ্য করে তাঁর প্রীতিভাজন হন এবং বিশাল রাজকীয় গ্রন্থাগারে নিজের জ্ঞান পিপাসা নিবৃত্ত করবার সুযোগপ্রাপ্ত হন। তিনি দর্শন, চিকিৎসাবিজ্ঞান, জ্যামিতি ও জ্যোতিষ-শাস্ত্র, ধর্ম ইত্যাদি বিষয়ে ৯৯টি গ্রন্থ রচনা করেছিলেন। তিনি একটি বিখ্যাত কবিতায় উচ্চমার্গ হতে দেহে আত্মার অবতরণ সম্বন্ধে বর্ণনা দান করেছেন। আল-ফারাবীর ভাবধারা অপেক্ষাকৃত প্রাঞ্জল ও বোধগম্য ভাষায় তিনি পরিবেশন করেন। তাঁর এ চিন্তার স্বচ্ছতা তাঁকে পাশ্চাত্যজগতে বিশেষ পরিচিত ও জনপ্রিয় করে তুলেছিল এবং তাঁর বহু গ্রন্থ ল্যাটিন ভাষায় অনূদিত হয়েছিল। তাঁর বিখ্যাত গ্রন্থ কিতাবুশ-শিফা একটি দার্শনিক বিশ্বকোষ। এতে গ্রীক ভাবধারা ও মুসলিম ধর্মতত্ত্বের অপূর্ব সমন্বয় ঘটেছে। তিনি মহাজগতের ঐক্য (Cosmic Unity), মানবীয় আত্মার সাথে আদিকারণের সম্পর্ক এবং সক্রিয় বুদ্ধি (আকলুল ফাআল) সম্পর্কে আলোচনা করেন। তিনি আত্মার অবিনশ্বরতা সম্পর্কেও আলোচনা করেন এবং নবুয়তের প্রয়োজনীয়তার বিষয় উল্লেখ করেন।

চিকিৎসাবিজ্ঞান ঃ মুসলিম চিকিৎসা বিজ্ঞানীদের অধিকাংশই ছিলেন পারসিক। এ ছাড়া ইহুদি ও খ্রিস্টানগণ চিকিৎসক হিসেবে বিশেষ সুনাম অর্জন করেন। এ যুগের চিকিৎসকগণ অধিকাংশই একাধারে ডাক্তার, অধি-বিজ্ঞানী, দার্শনিক এবং জ্ঞান-সাধক ছিলেন, এবং হাকিম নামে অভিহিত হতেন। চিকিৎসকগণ প্রচুর অর্থ উপার্জন করতেন। হারুনুর রশীদ, মামুন ও বার্মাকীদের চিকিৎসক নেস্টোরীয় খ্রিস্টান জিব্রীল ইবন বখতীযু ৮৮,৮০০,০০০ দিরহাম সঞ্চয় করেছিলেন বলে কথিত আছে। এ বখতীযু পরিবার ছয়-সাত পুরুষ ধরে প্রখ্যাত চিকিৎসকের জন্ম দান করে। খলিফা মুতাওয়াক্কীলের আমলে আলী আত্তাবারী

আলী আত্তাবারী নামক চিকিৎসাবিজ্ঞানী কর্তৃক লিখিত ফিরদৌসুল- হিকমা আরবি ভাষায় লিখিত প্রাচীনতম চিকিৎসাবিজ্ঞান বিষয়ক পুস্তক। আবু বকর আর-রাজী (৮৬৫-৯২৫ খ্রিঃ) ব্রাউনের মতে, মুসলমান চিকিৎসকদের মধ্যে

আর-রাজী সর্বশ্রেষ্ঠ এবং সর্বাপেক্ষা মৌলিক এবং গ্রন্থকার হিসেবে প্রচুর প্রণেতাদের অন্যতম। তাঁর সময়ে বাগদাদে যে নতুন হাসপাতাল প্রতিষ্ঠিত হয়, তিনি তার প্রধান চিকিৎসক ছিলেন। ফিহরিস্তের গ্রন্থকার তাঁর রচিত ১১৩টি প্রধান ও ২৮টি ছোটখাট পুস্তকের তালিকা দিয়েছেন। তিনি 'কিতাবুল-আসবার' নামক রসায়নবিজ্ঞানের একটি গ্রন্থ রচনা করেন। এ পুস্তক ল্যাটিন ভাষায় অনূদিত হয়ে চতুর্দশ শতাব্দী পর্যন্ত রসায়নের প্রধান পুস্তক ছিল। ঐ সময় জাবিরের রসায়ন পুস্তক আর-রাজীর এ পুস্তককে নিষ্প্রয়োজনীয় করে দেয়। তিনি সিস্তানের সামানী শাসক মনসুর ইবন ইসহাকের জন্য দশ বালামে লিখিত 'কিতাবুল-মনসুরী' রচনা করেন। এটা একটি চিকিৎসা বিষয়ক গ্রন্থ। 'কেন দক্ষ চিকিৎসকগণও সব রোগ নিরাময় করতে পারে না', 'কেন ভীত রোগীরা সহজে দক্ষ চিকিৎসকের সাহচর্য পরিহার করে', 'কেন লোকেরা দক্ষ চিকিৎসকের চেয়ে হাতুড়ে ও ভণ্ড চিকিৎসককে বেশি পছন্দ করে', কেন অজ্ঞ চিকিৎসক, আনাড়ী চিকিৎসক ও মেয়ে মানুষেরা বিদ্বান চিকিৎসকের চেয়ে বেশি কৃতকার্য হয়; এ সব নামে তাঁর হাল্কা বিষয়বস্তুর ওপর ছোটখাট বই রয়েছে। বিভিন্ন রোগ বিষয়ক গ্রন্থের মধ্যে বসন্ত রোগ ও হাম সম্পর্কে লিখিত বই বিখ্যাত। তাঁর এ গ্রন্থও ল্যাটিনে অনূদিত হয়েছে। চিকিৎসা বিজ্ঞানে তাঁর সর্বাপেক্ষা প্রধান বই আল-হাবী (الحاوى)। ১২৭৯ খ্রিস্টাব্দে সিসিলিতে এ গ্রন্থ ল্যান্টিন ভাষায় অনূদিত হয়। এ পুস্তকে গ্রীক, সিরীয়, আরব, পারসিক ও হিন্দু চিকিৎসাপদ্ধতি হতে তিনি অবলীলাক্রমে দৃষ্টান্ত আনয়ন করে পরিশেষে নিজের মতামত ও অভিজ্ঞতা সংযোজন করেছেন। বিংশতি খণ্ডে সমাপ্ত এ পুস্তকের দশ খণ্ডমাত্র এখনও বিদ্যমান। আর রাজীর এ সব গ্রন্থ ল্যাটিন ভাষায় অনূদিত হওয়ার পর মুদ্রিত হয়ে বহু শতাব্দী ধরে পাশ্চাত্য জগতে বিশেষ প্রভাব বিস্তার করে। বুওয়াইহী আমীর আদুদুদ্দৌলাহর দরবারের একজন চিকিৎসক আলী ইবন আব্বাস আল-মাজুসী (পাশ্চাত্যে হালি আব্বাস নামে পরিচিত)

আল-মাজুসী 'কিতাবুল মালিকী' নামক একটি চিকিৎসাগ্রন্থ রচনা করেন। এতে চিকিৎসাবিজ্ঞানের সাথে ব্যবহারিক চিকিৎসা

পদ্ধতির সমন্বয় সাধিত হয়েছে। এতে পথ্যাদি এবং ওষুধ-পত্র সম্পর্কে বিশেষভাবে আলোচনা করা হয়েছে। চিকিৎসাবিজ্ঞানে আর-রাজীর পরে বিখ্যাত নাম ইবন সীনা। দার্শনিক হিসেবে তাঁর সম্বন্ধে পূর্বে আমরা আলোচনা করেছি। তিনি প্রধানত দার্শনিক হলেও ইউরোপীয় চিকিৎসাবিজ্ঞানে তাঁর প্রভাব সর্বাধিক। তাঁর 'আল-কানুন ফিত-তিব্ব' গ্রন্থে গ্রীক ও আরব চিকিৎসাবিজ্ঞানের অপূর্ব সমন্বয় সাধিত হয়েছে। চিকিৎসাবিজ্ঞানের এ বিরাটকায় বিশ্বকোষে সাধারণ ওষুধ এবং মস্তক হতে পদ পর্যন্ত মানবদেহের যাবতীয় ব্যাধির বিষয় আলোচনা

ইবন সীনা

রয়েছে। এতে প্রত্যেক রোগের বৈজ্ঞানিক বিশ্লেষণ ও এর প্রতিকারের বিষয় উল্লেখ করা হয়েছে। সর্বমোট ৭৬০টি ওষুধের বিষয় এতে আলোচনা করা হয়েছে। তাঁর এ গ্রন্থ ক্রেমোনার জিরার্ড (Gerard of Cremona) কর্তৃক দ্বাদশ শতাব্দীতে ল্যাটিন ভাষায় অনূদিত হয়। এ গ্রন্থের অপূর্ব জ্ঞানভাণ্ডার, এর সুশৃঙ্খল রচনা বিন্যাস এবং দার্শনিক পরিকল্পনা শীঘ্রই চিকিৎসা-সাহিত্যে প্রসিদ্ধি অর্জন করে এবং অচিরে গ্যালেন, আর-রাজী ও আল-মাজুসীর গ্রন্থসমূহের পরিবর্তে এটাই ইউরোপের স্কুলসমূহে চিকিৎসাবিদ্যার পাঠ্য পুস্তক হিসেবে গৃহীত হয়। দ্বাদশ শতাব্দী হতে সপ্তদশ শতাব্দী পর্যন্ত এ গ্রন্থ পাশ্চাত্যে চিকিৎসাবিজ্ঞানের প্রধান অবলম্বন ছিল। ডক্টর অসলার বলেন, এ পুস্তক অন্য কোন পুস্তকের চেয়ে অধিকতর কাল ধরে 'চিকিৎসার বাইবেল' ছিল।

আলী ইবন ঈসা

একজন খ্রিস্টান চক্ষু চিকিৎসক আলী ইবন ঈসা একাদশশতাব্দীর প্রথমার্ধে বাগদাদে খ্যাতি লাভ করেন। তিনি এ বিষয়ে *'তাজকিরাতুল কাহ্হালীন'* নামক একটি গ্রন্থ প্রণয়ন করেন। এতে একশত ত্রিশ প্রকারের চক্ষুরোগের বর্ণনা রয়েছে এ গ্রন্থও হিব্রু এবং ল্যাটিন ভাষায় অনূদিত হয়েছে। মুতাদিদের আস্তাবল রক্ষক ইয়াকুব ইবন আখী হিজাম পশু-চিকিৎসা বিষয়ক একখানি পুস্তক রচনা করেন। এর একটি হস্তলিখিত প্রতিলিপি ব্রিটিশ মিউজিয়ামে রক্ষিত আছে।

এ যুগে আরবগণ রোগ নিরাময়ের জন্য ওষুধ আবিষ্কারেও বিশেষ উন্নতি সাধন করেন। তাঁরা ওষুধের দোকান, ওষুধ তৈরির কারখানা স্থাপন করেন ও

ওষুধ

ওষুধ বিষয়ক গ্রন্থ প্রণয়ন করেন। মামুন ও মুতাসিমের সময় ওষুধ প্রস্তুতকারকগণকে এক প্রকার বিশেষ পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হতে

হত। অনুরূপভাবে ডাক্তারগণকে পরীক্ষায় পাস করতে হত। খলিফা মুকতাদিরের সময় ডাক্তারদের মধ্যে দুর্নীতির ফলে সিনান ইবন সাবিতকে সকল চিকিৎসকদের পরীক্ষা নিয়ে তাঁদেরকে সার্টিফিকেট (ইজাজত) দেয়ার জন্য আদেশ করা হয়। বাগদাদে ৮৬০ ব্যক্তি এ পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন এবং এর ফলে বাগদাদ হতে হাতুড়ে ডাক্তারগণকে বিতাড়িত করা হয়। মুকতাদিরের উজীর আলী ইবন ঈসা একদল সরকারি ডাক্তারের সাহায্যে রোগগ্রস্ত লোকদেরকে বাড়ি বাড়ি ঘুরে ওষুধাদি প্রদান করতেন। কয়েকজন ডাক্তার দৈনিক জেলখানা পরিদর্শন করতেন। জনস্বাস্থ্যে এরূপ রাষ্ট্রীয় চেতনা তৎকালীন পৃথিবীর অন্যত্র নিতান্ত অজ্ঞাত ছিল। খলিফার চিকিৎসক সিনান (সাবীয়ান) কেবল চিকিৎসার মান উন্নয়ন করেই ক্ষান্ত হননি, তিনি বাগদাদের হাসপাতাল (বিমারিস্তান) দক্ষতার সাথে পরিচালনা করে বিশেষ সুখ্যাতির অধিকারী হন। বাগদাদের এ হাসপাতালের অনুকরণে সমগ্র মুসলিম জগতে ন্যূনাধিক চৌত্রিশটি হাসপাতাল গড়ে ওঠে। একাদশ শতাব্দীতে ভ্রাম্যমান হাসপাতালও দেখতে পাওয়া যায়। মেয়েদের জন্য হাসপাতালে পৃথক ওয়ার্ডের ব্যবস্থা ছিল। হাসপাতালে ডিস্পেন্সারী থাকত; কোন কোন হাসপাতালে চিকিৎসা গ্রন্থের গ্রন্থাগার থাকত এবং ব্যবহারিক চিকিৎসা বিদ্যায় শিক্ষাদান করা হত।

জ্যোতির্বিদ্যা

আরবগণ প্রাচীন হিন্দু, পারসিক ও গ্রীক জ্যোতির্বিজ্ঞানের ওপর ভিত্তি করে জ্যোতির্বিদ্যার উন্নতি সাধন করে। *'সিদ্ধান্ত'* নামক একটি জ্যোতির্বিদ্যার বই মুহম্মদ ইবন ইব্রাহীম আল-ফাজারী কর্তৃক অনূদিত হয়ে পরবর্তী পণ্ডিতগণের পথপ্রদর্শক ও সহায়ক হয়। টলেমীর আল মাজেস্টের তর্জমার কথা আগে উল্লেখ করা হয়েছে। পারসিকদের কাছ থেকে জ্যোতির্বিদ্যার নির্ঘণ্ট (যিজ) উত্তরাধিকার সূত্রে আরবদের হাতে আসে। পারস্যের জুন্দিসাবুর নামক স্থানে নবম শতাব্দীর প্রথম ভাগে নিয়মিত নিরীক্ষণ (রসদ) চলতে থাকে। মামুনের মানমন্দিরের কথা আগেই বলা হয়েছে। বাগদাদের শাম্মাসিয়া ফটকের কাছে স্থাপিত এ মানমন্দির হতে সিন্দ ইবন আলী ও ইয়াহিয়া ইবন মনসুর গ্রহ-নক্ষত্রের গতি-বিধিই নিরীক্ষণ করতেন না, বরং তাঁরা আল মাজেস্টের সূত্রগুলি পরীক্ষা করে দেখতেন এবং পৃথিবীর আকৃতি ও এর পরিধি নির্ভুলভাবে যাচাই করে দেখতেন। এ যুগের জ্যোতির্বিদদের যন্ত্রপাতির মধ্যে বৃত্তের চতুর্থাংশ (Quadrant) এস্ট্রোলেব, সূর্যঘড়ি এবং ভূগোল প্রধান ছিল। আলম ইবন ঈসা নামক একজন বৈজ্ঞানিক এস্ট্রোলেব তৈরি করে 'আস্তরলাবী'

উপাধি প্রাপ্ত হন। মুসা ইবন শাকিরের পুত্রগণ এ পরীক্ষা-নিরীক্ষায় অংশ গ্রহণ করতেন। তাঁদের নিজেদেরও মানমন্দির ছিল। খলিফা মুতাওয়াক্কিলের সময় বিখ্যাত জ্যোর্তিবিজ্ঞানী আলফারগানী '*মুদখিল*' নামক একটি গ্রন্থ রচনা করেন। এটা ১১৩৫ খ্রিস্টাব্দে ল্যাটিন ভাষায় অনূদিত হয়। বুওয়াইহী আমীর শরফুদ্দৌলাহর সময় বাগদাদে বিখ্যাত জ্যোর্তির্বিদ আল-কুহী উল্লেখযোগ্য গবেষণা চালান। আলবাত্তানী নামক সাবিয়ান জ্যোতির্বিদ গ্রহণ সম্পর্কে এবং গ্রহ-নক্ষত্রের গতিবিধি সম্পর্কে বহু তথ্য আবিষ্কার করেন। মুসলিম জগতের সর্বাপেক্ষা মৌলিক ও প্রজ্ঞাশীল মনীষী আবু রায়হান আল-বিরুনীও একজন জ্যোতির্বিদ ছিলেন। তিনি তার পৃষ্ঠপোষক মাসুদের (সুলতান মাহমুদের পুত্র) জন্য '*আল-কানুনুল-মাসউদী*' নামক জ্যোতির্বিদ্যা বিষয়ক গ্রন্থ প্রণয়ন করেন। তাঁর '*আত-তাফহীম*', জ্যামিতি, গণিত, জ্যোতির্বিদ্যা ও জ্যোতিষের একটি প্রশ্নোত্তর পুস্তক। তাঁর সর্বাপেক্ষা বিখ্যাত গ্রন্থ 'আল-আসার'। এতে তিনি প্রাচীন পঞ্জিকা ও অব্দসমূহের বিশেষ আলোচনা করেন। এ সব গ্রন্থে আল-বিরুনী পৃথিবীর গতি ও দ্রাঘিমা এবং অক্ষরেখার পরিমাপ নির্ভুলভাবে নিরূপণ করেন। সলজুক সুলতানদের মধ্যে জালালুদ্দীন মালিক শাহ্ জ্যোতির্বিদ্যার পৃষ্ঠপোষকতা করতেন। তিনি একটি মানমন্দির নির্মাণ করিয়ে পণ্ডিতদের গবেষণার সুযোগ করে দেন। তাঁর সময় পারসিক পঞ্জিকার সংস্কার করা হয়। কবি উমর খইয়াম একজন জ্যোতির্বিদও ছিলেন এবং অন্যদের সহযোগিতায় 'জালালী পঞ্জিকা'র উদ্ভাবন করেন। হালাকু খান ১২৫৯ খ্রিস্টাব্দে মারাগায় একটি মানমন্দির নির্মাণ করেন। সুবিখ্যাত জ্যোতির্বিদ নাসিরুদ্দীন তুসী এর পরিচালক ছিলেন। তিনি নতুন নির্ঘণ্ট তৈরি করেন। এগুলি সমগ্র এশিয়ায়, এমন কি চীন দেশে প্রচলিত হয়।

আরবগণ হিন্দুদের কাছ থেকে গণনাপদ্ধতি ও শূন্যের (০) ব্যবহার শিখেছিল। অচিরেই এ গণনাপদ্ধতি আরব জগতে জনপ্রিয়তা অর্জন করে। আরবগণের কাছ থেকে এ গণনাপদ্ধতি পাশ্চাত্যে প্রচলিত হয়।

গণিত

আরব লেখকগণের মধ্যে মুহম্মদ ইবন মুসা আলখাওয়ারিজমী সর্বপ্রথম এ গণনাপদ্ধতি আরবজগতে প্রচলিত করেন। কিন্তু আরবগণের মধ্যে এ গণনাপদ্ধতির সাথে সাথে পুরাতন কথায় লেখারপদ্ধতি ও গ্রীকদের অক্ষরের সাহায্যে গণনার পদ্ধতিও প্রচলিত ছিল। আল-খাওয়ারিজমী (৭৮০—৮৫০ খ্রিঃ) বিরাট গাণিতিক ও বৈজ্ঞানিক ছিলেন। তিনি জ্যোতির্বিদ্যার নির্ঘণ্ট তৈরি করেছিলেন। তিনি অঙ্কের সর্বপ্রাচীন গ্রন্থ রচনা করেন। এ্যালজেব্রা সম্পর্কিত তাঁর

গ্রন্থ *'হিসাবুল-জবর ওয়ালমুকাবলো'* ল্যাটিন তর্জমায় বিদ্যমান। ষোড়শ শতাব্দী পর্যন্ত এ গ্রন্থ ইউরোপের বিশ্ববিদ্যালয়সমূহে গণিতের প্রধান পাঠ্যপুস্তক হিসেবে ব্যবহৃত হত। এ গ্রন্থের মাধ্যমে ইউরোপে এ্যালজেব্রার চর্চা শুরু হয় এবং তাঁর গ্রন্থ হতেই এ বিষয়ের নামকরণ হয়। সুবিখ্যাত জ্যোতির্বিদ উমর খইয়াম এ্যালজেব্রা সম্বন্ধে গ্রন্থ প্রণয়ন করেন। তাঁর এ্যালজেব্রা খাওয়ারিজমীর এ্যালজেব্রা হতে উন্নত ধরনের ছিল। তিনি সমীকরণের প্রকার-ভেদ ও দ্বিতীয় পর্যায়ের সমীকরণে (Equations of the second degree) জ্যামিতির প্রয়োগ তাঁর গ্রন্থে সন্নিবেশিত করেন। আব্বাসীয় আমলের শেষ যুগের সর্বশ্রেষ্ঠ গাণিতিক ছিলেন আবুল ওয়াফা। ত্রিকোণমিতিতে তাঁর উল্লেখযোগ্য অবদান রয়েছে। তিনি খাওয়ারিজমী ও ডায়োফান্তাসের এ্যালজেব্রার ভাষ্য রচনা করেন। তিনি কেরানি ও রাজস্ব কর্মচারীদের জন্য একটি অঙ্কের বই রচনা করেন। জ্যোতির্বিদ্যায় তাঁর পরীক্ষা-নিরীক্ষার বিষয় আগেই উল্লেখ করা হয়েছে।

আরবগণের *'আল-কীমিয়া'* বর্তমান কেমিস্ট্রি বা রসায়নবিজ্ঞানের জনক। এ শব্দটি প্রাচীন মিসরীয় অথবা গ্রীক হতে উদ্ভূত বলে মনে করা হয়। মিসরীয় ও গ্রীকগণ কাল্পনিক বিষয় হিসেবে এর চর্চা করেন। আরবগণ পরীক্ষা-নিরীক্ষার মাধ্যমে একে বিজ্ঞানের পর্যায়ে উন্নীত করেন। আরবদের কীমিয়ার প্রতিষ্ঠাতা ও জন্মদাতা জাবির ইবন হাইয়ান (ল্যাটিন Geber)। তিনি ৭৭৬ খ্রিস্টাব্দের কাছাকাছি কুফায় কার্যরত ছিলেন। Max Mayerhof বলেন যে, জাবির হারুনুর রশীদের বার্মাকী উজীরদের সাথে ঘনিষ্ঠভাবে জড়িত ছিলেন বলে মনে করা হয়। ৮০৩ খ্রিস্টাব্দে এ উজীর পরিবারের পতনের সঙ্গে সঙ্গে তিনিও কুফায় নির্বাসিত হন এবং সেখানেই তাঁর মৃত্যু হয়। তাঁর মৃত্যুর দুই শতাব্দী পরে কুফার একটি রাস্তা পুনর্নির্মাণের সময় জাবিরের গবেষণাগার আবিষ্কৃত হয়। আরবি ও ল্যাটিন ভাষায় লিখিত কীমিয়ার একশত পুস্তকে গ্রন্থকার হিসেবে তাঁর নাম পাওয়া যায়। এর অনেকগুলি হিজিবিজি কুসংস্কারের গোঁজা মিল। অনেক আজেবাজে লোকের লেখা তাঁর নামে চালিয়ে দেয়া হয়েছে।

আল—কীমিয়া

কিন্তু তাঁর কয়েকটি গ্রন্থ হতে নিঃসন্দেহে প্রমাণিত হয় যে, তিনি রসায়নবিদদের মধ্যে সর্বপ্রথম হাতে-কলমে পরীক্ষার গুরুত্ব উপলব্ধি করে ছিলেন। কাজেই তিনি রসায়নের মতবাদ ও ব্যবহারিক ক্ষেত্রে উল্লেখযোগ্য উন্নতি সাধন করেন। ইউরোপীয় আল-কেমী ও কেমিস্ট্রির সমগ্র ঐতিহাসিক ধারায় তাঁর

প্রভাব পরিস্ফুট। তিনি কয়েকটি রাসায়নিক প্রক্রিয়ার বর্ণনা দিয়েছেন এবং কতকগুলি রাসায়নিক দ্রব্য আবিষ্কার করেছেন। তাঁর পুস্তকের ল্যাটিন তর্জমা হতে বহু বৈজ্ঞানিক নাম ইউরোপীয় ভাষায় গৃহীত হয়।

পরবর্তী মুসলিম রাসায়নিকগণ জাবিরকে তাঁদের শিক্ষক বলে মনে করতেন। কিন্তু পরবর্তীকালের আল-কীমিয়া বৈজ্ঞানিক পথে অগ্রসর না হয়ে কল্পনা ও বিলাসের রাজ্যে বিহার করতে থাকে। বিখ্যাত দার্শনিক ও চিকিৎসা বিজ্ঞানী আর-রাযী কীমিয়া সম্বন্ধে একটি গ্রন্থ রচনা করেছেন। এ গ্রন্থটি জাবিরের ভাবধারা অপেক্ষা অনেক উন্নত ধরনের। এতে বিভিন্ন বস্তুর শ্রেণীবিভাগ এবং রাসায়নিক প্রক্রিয়া ও যন্ত্রপাতি সম্বন্ধে উন্নতমানের আলোচনা রয়েছে।

উমাইয়া যুগে ইতিহাস রচনা আরম্ভ হলেও সেই যুগের কোন ইতিহাস পুস্তক পাওয়া যায় না। আব্বাসীয় যুগের প্রথম হতে প্রকৃত ইতিহাস রচনার কাজ

ইতিহাস ইলমুত-তাওয়ারিখ

আরম্ভ হয়। প্রথমে হাদীসের মত 'ইসনাদ পদ্ধতিতে ইতিহাস লিখিত হত। ঐতিহাসিক ঘটনার বিবরণীর উৎস বর্ণনা করতে গিয়ে নিজের সমসাময়িক কাল হতে আরম্ভ করে ঘটনার সময় পর্যন্ত বর্ণনাকারীদের নাম উল্লেখ করে যেতেন। এ পদ্ধতির সাহায্যে মূল বর্ণনাকারীর হুবহু জবানীতে ঘটনা বিবৃত হত। এ পদ্ধতি সব সময় ত্রুটিমুক্ত না হলেও ঘটনার সত্যতা উদ্ধারের জন্য ঐতিহাসিকের ঐকান্তিক আগ্রহ ও উৎকণ্ঠা এর মাধ্যমে প্রতিফলিত হয়। হিশামুল-কালবীর (মৃত্যু ৮১৯ খ্রিঃ) লেখায় প্রাক-ইসলামী যুগের কিংবদন্তী ও কাহিনী সংরক্ষিত হয়েছে। রসূলুল্লাহর (সঃ) প্রথম জীবনী গ্রন্থ লিখিত হয় ইবন ইসহাক (মৃঃ ৭৬৭ খ্রিঃ) কর্তৃক। তিনি মদীনার লোক ছিলেন। তাঁর মূলগ্রন্থ এখন আর পাওয়া যায় না। ইবন হিশাম নামক জীবনী-লেখক উক্ত গ্রন্থ অবলম্বনে পরবর্তীকালে রসূলের (স) একটি জীবনী প্রণয়ন করেন। ইবন হিশাম ৮৩৪ খ্রিস্টাব্দে কায়রোতে মৃত্যু মুখে পতিত হন। হাদীসবেত্তা ইবন শিহাব আজ-জুহরী রসূলের (স) জীবনী সম্পর্কিত বহু হাদীস সংগ্রহ করেন। এ সব হাদীসের ভিত্তিতে 'মাগাজী' গ্রন্থ (ধর্মযুদ্ধ) লিখিত হয়। মাগাজী-লিখক মুসা ইবন উক্বা (মৃঃ ৭৫৮ খ্রিঃ) এবং ওয়াকিদী (মৃঃ ৮২২ খ্রিঃ) মদীনার অধিবাসী ছিলেন। ইবন সা'দ (মৃঃ ৮৪৫ খ্রিঃ) তাবাকাত (বিভিন্ন শ্রেণীর জীবনী কোষ) রচনা করেন। এতে রসূলুল্লাহ, তাঁর সাহাবী ও তাবীয়ীনগণের জীবন সন্নিবেশিত হয়েছে। সীরাত (রসূলের জীবনী), মাগাজী ও তাবাকাত গ্রন্থে সর্বপ্রথম প্রকৃত ইতিহাস লিখন পদ্ধতি আরম্ভ হয়। নবম শতাব্দীতে ধারাবাহিক ঐতিহাসিক বিবরণী লিখার জন্য উপকরণসমূহ সংগ্রহ হয়। সীরাত, মাগাজী ও

তাবাকাত সাহিত্য ও অন্যান্য উপকরণের সাহায্যে নবম শতাব্দীতে ধারাবাহিক ইতিহাস লেখার কাজ আরম্ভ হয়। আহমদ ইবন ইয়াহিয়া আল বালাদুরী (মৃঃ ৮৯২ খ্রিঃ) তাঁর বিখ্যাত গ্রন্থ 'ফুতুহুল বুলদান' রচনা করেন। ইবন আবদুল হাকাম (মৃঃ ৮৭০ খ্রিঃ) ফুতুহুল মিসর ওয়া সাখবারুহা' রচনা করেন। পরবর্তী পর্যায়ে বিশ্ব ইতিহাস রচনা আরম্ভ হয়। কিংবদন্তী, উপাখ্যান, জীবনী, বংশ-তালিকা, ইহুদি ও খ্রিস্টান উপাখ্যান ব্যাপক ঐতিহাসিক গ্রন্থ রচনার পথ সুপ্রশস্ত করে। 'খুদাইনামা' নামক প্রাচীন পারসিক গ্রন্থ ইবনুল মুকাফফা (মৃঃ ৭৫৭ খ্রিঃ) কর্তৃক 'সিয়ারুল মুলুকুল আজম' নামে অনূদিত হয়। এখনকার ইতিহাস গ্রন্থে ইসলামী ও অনৈসলামী কাহিনী, কাল্পনিক উপাখ্যান ও ঐতিহাসিক কাহিনী পরস্পর সংযোজিত হতে থাকে এবং যে-কোন উৎস হতে যে-কোন কাহিনী ইতিহাস পুস্তকে লিপিবদ্ধ করার আগ্রহ দেখা দেয়। এ যুগের ঐতিহাসিকদের কয়েকটি প্রধান নাম তাঁদের গ্রন্থসহ নিম্নে দেয়া হল ঃ

ইবন কুতায়বা (মৃঃ ৮৮৯ খ্রিঃ) ঃ *কিতাবুল মাআরিফ*

আবু হানীফা আদ দীনাওয়ারী (মৃঃ ৮৯৫ খ্রিঃ) ঃ *আখবারুত তিওয়াল*

আল ইয়াকুবী ঃ *তারিখ*

হামজা আল ইসপাহানী ঃ (মৃঃ ৯৬১ খ্রিঃ) ঃ *তারিখ-ই-সিনি-ই-মুলুকিল-আরদ*

কিন্তু এ যুগের শ্রেষ্ঠ ঐতিহাসিক ছিলেন আবু জাফর মুহম্মদ ইবন জরীর আত-তাবারী (৮৩৮—৯২৩ খ্রিঃ)। তিনি তাঁর বিখ্যাত গ্রন্থ *'তারিখুর তরুসূল ওয়াল মুলুক'* এবং কুরআনের তফসীরের জন্য চিরস্মরণীয় হয়ে রয়েছেন। তিনি ইসলামের ঐতিহাসিক ঐতিহ্য অখণ্ড ও পূর্ণভাবে সূক্ষ্মদর্শীর বিচার-বিশ্লেষণসহ তাঁর ইতিহাস গ্রন্থে সন্নিবেশিত করেন। ইসলামের ইতিহাসের প্রাথমিক যুগের উপকরণসমূহ এত পরিপূর্ণভাবে আর কোন ঐতিহাসিক কর্তৃক সংগ্রহ ও সংকলনের চেষ্টা হয়নি। পরবর্তীকালে মিসকাওয়াইহ, ইবনুল আসীর ও আবুল ফিদা তাবারীর গ্রন্থ হতে বহু উপকরণ নিজেদের গ্রন্থে সংযোজন করেন। তিনি সৃষ্টির প্রারম্ভ হতে ৯১৫ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত ইতিহাস রচনা করেন। তিনি ইসনাদ পদ্ধতি অনুসরণ করেন। তিনি পারস্য, ইরাক, সিরিয়া ও মিসর সফর করেন। কথিত আছে, একবার তিনি মুসাফির অবস্থায় রুটির জন্য জামার আস্তিন বিক্রি করতে বাধ্য হন। তিনি চল্লিশ বছর ধরে প্রতিদিন চল্লিশ পৃষ্ঠা রচনা করেছিলেন। ধর্মীয় প্রেরণায় উদ্বুদ্ধ হয়ে তিনি যে

তাবারী

আশারীয়া' বলা হয়। এ বার ইমামের একটি তালিকা নিম্নে দেয়া হল ঃ

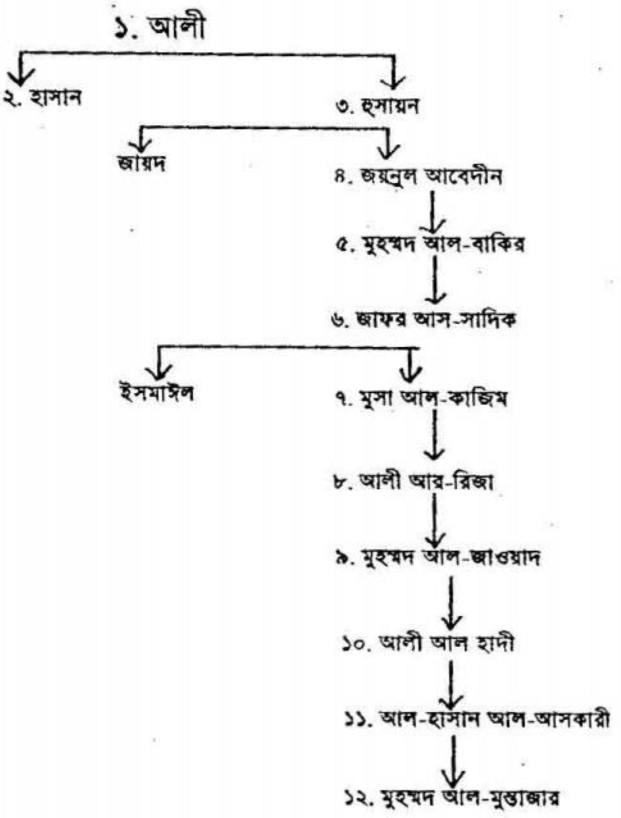

আলী, হাসান ও হুসায়ন ব্যতীত অপর নয়জন ইমাম সকলেই হুসায়নের বংশধর। এঁদের মধ্যে চারজনই বিষ প্রয়োগে নিহত হয়েছেন বলে মনে করা হয়, জাফর, মূসা, আলী আর-রিজা ও মুহম্মদ আল-জাওয়াদ। অপর চারজন যুদ্ধে নিহত হয়েছেন। দ্বাদশ ইমাম মুহম্মদ সামাররায় অদৃশ্য হয়ে যান। শিয়াদের মধ্যে এ বিশ্বাস প্রচলিত আছে যে, তিনি জীবিত আছেন এবং পৃথিবী ধ্বংস হবার পূর্বে একবার 'মাহদী' হিসেবে আত্মপ্রকাশ করবেন ও সমগ্র পৃথিবী জয় করবেন। দ্বাদশ ইমাম সর্বযুগে সর্বকালে অদৃশ্য ইমাম হিসেবে সম্মানিত হয়ে থাকেন। পারস্যের সাফাবী শাসকগণ অদৃশ্য ইমামের প্রতিনিধি হিসেবে রাজ্য শাসন করতেন এবং আলিম-মুজতাহিদগণ ইমামের প্রতিনিধি হিসেবে কাজ করতেন।

যারা ষষ্ঠ ইমাম জাফরের পর মুসা আল-কাজিমকে ইমাম বলে মানে না বরং ইমাম জাফরের জ্যেষ্ঠপুত্র ইসমাঈলকে যিনি পিতার মৃত্যুর পাঁচ বছর পূর্বে ইন্তিকাল করেন—সপ্তম ইমাম বলে স্বীকার করেন তারা 'ইসমাঈলী' নামে পরিচিত। তাদের মতে সপ্তম ইমাম ইসমাঈল অদৃশ্য ইমাম (ইমাম মুন্তাজার)। ইসমাঈলিগণ কুরআনের ব্যাপক অর্থে ও এর অভ্যন্তরীণ গোপন অর্থে বিশ্বাস করে থাকে, যারা কুরআনের এ গূঢ় রহস্য জানে না, প্রকৃতসত্য তাদের নিকট গোপন থাকে। এ মতবাদের জন্য ইসমাঈলিগণকে বাতিনীও বলা হয়।

গ্রন্থনির্দেশ

১. পি. কে. হিট্টি : *হিস্ট্রি অব দি এরাবস্।*

২. ট্রিটন : *ইসলাম।*

৩. সৈয়দ আবদুল হাই : *মুসলিম ফিলসফী।*

৪১

আব্বাসীয় যুগে শিক্ষাপদ্ধতি

মুসলমানগণ ধর্মীয় প্রয়োজনে মুসলিম জগতের সর্বত্র এক অতি উন্নত ও ব্যাপক শিক্ষা ব্যবস্থার প্রবর্তন করেছিল। জ্ঞান-বিজ্ঞানের উন্নতির সাথে সাথে এ শিক্ষা ব্যবস্থা উচ্চ পর্যায়ে বিশ্ববিদ্যালয়ে উন্নীত হয়। হযরত মুহম্মদের (স) জন্মের সময় মক্কায় খুব অল্পসংখ্যক লোকই লেখাপড়া জানত। সীমিত সংখ্যক লোকের মধ্যে জ্যোতিষ ও যাদুবিদ্যার প্রচলন ছিল। ইসলাম প্রচারের পর জ্ঞানার্জনের ওপর বিশেষ জোর দেয়া হয়। প্রথম অবতীর্ণ কুরআনের আয়াতে আল্লাহতায়ালা কর্তৃক মানুষকে জ্ঞান শিক্ষাদানের বিষয় বর্ণনা করা হয়েছে ঃ

"পড়, তোমার মহিমান্বিত প্রভু কলমের সাহায্যে শিক্ষাদান
করেছেন, মানুষকে শিক্ষা দিয়েছেন, যা তারা জানত না।"

হযরত রসূলুল্লাহ্‌র (স) হাদীস, "জ্ঞানার্জন প্রতি মুসলমান নর-নারীর জন্য অবশ্যকর্তব্য" এবং "জ্ঞানার্জন কর, যদি চীন দেশেও হয়।" জ্ঞানার্জনে মুসলমানগণকে যুগে যুগে উৎসাহিত করেছে।

মুসলমানদের শিক্ষা দুই জাতীয় শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের মাধ্যমে চালু হয়; প্রাথমিক ও উচ্চ। এ যুগে শিক্ষা প্রতিষ্ঠান ব্যক্তি বিশেষের বদান্যতায় গড়ে ওঠে। ফন ক্রেমারের মতে মুসলিম শিক্ষা-পদ্ধতি পুরামাত্রায় শিক্ষাদানের স্বাধীনতা ও বিষয়বস্তুর স্বাধীনতায় পরীক্ষা-নিরীক্ষার এক সুমহান দৃষ্টান্ত। এতে রাষ্ট্রীয় হস্তক্ষেপের দৃষ্টান্ত বিরল।

প্রাথমিক শিক্ষা মসজিদ সংলগ্ন গৃহে সম্পন্ন হত। সমগ্র মুসলিম জগতে এ ধরনের হাজার হাজার প্রাথমিক বিদ্যালয় আপনা-আপনি গড়ে ওঠে। প্রায় প্রতি মসজিদে অথবা প্রতি গ্রামে এরকম একটি বিদ্যালয় থাকত। ছয় বছর বয়সে বালক-বালিকাগণ এ বিদ্যালয়ে লেখাপড়া আরম্ভ করত। কুরআন শরীফ পাঠ ও লেখার অভ্যাস এ বিদ্যালয়ের প্রধান কাজ ছিল। লেখার অভ্যাস করা হত বলে এ সব শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের নাম দেয়া হয় 'মাকতাব' বা লেখার স্থান। এ সব মকতবে নামায পড়ার জন্য কুরআনের কিয়দংশ মুখস্থ করান হত। লেখা ও পড়ার সঙ্গে সঙ্গে আরবি ব্যাকরণ, রসূল ও সাহাবীদের সম্বন্ধীয় গল্প, কিছু অন্বয় এবং কবিতাও শিখান হত। মুখস্থ করার ওপর বিশেষ জোর দেয়া হত। ছেলে-মেয়েদেরকে

শাসন করার জন্য দৈহিক শাস্তির প্রচলন ছিল। রাজ-পরিবারের ও অভিজাত বংশের ছেলে-মেয়েদের জন্য বিশেষ শিক্ষকের ব্যবস্থা থাকত। শিক্ষকের সম্মান সম্পর্কে মুসলিম সমাজে বহু প্রবাদ ও প্রবচন প্রচলিত আছে। এ সম্বন্ধে হযরত আলীর (রা) একটি কথা প্রায়ই উল্লেখ করা হয়ে থাকে, "যিনি আমাকে এক হরফও শিক্ষা দিয়েছেন, আমি তাঁর গোলাম।" এ সত্ত্বেও মক্তবের শিক্ষক (মুআল্লিম) সমাজে বিশেষ মর্যাদার অধিকারী ছিলেন না। উচ্চস্তরের শিক্ষকগণ সর্বত্র মোটামুটি বিশেষ সমাদৃত হলেও মক্তবের শিক্ষককে বোকা ও নিম্ন মর্যাদা সম্পন্ন বলে মনে করা হত। কিন্তু তাঁরা সুদূরপ্রসারী প্রাথমিক শিক্ষা পদ্ধতির মাধ্যমে জ্ঞানালোক বিতরণের পবিত্র দায়িত্ব সম্পাদন করতেন এবং নিরক্ষরতা দূরীকরণে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করতেন।

উচ্চ শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে প্রথমদিকে ফিক্‌হ অধ্যয়ন করা হত। এ সঙ্গে মুসলিম আইনের উৎস কুরআন ও হাদীস শিক্ষাদান করা হত। ক্রমান্বয়ে উচ্চ শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে চিকিৎসা, বিজ্ঞান, ভাষাতত্ত্ব ও অঙ্ক পাঠ্যতালিকার অন্তর্ভুক্ত হয়। তবে ধর্মীয় শিক্ষার সহায়ক হিসেবে এ সব বিষয়ে শিক্ষাদান করা হত। প্রথমত, ব্যক্তি বিশেষকে কেন্দ্র করে বিশেষ বিশেষ বিষয়ে শিক্ষাদান হত। দূর-দূরান্ত হতে জ্ঞানপিপাসু ছাত্রগণ বিশেষজ্ঞের কাছে সমবেত হত এবং তাঁর কাছে শিক্ষালাভ করত। বিষয় নির্বাচনে, শিক্ষাদান পদ্ধতিতে ও ব্যক্তিগত মত প্রকাশে শিক্ষক সম্পূর্ণ স্বাধীন ছিলেন। এ শিক্ষকগণও অধিকাংশ সময় মসজিদের সাথে সংশ্লিষ্ট থাকতেন। একই ছাদের নিচে ভক্তেরা নামায আদায় করত, আলিম ও আইনজ্ঞ কুরআন ও হাদীসের ওপর বক্তৃতা করতেন এবং ভাষাবিজ্ঞানী কবিতার ব্যাখ্যাদান করতেন। বিদ্বান ব্যক্তিগণ ছাত্রগণকে শিক্ষাদান ছাড়াও মাঝে মাঝে সর্বসাধারণের জন্য বক্তৃতা দান করতেন। এ সব বক্তৃতার মাধ্যমেও উচ্চশিক্ষার প্রসার হত। এতে বক্তার খ্যাতি ও সুনাম চতুর্দিকে ছড়িয়ে পড়ত। অবারিতদ্বার এ সব বক্তৃতায় যে-কেউ আলোচনা-সমালোচনায় যোগদান করতে পারত। এভাবে উচ্চ শিক্ষার সাথে বৃহত্তর জনসাধারণের যোগাযোগ ঘটত এবং বক্তা বিপুল জনপ্রিয়তা অর্জন করতেন। একাদশ শতাব্দী পর্যন্ত এভাবে মসজিদেই উচ্চশিক্ষার জন্য উপযুক্ত স্থান ছিল।

উচ্চ শিক্ষার জন্য অচিরে মুসলিম জগতের বিভিন্ন স্থানে বিশ্ববিদ্যালয় (মাদ্রাসা) গড়ে ওঠে। এ সব শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের মধ্যে বাগদাদের নিজামীয়া সর্বপ্রথম এবং পরবর্তীকালের মাদ্রাসার জন্য এটি আদর্শস্বরূপ ছিল। ১০৬৫—৬৭ খ্রিস্টাব্দে সলজুক উজীর নিজামুল-মুলক এ মাদ্রাসা স্থাপন করেন। এ মাদ্রাসায় শাফিয়ী মাজহাব ও আশ্‌আরী মতবাদে শিক্ষাদান করা হত। এ

মাদ্রাসার ছাত্রগণ মাদ্রাসা-গৃহেই অবস্থান করত এবং অনেকেই বৃত্তি পেত। কোন কোন পাশ্চাত্য লেখকের মতে নিজামীয়ার গঠন পদ্ধতি ও নিয়মকানুন পরবর্তীকালে ইউরোপের বিশ্ববিদ্যালয়সমূহকে প্রভাবিত করেছিল। নিজামীয়া সরকারি সমর্থন ও সাহায্যপুষ্ট ছিল। সেজন্য এতে অধ্যাপকের (মুদাররিস) নিযুক্তির জন্য খলিফার অনুমোদনের প্রয়োজন ছিল বলে মনে হয়। এক সময় একজন অধ্যাপক নিযুক্ত হতেন। তাঁর অধীনে দুই বা ততোধিক সহকারী থাকতেন। এঁদেরকে মুয়ীদ (পুনরালোচনাকারী) বলা হত। এঁরা বক্তৃতার পরে কম মেধাসম্পন্ন ছাত্রদেরকে বক্তৃতার অংশবিশেষ বুঝিয়ে দিতেন। পরিব্রাজক ইবন বতুতা আসরের নামাযের পর একজন বিখ্যাত অধ্যাপকের একটি বক্তৃতা শ্রবণ করেছিলেন। অধ্যাপক উচ্চমঞ্চে দাঁড়িয়ে বক্তৃতা করলেন এবং ছাত্ররা টুলের ওপর বসে বক্তৃতা শ্রবণ করল। তারা মাগরিবের নামাজ পর্যন্ত বক্তাকে নানা লিখিত ও মৌখিক প্রশ্ন জিজ্ঞেস করে চলল। এ নিজামীয়া মাদ্রাসায় আল-গাজ্জালী(র)চার বছর পর্যন্ত বক্তৃতাদান করেন। গাজ্জালীর মতে কেবল জ্ঞানদানই শিক্ষার উদ্দেশ্য নয়, ছাত্রদের মধ্যে একটি নৈতিক চেতনা জাগ্রত করাই শিক্ষার মূল উদ্দেশ্য। বক্তৃতাগৃহে কাগজ ও কালির ব্যবস্থা ছিল, যাতে ছাত্ররা অধ্যাপকের বক্তৃতা প্রয়োজন মত টুকে নিতে পারে। নিশাপুরের এক বক্তৃতাগৃহে ৫০০ কালির দোয়াত ছিল। অধ্যাপকগণ বিশেষ সম্মানের অধিকারী ছিলেন। অন্যপক্ষে অপেক্ষাকৃত অপরিপক্ক অধ্যাপকগণকে অধ্যাপনা ত্যাগ করে পুনরায় অধ্যয়নে মনোনিবেশ করতেও দেখা যায়। ছাত্ররা অধ্যাপকগণকে গভীরভাবে শ্রদ্ধা করত এবং শিষ্যের মত তাঁদের সেবা করত। একবার নিজামীয়ার একজন অধ্যাপকের মৃত্যু হলে বাগদাদের জনসাধারণ দোকানপাট বন্ধ করে তাঁর প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদন করেন এবং ছাত্রগণ তাদের কলম ভেঙ্গে ও দোয়াত ছুঁড়ে তাদের দুঃখ প্রকাশ করে। নিজামীয়া হালাকু খানের বাগদাদ আক্রমণের পরেও টিকেছিল। পরবর্তীকালে এটা 'আল মুস্তানসিরীয়ার' সাথে একীভূত হয়ে যায়। 'আল-মুস্তানসিরীয়া' ১২৩৪ খ্রিস্টাব্দে বাগদাদে স্থাপিত হয়। খলিফা 'আল-মুস্তানসিরের নামানুসারে এর নামকরণ হয়। এ মাদ্রাসায় চার মাজহাবের ফিক্‌হ্ পড়ান হত। মাদ্রাসার ফটকদ্বারে একটি ঘড়ি ছিল। মাদ্রাসার মধ্যে হাম্মাম ও রান্নাঘর ছিল এবং এতে একটি হাসপাতাল ও গ্রন্থাগার ছিল। সলজুক উজীর নিজামুল-মুলক বাগদাদের নিজামীয়া ব্যতীত নিশাপুর ও অন্যান্য স্থানে অনুরূপ মাদ্রাসা স্থাপন করেছিলেন। এ সব মাদ্রাসাও নিজামীয়া নামে অভিহিত হত। খুরাসান, ইরাক ও সিরিয়ায় এ জাতীয় মাদ্রাসা স্থাপিত হতে থাকে। পরিব্রাজক ইবন জুবায়র বাগদাদে ত্রিশটি, দামিস্কে বিশটি ও মসুলে ছয়টি মাদ্রাসার কথা উল্লেখ করেছেন।

মসজিদ-মাদ্রাসা ব্যতীত সাহিত্যিক ও সাহিত্যামোদীদের এক প্রকার মজলিস বসত। খলিফাগণ, তাঁদের উজীর ও অন্যান্য অভিজাত শ্রেণীর লোকেরা নিজ নিজ সাধ্যমত কবি-সাহিত্যিকগণের পৃষ্ঠপোষকতা করতেন এবং সন্ধ্যার পর এ সব প্রতিভাবান লোকদের সমাবেশে 'মজলিসুল-আদাব' বা সাহিত্যানুষ্ঠান বসত। এ যুগে স্মৃতিশক্তি ও মুখস্থবিদ্যার ওপর জোর দেয়া হত। তখন ছাপাখানা ছিল না। কুতুবখানায় বা গ্রন্থাগারে বই-পুস্তক প্রচুর থাকলেও একই বইয়ের সংখ্যা সীমিত ছিল এবং সাধারণ লোকের পক্ষে বই যোগাড় করা দুঃসাধ্য ছিল। এ পরিপ্রেক্ষিতে এবং প্রাচীন আরব প্রথামত স্মৃতিশক্তির ওপর গুরুত্ব-আরোপ মুসলিম শিক্ষা ব্যবস্থার এক অবিচ্ছেদ্য অঙ্গরূপে পরিগণিত হয়েছে। কথিত আছে, আল-গাজ্জালী তিন লক্ষ হাদীস মুখস্থ করেছিলেন। ইমাম আহমদ ইবন হাম্বল এক লক্ষ হাদীস মুখস্থ করেছিলেন।

শিক্ষার সহায়ক হিসেবে মুসলমানদের মধ্যে বড় বড় কুতুবখানা স্থাপিত হয়েছিল। মসজিদগুলিতে বহু পুস্তক রাখা হত। অনেকের মৃত্যুর সময় পুস্তকাদি মসজিদের জন্য উইল করে যেতেন। সাধারণত মসজিদে ধর্মীয় পুস্তকই বেশি রাখা হত। এ ছাড়া ধনী ও অভিজাত শ্রেণীর লোকেরা আপন আপন গ্রন্থাগারে বহু বই-পুস্তক যোগাড় করে রাখতেন। বিদ্যান্বেষী ও শিক্ষার্থীকে এ সব পুস্তক পড়তে দেয়া হত। বুওয়াইহী আমীর আদুদুদ্দৌলাহ শিরাজে যে গ্রন্থাগার স্থাপন করেছিলেন, তাতে বিষয়বস্তুর ভিত্তিতে বইগুলিকে বিভিন্ন আলমারীতে সাজিয়ে রাখা হত এবং তালিকায় বইয়ের নাম লিপিবদ্ধ করা হত। সব বিষয়ে লিখিত সব গ্রন্থ এ গ্রন্থগারে স্থান পেত। রামহরমুজ ও বসরায় ঐ সময় আরও দুটি পুস্তকালয় ছিল। এখানে বইয়ের পাঠকদের জন্য বৃত্তির ব্যবস্থা ছিল। রামহরমুজের পুস্তকালয়ে একজন মুতাজিলী শায়খ মুতাজিলা মতবাদ সম্পর্কে বক্তৃতা করতেন। বিখ্যাত বুওয়াইহী উজীর সাহিব ইবন আব্বাদের বিরাট কুতুবখানা ছিল। এর পুস্তকগুলি বহন করবার জন্য চারশত ভারবাহী উটের প্রয়োজন হত। এ সব পুস্তকের তালিকাই মোটা দশ বালামে সম্পূর্ণ হয়েছিল। ফিরুজাবাদে অপর একজন বুওয়াইহী উজীরের কুতুবখানায় ৭০০০ পুস্তক ছিল। সাবুর নামক অপর উজীরের বাগদাদস্থ কুতুব খানায় ১০,৪০০ পুস্তক ছিল এবং এখানে সন্ধ্যার পর সাহিত্যিক ও কবিদের আবৃত্তি, সঙ্গীতানুষ্ঠান ও আলোচনা সভা বসত।

গ্রন্থাগার

এ যুগে বইয়ের ব্যবসাও বিশেষ চালু হয়। ছাপাখানার অভাবে হস্তলিখিত বই বিক্রয় হত। সুন্দর হস্তাক্ষরের খুব সমাদর ছিল। বই বিক্রেতাগণ নিজেরাই সুন্দর হস্তাক্ষর লিখতেন এবং বইয়ের প্রতিলিপি প্রণয়ন করতেন। কাগজের প্রচলন বইয়ের প্রসার ও প্রচারে সহায়তা করেছিল। সমরকন্দ হতে আরবগণ চীন দেশীয় বন্দীদের কাছে কাগজ প্রস্তুত কৌশল আয়ত্ত করেন। দশম শতাব্দীর মধ্যে কাগজের ব্যবহার সমগ্র মুসলিম জগতে চালু হয়।

জ্ঞানার্জনের জন্য সফর মুসলমানদের জন্য ধর্মীয় কর্তব্য বলে বিবেচিত হত। হজ্ব সমাপন উপলক্ষে মক্কায় মুসলিম জগতের বিভিন্ন অঞ্চল হতে বহু জ্ঞানী ও জ্ঞানপিপাসু লোকের সমাবেশ হত। এ ছাড়াও হাদীস সংগ্রাহকগণ বহু বাধা-বিঘ্ন ও কষ্ট স্বীকার করে স্থান হতে স্থানান্তরে ঘুরে বেড়াতেন। ভাষাবিদগণও ভাষাতত্ত্বের গবেষণার জন্য বিভিন্ন স্থানে ভ্রমণ করতেন। কুরআন শরীফের অর্থ হৃদয়ঙ্গম করার জন্য বেদুঈনদের মধ্যে বসবাস করা প্রয়োজন বলে মনে করা হত। এভাবে নানা কারণে মুসলমানগণ দেশে-বিদেশে ঘুরে বেড়াত। শিক্ষার উদ্দেশ্যে, নিতান্ত কৌতূহল পরবশ হয়ে, সত্যের অনুসন্ধানে অথবা নিছক খেয়ালের বশে বহু মুসলমান পরিব্রাজক তখনকার বিপদসংকুল ও কষ্টসাধ্য ভ্রমণযাত্রায় জীবনের বহু বছর কাটিয়ে দিত। এ সফর মুসলিম শিক্ষা পদ্ধতিকে বহুমুখী বৈচিত্র্য দান করে। নতুন ভাবধারা, নতুন মতাদর্শ অথবা নতুন আবিষ্কারের সংবাদ প্রচারের জন্য কোন পত্র-পত্রিকা তখন ছিল না বটে, কিন্তু এ পরিব্রাজক মণ্ডলী দূর হতে দূরান্তে, দেশ হতে দেশান্তরে প্রখ্যাত অধ্যাপক, আলিম অথবা বৈজ্ঞানিকের মত ও পথের ভালমন্দ বিবরণ অল্পসময়ের মধ্যে ছড়িয়ে দিত।

শিক্ষাসফর

আব্বাসীয় যুগে সমাজে অতি উচ্চ শিক্ষিত ও পরিমার্জিত রুচিসম্পন্ন একদল লোকের সৃষ্টি হয়েছিল, তাতে কোন সন্দেহ নেই। কিন্তু সাধারণ লোকের শিক্ষার মান কতখানি উঁচু ছিল, তা বলা কঠিন। তবে শিক্ষিত লোকের জ্ঞানের পরিধি খুবই ব্যাপক ছিল বলে মনে হয়। আরব্যোপন্যাসে বর্ণিত ক্রীতদাসী ও তাওয়াদ্দুদের জবানীতে যে সব জ্ঞানগর্ভ আলোচনা সন্নিবেশিত হয়েছে, তা হতে শিক্ষিত লোকের সাধারণ জ্ঞানের মান সম্বন্ধে ধারণা করা যায়। তাওয়াদ্দুদের মতে জ্ঞান দুই প্রকার—একটি সহজাত, অপরটি আয়াসলব্ধ। মানুষ চারটি উপাদানে তৈরি—পানি, মাটি, আগুন ও বায়ু। যকৃৎ দয়ার উৎস, প্লীহা হাসির উৎস এবং মূত্রাশয় ধূর্ততার উৎস। মস্তিষ্কের পাঁচটি গুণ রয়েছে— অনুভূতি, কল্পনা, ইচ্ছা, খেয়াল ও স্মৃতি। পাকস্থলী সব রোগের আকর, খাদ্য সব আরোগ্যের মূল। গ্রহ সাতটি— চন্দ্র, সূর্য, বুধ, শুক্র, মঙ্গল, বৃহস্পতি ও শনি।

শিক্ষা ও সংস্কৃতির সাধারণ মান

গ্রন্থনির্দেশ

১. পি. কে. হিট্টি : *হিস্ট্রি অব দি এরাব্‌স্*
২. খুদাবক্স : *কন্ট্রিবিউশন টু মুসলিম সিভিলাইজেশন,* প্রথম খণ্ড।

স্পেনে মুসলিম শাসন

মুসলমানদের স্পেন বিজয়

উমাইয়া খলিফা ওয়ালীদের সময় স্পেন বিজয়ের কথা পূর্বে উল্লেখ করা হয়েছে। * মুসলিম বিজয়ের প্রাক্কালে স্পেনে শাসক ও অভিজাত সম্প্রদায় এবং শাসিতদের মধ্যে বিভেদ চরম আকার ধারণ করে ছিল। প্রথমোক্ত শ্রেণীতে ছিলেন রাজা, যাজক ও সভাসদগণ, আর শেষোক্ত শ্রেণীতে ছিল মধ্যবিত্ত, ভূমিদাস, দাস ও ইহুদিগণ। দেশের রাজস্বব্যবস্থা এমন ছিল যে, অভিজাত শ্রেণী কর হতে প্রায় মুক্ত ছিল এবং মধ্যবিত্ত শ্রেণীকে করের সম্পূর্ণ বোঝা বহন করতে হত। দাস ও ভূমিদাসগণ জমিদার ও মালিকগণ কর্তৃক নানাভাবে নির্যাতিত হত। রাস্তাঘাটের অবস্থা ভাল ছিল না। দস্যু-তস্করের ভয়ে মানুষ নিরাপদে চলাফেরা করতে পারত না। ব্যবসা-বাণিজ্যে অচলাবস্থার সৃষ্টি হয়েছিল এবং দেশের অর্থনৈতিক কাঠামো ভেঙ্গে পড়বার উপক্রম হয়েছিল। ক্ষমতায় প্রতিষ্ঠিত ও সংখ্যাগুরু খ্রিস্টানগণ ইহুদিদের ওপর অত্যাচার করত। তাদেরকে খ্রিস্টান ধর্মে দীক্ষিত করার চেষ্টা করা হয়; ধর্মান্তরিত না হলে তাদের ওপর নানাভাবে নির্যাতন চালান হত। ইহুদিগণ গথ রাজার শাসনে অতিষ্ঠ হয়ে মুক্তির পথ খুঁজতেছিল। এ সময় স্পেনের ভিসিগথ রাজাকে সিংহাসনচ্যুত করে রডারিক নামক একজন সভাসদ সিংহাসন দখল করেন। পূর্ববর্তী রাজার জামাতা কাউন্ট জুলিয়ান সিউটা ও আলজিসিরাসের শাসনকর্তা ছিলেন। তিনি এবং অন্যান্য নেতৃস্থানীয় লোকেরা জবর-দখলকারী রাজার ব্যবহারে অসন্তুষ্ট হয়ে তাঁকে ক্ষমতাচ্যুত করার উপায় খুঁজছিলেন। জুলিয়ান উত্তর আফ্রিকার মুসলমান শাসনকর্তা মূসাকে স্পেন আক্রমণের জন্য উৎসাহিত করতে লাগলেন। মূসা প্রথমে তারিক নামক একজন সেনাপতিকে ১০০ অশ্বারোহী ও ৪০০ পদাতিক সৈন্যসহ ৭১০ খ্রিস্টাব্দের জুলাই মাসে তথ্যসংগ্রহ অভিযানে প্রেরণ করলেন। অতঃপর ৭১১ খ্রিস্টাব্দে সেনাপতি তারিক ইবন জিয়াদকে ৭০০০ সৈন্যসহ স্পেন বিজয়ের উদ্দেশ্যে প্রেরণ করা হল। তারিক প্রথমে যেখানে অবতরণ করেন, তার নাম তাঁরই নামানুসারে জিব্রাল্টার হয়েছে। জুলিয়ান কর্তৃক প্রদত্ত চারটি জাহাজের সাহায্যে জিব্রাল্টার প্রণালী পার হয়ে তাঁরা স্পেনের দিকে যাত্রা করলেন। সর্বমোট ১২০০০ সৈন্যসহ ৭১১ খ্রিস্টাব্দের ১৯ জুলাই তারিক

---

* ১৬শ অধ্যায় 'উমাইয়া রাজ্য বিস্তার' পার্শ্ব টীকা 'স্পেন বিজয়' দ্রষ্টব্য পৃঃ ১৮২।

রডারিকের ১ লক্ষ সৈন্যের মোকাবিলা করলেন। ওয়াদি লাক্কো (বারবেইট নদী) নদীর তীরে সাতদিন ধরে প্রচণ্ড যুদ্ধ হল। রডারিকের সৈন্যদলে ভাঙ্গন ধরল; মুসলমানদের আক্রমণে গথ বাহিনী পর্যুদস্ত হল। রডারিক যুদ্ধক্ষেত্রে নিহত কিংবা নদীগর্ভে নিমজ্জিত হলেন। ওয়াদি লাক্কোর যুদ্ধে স্পেনীয়গণের পরাজয় মুসলমান বিজয় ত্বরান্বিত করল। একে একে প্রধান শহরগুলি মুসলমানদের করতলগত হল। এলভিরা, কর্ডোভা, মালাগা, এসিজা ও সর্বশেষে গথ রাজধানী টলেডো একে একে অধিকৃত হল। স্পেনের অর্ধাংশ তারিকের অধিকারে আসল।

ওয়াদি লাক্কোর বিজয় সংবাদ মূসার নিকট পৌঁছলে তিনি তারিককে অগ্রাভিযান বন্ধ রেখে তাঁর আগমন প্রতীক্ষা করতে নির্দেশ পাঠিয়েছিলেন, কিন্তু সুচতুর তারিক তা অগ্রাহ্য করে সম্মুখে অগ্রসর হলেন। অন্যপক্ষে শত্রুকে সময় দিলে তারা সৈন্যবাহিনী পুনর্গঠন করে তাঁর নিশ্চিত বিজয়ের সম্ভাবনা বিনষ্ট করে ফেলতে পারত। কিন্তু মূসা তাঁর সহকারির এ অভাবিতপূর্ব সাফল্যে ঈর্ষান্বিত হয়ে দশ সহস্র সৈন্যসহ ৭১২ খ্রিষ্টাব্দের জুন মাসে স্পেনে উপস্থিত হলেন। তিনি ভিন্ন পথে অগ্রসর হয়ে মেডিনা, সিডোনিয়া, কারমোনা ও প্রাচীন রোমক রাজধানী সেভিল দখল করলেন। টলেডোর কাছে তিনি তারিকের সাথে সাক্ষাৎ করে আদেশ অমান্য করার অপরাধে তাঁকে কষাঘাত করলেন। তারপর আবার দুই সেনাপতির মিলিত চেষ্টায় সারাগোসা, এ্যারাগন, লিওঁ ও গ্যালিসিয়া অধিকার করলেন। এর অল্প পরে দামিস্ক হতে খলিফা মূসাকে ডেকে পাঠালেন। মূসার দামিস্ক যাত্রার দৃশ্য আরব ঐতিহাসিকগণের বর্ণনায় বিশেষ প্রাধান্য লাভ করেছে। তাঁর সাথে ছিল তাঁর কর্মচারীবৃন্দ, মুকুট পরিহিত ও সুবর্ণের কটিবন্ধে সজ্জিত চারশত ভিসিগথ যুবরাজ, অগণিত দাসবাসী ও যুদ্ধবন্দী এবং বেশুমার ধনদৌলত। খলিফা ওয়ালীদ মূসাকে মহাসমারোহে সম্বর্ধনা করলেও পরে সুলায়মান তাঁর সম্পত্তি বাজেয়াপ্ত করেন এবং তাঁকে অপমানজনক শাস্তি প্রদান করেন।

স্পেন তখন হতে খিলাফতের একটি প্রদেশ হিসেবে শাসিত হতে থাকে। মুসলমানগণ এর নাম দিল আল-আন্দালুস। মূসা তাঁর পুত্র আব্দুল আজীজকে আমীর নিযুক্ত করেছিলেন। সেভিলে রাজধানী স্থাপিত হয়। আবদুল আজীজ অচিরে আততায়ীর হাতে প্রাণ হারালে সেনাবাহিনী আইয়ুব নামক এক সেনাপতিকে নেতা মনোনীত করে। তিনি হুর নামক অপর প্রতিদ্বন্দ্বী কর্তৃক বিতাড়িত হন। হুর পিরেনীজ পর্বত অতিক্রম করেন। সামহ্ নামক সেনাপতি হুরকে অপসারিত করেন (৭১৯ খ্রিঃ)। তিনি রাজধানী কর্ডোভায় স্থানান্তরিত

করেন। তিনি সারাগোসায় একটি জুমা মসজিদ নির্মাণ করেন এবং গুয়াদাল কুইভির নদীর ওপর কর্ডোভার সেতুটি পুনর্নির্মাণ করেন। তিনি জমি নতুনভাবে জরিপ করিয়ে কর ধার্য করেন, সেপ্টিমেনিয়া ও নারবোন দখল করে মুসলিম অধিকার বিস্তৃত করেন। কিন্তু টুলো দখল করতে গিয়ে ৭২১ খিষ্টাব্দে তিনি যুদ্ধে নিহত হন।

সামহের উত্তরাধিকারী আবদুর রহমান আল-গাফিকী ৭৩২ খ্রিষ্টাব্দে পশ্চিম পিরেনীজ অতিক্রম করেন এবং ডিউক ইউডেমকে পরাজিত করে বোর্ডক্স আক্রমণ করেন। উত্তরদিকে অপ্রতিহত গতিতে অগ্রসর হয়ে তিনি টুরস নামক শহরে উপস্থিত হলেন। ডিউক ইউডেস আরবদের বিরুদ্ধে ফ্রাঙ্ক নেতা চার্লস মার্টেলের সাহায্য প্রার্থনা করলেন। টুরস ও পয়িটিয়ার্সের মধ্যবর্তী অঞ্চলে আবদুর রহমান চার্লস মার্টেলের সৈন্য বাহিনী মোকাবেলা করেন। সাত দিন ধরে উভয় সৈন্যদল পরস্পরের মুখোমুখী দাঁড়িয়ে রইল। ছোট খাট যুদ্ধ-বিগ্রহ চলছিল।

টুরসের যুদ্ধ ৭৩২ খ্রিঃ

অবশেষে আরব সেনাপতি ফ্রাঙ্ক বাহিনীকে আক্রমণ করলেন। আরব অশ্বারোহীদের প্রচণ্ড আক্রমণে ফ্রাঙ্কগণ টলটলায়মান হয়ে উঠল, কিন্তু আরবগণ গনীমতের লোভে একবার বিশৃঙ্খল হয়ে পড়লে শত্রুদের পাল্টা আক্রমণে আবদুর রহমান যুদ্ধক্ষেত্রে প্রাণ হারালেন। তাঁর উত্তরাধিকারী নির্বাচনের প্রশ্নে আরবদের মধ্যে বিভেদ দেখা দিলে তারা রাত্রির অন্ধকারে আহত সৈনিকদেরকে যুদ্ধক্ষেত্রে ফেলে পালিয়ে আসল। চার্লস আহত সৈনিকদেরকে নির্মমভাবে হত্যা করেন।

আরবদের বিরুদ্ধে বিজয়ের জন্য তিনি মার্টেল বা হাতুড়ি উপাধি লাভ করেন। মুসলমানগণ এ যুদ্ধকে 'বালাতুশ শুহাদা' বা শহীদা চত্বর নামে অভিহিত করে থাকে। এ যুদ্ধের ফলে ইউরোপে আরবদের গতি রুদ্ধ হল এবং গলে নারবোন ছাড়া আর কোন উল্লেখযোগ্য স্থান মুসলমানদের অধিকারে রইল না। চার্লস এ যুদ্ধের পর অশ্বারোহী সেনাবাহিনীর প্রয়োজনীয়তা উপলব্ধি করে আরবদের অনুকরণে অশ্বারোহী বাহিনী গঠন করবার উদ্দেশ্যে উল্লেখযোগ্য ভূমিকা গ্রহণ করেন। তিনি অশ্বারোহী সৈন্যগণকে জায়গীর দান করে ভবিষ্যৎ সামন্তবাহিনীর গোড়া পত্তন করলেন।

এ যুদ্ধের গুরুত্ব ও ফলাফল সম্পর্কে পূর্বে ঐতিহাসিকগণ যে মত পোষণ করতেন, তা এখন অনেক পরিবর্তিত হয়েছে। গিবন ও অন্যান্য ঐতিহাসিকগণ মনে করতেন যে, এ যুদ্ধে আরবগণের পরাজয় খ্রিস্টানগণকে চরম বিপর্যয়ের হাত হতে রক্ষা করেছে। আরবগণ জয়ী হলে প্যারিস ও লণ্ডনে যেখানে

গির্জাসমূহ দণ্ডায়মান রয়েছে, সেখানে আজ মসজিদ দেখা যেত এবং অক্সফোর্ড ও অন্যান্য ইউরোপীয় বিদ্যায়তনে বাইবেলের পরিবর্তে কুরআন শিক্ষা দেয়া হত। বহু ঐতিহাসিক মন্তব্য করেছেন যে, এ যুদ্ধ একটি মীমাংসক যুদ্ধ। কিন্তু হিট্টির মতে এ যুদ্ধ প্রকৃতপক্ষে কিছুই মীমাংসা করেনি। আরব অগ্রগতি গল পর্যন্ত পৌছে এর স্বতঃস্ফূর্ত ও স্বচ্ছন্দ বেগ হারিয়ে ফেলেছে। আরবদের মধ্যে গোত্রীয় বিবাদ ও দলগত বিভেদ প্রকট হয়ে উঠেছে। এর ফলেই তাদের অগ্রগতি রুদ্ধ হয়েছে। এ যুদ্ধের পরাজয় তাদের দলগত বিভেদের পরিণতি স্বরূপ। অন্য পক্ষে আরবদের অগ্রাভিযান ইউরোপে একেবারেই বন্ধ হয়ে গিয়েছে এমনও বলা যায় না। কারণ এর পরেও তারা এ্যাভিগনন ও লিওঁ আক্রমণ করেছিল এবং তারা নারবোনে ৭৫৯ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত তাদের অধিকার বজায় রাখে।

স্পেনে আরবদের মধ্যে অন্তর্দ্বন্দ্ব ক্রমান্বয়ে চরম আকার ধারণ করে। ৭৩২ খ্রিস্টাব্দ হতে ৭৫৫ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত ২৩ জন গভর্ণর স্পেন শাসন করেন। মুদার ও হিময়ারদের মধ্যে গভর্ণর পদ নিয়ে রক্তক্ষয়ী যুদ্ধ সংঘটিত হত। এ অন্তর্দ্বন্দ্বের মীমাংসার জন্য তারা ঠিক করল যে, পর্যায়ক্রমে একজন মুদার ও একজন হিময়ার এক বছর করে গভর্ণর হবেন। এ ব্যবস্থাও কার্যকরী হল না। কারণ এ ব্যবস্থানুযায়ী নিযুক্ত প্রথম মুদার গভর্নর ইউসুফ কোন ইয়ামনীকে ক্ষমতা হস্তান্তর করতে রাজি হলেন না। তিনি দশ বছর (৭৪৬—৭৫৬ খ্রিঃ) যাবৎ ক্ষমতাসীন ছিলেন। এর পর খলিফা হিশামের পৌত্র আবদুর রহমান স্পেনের আমীর হলেন।

উমাইয়া আমীরগণের শাসন (৭৫৬—১০৩১ খ্রিঃ)

প্রথম আবদুর রহমান (৭৫৬-৭৮৭ খ্রিঃ)

৭৫০ খ্রিস্টাব্দে আব্বাসীয়গণ ক্ষমতাসীন হওয়ার পর তারা উমাইয়া বংশের যাকে যেখানে পেত, নিষ্ঠুরভাবে হত্যা করত। পতিত রাজবংশের কেউ তাদের প্রতিদ্বন্দ্বিতা করতে না পারে, এ জন্য তাদের বংশ নির্মূল করাই তাদের উদ্দেশ্য ছিল। যে অল্পসংখ্যক উমাইয়া বংশের লোক আব্বাসীয়গণের কোপানল হতে রক্ষা পেয়েছিল, তন্মধ্যে খলিফা হিশামের পৌত্র আবদুর রহমান অন্যতম। পাঁচ বছর পর্যন্ত এই একুশ বছরবয়স্ক যুবক ছদ্মবেশে ও সন্তর্পণে আব্বাসীয় গুপ্তচরগণের শ্যেন দৃষ্টি এড়িয়ে প্যালেস্টাইন, মিসর ও উত্তর আফ্রিকার মধ্য দিয়ে পলায়ন করে অবশেষে স্পেনে নিরাপদ আশ্রয় স্থলে পৌছেন। ফুরাত নদীর তীরবর্তী একটি বেদুঈন শিবির হতে তাঁর যাত্রা আরম্ভ হয়। আব্বাসীয়গণ তাঁদের শিবিরের অতি সন্নিকটে পৌছেছে জানতে পেরে আবদুর রহমান তাঁর ত্রয়োদশ বর্ষীয় এক ভ্রাতার সাথে

আত্মরক্ষার শেষ প্রচেষ্টা হিসেবে নদীর স্রোতে লাফিয়ে পড়লেন। ছোট ভাই শত্রুর মিথ্যা প্রতিশ্রুতিতে ভুলে নদীবক্ষ হতে প্রত্যাবর্তন করলেন বটে, কিন্তু আব্বাসীয়গণের হাতে তাঁকে প্রাণ হারাতে হল। আবদুর রহমান আপন সংকল্পে অটুট রইলেন এবং নিরাপদে নদীর অপর পাড়ে উপস্থিত হলেন। তাঁর অনুগত ভৃত্য বদর প্যালেস্টাইনে তাঁর সাথে মিলিত হল। তখন উত্তর আফ্রিকায় স্পেনের গভর্নর ইউসূফের এক আত্মীয় শাসন করছিলেন। এ শাসনকর্তা আবদুর রহমানকে হত্যা করতে চেষ্টা করলেন। শহর হতে শহরান্তরে এবং গোত্র হতে গোত্রান্তরে আশ্রয়ের আশায় বন্ধুহীন ও কপর্দকহীন অবস্থায় ঘুরে ঘুরে আবদুর রহমান অবশেষে ৭৫৫ খ্রিস্টাব্দে মিউটায় পৌছলেন। বার্বারগণ তাঁর মাতুল বংশীয় ছিলেন এবং নিকটবর্তী অঞ্চল হতে তাঁরা তাঁকে আশ্রয় দান করলেন। সেখান হতে তিনি বদরকে স্পেনে প্রেরণ করলেন। দক্ষিণ স্পেনের ইলভিরা, জেইন ও অন্যান্য স্থানে দামিস্ক ও কিন্নিসরীনের বহু সিরীয় বাহিনী বসবাস করছিল। এদের অনেকে উমাইয়া খলিফাদের অনুগ্রহপুষ্ট ছিল। তারা আবদুর রহমানের নাম শুনে উমাইয়াদের রাজগৌরব পুনঃ প্রতিষ্ঠার স্বপ্নে মেতে উঠল। এ সিরীয় সৈনিকগণ অচিরে স্পেনের ইয়ামনী সম্প্রদায়ের লোকজনকে নিজেদের দলভুক্ত করে নিল। স্পেনে তখন মুদার বংশীয় ইউসূফ আমীর ছিলেন। ইয়ামনিগণ তাঁর প্রাধান্য পছন্দ করত না। এরা সকলে মিলে তাদের প্রতিনিধির মাধ্যমে আবদুর রহমানকে স্পেনে আসবার জন্য আহ্বান করে পাঠাল। তাদের প্রেরিত একটি জাহাজে করে আবদুর রহমান ৭৫৫ খ্রিস্টাব্দের সেপ্টেম্বর মাসে স্পেনে অবতরণ করলেন। এ সময় স্পেনের আমীর ইউসূফ এ্যারাগণ অঞ্চলে বিদ্রোহ দমনে ব্যাপৃত ছিলেন। আবদুর রহমানের স্পেনে আগমনের সংবাদ পেয়ে তিনি দ্রুত রাজধানীতে প্রত্যাবর্তন করলেন এবং তাঁর কর্মাধ্যক্ষ খালিদ ইবন জায়দের হাতে আবদুর রহমানের নিকট একটি পত্র প্রেরণ করে তাঁকে প্রচুর উপঢৌকন দিতে অঙ্গীকার করে ও তাঁর সাথে আপন কন্যার বিবাহের প্রস্তাব করে তাঁর মনোরঞ্জন করতে চেষ্টা করলেন। কিন্তু সব প্রচেষ্টাই ব্যর্থ হল। দক্ষিণ স্পেনের নগরগুলি একের পর এক আবদুর রহমানের বশ্যতা স্বীকার করল। জর্ডানের আরবগণ কর্তৃক অধ্যুষিত আর্কিডোনা, প্যালেস্টাইন আরবদের শহর সিডোনা এবং হিমসের আরবদের বাসভূমি সেভিল আবদুর রহমানকে আমীর বলে স্বীকার করে নিল এবং ৭৫৬ খ্রিস্টাব্দে মার্চ মাসের মধ্যে বিনা রক্তপাতে দক্ষিণ স্পেনে আবদুর রহমানের ক্ষমতা সুপ্রতিষ্ঠিত হল। ৭৫৬ খ্রিস্টাব্দের ১৪ মে গুয়াদাল কুইভির নদীর তীরে ইউসূফের সৈন্যবাহিনী আবদুর রহমানের বাহিনীর

মোকাবেলা করল। উভয় পক্ষে তুমুল যুদ্ধ হল। ইউসুফ পরাজিত হয়ে পলায়ন করলেন। আবদুর রহমান কর্ডোভা অধিকার করে সাধারণ ক্ষমা ঘোষণা করলেন। এর ফলে লোকেরা বিনা যুদ্ধে আত্মসমর্পণ করল। এভাবে দামিস্কে উমাইয়া বংশের পতনের ছয় বছর পরে স্পেনে উমাইয়া বংশের রাজত্ব প্রতিষ্ঠিত হল। কিন্তু কর্ডোভার ওপর স্বীয় আধিপত্য স্থাপন করলেও আবদুর রহমানের অবস্থা তখনও নিরাপদ ছিল না। পরাজিত আমীর ইউসুফ উত্তরাঞ্চলে গোলযোগ সৃষ্টি করতেছিলেন। অবশেষে তিনি টলেডোর নিকট পরাজিত ও নিহত হন। যে ইয়ামনী আরবগণ বার্বারদের সাথে মিলিত হয়ে আবদুর রহমানের স্পেনে আগমনকে অভিনন্দিত করেছিল, তারা বিদ্রোহী হল। সেভিলের ইয়ামনী শাসনকর্তা আবদুর রহমানের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্রে লিপ্ত হলে তিনি পদচ্যুত হন ও ৭৬৬ খ্রিস্টাব্দে নিহত হন। এতে বহু ইয়ামনী আরব বিদ্রোহী হল। ৭৭৪ খ্রিস্টাব্দে মায়সার নদীর তীরে তারা সম্পূর্ণরূপে পরাজিত ও নিহত হয়। টলেডোর শাসনকর্তা বিদ্রোহী হলে ৭৬৪ খ্রিস্টাব্দে নগরী অধিকৃত হয় এবং সকল বিদ্রোহী নেতার ফাঁসী হয়।

আব্বাসীয় খলিফা আল-মনসুর তাঁর উত্তর আফ্রিকার গভর্নর আলা ইবন মুগীসকে স্পেন দখল করার জন্য আদেশ দেন। খলিফা তাঁকে স্পেনের গভর্নর হিসেবে একটি নিযুক্তিপত্রও দিয়েছিলেন। তদনুসারে আলা ৭৬৩ খ্রিস্টাব্দে ইয়ামনীদের সহায়তায় বেজা প্রদেশে আব্বাসীয় কৃষ্ণ পতাকা উড্ডীন করেন। তিনি এর পর সেভিলে গমন করেন এবং সেখানকার ইয়ামনীদের সমর্থন লাভ করেন। আবদুর রহমান এ আব্বাসীয় প্রতিনিধিকে সমুচিত শাস্তি দিবার জন্য সেভিলের দিকে যাত্রা করলে আলা কারমোনা নামক শহরের দিকে গমন করেন এবং শহরটি অবরোধ করেন। আবদুর রহমান এক অতর্কিত আক্রমণে আলাকে পরাজিত ও নিহত করেন। আলার ছিন্ন মস্তক, আব্বাসীয় পতাকা ও নিযুক্তিপত্র খলিফা মনসুরের নিকট প্রেরণ করা হল। খলিফা মনসুর স্বস্তির নিশ্বাস ফেলে বলেছিলেন, "আল্লাহ্‌র শুকর যে, তিনি আমাদের মধ্যে এবং এরূপ শত্রুর মধ্যে সাগরের ব্যবধান রেখেছিলেন।"

দশ বছর ধরে বার্বারগণ আবদুর রহমানকে ব্যতিব্যস্ত করে তুলেছিল। তাদের নেতা শাকনা শান্তাব্রিয়াতে ৭৬৮ খ্রিস্টাব্দে স্বাধীনতা ঘোষণা করেন এবং দীর্ঘ নয় বছর আবদুর রহমানের বিরোধিতা করেন। সরকারি সেনাবাহিনীর আগমন সংবাদে তিনি অরণ্যে ও পর্বতে গিয়ে আশ্রয় গ্রহণ করতেন। পরিশেষে তাঁরই দলের দুজন লোক ৭৭৭ খ্রিস্টাব্দে তাঁকে হত্যা করে।

আবদুর রহমানের রাজত্বের শেষভাগে উত্তর-পূর্ব স্পেনের মুসলমান সর্দারগণ তাঁর বিরুদ্ধে একট ঐক্যজোট গঠন করে ফ্রান্সের সম্রাট শার্লিমানকে স্পেন আক্রমণ করতে উৎসাহিত করেন। এদের মধ্যে ছিলেন বার্সিলোনার গভর্নর সুলায়মান এবং প্রাক্তন স্পেনের আমীর ইউসুফের জামাতা আবদুর রহমান ইবন হাবিব। ৭৭৭ খ্রিস্টাব্দে শার্লিমান পিরেনীজ পর্বতমালা অতিক্রম করে স্পেন আক্রমণ করলেন। পরবছর (৭৭৮ খ্রিঃ) তিনি সারগোসা আক্রমণ করে প্রতিহত হন এবং ফ্রান্সের অভ্যন্তরীণ কলহের জন্য স্পেন হতে প্রত্যাবর্তন করতে বাধ্য হন। পিরেনীজ আক্রমণের সময় বাস্ক ও অন্যান্য পার্বত্য জাতি ফ্রাঙ্ক বাহিনীকে আক্রমণ করে বহু লোককে হতাহত করে। আবদুর রহমান ৭৮০ খ্রিস্টাব্দে সারাগোসা অধিকার করেন এবং বিদ্রোহী আরব নেতাদের সাথে যুদ্ধ করে ঐক্যজোট ভেঙ্গে দেন। ৭৮৮ খ্রিস্টাব্দে ৫৯ বছর বয়সে আবদুর রহমানের মৃত্যু হয়। তাঁকে কর্ডোভার রাজপ্রাসাদে সমাহিত করা হয়।

শার্লিমানের সাথে যুদ্ধ

আবদুর রহমান উত্তর আফ্রিকার বার্বারদের সাহায্যে একটি বিশাল সৈন্যবাহিনী গঠন করেন। ৪০,০০০ (মতান্তরে ২ লক্ষ)-এরও ওপর সুশৃঙ্খল ও সুশিক্ষিত সেনাবাহিনীর সাহায্যে তিনি স্পেনে তাঁর ক্ষমতা সুপ্রতিষ্ঠিত করেন। প্রাচ্যের আব্বাসী খলিফা ও পাশ্চাত্যের সম্রাট শার্লিমানের মতই তিনি ক্ষমতাসম্পন্ন ছিলেন। ৭৭৩ খ্রিস্টাব্দে তিনি স্পেনে আব্বাসীয় খলিফার নাম খুৎবা হতে অপসারিত করেন এবং স্বয়ং 'আমীরুল মুসলিমীন' উপাধি ধারণ করেন। তবে তিনি খলিফা উপাধি গ্রহণ হতে বিরত থাকেন।

আবদুর রহমান সমগ্র স্পেনে ক্ষমতা প্রতিষ্ঠিত করে আরব সর্দারদের ক্ষমতা খর্ব করেন। তাঁর সমসাময়িক আব্বাসী খলিফা মনসুর তাঁকে 'কুরায়শদের শ্যেন' বলে আখ্যায়িত করেছেন। তিনি যে দ্রুততার সাথে স্পেনে উপস্থিত হয়ে স্বীয় ক্ষমতা প্রতিষ্ঠিত করেন, সেজন্য তাঁকে এ উপাধি দেয়া হয়েছিল। তিনি স্পেনে একটি সুষ্ঠু শাসনব্যবস্থা কায়েম করেন। তাঁর শাসন ব্যবস্থা পরবর্তীকালে সম্প্রসারিত ও বর্ধিত হয়ে বহুদিন যাবৎ স্পেনে বিদ্যমান থাকে। তিনি হাজিব, কাতিব, কাজী, সাহিবুশ-শুরতা ও কায়েদ (সৈন্যাধ্যক্ষ) প্রভৃতি অফিসারের সাহায্যে শাসনকার্য চালাতেন। তিনি রাস্তাঘাটের উন্নতি বিধান করেন এবং বিশেষ দূত ও ঘোড়ার সাহায্যে দ্রুত ডাক বিলির ব্যবস্থা করেন। তিনি প্রাচীন কর্ডোভা নগরীর সংশোধন ও সম্প্রসারণ করেন। রাজধানীর পশ্চিম দিকে তিনি 'মুনইয়াতুর রুসাফা' নামক একটি প্রমোদ উদ্যান রচনা করে সেখানে ইরাক, সিরিয়া ও মিসর হতে নানা রকমের গাছ-গাছড়া ও ফলের গাছ আমদানি করেন।

ফলবৃক্ষের মধ্যে পীচ ও দাড়িম্ব প্রধান ছিল। সিরিয়া হতে আমদানিকৃত একটি তালগাছ সম্পর্কে তিনি কবিতাও রচনা করেছিলেন। তিনি আশি হাজার দীনার ব্যয়ে কর্ডোভায় একটি বিশাল জুমা মসজিদ নির্মাণ করেন। কালক্রমে এটা মক্কা ও জেরুজালেমের মতই খ্যাতি ও গুরুত্ব অর্জন করে। ১২৩৬ খ্রিস্টাব্দে ফার্ডিনাণ্ড (৩য়) এ মসজিদটিকে গির্জায় পরিণত করেন। এটা আজও 'লা মেসকুইটা' (মসজিদ) নামেই পরিচিত। তিনি কর্ডোভায় পানীয় জলের সরবরাহের জন্য একটি পয়ঃপ্রণালীর বন্দোবস্ত করেন। তিনি রাজ্যের অন্যান্য স্থানেও মসজিদ, হাম্মাম ও দুর্গ নির্মাণ করেন। তিনি বিদ্বান ও পণ্ডিত লোকের সমাদর করতেন এবং এদের সাথে সাহিত্যালোচনায় যোগদান করতে আগ্রহী ছিলেন। নবম শতাব্দী হতে একাদশ শতাব্দী পর্যন্ত স্পেন যে বিশ্বসভ্যতার অন্যতম প্রধান কেন্দ্রে পরিণত হয়েছিল, আবদুর রহমান 'আদ-দাখিল' (আগন্তুক) একাধিক উপায়ে তার সূচনা করেছিলেন। স্পেনের রাজধানী কর্ডোভা বাগদাদের প্রতিদ্বন্দ্বী ও সমকক্ষ হিসেবে জগতে প্রসিদ্ধি অর্জন করে।

আবদুর রহমানের পুত্র প্রথম হিশাম (৭৮৮—৯৬ খ্রিঃ) পিতার উত্তরাধিকারী হলেন। তিনি পণ্ডিত এবং ধার্মিক ছিলেন। ধর্মপরায়ণতার জন্য তাঁকে উমর ইবন আবদুল আজীজের সাথে তুলনা করা হয়েছে। কিন্তু হিশামের পুত্র হাকাম (১ম) আমোদ-প্রমোদ ও জাঁকজমক ভালবাসতেন। তাঁর রাজত্বকালে (৭৯৬—৮২২ খ্রিঃ) কর্ডোভার নও-মুসলিমগণ একজন বার্বার ফকীহের নেতৃত্বে তাঁর বিরুদ্ধে বিদ্রোহী হয়। বিক্ষুব্ধ জনতা হাকামকে তাঁর প্রাসাদে অবরুদ্ধ করে রাখে। কিন্তু আমীরের অশ্বারোহিগণ বিদ্রোহিগণকে বিতাড়িত করে। তিনশত নেতাকে নিষ্ঠুরভাবে হত্যা করা হয়। কর্ডোভার দক্ষিণ উপকণ্ঠে নও-মুসলিমগণ বাস করত। তাদেরকে তিন দিনের ভেতর স্পেন ত্যাগ করে চলে যেতে নির্দেশ দেয়া হয়। তাদের ঘরবাড়ি সম্পূর্ণ ধূলিসাৎ করা হয়। এ সময় আট হাজার পরিবার মরক্কোতে আশ্রয় গ্রহণ করে এবং পনর হাজার লোক আলেকজান্দ্রিয়ায় বসতি স্থাপন করে।

হাকামের পুত্র দ্বিতীয় আবদুর রহমানের রাজত্বকালে (৮২২—৫২ খ্রিঃ) অপেক্ষাকৃত শান্ত ছিল। হিট্টির মতে তিনি ছিলেন "উমাইয়া-স্পেনীয় ঐক্যের স্রষ্টা এবং সঙ্গীত ও জ্যোতির্বিদ্যার উৎসাহী পৃষ্ঠপোষক।" কথিত আছে, দ্বিতীয় আবদুর রহমান চার ব্যক্তির দ্বারা প্রভাবান্বিত হয়েছিলেন ঃ একজন স্ত্রীলোক, একজন খোজা, একজন ফকীহ ও একজন গায়ক। স্ত্রীলোকটি ছিলেন তাঁর স্ত্রী রানী তরুব। ষড়যন্ত্রে পটিয়সী এ মহিলা স্পেনের শাসনকার্যে হস্তক্ষেপ করতেন। খোজা লোকটি ছিলেন

দ্বিতীয় আবদুর রহমান (৮২২-৫২খ্রিঃ)

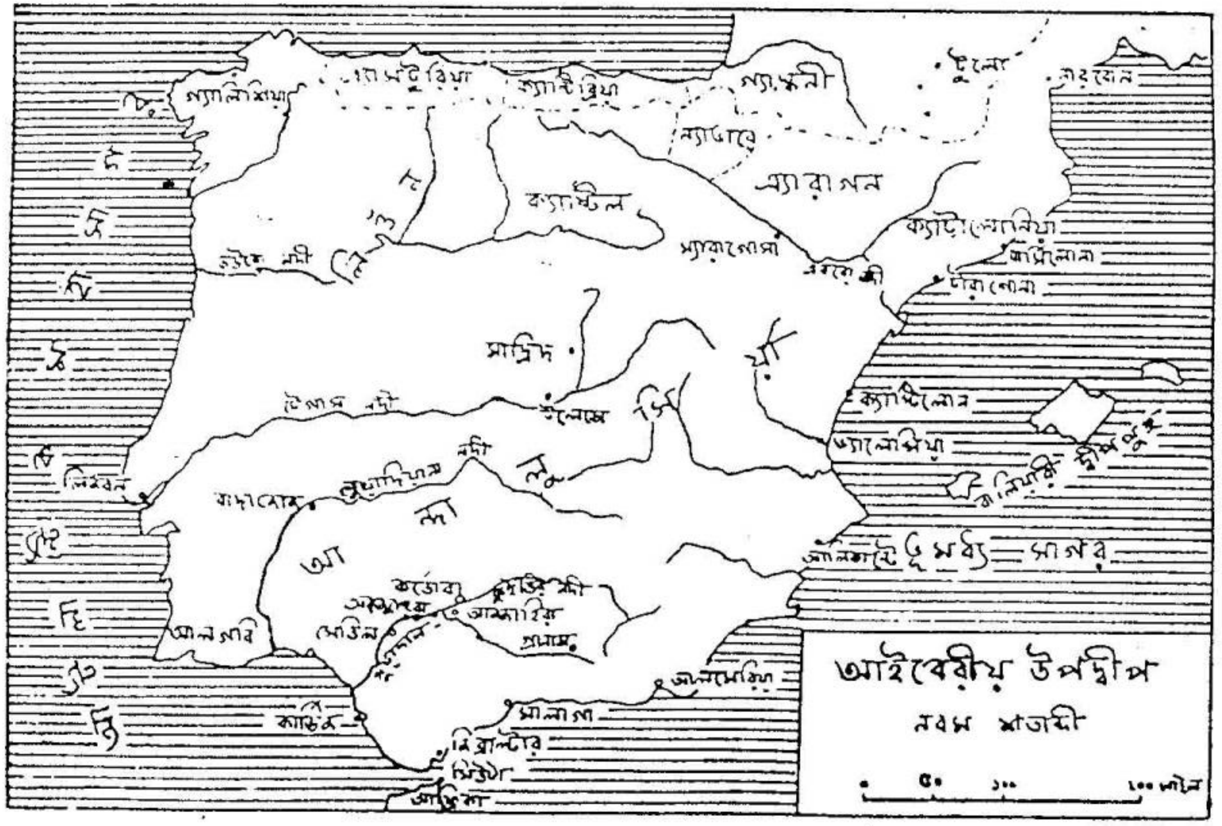

আইবেরীয় উপদ্বীপ (নবম শতাব্দী)

হাজিব (প্রাসাদাধ্যক্ষ) নাসর। তিনি রানীর বিশেষ প্রিয়পাত্র ছিলেন। আমীর আবদুর রহমান গান-বাজনায় ও কাব্যচর্চায় ভুলে থাকতেন। এর ফলে খোজা নাসর রানী তরুবের সাথে মিলিত হয়ে রাজ্যের সব শাসন ক্ষমতা কুক্ষিগত করতে সমর্থ হলেন। তৃতীয় ব্যক্তি ছিলেন ফকীহ মুহম্মদ ইয়াহিয়া ইবন ইয়াহিয়া। ইনিই প্রথম হাকামের বিরুদ্ধে গণবিদ্রোহ পরিচালনা করেছিলেন এবং আমীরকে প্রাসাদে অবরোধ করে রেখেছিলেন। ইয়াহিয়া এক্ষণে বিদ্রোহের পন্থা পরিত্যাগ করে সরকারের সাথে সহযোগিতার নীতি গ্রহণ করেন এবং এ সময় তাঁরই চেষ্টায় আন্দালুসে মালিকী মাজহাব জনপ্রিয়তা অর্জন করে। আমীর কাজী নিযুক্ত করার সময় তাঁর পরামর্শ গ্রহণ করতেন।

আমীর যে চতুর্থ ব্যক্তির প্রভাবাধীন ছিলেন, তিনি গায়ক ও সঙ্গীতজ্ঞ জিরইয়াব। তিনি প্রথমে বাগদাদে হারুনুর রশীদ ও তাঁর পুত্র আমীন ও মামুনের দরবারে ছিলেন। তিনি বিখ্যাত গায়ক ইসহাক মসুলীর কাছে সঙ্গীত শিক্ষা করেন। তিনি কালক্রমে সঙ্গীতে এত পারদর্শিতা লাভ করেন যে, তাঁর শিক্ষক ঈর্ষান্বিত হয়ে তাঁকে বাগদাদ ত্যাগ করতে বাধ্য করেন। প্রথমে তিনি উত্তর-পশ্চিম আফ্রিকায় গমন করেন। সেখান হতে তিনি কর্ডোভায় যান। দ্বিতীয় আবদুর রহমান কর্ডোভা নগরীকে বাগদাদের মত গৌরব ও জাঁকজমকপূর্ণ করে তোলার উদ্দেশ্যে যে-কোন মূল্যে সাহিত্যিক, পণ্ডিত ও গায়কগণকে নিজের দরবারে আকৃষ্ট করতে প্রয়াসী হন। তিনি স্বয়ং রাজধানী হতে বের হয়ে জিরইয়াবকে অভ্যর্থনা জানান। আমীর তাঁকে একটি প্রাসাদোপম বাসগৃহ দান করেন এবং বাৎসরিক ২৪০০০ দীনার বেতন ও অন্যান্য ভাতা প্রদান করেন। তিনি স্পেনের সব গায়ক অপেক্ষা খ্যাতি অর্জন করেন এবং দশ হাজার গানের কথা ও সুর জানতেন। এ ছাড়া তিনি একজন কবি, জ্যোতিষী এবং ভৌগোলিকও ছিলেন। তিনি একজন হাস্যরসিক এবং ফ্যাশনের প্রবর্তক ছিলেন।

আবদুর রহমানের রাজত্বের শেষভাগে কর্ডোভায় খ্রিস্টানদের মধ্যে একটি অদ্ভুত আন্দোলন আরম্ভ হয়। এই আন্দোলনের উদ্দেশ্য ছিল খ্রিস্টানদের মধ্যে আরব সংস্কৃতির বিস্তার রোধ করা। এর কারণ এ যে, স্পেনের খ্রিস্টানগণ আরবি ভাষা, সাহিত্য, রীতিনীতি ও আচার-ব্যবহারে আকৃষ্ট হয়ে আরবদের অনুকরণ আরম্ভ করে এবং অনেকে ইসলাম ধর্মে দীক্ষিত না হয়েও আরবীয় সংস্কৃতি গ্রহণ করে। এরা মোজারাব (আরবি মুস্তারাব) নামে অভিহিত হয়। সেভিলের বিশপ জন ৭২৪ খ্রিস্টাব্দে বাইবেলের একটি আরবি সংস্করণ প্রণয়ন করেন। কর্ডোভার

ধর্মান্ধ খ্রিস্টানগণ এ আরব প্রীতিরোধ করার উদ্দেশ্যে প্রকাশ্যে হযরত মুহম্মদ (স) ও ইসলাম ধর্মের বিরুদ্ধে নিন্দাবাদ করতে থাকে। এদের নেতা ছিল ইউলোজিয়াস নামক একজন খ্রিস্টান সাধু। আবদুর রহমান বিশপদের এক সভা ডেকে তাঁদের সাহায্যে এ ধরনের নিন্দাবাদের প্রতি নিষেধাজ্ঞা জারি করালেন। কিন্তু খ্রিস্টানগণ তাদের বিশপদের নিষেধাজ্ঞা অমান্য করল। ধর্মান্ধ খ্রিস্টানগণ হযরত মুহম্মদের (স) প্রতি অভিসম্পাত বর্ষণ করে প্রাণ দিতেও কুণ্ঠিত হল না। আমীর বাধ্য হয়ে এদেরকে কঠোর শাস্তি দিলেন। অনেকে বন্দী হল। এগারজন মৃত্যুদণ্ডে দণ্ডিত হল। ফ্লোরাও মেরী নামক খ্রিস্টান রমণীও মৃত্যু দণ্ডাজ্ঞা প্রাপ্ত হল। খ্রিস্টানদের মধ্যে মুহম্মদের (স) প্রতি গালিগালাজ করে স্বেচ্ছায় মৃত্যু বরণের এ হিড়িক ক্রমাগত বেড়ে চলল। এ আন্দোলন আবদুর রহমানের মৃত্যুর পরেও অব্যাহত থাকে। দীর্ঘ ত্রিশ বছর রাজত্ব করার পর ৮৫২ খ্রিস্টাব্দে আবদুর রহমানের মৃত্যু হয়।

তাঁর আমলে যোগ্য শাসক ও কর্মচারীদের সাহায্যে শাসন কার্যে শৃঙ্খলা বিধান করা হয়। তিনি বহু অট্টালিকা, মসজিদ, রাস্তাঘাট ও পুল নির্মাণ করেন। কর্ডোভার জুমা মসজিদে তিনি দুটি অলিন্দ বৃদ্ধি করেন। তিনি বিজ্ঞান বিষয়ক গ্রন্থাদি সংগ্রহের জন্য একজন পণ্ডিতকে মেসোপটেমিয়ায় প্রেরণ করেন। বিদ্বান ও শিল্পীদের সাহায্যে তিনি তাঁর দরবার অলংকৃত করেন। তিনি স্পেনে আরব ও পারসিক চাল-চলন ও আদব-কায়দা প্রবর্তন করেন। তিনি নিজেও কবি ছিলেন এবং বিশেষ দরবারে কবিদের আবৃত্তি শুনতেন।

দ্বিতীয় আবদুর রহমানের তিনজন উত্তরাধিকারী মুহম্মদ, মুনজির ও আবদুল্লাহ্‌র রাজত্বকালে বিভিন্ন প্রদেশে বিদ্রোহ দেখা দেয়। নও-মুসলিম-গণ ও বার্বারগণ এ সব বিদ্রোহের নেতা ছিল। তারা প্রদেশগুলিতে প্রায় স্বাধীন রাজ্য স্থাপন করল। দক্ষিণাঞ্চলে আর্কিডোনায় স্পেনীয় মুসলমানগণ বাৎসরিক কর দানের প্রতিশ্রুতিতে মুহম্মদের সাথে সন্ধিসূত্রে আবদ্ধ হয়ে স্বাধীনতা লাভ করল। উত্তরাঞ্চলে এ্যারাগনে বনু কাসি নামক ইসলাম ধর্মে দীক্ষিত প্রাচীন ভিসিগথ পরিবার একটি স্বাধীন রাজ্য স্থাপন করে। টলেডোর আশেপাশে বনু জুন্নুন নামক বার্বার পরিবার গোলযোগ করে বেড়াত। সেভিলে বনু হাজ্জাজ ক্ষমতাশালী হয়ে উঠল। এভাবে দক্ষিণ-পশ্চিমাঞ্চলে মেরিডা ও বাদাজোজে, আলগার্বে ও মুর্সিয়ায় স্বাধীন রাজ্যের উদ্ভব হয়। কিন্তু এ সব বিদ্রোহের চেয়ে ভয়াবহ ও বিপজ্জনক ছিল উমর ইবন হাফসুনের বিদ্রোহ। এ লোক দস্যুদলের সর্দার ছিল। বোবাস্ট্রো পাহাড়ে তার ঘাঁটি ছিল। সে স্পেনীয় মুসলমান ছিল এবং স্পেনের দক্ষিণাঞ্চলের

মুসলমান শাসনের বিরোধী আন্দোলনে সক্রিয় অংশগ্রহণ করে। দক্ষিণাঞ্চলের খ্রিস্টানগণ তাকে স্পেনের জাতীয় স্বাধীনতার অগ্রনায়ক বলে মনে করত। সে স্পেনে ক্রমাগত গোলযোগের সৃষ্টি করে আব্বাসীয় কিংবা উত্তর আফ্রিকার আগলবী বংশের শাসকদের কাছ থেকে স্পেনের গভর্নরের পদ প্রাপ্তির আশা করেছিল। এতে ব্যর্থ হয়ে সে ৮৯৯ খ্রিস্টাব্দে ইসলাম ধর্ম ত্যাগ করে পিতৃ-পিতামহের ধর্মে ফিরে গেল এবং সামুয়েল নাম গ্রহণ করল। তার বিপ্লবাত্মক কার্যকলাপের ফলে স্পেনে আরব শাসনের ভিত্তিমূল পর্যন্ত কেঁপে উঠল। স্পেনের উমাইয়া পরিবারে একজন ত্রাণকর্তার অভাব বিশেষভাবে অনুভূত হতে থাকে।

কর্ডোভার উমাইয়া খিলাফত

তৃতীয় আবদুর রহমান (৯১২—৯৬১ খ্রিঃ)

স্পেনের এরূপ সংকট সময়ে ৯১২ খ্রিস্টাব্দে মাত্র তেইশ বছর বয়সে আবদুর রহমান আমীর হলেন। তিনি যখন সিংহাসনে আরোহণ করেন, তখন আমীরের ক্ষমতা কর্ডোভা ও এর আশে-পাশে সীমাবদ্ধ হয়ে পড়ে। আবদুর রহমান বিদ্রোহীদেরকে দমন করে দেশে শান্তি ও শৃঙ্খলা স্থাপনের জন্য বদ্ধপরিকর হলেন। অরাজকতা ও গৃহযুদ্ধের ফলে শান্তিকামী জনসাধারণ বিদ্রোহী সর্দারদের ওপর বিরক্ত হয়ে উঠল এবং শান্তি পুনঃপ্রতিষ্ঠার ব্যাপারে আবদুর রহমানকে সমর্থন করতে লাগল।

আবদুর রহমান যুগোপযোগী প্রতিভা ছিলেন। অটুট সংকল্প, অদম্য সাহস ও দৃঢ় আত্ম-প্রত্যয় তাঁর চরিত্রের বৈশিষ্ট্য ছিল। দীর্ঘ পঞ্চাশ বছরের রাজত্বকালে তিনি বিদ্রোহী প্রদেশগুলিকেই পুনরধিকার করেননি, চতুর্দিকে বহুদূর পর্যন্ত বিজয়াভিযান পরিচালনা করেছিলেন। প্রথমে এসিজা দুর্গ অধিকৃত হয় (৯১২ খ্রিঃ) এবং এ প্রদেশ তাঁর অধিকারে আসে। এর পর জেইন ও এলভিরা অধিকৃত হয়। সেভিলের বনু হাজ্জাজ যুদ্ধে পরাজিত হয়ে তাঁর বশ্যতা স্বীকার করল। স্পেনের দক্ষিণাঞ্চলে নও-মুসলিম ও খ্রিস্টানগণ ইবন হাফসুনের পতাকাতলে সমবেত হয়ে স্পেনের আমীরের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করছিল। কিন্তু ইবন হাফসুন খ্রিস্টধর্ম অবলম্বন করে সামুয়েল নাম গ্রহণ করার পর হতে তার জনপ্রিয়তায় ভাটা পড়ল। নও-মুসলিমগণ খ্রিস্টান শক্তির পুনঃপ্রতিষ্ঠায় আশঙ্কিত হয়ে সামুয়েলের পক্ষ ত্যাগ করল। তারা আবদুর রহমানের সাথে শান্তি স্থাপনে উদগ্রীব হয়ে উঠল। সামুয়েল এখন শুধু খ্রিস্টান সমর্থকদের ওপর নির্ভরশীল হয়ে পড়ল। আবদুর রহমান সামুয়েলকে পরাজিত করে তার রাজ্য আক্রমণ করলেন। ৯১৭ খ্রিস্টাব্দে সামুয়েলের মৃত্যু হয়। ত্রিশ বছর ধরে সে চারজন আমীরের সাথে যুদ্ধ করেছিল। সামুয়েলের মৃত্যুর পর ৯২৭ খ্রিস্টাব্দে তার পার্বত্য দুর্গ বোবাস্ট্রো

আবদুর রহমানের দখলে আসে। মেরিডা, বেজা ও বাদাজোজ একে একে বশ্যতা স্বীকার করল। সর্বশেষে বাকি রইল প্রাচীন স্পেনীয় রাজধানী টলেডো। এ নগরের অধিবাসীরা দুর্ভিক্ষের কবলে পতিত হল। আবদুর রহমান নগর অবরোধ করে নিকটবর্তী অঞ্চলে আলফাতাহ নামক একটি শহর নির্মাণ করলেন। ৯৩২ খ্রিস্টাব্দে টলেডো অধিকৃত হয়।

বহিঃশত্রুর সাথেও আবদুর রহমানকে যুদ্ধ করতে হয়। দক্ষিণে উত্তর আফ্রিকার মুসলিম ফাতিমীয় শাসকগণ এবং স্পেনের উত্তরাঞ্চলে লিওঁর খ্রিস্টান শাসকগণ আবদুর রহমানের ক্ষমতা খর্ব করতে চেষ্টিত ছিল। ফাতিমীয় উবায়দুল্লাহ আল-মাহদী ইবন হাফসুনের সাথে দূত বিনিময় করে মিত্রতা স্থাপন করেছিলেন। আবদুর রহমান ফাতিমীয় শক্তির বিরুদ্ধে নিরাপত্তা বিধানের জন্য ৯৩১ খ্রিস্টাব্দে সিউটা দখল করেন। তিনি আল-মাবিয়া পোতাশ্রয়ে একটি শক্তিশালী নৌবহর গঠন করেন। এ নৌবহর পৃথিবীর কোন নৌবহর অপেক্ষা নিকৃষ্ট ছিল না। এটা পশ্চিম ভূমধ্যসাগরে ফাতিমীয় নৌবহরের মোকাবেলা করতে লাগল। ফাতিমীয় খলিফার আদেশে সিসিলীর একটি নৌবহর স্পেনের উপকূল আক্রমণ করলে আবদুর রহমানের সত্তরটি যুদ্ধ জাহাজের এক বহর ৯৫৬ খ্রিস্টাব্দে আফ্রিকার উপকূল আক্রমণ করে। স্পেনের উত্তরাঞ্চল কখনও মুসলমানদের অধিকারে আসেনি। তার মধ্যে 'বাস্কান' (বাস্ক) পার্বত্য জাতি মধ্যস্থলে অবস্থিত ছিল। এর পূর্বদিকে ন্যাভারে ও এ্যারাগণ অবস্থিত ছিল; পশ্চিম দিকে ছিল ক্যাস্টিল ও লিওঁ। লিওঁর রাজা ওরডনো (২য়) ৯১৪ খ্রিস্টাব্দে মুসলিম রাজ্য আক্রমণ করেন। তিন বছর পর তিনি আবদুর রহমানের এক সেনাপতিকে বন্দী করে তাঁর ছিন্ন মস্তক একটি শূকরের মস্তকের পার্শ্বে দুর্গ প্রাকারে কীলকবিদ্ধ করেন। ৯২০ খ্রিস্টাব্দে আবদুর রহমান স্বয়ং যুদ্ধাভিযানে বের হয়ে 'সান এসটেবান' নামক দুর্গ ধূলিসাৎ করেন এবং আরও কতকগুলি দুর্গ ধ্বংস করেন। এর পর তিনি ওরডনো এবং ন্যাভারের রাজা সাঞ্চোর সম্মিলিত বাহিনীর মোকাবেলা করেন এবং তাদেরকে পরাজিত করেন; ন্যাভারের কিয়দংশ ও অন্যান্য খ্রিস্টান জায়গা পদদলিত করে বিজয়োল্লাসে রাজধানীতে প্রত্যাবর্তন করেন। কিন্তু খ্রিস্টানগণ এতে নিরাশ হয়নি; ওরডনো এবং সাঞ্চো পুনরায় মুসলিম রাজ্য আক্রমণ করে বহু স্ত্রীলোক ও ছেলেমেয়েকে বন্দী করে নিয়ে গেলেন। আবদুর রহমান তাঁদেরকে আক্রমণ করে ন্যাভারের রাজধানী পর্যন্ত অগ্রসর হলেন এবং শত্রুর বহু দুর্গ ধ্বংস করলেন। তিনি সঞ্চোকে পরাজিত করে তাঁর দর্প চূর্ণ করলেন। লিওঁর রাজা ওরডানো ৯২৪ খ্রিস্টাব্দে মৃত্যুমুখে পতিত

যুদ্ধ চালিয়ে পূর্বে এ্যাব্রো নদীর মোহনা হতে পশ্চিমে আটলান্টিক মহাসাগর পর্যন্ত এবং উত্তরে পিরেনীজের পাদদেশ হতে দক্ষিণে জিব্রাল্টার পর্যন্ত সমগ্র ভূভাগে অপ্রতিহত ক্ষমতা স্থাপন করেন। কিন্তু আবদুর রহমানের গৌরব ও সুখ্যাতি তাঁর যুদ্ধজয়ের মধ্যে সীমাবদ্ধ ছিল না। তাঁর সময় জ্ঞান-বিজ্ঞান, শিল্প ও স্থাপত্য, ব্যবসা-বাণিজ্য ও কৃষির প্রভূত উন্নতি সাধিত হয়। তাঁর সুনাম ও সুখ্যাতিতে আকৃষ্ট হয়ে কনস্টান্টিনোপলের সম্রাট এবং জার্মানি, ইটালি ও ফ্রান্সের রাজারা তাঁর দরবারে দূত পাঠিয়ে স্পেনের সাথে কূটনৈতিক সম্পর্ক স্থাপন করেন। খলিফাও জার্মানির ও অন্যান্য স্থানের খ্রিস্টান রাজাদের দরবারে দূত প্রেরণ করেছিলেন।

আবদুর রহমানের সময় কর্ডোভা উন্নতির উচ্চতম সোপানে আরোহণ করে। পাঁচ লক্ষ লোক অধ্যুষিত এ নগরীতে সাতশত মসজিদ ও তিনশত হাম্মাম ছিল। কর্ডোভার তিন মাইল উত্তর-পশ্চিমে গুয়াদাল কুইভির নদীর তীরে তিনি 'আজ-জাহরা' নামক নতুন শহর ও প্রাসাদ নির্মাণ করেন। এর নির্মাণ কার্য ৯৩৬ খ্রিস্টাব্দে আরম্ভ হয়ে তাঁর মৃত্যুর পনর বছর পরে সম্পন্ন হয়। তিনি এ প্রাসাদের জন্য পঞ্চাশ লক্ষ দীনার ব্যয় করেন; নিউমিডিয়া ও কার্থেজ হতে মার্বেল আমদানি করা হয়; কনস্টান্টিনোপল হতেও নানা উপকরণ আসে। খলিফার একটি মুক্তিপ্রাপ্ত ক্রীতদাসীর নামানুসারে এর নাম 'আজ-জাহরা' রাখা হয়। এতে চারশত প্রকোষ্ঠ ছিল এবং হাজার হাজার ক্রীতদাস ও ক্রীতদাসী এবং প্রহরী এর অভ্যন্তরে বাস করত। খলিফার দেহরক্ষীদের সংখ্যা ছিল ৩৭৫০। এরা সকলে বিদেশী ক্রীতদাস ছিল। তাঁর সেনাবাহিনীর সংখ্যা ছিল এক লক্ষ।

আবদুর রহমান জ্ঞান-বিজ্ঞানের উন্নতি বিধানে বিশেষ যত্নবান ছিলেন। রাজ্যের মোট আয়ের এক-তৃতীয়াংশ জ্ঞান-বিজ্ঞানের উন্নতির জন্য ব্যয়িত হত। দার্শনিক ইবন মাসাররা, ঐতিহাসিক ইবনুল আহমার, জ্যোতির্বিজ্ঞানী আহমদ ইবন নাসর এবং মাসলামা ইবন কাশিম, চিকিৎসাবিদ আরিব ইবন সাঈদ এবং ইয়াহিয়া ইবন ইসহাক আবদুর রহমানের দরবার অলংকৃত করেছিলেন। গ্রীক ও ইহুদি পণ্ডিতগণও তাঁর দরবারে সমাদৃত হতেন। বহু গ্রীক গ্রন্থ আরবিতে অনূদিত হয় এবং বিভিন্ন বিষয়ে আরবিতে অনেক মৌলিক গ্রন্থও লিখিত হয়। খলিফার গ্রন্থাগারে বহু গ্রন্থ সংগৃহীত হয়। রাজ্যের সর্বত্র শিক্ষা প্রতিষ্ঠান ও ইয়াতিম খানা স্থাপিত হয়। কর্ডোভার বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপিত হয়। এ সময় কৃষি-কার্যের বিশেষ উন্নতি সাধিত হয়। নতুন কৃষি পদ্ধতির প্রবর্তন হয়। স্পেনের বিভিন্ন স্থানে মনোরম উদ্যান রচিত হয়।

কর্ডোভায় বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপিত হয়।

যুদ্ধ চালিয়ে পূর্বে এ্যাব্রো নদীর মোহনা হতে পশ্চিমে আটলান্টিক মহাসাগর পর্যন্ত এবং উত্তরে পিরেনীজের পাদদেশ হতে দক্ষিণে জিব্রাল্টার পর্যন্ত সমগ্র ভূভাগে অপ্রতিহত ক্ষমতা স্থাপন করেন। কিন্তু আবদুর রহমানের গৌরব ও সুখ্যাতি তাঁর যুদ্ধজয়ের মধ্যে সীমাবদ্ধ ছিল না। তাঁর সময় জ্ঞান-বিজ্ঞান, শিল্প ও স্থাপত্য, ব্যবসা-বাণিজ্য ও কৃষির প্রভূত উন্নতি সাধিত হয়। তাঁর সুনাম ও সুখ্যাতিতে আকৃষ্ট হয়ে কনস্টান্টিনোপলের সম্রাট এবং জার্মানি, ইটালি ও ফ্রান্সের রাজারা তাঁর দরবারে দূত পাঠিয়ে স্পেনের সাথে কূটনৈতিক সম্পর্ক স্থাপন করেন। খলিফাও জার্মানির ও অন্যান্য স্থানের খ্রিস্টান রাজাদের দরবারে দূত প্রেরণ করেছিলেন।

আবদুর রহমানের সময় কর্ডোভা উন্নতির উচ্চতম সোপানে আরোহণ করে। পাঁচ লক্ষ লোক অধ্যুষিত এ নগরীতে সাতশত মসজিদ ও তিনশত হাম্মাম ছিল। কর্ডোভার তিন মাইল উত্তর-পশ্চিমে গুয়াদাল কুইভির নদীর তীরে তিনি 'আজ-জাহরা' নামক নতুন শহর ও প্রাসাদ নির্মাণ করেন। এর নির্মাণ কার্য ৯৩৬ খ্রিস্টাব্দে আরম্ভ হয়ে তাঁর মৃত্যুর পনর বছর পরে সম্পন্ন হয়। তিনি এ প্রাসাদের জন্য পঞ্চাশ লক্ষ দীনার ব্যয় করেন; নিউমিডিয়া ও কার্থেজ হতে মার্বেল আমদানি করা হয়; কনস্টান্টিনোপল হতেও নানা উপকরণ আসে। খলিফার একটি মুক্তিপ্রাপ্ত ক্রীতদাসীর নামানুসারে এর নাম 'আজ-জাহরা' রাখা হয়। এতে চারশত প্রকোষ্ঠ ছিল এবং হাজার হাজার ক্রীতদাস ও ক্রীতদাসী এবং প্রহরী এর অভ্যন্তরে বাস করত। খলিফার দেহরক্ষীদের সংখ্যা ছিল ৩৭৫০। এরা সকলে বিদেশী ক্রীতদাস ছিল। তাঁর সেনাবাহিনীর সংখ্যা ছিল এক লক্ষ।

আবদুর রহমান জ্ঞান-বিজ্ঞানের উন্নতি বিধানে বিশেষ যত্নবান ছিলেন। রাজ্যের মোট আয়ের এক-তৃতীয়াংশ জ্ঞান-বিজ্ঞানের উন্নতির জন্য ব্যয়িত হত। দার্শনিক ইবন মাসাররা, ঐতিহাসিক ইবনুল আহমার, জ্যোতিবিজ্ঞানী আহমদ ইবন নাসর এবং মাসলামা ইবন কাশিম, চিকিৎসাবিদ আরিব ইবন সাঈদ এবং ইয়াহিয়া ইবন ইসহাক আবদুর রহমানের দরবার অলংকৃত করেছিলেন। গ্রীক ও ইহুদি পণ্ডিতগণও তাঁর দরবারে সমাদৃত হতেন। বহু গ্রীক গ্রন্থ আরবিতে অনূদিত হয় এবং বিভিন্ন বিষয়ে আরবিতে অনেক মৌলিক গ্রন্থও লিখিত হয়। খলিফার গ্রন্থাগারে বহু গ্রন্থ সংগৃহীত হয়। রাজ্যের সর্বত্র শিক্ষা প্রতিষ্ঠান ও ইয়াতিম খানা স্থাপিত হয়। কর্ডোভার বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপিত হয়। এ সময় কৃষি-কার্যের বিশেষ উন্নতি সাধিত হয়। নতুন কৃষি পদ্ধতির প্রবর্তন হয়। স্পেনের বিভিন্ন স্থানে মনোরম উদ্যান রচিত হয়।

কর্ডোভায় বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপিত হয়।

বহু পতিত জমি আবাদ করা হয়। সেচ ব্যবস্থার উন্নতি হয়। পাহাড়ে থাক কেটে কৃষির ব্যবস্থা করা হয়। জিনিসপত্রের দাম সস্তা হয়। ভিক্ষুক ও ভিক্ষাবৃত্তি লোপ পায়। কৃষির সঙ্গে সঙ্গে শিল্পেরও উন্নতি হয়। রেশম, সুতা, পশম, চামড়া ও ধাতব শিল্প প্রসার লাভ করে। কর্ডোভার ১৩০০০ তাঁতী ছিল। স্বর্ণ, রৌপ্য, লৌহ ও পারদের খনি হতে এ সব ধাতু উদ্ধার করা হয়। স্পেনের লোকেরা ব্যবসা-বাণিজ্যেও বিশেষ প্রশংসনীয় ভূমিকা গ্রহণ করে। আর্থিক উন্নতির ফলে রাজ্যের আয় বেড়ে যায়। বাৎসরিক ৬,২৪৫,০০০ দীনার রাজস্ব আমদানি হত। এর এক-তৃতীয়াংশ দ্বারা সৈন্যের ব্যয় নির্বাহ হত। অধিকাংশ লোক খচ্চর ও ঘোড়ায় চড়ে বেড়াত। ঐতিহাসিক হিট্টি বলেন, "পূর্বে কখনও কর্ডোভা এত উন্নতিশীল, আন্দালুস এত ধনশালী ও রাজ্য এত বিজয়মণ্ডিত হয়নি।"

দ্বিতীয় হাকাম (৯৬১—৭৬ খ্রিঃ) ঃ আবদুর রহমানের মৃত্যুর পর তাঁর পুত্র হাকাম আল-মুমতানসির বিল্লাহ উপাধি ধারণ করে খলিফা হলেন। তাঁর রাজত্বকালে উত্তরাঞ্চলের খ্রিস্টানগণ পুনরায় আন্দালুসিয়ার বিরুদ্ধে অস্ত্র ধারণ করে। আল-হাকাম সুপণ্ডিত ছিলেন এবং জ্ঞান-বিজ্ঞানের সাধনায় ব্যাপৃত থাকতেন। তথাপি তিনি খ্রিস্টান আক্রমণের সমুচিত জবাব দিবার জন্য ৯৭২ খ্রিস্টাব্দে স্বয়ং সৈন্য পরিচালনা করে তাদের আক্রমণ প্রতিহত করেন। লিওঁ ও ন্যাভারের রাজা সাঞ্চো ও গ্র্যাসিয়া তৃতীয় আবদুর রহমানের সাথে সন্ধিসূত্রে আবদ্ধ হয়েছিলেন, কিন্তু তাঁরা তাঁর মৃত্যুর পর এ সন্ধির শর্ত ভঙ্গ করেন। লিওঁর রাজা সাঞ্চো আবদুর রহমানের সহায়তায় সিংহাসনে প্রতিষ্ঠিত হয়েছিলেন। এখন সাঞ্চোর বিশ্বাসঘাতকতার সুযোগ নিয়ে তাঁর প্রতিদ্বন্দ্বী ৪র্থ ওরডনো আল-হাকামের সাহায্য প্রার্থী হলেন। ওরডনোকে সসম্মানে জাহরা প্রাসাদে অভ্যর্থনা জানান হয়। আল-হাকাম তাঁকে সাহায্য করতে প্রতিশ্রুত হলেন। কিন্তু সাঞ্চো আসন্ন বিপদের মুখে সন্ধির শর্তপূর্ণ করবার প্রতিশ্রুতি দেয়ায় হাকাম সাঞ্চোকে সিংহাসনচ্যুত না করাই সিদ্ধান্ত করলেন। ওরডনোর মৃত্যু হলে সাঞ্চো পুনরায় প্রতিশ্রুতি ভঙ্গ করলেন। আল-হাকামের সেনাপতিগণ অমিত তেজে যুদ্ধ করে সাঞ্চোকে বশ্যতা স্বীকারে বাধ্য করলেন। সাঞ্চোর দেখাদেখি খ্রিস্টান দলপতিগণ হাকামের অধীনতা স্বীকার করল। ফাতিমীয়গণের সাথেও আল-হাকামের কয়েকবার যুদ্ধ হয়। এর ফলে মৌরিটানিয়া আল-হাকামের বশ্যতা স্বীকার করে।

হাকাম জ্ঞান-বিজ্ঞানের চর্চার জন্য সমধিক প্রসিদ্ধ। তিনি বিদ্বান ছিলেন এবং বিদ্বজ্জনের সমাদর করতেন। তিনি জ্ঞানী ও পণ্ডিত ব্যক্তিদের জন্য অকাতরে অর্থব্যয় করতেন। তিনি রাজধানীতে সাতাইশটি অবৈতনিক স্কুল স্থাপন করেন।

আবদুর রহমান (৩য়) কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত কর্ডোভা বিশ্ববিদ্যালয় তাঁর সময় পৃথিবীর শিক্ষা প্রতিষ্ঠানসমূহের মধ্যে বিশিষ্ট গৌরব অর্জন করে। কায়রোর আল-আজহার এবং বাগদাদের নিজামীয়ার পূর্বেই এ বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপিত হয় এবং এতে স্পেন, ইউরোপের অন্যান্য অংশ এবং আফ্রিকা ও এশিয়া হতে ইহুদি, খ্রিস্টান ও মুসলমান ছাত্রগণ পড়াশুনা করতে আসে। হাকাম কর্ডোভার মসজিদটি সম্প্রসারণ করেন; এ মসজিদেই বিশ্ববিদ্যালয়টি অবস্থিত ছিল। তিনি এর মধ্যে সীসার পাইপের মধ্য দিয়ে পানি আনয়ন করেন এবং একে মোজাইকে সুসজ্জিত করেন। আন্দালুসিয়ার এমন কোন ছোট বড় শহর ছিল না, যেখানে স্কুল ছিল না। এ ছাড়া প্রধান শহরে উচ্চ শিক্ষার জন্য প্রতিষ্ঠান ছিল। সেভিল, মালাগা, সারাগোসা ও জেইনের উচ্চ বিদ্যালয়সমূহ কর্ডোভার অনুকরণেই স্থাপিত হয়েছিল। এগুলিকেও বিশ্ববিদ্যালয় বলা যায়।

হাকাম কর্ডোভা বিশ্ববিদ্যালয়ের জন্য মুসলিম প্রাচ্য হতে সুযোগ্য অধ্যাপক মণ্ডলীকে আহ্বান করে এনেছিলেন। তাঁদের বেতনের জন্য তিনি ওয়াকফ নির্ধারণ করেন। কর্ডোভার বিখ্যাত অধ্যাপকদের মধ্যে ঐতিহাসিক ও ব্যাকরণবিদ ইবনুল-কুতিয়া এবং বাগদাদের বিখ্যাত ভাষাতত্ত্ববিদ আবু আলী আল-কালীর নাম বিশেষ উল্লেখযোগ্য। আবু আলীর রচিত *'কিতাবুল আমালী'* এখনও আরবি ভাষাভাষী অঞ্চলে পঠিত হয়। আবু আলীর প্রজ্ঞা ও পাণ্ডিত্য সর্বজন-স্বীকৃত হলেও তাঁর মঞ্চভীতি সম্পর্কে চমৎকার গল্প প্রচলিত আছে। কথিত আছে, তাঁকে খলিফা আবদুর রহমানের দরবারে আগত বাইজান্টাইন দূতের সম্মানে আয়োজিত সম্বর্ধনা সভায় বক্তৃতা দিতে বলায় তিনি ভূমিকায় 'হামদ ও নাত' (আল্লাহর প্রশংসা ও রসূলের গুণগান) ছাড়া আর কিছুই বলতে পারলেন না। এ দুইজন অধ্যাপক ছাড়া ফকীহ আবু ইব্রাহীম ও আবু বকর ইবন মুয়াবিয়াও কর্ডোভার বিশ্ববিদ্যালয় অলংকৃত করেছিলেন। শেষোক্ত অধ্যাপক হাদীস ও আইন বিষয়ে বক্তৃতা করতেন। হাকামের দরবারের পণ্ডিত ব্যক্তিদের মধ্যে 'কিতাবুল-আইন' নামক অভিধান রচয়িতা আবু বকর আজ-জুবায়দীর নাম করা যেতে পারে। হাকাম একে শাহজাদা হিশামের জন্য গৃহশিক্ষক হিসেবে নিযুক্ত করেছিলেন। হাকামের প্রধান চিকিৎসক ছিলেন আবু আবদুল্লাহ আল-উজরী।

আল-হাকাম ও তাঁর ভ্রাতা আবদুল্লাহ তাঁদের পিতার জীবদ্দশায় আপন আপন গ্রন্থাগার স্থাপন করেছিলেন। এখন হাকাম পিতার গ্রন্থাগার ও তাঁদের গ্রন্থাগার দুটিকে একত্র করে একটি বৃহৎ কুতুবখানা গঠন করেন। তিনি বহু অর্থ ব্যয়ে মূল্যবান ও দুষ্প্রাপ্য পুস্তকাদি সংগ্রহ করেন। পুস্তক সংগ্রহে তাঁর নিষ্ঠা

অতুলনীয় ছিল। পুস্তকের অন্বেষণে তাঁর প্রতিনিধিগণ আলেকজান্দ্রিয়া, দামিস্ক ও বাগদাদের পুস্তকের দোকানসমূহ তন্ন তন্ন করে খুঁজে বেড়াত। তারা পুস্তক ক্রয় করত কিংবা পুস্তকের প্রতিলিপি প্রস্তুত করিয়ে নিত। কেউ খলিফাকে কোন দুষ্প্রাপ্য গ্রন্থ উপহার দিলে তিনি অত্যন্ত সন্তুষ্ট হতেন। রাজকীয় লাইব্রেরির পুস্তকের সংখ্যা অন্যূন ৪০০,০০০ (মতান্তরে ৬০০,০০০) ছিল। এ সব পুস্তকের তালিকা ৪৪টি খণ্ডেও সমাপ্ত হয়নি। প্রতিখণ্ডে কেবল কাব্য ও কবিতার গ্রন্থের নাম লিখতেই ২০ পাতা লেগেছিল। পালিশ-করা চন্দন কাঠের নির্মিত আলমারীতে বইগুলি রাখা হত। পুস্তকের প্রতিলিপি প্রস্তুত, বাঁধাই ও সোনালি হরফে নাম খোদাইয়ের জন্য পার্শ্ববর্তী প্রকোষ্ঠসমূহে বহুলোক নিযুক্ত হত। বড় বড় শহরে সাধারণ পাঠাগারও ছিল। এগুলি সরকারি খরচে চলত। মাত্র কর্ডোভাতেই এরকম সত্তরটি সাধারণ পাঠাগার ছিল। খলিফার উৎসাহে কর্ডোভা নগরীতে বিরাট পুস্তক ব্যবসায়ও গড়ে ওঠে। জহুরীর দোকান, কাপড়-চোপড়ের দোকান ও অন্যান্য দোকান-পাটের মত পুস্তকের দোকানেও বহু গ্রাহকের সমাবেশ হত। কোন খ্যাতনামা গ্রন্থকারের পুস্তকের প্রথম কপি সংগ্রহ করার জন্য ক্রেতাদের মধ্যে প্রতিযোগিতা দেখা দিত। খলিফা নিজে প্রচুর দাম দিয়ে এরূপ বিখ্যাত লেখকের গ্রন্থ যোগাড় করতেন। '*কিতাবুল আগানীর*' রচয়িতা আবুল ফরাজ ইস্পাহানীর এ গ্রন্থের জন্য খলিফা হাকাম এক হাজার দীনার দিয়েছিলেন। ইস্পাহানী উমাইয়া বংশোদ্ভূত ছিলেন এবং সানন্দে তাঁর পুস্তকের একটি কপি ইরাক হতে স্পেনে পাঠিয়ে দিয়েছিলেন।

হাকাম কেবল পুস্তকের সংগ্রাহকই ছিলেন না, তিনি নিজেও একজন সুপণ্ডিত ব্যক্তি ছিলেন। মুসলমান খলিফাদের মধ্যে এবং তাঁর সমসাময়িক রাজা-বাদশাহদের মধ্যে তিনি সর্বশ্রেষ্ঠ পণ্ডিত ছিলেন। তিনি বইয়ের নিয়মিত পাঠক ছিলেন এবং পুস্তকের পৃষ্ঠার প্রান্তে নিজ হাতে মন্তব্য লিখতেন। এ মন্তব্য সম্বলিত পুঁথি-পুস্তকগুলি পরবর্তীকালে পণ্ডিত ব্যক্তিদের বিশেষ উপকারে আসত। তিনি ইতিহাস, জীবনী ও বংশতত্ত্বে বিশেষ পারদর্শী ছিলেন।

তাঁর বদান্যতা ও পৃষ্ঠপোষকতায় স্পেনে জ্ঞান-বিজ্ঞানের চরমোৎকর্ষ সাধিত হয়। তাঁর তত্ত্বাবধানে বহু গ্রীক গ্রন্থ আরবিতে অনূদিত হয়। স্কুল-মাদ্রাসার বৃদ্ধি, পাঠাগারের প্রাচুর্য ও বই-পুস্তকের প্রতুলতা আন্দালুসে সাধারণ শিক্ষার মান বাড়িয়ে দেয়। এশিয়া, আফ্রিকা ও ইউরোপের সম্মিলিত জ্ঞানের ভাণ্ডার কর্ডোভায় বুদ্ধিজীবী মহলের গোচরীভূত হয়। আন্দালুসিয়ার সাধারণ শিক্ষার মান সম্বন্ধে

সুপণ্ডিত ডোজী মন্তব্য করেছেন যে, এ সময় আন্দালুসিয়ায় প্রায় প্রত্যেক লোক লিখতে ও পড়তে জানত।" অথচ খ্রিস্টীয় ইউরোপে এ সময় মাত্র পুরোহিত শ্রেণীর মধ্যেই লেখাপড়া সীমাবদ্ধ ছিল। তা ছাড়া খুব অল্পলোকই সামান্য লেখাপড়া জানত।

খলিফা জনহিতকর কাজেও বিশেষ আগ্রহী ছিলেন। তিনি রাস্তাঘাটের সংস্কার করেন এবং পথিকের জন্য কূপ ও সরাইখানার ব্যবস্থা করেন। রাজ্যের সর্বত্র কূপ, সরাইখানা, হাম্মাম ও বাজার নির্মাণ করান হয়। তিনি উদ্যান রচনায় উৎসাহী ছিলেন এবং জনসাধারণকে উদ্যান তৈরি করতে উৎসাহিত করতেন। তিনি বহু অর্থব্যয়ে কর্ডোভার মসজিদের সম্প্রসারণ করেন। পণ্ডিত, জ্ঞানী, ধর্মপরায়ণ, দানশীল, বিদ্যোৎসাহী ও সহনশীল খলিফা আন্দালুসের সার্বিক কল্যাণ সাধন করে কর্ডোভাকে মুসলিম জগতের তৃতীয় জ্ঞানকেন্দ্রে উন্নীত করে গিয়েছেন।

উমাইয়া খিলাফতের পতন

হাকামের (দ্বিতীয়) মৃত্যুর পর তাঁর পুত্র দ্বিতীয় হিশাম বার বছর বয়সে খলিফা হলেন। হিশামের মাতা সুবহ্ এবং তাঁর উজীর মুহম্মদ ইবন আবি আমীর রাজ্যে সর্বময় কর্তৃত্ব স্থাপিত করেছিলেন। অচিরেই ইবন আবি আমীর বালক খলিফাকে বন্দী করে নিজেই শাসনকার্য চালাতে লাগলেন। তিনি হাজিব আলমনসুর নামেই সমধিক পরিচিত। তিনি উত্তরাঞ্চলের খ্রিস্টান শাসকদের সাথে যুদ্ধ করে তাঁদের ক্ষমতা খর্ব করেন। ১০০২ খ্রিস্টাব্দে তাঁর মৃত্যু হয়। কিন্তু আন্দালুসের খিলাফতের পূর্বগৌরব আর ফিরে আসল না। বার্বার, আরব, স্লাভ ও স্পেনীয়দের কলহে কর্ডোভার গৌরব-রবি ক্রমাগত অস্তাচলে ঢলে পড়তে লাগল। প্রথমে হাজিব আল-মনসুরের পুত্রদের মধ্যে কলহ, পরে দ্বিতীয় হিশামের পুনরায় সিংহাসনারোহণ ও সিংহাসন ত্যাগ এবং উমাইয়া বংশের দুর্বল ও অযোগ্য খলিফাদের সিংহাসন লাভ ও শোচনীয় পরিণতি উমাইয়া খিলাফতের চরম অবনতি সূচিত করে। শেষ খলিফা তৃতীয় হিশাম ১০৩১ খ্রিস্টাব্দে সিংহাসন ত্যাগ করতে বাধ্য হন। ইবন জওহর নামক একজন নেতার অধীনে গঠিত রাষ্ট্রীয় পরিষদ খলিফার কার্যভার গ্রহণ করে।

হাজিব আল-মনসুর

কর্ডোভার গৌরব

স্পেনে উমাইয়া বংশের শাসন পৌণে তিনশত বছর (৭৫৬—১০৩১ খ্রিঃ) স্থায়ী হয়েছিল। এ সময় রাজধানী কর্ডোভা ইউরোপের সর্বশ্রেষ্ঠ সংস্কৃতি কেন্দ্রে পরিণত হয় এবং বাগদাদ ও কনস্টান্টিনোপলের সাথে সমগ্র পৃথিবীর তিনটি সংস্কৃতি কেন্দ্রের অন্যতম বলে বিবেচিত হয়। এর এক লক্ষ তের হাজার গৃহ, একুশটি উপশহর, সত্তরটি লাইব্রেরি ও অগণিত বইয়ের দোকান, মসজিদ ও প্রাসাদ এর আন্তর্জাতিক খ্যাতি বৃদ্ধি করেছিল। পর্যটক মাত্রেই কর্ডোভার সমৃদ্ধি ও জাঁকজমক দেখে বিস্ময়ে অভিভূত হত। নগরীতে মাইলের পর মাইল পাকা রাস্তা ছিল। পার্শ্ববর্তী গৃহসমূহ হতে রক্ষিত আলোকবর্তিকা দ্বারা এ রাস্তাগুলি রাত্রিতে আলোকিত হত। অথচ "এরও সাতশত বছর পরে লণ্ডনে সরকারি বাতি বলতে কিছুই ছিল না" কিংবা "প্যারিসে বহু শতাব্দী পরে যে, কেউ বৃষ্টির দিনে নিজের দোর-গোড়ার বাইরে পা বাড়াত, তার পায়ের গোড়ালি পর্যন্ত কাদায় ডুবে যেত।" যখন অক্সফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয়ে গোসল করাকে অখ্রিস্ট আচরণ বলে হেয় মনে করা হত, তখন কর্ডোভার বৈজ্ঞানিকগণ তাঁদের জমকালো বাসগৃহে হামামখানায় গোসলের আনন্দ উপভোগ করতেন। লিওঁ, নেভারে কিংবা বার্সিলোনের শাসকগণ যখনই কোন শল্য চিকিৎসক, স্থপতি, সঙ্গীতবিশারদ বা পোশাক প্রস্তুতকারক চাইতেন, তখন তাঁদেরকে কর্ডোভার শরণাপন্ন হতে হত। শুধু তাই নয়, নানাপ্রকার শিল্পে স্পেন পারদর্শিতা লাভ করেছিল। কেবল কর্ডোভাতেই তের হাজার তন্তুবায় বয়ন শিল্পে নিয়োজিত ছিল। চর্মশিল্প কর্ডোভা হতে মরক্কোতে এবং সেখান হতে ইউরোপে প্রসার লাভ করে। পশম ও রেশম শিল্প কর্ডোভা, মালাসা ও আলমারিয়ায় সমৃদ্ধি লাভ করে। দামিনু হতে বিভিন্ন ধাতুর কাজ স্পেনে প্রবর্তিত হয়। ধাতুর ওপর স্বর্ণ ও রৌপ্যের কাজ ও ফুলের কাজ বিশেষ নিপুণতার সাথে সম্পাদিত হয়। কৃষিকার্যেও উমাইয়াদের সময় প্রভূত উন্নতি সাধিত হয়। ধান, গম, ইক্ষু, তুলার চাষ ছাড়া নানা রকম ফল যেমন— আঙ্গুর, পীচ, এ্যাপরিকট, কমলালেবু এবং আনারও প্রচুর পরিমাণে উৎপন্ন হত। উমাইয়াগণ উত্তম সেচ ব্যবস্থার সাহায্যে ফলন বাড়িয়ে স্পেনকে সমৃদ্ধিশালী রাজ্যে পরিণত করেন। কৃষির উন্নতি আন্দালুসিয়ায় আরবগণের বিশেষ অবদান। উদ্বৃত্ত ফসল ও শিল্পজাত দ্রব্য স্পেন হতে দামিস্ক, মক্কা ও বাগদাদে রপ্তানি হত।

আইবেরীয় উপদ্বীপ (মধ্য দ্বাদশ শতাব্দী)

ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র রাজবংশ (মুলুকুত-তাওয়ায়িফ)

বনু আব্বাদ (১০২৩-৯১ খ্রিঃ)

উমাইয়া বংশের প...নের পর আন্দালুসিয়ায় ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র রাজবংশের উদ্ভব হয়। এদের মধ্যে সেভিলের বনু আব্বাদ বিখ্যাত। এ বংশের শাসকগণ হিরার লখমী বংশোদ্ভূত বলে দাবি করতেন। এ বংশের স্থাপয়িতা মুতাদিদ একজন কবি ও সাহিত্যানুরাগী ছিলেন। তাঁর পুত্র মুতামিদ (১০৬৮—১০৯১ খ্রিঃ) সর্বকালের আরব কবিদের মধ্যে শ্রেষ্ঠ। তিনি "ক্ষুদ্র রাজাদের মধ্যে সর্বাপেক্ষা দানশীল, সর্বাপেক্ষা জনপ্রিয় এবং সর্বাপেক্ষা শক্তিশালী ছিলেন। তাঁর উজীর ইবন আম্মারও একজন কবি ছিলেন। তাঁর স্ত্রী ইতিমাদ গুণবতী ও সুন্দরী রমণী ছিলেন। তিনি প্রথমে একজন ক্রীতদাসী ছিলেন। একবার বাদশাহ উজীরের সাথে গুয়াদাল কুইভির নদীর তীরে বেড়াচ্ছিলেন। মৃদুমন্দ সমীরণে নদীর পানি নড়ে উঠতে দেখে বাদশাহ এক পংক্তি কবিতা রচনা করে পরবর্তী পঙক্তি পূর্ণ করবার জন্য উজীরের দিকে চেয়েছিলেন। তখন নদীতে কাপড় ধৌত করতে করতে একজন ক্রীতদাসী পঙক্তিটি পূর্ণ করলেন। খলিফা এঁর গুণে মুগ্ধ হয়ে এঁর পাণি-গ্রহণ করলেন। এঁরই নাম ইতিমাদ এবং বাদশাহও এ নাম হতে মুতামিদ নাম গ্রহণ করেছিলেন বলে মনে করা হয়। বাদশাহ রানীর বহু আবদার মিটিয়েছিলেন। একবার কর্ডোভায় বরফ পড়তেছিল। রানী বাদশাহকে অনুরোধ জানালেন যে, এ তুষারপাতের দৃশ্যকে কি করে অনুকরণ করা যায়। বাদশাহ নগরীর উপকণ্ঠে বাদামগাছ লাগিয়ে দিলেন। এ বাদামের সাদা ফুল শীতের শেষে তুষার পাতের দৃশ্যের অনুরূপ প্রতীয়মান হল। আর একবার বেদুঈন রমণীরা কর্দমাক্ত রাস্তায় তাদের কাপড়ের প্রান্ত তুলে ধরে দুধের পাত্র নিয়ে হেঁটে যাচ্ছিল। রানীর ইচ্ছা হল, এ রকম কিছু করা। যেই কথা, সেই কাজ। রাজপ্রাসাদের অঙ্গন তৎক্ষণাৎ গোলাপ পানি ও নানা সুগন্ধি দ্রব্য ছড়িয়ে খোশবুদার পঙ্কে পরিপূর্ণ করে ফেলা হল। তখন রানী সখী-সাথীদেরকে নিয়ে বেদুঈন রমণীদের কার্যের পুনরাবৃত্তি করলেন।

মুতামিদের শেষজীবন বড় দুঃখজনক হয়েছিল। উত্তরাঞ্চলের খ্রিস্টান রাজাগণ এ সময় পুনরায় সক্রিয় হয়ে উঠলেন। লিওঁ ও ক্যাস্টিলের দুটি রাজ্য প্রথম ফার্ডিনাণ্ডের অধীনে একীভূত হল। ফার্ডিনাণ্ডের পুত্র ষষ্ঠ আলফনজো তাঁর রাজ্যের সাথে গ্যালিসিয়া ও ন্যাভেরে যুক্ত করলেন এবং সম্রাট উপাধি গ্রহণ করলেন। উত্তরাঞ্চল হতে ঘন ঘন মুসলিম রাজ্য আক্রান্ত হতে লাগল। ষষ্ঠ আলফনজোর বিরুদ্ধে সহায়তার জন্য মুতামিদ মরক্কোর মুরবিত নেতা ইউসুফ

ইবন তাশফীনকে আহ্বান করলেন। এটাই পরবর্তীকালে তাঁর কাল হল। ইউসুফ সানন্দে এ আহ্বানে সাড়া দিয়ে মরক্কো হতে স্পেনে আসলেন এবং ১০৮৬ খ্রিস্টাব্দে ২৩ অক্টোবর ষষ্ঠ আলফানসোকে জাল্লাকার যুদ্ধে শোচনীয়ভাবে পরাজিত করলেন। খ্রিস্টানরাজ কোন রকমে প্রাণে বেঁচে গেলেন। ইউসুফ বিজয়গর্বে আফ্রিকায় প্রত্যাবর্তন করলেন, কিন্তু পর বছর (নভেম্বর, ১০৯০ খ্রিঃ) তিনি পুনরায় স্পেনে পদার্পণ করলেন এবং একে একে গ্র্যানাডা, সেভিল ও অন্যান্য শহর অধিকার করলেন। সারাগোসা ছাড়া সম্পূর্ণ মুসলিম স্পেন তাঁর অধীনতা স্বীকার করল। মুতামিদ বন্দী হয়ে মরক্কোতে নীত হলেন এবং রানী ইতিমাদ ও কন্যাগণের সাথে বহু কষ্টে দিন কাটালেন। একবার একদিন মুতামিদ দেখলেন যে, লোকেরা মিছিল করে বৃষ্টির জন্য নামাজ পড়তে যাচ্ছে। এটা দেখে তাঁর কবি মন উদ্বেলিত হয়ে উঠল। তিনি নিচের কয়েকটি বেদনাতুর পঙক্তি রচনা করলেন।

"আল্লা পানি দেরে" মিনতি করিয়া অযুত কণ্ঠে কয়,
আমি বলি "মোর অশ্রু সায়রে বন্যার পরাজয়"।
তারা ডেকে কয় "তোমার অশ্রু প্রচুর বলিয়া মানি,
কিন্তু তাহাতে নিঙ্গাড়িয়া আসে তোমার রক্ত জানি।"*

মুরাবিতগণ

মুরাবিতগণ প্রথমে ছিল একটি ধর্মীয় সম্প্রদায়। সিনিগালের একটি নির্জন দ্বীপে প্রতিষ্ঠিত একটি রিবাতে (সুফীর আস্তানা) তারা বাস করত। এদের বৈশিষ্ট্য এ যে, এরা যুগপৎ সুফী ও যোদ্ধা ছিল। তারা বহু লোককে ইসলাম ধর্মে দীক্ষিত করে এবং উত্তর-পশ্চিম আফ্রিকায় নিজেদের প্রাধান্য প্রতিষ্ঠিত করে। ইউসুফ ইবন তাফশীন ১০৬২ খ্রিস্টাব্দে মারাকেশ (মরক্কো) নগরীর পত্তন করেন। তখন হতে মরক্কো তাঁর ও তাঁর উত্তরাধিকারীদের রাজধানী বলে পরিগণিত হয়। স্পেনে কর্ডোভার পরিবর্তে সেভিলে মুরাবিতগণের দ্বিতীয় রাজধানী স্থাপিত হয়। মুরাবিত শাসকগণ 'আমীরুল মুসলিমীন' উপাধি গ্রহণ করে রাজনৈতিক স্বাধীনতা ঘোষণা করলেও ধর্মীয় ব্যাপারে আব্বাসীয় খলিফার প্রাধান্য মেনে চলতেন। অর্ধশতাব্দীর অধিককাল তাঁরা উত্তর-পশ্চিম আফ্রিকা ও দক্ষিণ স্পেনে ক্ষমতাসীন ছিলেন। এঁরা জাতিতে বার্বার ছিলেন। লিওঁ ও ক্যাস্টিলের রাজা অষ্টম আলফনজো মুরাবিত মুদ্রা রীতি অনুকরণ করে আরবিতে নামধাম লিখতে থাকেন।

* গ্রন্থকার মফীজুল্লাহ কবীর কর্তৃক অনুদিত।

মুওয়াহ্‌হিদগণ

এ সংঘের প্রতিষ্ঠাতা ছিলেন বার্বার বংশীয় মুহম্মদ ইবন তুমার্ত। তিনি ক্রমবর্ধমান অন-ইসলামী আচার-ব্যবহারের বিরুদ্ধে সংগ্রাম ঘোষণা করে তওহীদের (আল্লাহর একত্ব) ওপর বিশেষ গুরুত্বারোপ করেন। এ জন্য তাঁর অনুসারীদেরকে মুওয়াহ্‌হিদ বলা হয়। তাঁরই শিষ্য আবদুল মুনইম মুওয়াহহিদ বংশের প্রতিষ্ঠাতা। তিনি খলিফা উপাধি গ্রহণ করেন। তিনি মুয়াবিত বংশের সৈন্যবাহিনীর সাথে যুদ্ধ করে ফাস, সিউটা, তাঞ্জির ও আগমাত দখল করে মরক্কো অবরোধ করেন। এগার মাস অবরোধের পর মরক্কো অধিকার করে তিনি ১১৪৬—৪৭ খ্রিস্টাব্দে মুরাবিত বংশের প্রাধান্য লোপ করেন। ১১৪৫ খ্রিস্টাব্দে আবদুল মুনইম স্পেনে সৈন্য প্রেরণ করেন এবং পাঁচ বছর যুদ্ধ করে সমগ্র মুসলিম স্পেন অধিকার করেন। ১১৫২ খ্রিস্টাব্দে আলজিরিয়া, ১১৫৮ খ্রিস্টাব্দে তিউনিসিয়া এবং ১১৬০ খ্রিস্টাব্দে ত্রিপলী অধিকৃত হয়। এভাবে পশ্চিমে আটলান্টিক মহাসাগর হতে পূর্বে মিসরের সীমান্ত পর্যন্ত সমগ্র তীরভূমি আন্দালুসিয়ার সাথে সংযুক্ত হয়। এখন হতে সমগ্র রাজ্যে আব্বাসীয় খলিফার নামের পরিবর্তে মুওয়াহহিদ খলিফার নামে খুৎবা পাঠ করা হয়। আবদুল মুনইম ১১৬৩ খ্রিস্টাব্দে ইনতিকাল করেন। তাঁর উত্তরাধিকারীদের মধ্যে তাঁর পৌত্র আবু ইউসুফ আল-মনসুর সুপ্রসিদ্ধ। সুলতান সালাহুদ্দীন তাঁর দরবারে এক দূত প্রেরণ করেন। তবে সালাহুদ্দীন আব্বাসীয় খলিফার প্রাধান্য স্বীকার করতেন, সেই জন্য দূতের নিয়োগপত্রে তিনি খলিফা মনসুরকে আমীরুল মুমিনীনের পরিবর্তে 'আমীরুল মুসলিমীন' বলে সম্বোধন করেন। সালাহুদ্দীন তাঁর নিকট অনেক উপঢৌকন প্রেরণ করেন। প্রথমে তিনি এ সম্বোধনের ফলে কিছুটা অসন্তুষ্ট হলেও পরে সালাহুদ্দীনকে ক্রুসেডারগণের সাথে যুদ্ধ করার জন্য ১৮০ খানা জাহাজ প্রেরণ করেন। খলিফা মনসুর স্থাপত্য শিল্পে, বিশেষত মসজিদ, সুফীদের রিবাত ও হাসপাতাল নির্মাণে বিশেষ আগ্রহী ছিলেন। এ বংশীয় খলিফাগণ স্পেনে খ্রিস্টানদের সাথে যুদ্ধ করে খ্রিস্টান শক্তির অগ্রগতি রোধ করতে চেয়েছিলেন, কিন্তু মনসুরের পুত্র নাসির সম্মিলিত খ্রিস্টান বাহিনীর কাছে ১২১২ সালে শোচনীয়রূপে পরাজিত হয়ে মরক্কোতে ফিরে আসেন। বিজেতাগণ মুসলিম স্পেনের প্রায় সম্পূর্ণ অংশ দখল করে নিলেন। কেবল গ্র্যানাডার বনু নাসর আরও কিছুকাল স্পেনে টিকে রইলেন।

বনু নাসর

এ বংশের প্রতিষ্ঠাতা ছিলেন মুহম্মদ ইবন ইউসুফ ইবন নাসর। তিনি ইবনুল আহমার নামে সমধিক পরিচিত। স্পেনে মুওয়াহহিদ ক্ষমতা লুপ্ত হওয়ার পর মুহম্মদ খ্রিস্টানদের সহযোগিতায় গ্র্যানাডার আশেপাশে একটি রাজ্যের প্রতিষ্ঠা করেন এবং সেভিলের লুপ্ত গৌরব পুনরুদ্ধার করতে প্রয়াসী হন। এ বংশের লোকেরা আড়াই শতাব্দী যাবৎ ক্রমবর্ধমান খ্রিস্টান শক্তির সাথে মুকাবিলা করে স্পেনে মুসলিম স্বার্থ সংরক্ষণের চেষ্টা করেন। ইবনুল আহমার গালিব (বিজয়ী) উপাধি ধারণ করে গ্র্যানাডায় রাজধানী স্থাপন করেন। তিনি এবং তাঁর উত্তরাধিকারীরা ক্যাস্টিলের রাজার অধীনতা স্বীকার করে তাঁকে করদান করতেন। গ্র্যানাডা নগরী উত্তম পরিবেশে ও স্বাস্থ্যকর আবহাওয়ায় অবস্থিত ছিল। এর চতুষ্পার্শ্বে বহু স্রোতস্বিনী-বিধৌত মনোরম সবুজ সমতল ভূমি অবস্থিত ছিল। নগরীর দক্ষিণ-পূর্ব পার্শ্বে গালিব বিশ্ববিশ্রুত 'আল-হামরা' প্রাসাদ নির্মাণ করেন। লাল চুনাবালির সাহায্যে নির্মিত এ প্রাসাদ গালিবের উত্তরাধিকারিগণ কর্তৃক সম্পন্ন হয়ে এর অপরূপ সাজ-সজ্জা এবং 'এরাবেস্ক' ফুল পাতার খোদাইয়ের জন্য আজিও দর্শকের বিস্ময়ের উদ্রেক করে। কিছুকালের জন্য বনু নাসর স্পেনের লুপ্ত গৌরব পুনরুদ্ধার করতে সক্ষম হন। এদের দরবারে বহু পণ্ডিত ব্যক্তির সমাবেশ ঘটে। ব্যবসা-বাণিজ্যের উন্নতির ফলে গ্র্যানাডা স্পেনের সর্বাপেক্ষা সমৃদ্ধিশালী নগরে পরিণত হয়। খ্রিস্টানদের আক্রমণ হতে রক্ষা পাওয়ার জন্য বহু মুসলমান গ্র্যানাডায় আশ্রয় গ্রহণ করে। কিন্তু স্পেনে মুসলমানদের পতনের আর বেশিদিন বাকি ছিল না।

আল-হামরা

১৪৬৯ খ্রিস্টাব্দে ক্যাস্টিল ও এ্যারাগণ রাজ্য দুটির একত্র সমাবেশ ঘটে। ঐ বছর এ্যারাগনের রাজা ফার্ডিনাণ্ডের সাথে ক্যাস্টিলের রানী ইসাবেলার বিবাহ হয়। এভাবে এ রাজ্য দুটির স্থায়ী মিলন ঘটায় স্পেনে মুসলিম শক্তির শেষ পতন অবশ্যম্ভাবী হয়ে পড়ে। গ্র্যানাডায় মোট একুশ জন সুলতান রাজত্ব করেন। উনবিংশ সুলতান আবুল হাসানের অবিমৃষ্যকারিতার জন্য গ্র্যানাডার পতন ত্বরান্বিত হয়। তিনি ক্যাস্টিলের রাজ সরকারের দেয় রাজস্ব আদায় করতে অস্বীকার করে খ্রিস্টান রাজ্য আক্রমণ করেন। ফার্ডিনাণ্ড প্রতিশোধ স্বরূপ ১৪৮২ খ্রিস্টাব্দে আল-হাম্মা দুর্গ অধিকার করেন। আবুল হাসানের পুত্র আবদুল্লাহ এ সংকটময় মুহূর্তে মাতার প্ররোচণায় পিতার বিরুদ্ধে বিদ্রোহী হলেন এবং ১৪৮২ খ্রিস্টাব্দে আল-হামরা দখল করেন এবং গ্র্যানাডার সুলতান হলেন। ইনি স্পেনে

'বোয়াবদিল' নামে সমধিক পরিচিত। তিনিও একটি ক্যাস্টিলীয় শহর আক্রমণ করে খ্রিস্টানদের কাছে পরাজিত ও বন্দী হলেন। আবুল হাসান কিছুদিন গ্র্যানাডার সিংহাসনে বসেন এবং পরে তাঁর ভ্রাতা মুহম্মদ জাগালকে সিংহাসন ছেড়ে দেন। এখন ফার্ডিনাণ্ড ও ইসাবেলা তাঁদের বন্দী বোয়াবদিলকে অর্থ, সৈন্য ও অস্ত্রশস্ত্র সাহায্য করে আপন পিতৃব্যের বিরুদ্ধে লেলিয়ে দিলেন। বোয়াবদিল গ্র্যানাডা অধিকার করলেন। খ্রিস্টানগণ মুহম্মদ জাগালকে সিংহাসন ত্যাগ করতে বাধ্য করে। গ্র্যানাডা নগর ব্যতীত সমুদয় রাজ্য তাদের অধিকারে আসল। এখন ফার্ডিনাণ্ড ও ইসাবেলা বোয়াবদিলকে গ্র্যানাডা ছেড়ে দিতে অনুরোধ করলেন। বোয়াবদিল রাজি না হওয়ায় ১৪৯১ খ্রিস্টাব্দে ফার্ডিনাণ্ড দশ সহস্র অশ্বারোহী সহ গ্র্যানাডা আক্রমণ করলেন। অবশেষে মুসলমানগণ নিম্নলিখিত শর্তে ১৪৯২ খ্রিস্টাব্দের ২ জানুয়ারি আত্মসমর্পণ করে ঃ

১। আবু আবদুল্লাহ (বোয়াবদিল), তাঁর কর্মচারী ও প্রজাগণ ফার্ডিনাণ্ড ও ইসাবেলার প্রতি আনুগত্যের শপথ গ্রহণ করবেন।

২। আবু আবদুল্লাহ আল-বুশারায় একটি জায়গীর পাবেন।

৩। মুসলমানগণ জান-মালের নিরাপত্তা ও ধর্মীয় স্বাধীনতা উপভোগ করবে।

৪। তারা আপন আপন আচার-ব্যবহার, পোশাক-পরিচ্ছদ ও ভাষা রক্ষা করে চলবে।

৫। খ্রিস্টান ও মুসলমানদের মধ্যে কোন বিবাদ হলে মিশ্র আদালতে তার মীমাংসা হবে।

৬। মুসলমানগণ মুসলমান রাজা-বাদশাহদেরকে যে রাজস্ব দিত, তাই তাদের ওপর ধার্য হবে।

৭। মুসলমান বন্দীদেরকে মুক্তি দেয়া হবে।

৮। নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে তারা অস্থাবর সম্পত্তি নিয়ে স্পেন ত্যাগ করে চলে যেতে পারবে, কিন্তু নির্দিষ্ট সময় উত্তীর্ণ হয়ে গেলে এ সম্পত্তির এক-দশমাংশ রাজসরকারে জমা দিতে হবে।

৯। নও-মুসলিমগণকে তাদের পূর্বধর্মে ধর্মান্তরিত করা হবে না, কিন্তু মুসলমানগণ খ্রিস্টানধর্ম গ্রহণ করতে চাইলে তাদেরকে চিন্তা করার সময় দেয়া হবে এবং পরে একজন খ্রিস্টান ও একজন মুসলমান বিচারকের সম্মুখে তাকে সিদ্ধান্ত ঘোষণা করতে হবে।

সাত বছর পর এ সব শর্ত অগ্রাহ্য করে ফার্ডিনাণ্ড মরিস্কো(মুসলিম) নির্যাতন নীতি আরম্ভ করেন। ফ্রান্সিসকো নামক একজন পাদ্রীকে মুসলমানদেরকে জোর - পূর্বক ধর্মান্তরিত করার ভার দেয়া হয়। এ পাদ্রী যাবতীয় আরবি পুস্তক সংগ্রহ করে পুড়িয়ে দেন। গ্র্যানাডায় এ সব পুস্তকের এক বিরাট অগ্নিযজ্ঞ সাধিত হয়। এ সব নির্যাতন ও ধর্মান্তরিত করণের ফলে বিভিন্ন স্থানে বিদ্রোহ দেখা দেয়। মুসলমানদেরকে প্রথমে রাজদ্রোহের অপরাধে অভিযুক্ত করা হয়। তারপর তাদের কাছ থেকে প্রচুর অর্থ দাবি করা হয়, অর্থ দিতে না পারলে তাদেরকে পবিত্র পানি ছিটিয়ে খ্রিস্টান করা হয়। এর ফলে মুসলমানগণ বাহ্যত নিজদেরকে খ্রিস্টান বলে প্রকাশ করত, কিন্তু গোপনে তারা ইসলামের আচার-পদ্ধতি পালন করত। কেউ কেউ একবার খ্রিস্টান পদ্ধতিতে বিবাহ সেরে বাড়িতে এসে পুনরায় গোপনে মুসলিম পদ্ধতিতে বিবাহের পুনরাবৃত্তি করত। তারা প্রকাশ্যে খ্রিস্টান নাম গ্রহণ করত, আবার গোপনে একটি আরবি নামও রাখত। ১৫০১ খ্রিস্টাব্দে ক্যাস্টিল ও লিওঁতে এ মর্মে একটি রাজকীয় ফরমান জারি করা হয় যে, মুসলমানগণ হয় ধর্মত্যাগ করবে, না হয় স্পেন ত্যাগ করে চলে যাবে। এ ফরমান কড়াকড়িভাবে কার্যকরী করা হয়নি। ১৫২৬ খ্রিস্টাব্দে এ্যারাগনের মুসলমানগণকেও অনুরূপ আদেশ দেয়া হয়। ১৫৫৬ খ্রিস্টাব্দে দ্বিতীয় ফিলিপ আরও একটি কড়া অনুশাসন জারি করে মুসলমানগণকে অবিলম্বে তাদের ভাষা, ধর্ম ও আচার-অনুষ্ঠান ত্যাগ করতে নির্দেশ দেন। তিনি স্পেনের যাবতীয় হামামখানাগুলিকে অধার্মিক প্রতিষ্ঠান বলে ধ্বংস করে ফেলার আদেশ দেন। এর ফলে গ্র্যানাডায় পুনরায় বিদ্রোহ দেখা দেয়, কিন্তু এ বিদ্রোহ কঠোরতার সাথে প্রশমিত হয়। তৃতীয় ফিলিপ ১৬০৯ খ্রিস্টাব্দে সর্বশেষ বহিষ্কার আদেশ জারি করেন। স্পেনের সব মুসলমানকে জোর পূর্বক বের করে দেয়া হয়। এ সব মুসলমান প্রথমে আফ্রিকায় ও পরে অন্যান্য মুসলমান দেশে চলে যায়। গ্র্যানাডার পতন হতে সপ্তদশ শতাব্দীর প্রথম দশক পর্যন্ত সময়ের মধ্যে প্রায় ত্রিশ লক্ষ মুসলমান স্পেন হতে নির্বাসিত হয় কিংবা মৃত্যু দণ্ডে দণ্ডিত হয়।

মরিস্কো নির্যাতন ও নির্বাসন

জ্ঞান-বিজ্ঞানে মুসলিম স্পেনের দান

জ্ঞান-বিজ্ঞানে আন্দালুসিয়ার অবদান মুসলিম সংস্কৃতির ইতিহাসের এক উজ্জ্বল অধ্যায়। অষ্টম ও ত্রয়োদশ শতাব্দীর মধ্যবর্তী সময়ে আরবগণ কেবল ইউরোপেই আলোকবর্তিকা প্রজ্বলিত রাখেনি, বরং তারা ঐ সময় সমগ্র পৃথিবীর

জ্ঞানালোকের দিশারী ছিল। মুসলমানদের কাছ থেকে জ্ঞান-বিজ্ঞান ইউরোপে গৃহীত হয় এবং এর ফলেই ইউরোপে রেনেঁশা বা জ্ঞান-বিজ্ঞানের পুনর্জন্ম হয়। স্পেনে সাহিত্যে সর্বাপেক্ষা উল্লেখযোগ্য নাম ইবন আবদ রাব্বিহ্। তিনি তৃতীয় আবদুর রহমানের সভা-কবি ছিলেন। তাঁর রচিত 'ইকদুল ফরীদ' আগানীর পরেই সাহিত্যের ইতিহাসে শ্রেষ্ঠ আসনের অধিকারী। স্পেনের মুসলমান চিন্তাবিদদের মধ্যে সর্বাপেক্ষা মৌলিক প্রতিভার অধিকারী ছিলেন আলী ইবন হাজম। তাঁকে বিভিন্ন বিষয়ে চারশত গ্রন্থের রচয়িতা বলা হয়। তার মধ্যে তাঁর *'আল-ফাসল ফিল-মিলাল ওয়াল-আহাওয়া ওয়ান-নিহাল'* (স) তুলনামূলক ধর্মতত্ত্বে প্রথম গ্রন্থ। তাঁর বিখ্যাত কবিতা গ্রন্থ *'তওকুল- হামামাহ্'* (ঘুঘুর হার) প্রেমের কবিতার সংগ্রহ।

সাহিত্য

উমাইয়াগণের পতনের পর আঞ্চলিক রাজবংশসমূহের পৃষ্ঠপোষকতায় সাহিত্য আরও উন্নতি লাভ করে। সেভিল, টলেডো ও গ্র্যানাডা জ্ঞান-বিজ্ঞানের কেন্দ্র হিসেবে কর্ডোভাকে নিষ্প্রভ করে দেয়। গ্র্যানাডা হতে মোজারাগণ (আরব ভাষা ও ভাবধারায় অনুপ্রাণিত খ্রিস্টানগণ) মুসলিম স্পেনের ভাষা ও সাহিত্যকে সুদূর উত্তর ও দক্ষিণাঞ্চলে নিয়ে যায়। আরবি গল্প ও উপাখ্যান ত্রয়োদশ শতাব্দীতে পশ্চিম ইউরোপের সাহিত্যকেও প্রভাবিত করে। 'কালিলা ওয়া দিমনা'র গল্প 'গুণী আল-ফাজজো' বলে কথিত ক্যাস্টিল ও লিওঁ রাজার জন্য ল্যাটিন ভাষায় অনূদিত হয়। স্পেনের উপন্যাস সাহিত্যে আরবি 'মকামা' গল্প পদ্ধতির ছাপ সুস্পষ্ট। মুসলিম স্পেনের কবিদের মধ্যে ইবন জায়দুনের নাম বিশেষ উল্লেখযোগ্য। স্পেনের আরবগণ স্থানীয় প্রভাবে নতুন নতুন কবিতা পদ্ধতি আবিষ্কার করেন। তার মধ্যে 'মুওয়াশশা' ও 'জজলের' নাম বিশেষ উল্লেখযোগ্য।

খলিফা দ্বিতীয় হাকামের সময়ে স্পেনে লেখাপড়ার উন্নতি সম্পর্কে বলা হয়েছে। অন্যান্য মুসলমান দেশ অপেক্ষা স্পেনে সাধারণ শিক্ষার প্রসার খুব বেশি হয়েছিল। স্পেনীয় মুসলমানেরা অনেকেই লেখাপড়া জানত। মেয়েদের মধ্যেও শিক্ষার মান খুব উঁচু ছিল। বড় বড় শহরে উচ্চ শিক্ষার জন্য প্রতিষ্ঠান ছিল। এগুলি আধুনিককালের বিশ্ববিদ্যালয়ের সাথে তুলনীয়। কর্ডোভা, সেভিল, মালাগা ও গ্র্যানাডায় এরূপ বিশ্ববিদ্যালয় ছিল। কর্ডোভা বিশ্ববিদ্যালয়ে ফিকহ, ধর্মতত্ত্ব ছাড়াও জ্যোতির্বিজ্ঞান, অঙ্কশাস্ত্র ও চিকিৎসাবিজ্ঞানের বিভাগ ছিল। হাজার হাজার মুসলিম, খ্রিস্টান ও ইহুদি এখানে অধ্যয়ন করত এবং এখানকার পাস-করা

শিক্ষা

লোক রাজ্যে লাভজনক চাকরিতে নিযুক্ত হত। সপ্তম নাসরীয় সুলতান ইউসুফ আবু হাজ্জাজ গ্র্যানাডা বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপন করেছিলেন। এ বিশ্ববিদ্যালয়ের তোরণ-দ্বারে পাথরের সিংহ-মূর্তি শোভা পেত। এখানে ধর্মতত্ত্ব, ফিকহ, চিকিৎসাবিজ্ঞান, রসায়ন, দর্শন ও জ্যোতির্বিজ্ঞান পড়ান হত। স্পেনের বিশ্ববিদ্যালয়সমূহে মাঝে মাঝে সাধারণ সভা অনুষ্ঠিত হত। এতে শিক্ষকগণ বক্তৃতা করতেন কিংবা স্বরচিত কবিতাদি আবৃত্তি করতেন।

স্পেনের প্রথম যুগের ঐতিহাসিকদের মধ্যে ইবনুল-কুতিয়া ও ইবন হাইয়ানের নাম উল্লেখযোগ্য। গ্র্যানাডার সুলতান ইউসুফ আবু হাজ্জাজের উজীর লিসানুদ্দীন ইবনুল-খতীব সর্বমোট ষাটটি বই লিখে গিয়েছেন। তন্মধ্যে গ্র্যানাডার ইতিহাস বিষয়ক গ্রন্থ সর্বাপেক্ষা বিখ্যাত। বিখ্যাত মুসলিম মনীষী ইবন খলদুন স্পেন এবং উত্তর আফ্রিকার বহু রাজবংশের অধীনে চাকরি করেন। আরবদের মধ্যে পূর্বে বহু বিখ্যাত ঐতিহাসিক ছিলেন, অনেকে ইবন খলদুন অপেক্ষা শ্রেষ্ঠও ছিলেন; কিন্তু ইবন খলদুন ছিলেন প্রথম আরব সমাজ-বিজ্ঞানী তথা পৃথিবীর প্রথম সমাজ বিজ্ঞানী। তিনি মুসলমানদের মধ্যে শ্রেষ্ঠ ইতিহাস-দার্শনিক। মানবেতিহাসের জ্ঞান-সাগর মন্থন করে তিনি আবহাওয়া, ভৌগোলিক অবস্থান, নৈতিক ও আধ্যাত্মিক মূল্যবোধের ভিত্তিতে ইতিহাসের গতি-প্রকৃতি, ধারা ও নিয়ম-কানুন আবিষ্কারে প্রয়াসী হন। তাঁর *'মুকাদ্দিমা'* বা ইতিহাস গ্রন্থের ভূমিকায় তিনি ইতিহাস-দর্শনের বিস্তারিত আলোচনা করে ইতিহাস পাঠের নতুন দিগন্ত উন্মোচন করে গিয়েছেন। তাঁর ভাবধারা সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা এখানে সম্ভব নয়। তিনি ম্যাকিয়াভেলি, বোদিন, ভিকো এবং কম্‌তের পূর্বসূরী। তিনি ছিলেন "মানবীয় কার্যকলাপের একজন গভীর পাঠক এবং মানুষের বর্তমান ও ভবিষ্যৎকে হৃদয়ঙ্গম করার উদ্দেশ্যে অতীতকে বিশ্লেষণ করার জন্য উদ্‌গ্রীব।"

ইতিহাস

স্পেনের সর্বশ্রেষ্ঠ ভৌগোলিক ছিলেন আল-ইদ্রিসী। তিনি নরম্যান রাজা দ্বিতীয় রোজারের অধীনে সিসিলিতে জ্ঞানচর্চায় ব্যাপৃত ছিলেন। তাঁর বিখ্যাত গ্রন্থ *'নুজহাতুল-মুশতাক'*। তিনি তাঁর পৃষ্ঠপোষকের জন্য একটি ভূগোলক ও একটি মানচিত্র তৈরি করেছিলেন। জ্যোতিষ ও বিজ্ঞানে স্পেনের মুসলমানগণের উল্লেখযোগ্য অবদান রয়েছে। স্পেনের জ্যোতিষীদের মধ্যে আল-মাজরিতী আজ-জারকালী এবং নুরুদ্দীন আল-

ভূগোল, জ্যোতিষ ও অঙ্ক

বিতরুজীর নাম বিশেষ উল্লেখযোগ্য। শেষোক্ত জন গ্রহ-নক্ষত্রের অবস্থান সম্বন্ধে পুস্তক লিখে গিয়েছেন। ইউরোপের ভাষায় জ্যোতিষ সম্পর্কিত বহু আরবি শব্দ প্রচলিত রয়েছে। অঙ্কে আরবগণ শূন্যের ব্যবহার ও সংখ্যার ব্যবহার প্রবর্তন করেন।

উদ্ভিদবিজ্ঞান ও চিকিৎসা বিজ্ঞান

উদ্ভিদবিজ্ঞানে আরবগণ বিশেষ উন্নতি লাভ করে। তারা গাছের বিভিন্ন প্রকারভেদ নির্ণয় করে প্রত্যেক জাতীয় গাছপালার নির্দিষ্ট নাম দেয়। কর্ডোভার আল-গাফিকী স্পেন ও আফ্রিকার বিভিন্ন গাছ-গাছড়া সংগ্রহ করে এর প্রতিটিকে একটি আরবি, ল্যাটিন ও বার্বার নাম দেন এবং এদের নিখুঁত বর্ণনা রেখে যান। দ্বাদশ শতাব্দীর শেষভাগে আবু জাকারিয়া ইবনুল-আওয়াম নামক একজন বিজ্ঞানী সেভিলে বাস করতেন। তাঁর কৃষি বিষয়ক গ্রন্থ *'আল-ফিলাহা'* কৃষিবিজ্ঞানে মধ্যযুগের একটি বিশিষ্ট গ্রন্থ। এ পুস্তকে ৫৮৫ রকমের গাছ সম্পর্কে আলোচনা রয়েছে এবং পঞ্চাশের অধিক ফলের গাছের চাষের পদ্ধতি বর্ণিত হয়েছে। এ পুস্তকে গাছ-গাছড়ার রোগ ও এর প্রতিবিধান, মাটির গুণাগুণ ও সার প্রয়োগ এবং কলম তৈরি সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা রয়েছে। মুসলিম জগতের সর্বশ্রেষ্ঠ উদ্ভিদ বিজ্ঞানী ছিলেন আবদুল্লাহ ইবনুল রায়তার (মৃত্যু ১২৪৮ খ্রিঃ)। তিনি স্পেনের মালাগায় জন্মগ্রহণ করেন এবং আইয়ুবী সুলতান কামিলের অধীনে প্রধান উদ্ভিদ বিজ্ঞানী ছিলেন। তিনি বিভিন্ন লতাপাতার ওষুধ হিসেবে ব্যবহার সম্পর্কে পুস্তক প্রণয়ন করেন। তাঁর ওষুধ সম্পর্কিত দুটি বই *'আল-মুগনী ও আল-জামী'* বিখ্যাত। তাঁর দ্বিতীয় পুস্তকটি ল্যাটিন ভাষায় অনূদিত হয়েছিল। স্পেনের দার্শনিকগণ অনেকেই চিকিৎসাবিজ্ঞানেও পারদর্শী ছিলেন। এঁদের মধ্যে ইবন রুশদ, ইবন মায়মুন ও ইবন তুফায়লের নাম করা যেতে পারে। ঐতিহাসিক ইবনুল-খাতিবও একজন চিকিৎসক ছিলেন এবং চিকিৎসাবিজ্ঞানে ব্যাধির সংক্রমণ সম্বন্ধে উল্লেখযোগ্য মন্তব্য করেছেন। আরবদের মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ শল্য চিকিৎসক আবুল কাশিম আজ-জাহরাবী (মৃঃ ১০১৩ খ্রিঃ)। তিনি দ্বিতীয় হাকামের দরবারের চিকিৎসক ছিলেন। তাঁর *'আত-তসরীফ'* নামক গ্রন্থে তিনি তৎকালীন শল্য চিকিৎসা বিষয়ক জ্ঞান সন্নিবেশিত করেছেন। আহত স্থানে তাপ প্রয়োগে চিকিৎসা (Canterization), মূত্রাশয়ের মধ্যে পাথর চূর্ণ করা, জীবিত জন্তুর অঙ্গচ্ছেদ ও শব ব্যবচ্ছেদের প্রয়োজনীয়তা প্রভৃতি বিষয় তিনি বিশদ আলোচনা করেছেন। শল্যবিদ্যা সম্পর্কিত

তাঁর পুস্তকের এ অংশ ল্যাটিন ভাষায় অনূদিত হয়। শল্য চিকিৎসায় আজ-জাহরাবী যেমন প্রসিদ্ধ, সাধারণ চিকিৎসাবিজ্ঞানে ইবন জুহর তেমনি খ্যাতির অধিকারী। তিনি সেভিলে জন্মগ্রহণ করেন। তিনি মুওয়াহহিদ শাসক আবদুল মুনইমের চিকিৎসক ও উজীর ছিলেন। ১১৬২ খ্রিষ্টাব্দে তাঁর মৃত্যু হয়। তাঁর রচিত ছয়টি পুস্তকের মধ্যে তিনটি এখনও বিদ্যমান। তার মধ্যে *'তায়সীর'* সর্বাপেক্ষা প্রসিদ্ধ। তাঁর পরিবার ছয় পুরুষ ধরে চিকিৎসক ছিলেন। মুসলিম জগতের পূর্বাঞ্চল হতেও চিকিৎসা বিষয়ক জ্ঞান স্পেনে আমদানি হয় এবং বহু চিকিৎসা বিষয়ক আরবি গ্রন্থ ল্যাটিনে অনূদিত হয়। এভাবে ইউরোপে সমগ্র আরবিয় চিকিৎসা জ্ঞান প্রসারিত হয়। এ সব তর্জমার মাধ্যমে অনেক আরবি শব্দ ইউরোপীয় ভাষায় স্থান লাভ করে; যেমন—জুলেপ (আরবি জুলাব, ফারসি গুলাব), সিরাপ (আরবি শারাব), সোডা (আরবি সুদা বা মাথা-ব্যথা), এ্যালকহল (আরবি আল-কুহল্) ও আল-কালী ইত্যাদি।

স্পেনের মুসলমানগণ দর্শনে প্রশংসনীয় অবদান রেখে গিয়েছেন। দর্শনের ক্ষেত্রে তাঁদের এবং পূর্বদেশীয় মুসলমানদের প্রধান কাজ ছিল ধর্ম ও যুক্তি এবং

দর্শন

ধর্ম ও বিজ্ঞানের 'মধ্যে সমন্বয় সাধন। বাগদাদ ও আন্দালুসিয়ার চিন্তাবিদদের বিশিষ্ট কীর্তি গ্রীক দর্শন ও ইসলাম ধর্মের মধ্যে সমন্বয় সাধন করে এ সমন্বিত ভাবধারা ইউরোপের কাছে উপস্থাপিত করা। এ ভাবধারার প্রবর্তন ইউরোপে 'অন্ধকার যুগের' অবসান ও মধ্যযুগীয় জ্ঞান-চর্চার প্রারম্ভ সূচিত করে। স্পেনের প্রাথমিক যুগের দার্শনিকদের মধ্যে বেন গাবরিওলের নাম করা যেতে পারে। তিনি ইহুদি ছিলেন। তিনি গ্রীক ও ইসলামী দর্শন আরবি ভাষায় ইউরোপের কাছে উপস্থিত করেন। তাঁর এ বই পরে ল্যাটিনে অনূদিত হয়। মুসলিম দার্শনিক ইবন বাজ্জা তাঁর পুস্তকে মানবীয় আত্মার সাথে স্বর্গীয় মিলনের বিষয় বর্ণনা করেন। চিকিৎসক-দার্শনিক ইবন তুফায়ল (মৃঃ ১১৮৫ খ্রিঃ) তাঁর *'হাই ইবন ইয়াকজান'* গ্রন্থে পরমাত্মার সান্নিধ্য লাভের পর্যায় বর্ণনা করেন। স্পেনের সর্বশ্রেষ্ঠ মুসলিম দার্শনিক ইবন রুশদ (মৃঃ ১১৯৮ খ্রিঃ)। ইউরোপীয়গণ তাঁকে সর্বশ্রেষ্ঠ মুসলিম দার্শনিক বলে মনে করেন। তাঁর বিখ্যাত চিকিৎসা বিষয়ক গ্রন্থের নাম *'আল-কুল্লিয়াৎ'*। এতে তিনি দেখিয়েছেন যে, দুবার কারও বসন্ত রোগ হয় না। দর্শনে তাঁর বিখ্যাত গ্রন্থ *'তাহাফুতুত-তাহাফুত'*। তাঁর এ গ্রন্থের জন্যই তিনি ইউরোপে সমধিক প্রসিদ্ধ। তিনি এ্যারিস্টটলের ভাষ্য রচনা করেন। তিনি যুক্তিবাদী ছিলেন এবং ধর্ম ও দর্শনের মধ্যে সমন্বয় সাধনের চেষ্টা

করেন। তাঁর গ্রন্থের আপত্তিকর অংশ বিশেষ বর্জিত হয়ে প্যারিস বিশ্ববিদ্যালয়ে ও ইউরোপের অন্যান্য শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে পঠিত হতে থাকে। ইহুদি দার্শনিক ইবন মায়মুন (মৃঃ ১২০৪ খ্রিঃ) ও ইবন রুশদের মত চিকিৎসকও ছিলেন। তাঁর *'ফুসুল'* উন্নতমানের চিকিৎসা পুস্তক। *'দালালাতুল-হায়িরীন'* তাঁর দার্শনিক গ্রন্থ। এতে তিনি গ্রীক দর্শনের সাথে মুসলিম-এ্যারিস্টটলবাদের তথা ধর্মের সাথে যুক্তি সমন্বয় বিধানের চেষ্টা করেন।

আরবি জ্ঞান-বিজ্ঞান ইউরোপে প্রসার লাভ করার পূর্বে স্পেনে ল্যাটিন ভাষায় অনূদিত হয় এবং এ অনুবাদ ও পরবর্তী পর্যায়ে ইউরোপে তার প্রসারের ক্ষেত্রে টলেডো বিশিষ্ট ভূমিকা পালন করে। ত্রয়োদশ শতাব্দীর শেষভাগের মধ্যে স্পেনের মধ্যস্থতায় আরবি জ্ঞান-বিজ্ঞান ইউরোপে প্রবেশ লাভ করে। টলেডো হতে পিরেনীজের মধ্য দিয়ে ফ্রান্স, জার্মানি, মধ্য-ইউরোপ এবং ইংলণ্ডে এ জ্ঞানের বিস্তার ঘটে।

গ্রন্থনির্দেশ

১. পি. কে. হিট্টি ঃ *হিস্ট্রি অব দি এরাবস্।*
২. এস. এম. ইমামুদ্দীন ঃ *এ পলিটিক্যাল হিস্ট্রি অব মুসলিম স্পেন।*
৩. সৈয়দ আমীর আলী ঃ *হিস্ট্রি অব সারাসেনস্।*

ফাতিমীয় ও আইয়ুবী শাসকগণ

ফাতিমীয় বংশ

ইসমাঈলী শিয়াগণ কর্তৃক গোপন প্রচারণার ফলে উত্তর আফ্রিকায় ফাতিমীয় বংশের রাজত্ব প্রতিষ্ঠিত হয়। ইসমাঈলিগণ ইমাম জাফর আসসাদিকের জ্যেষ্ঠপুত্র ইসমাঈলকে সপ্তম ও অদৃশ্য ইমাম বলে মনে করে। পক্ষান্তরে ইসনা আশারীয়া শিয়া সম্প্রদায় ইমাম জাফরের দ্বিতীয় পুত্র মুসাকে ও তাঁর বংশধরগণকে ইমাম মেনে থাকে। এ উভয় সম্প্রদায়ের মতে তাদের সপ্তম বা দ্বাদশ ইমাম লোকচক্ষুর অন্তরালে অদৃশ্য রয়েছেন এবং তিনি মাহদী হিসেবে আবির্ভূত হবেন। এজন্য তিনি ইমাম মুন্তাজার (প্রতীক্ষিত)।

ইমাম মুন্তাজারের পক্ষে দায়ী বা মিশনারিগণ প্রচারণা চালিয়ে বিশ্বাসীদের মধ্যে তাঁর আবির্ভাবের আশা উজ্জীবিত রাখে। আব্বাসীয় খিলাফতের বিভিন্ন অঞ্চলে সুযোগ্য দায়িগণ এ প্রচারণা চালাতে থাকে। এরূপ একজন দায়ী বা প্রচারক ছিলেন আবু আবদুল্লাহ আশ-শিয়ী। তিনি আফ্রিকার 'কিতামা' উপজাতির নিকট গুপ্ত ইমামের পক্ষে প্রচারণা চালিয়ে ইমামের আবির্ভাবের ক্ষেত্র প্রস্তুত করতে থাকেন। এ সময় উত্তর আফ্রিকায় সুন্নী আগলবী বংশ রাজত্ব করছিল। আশ-শিয়ী যে ইমামের পক্ষে প্রচার কার্য চালাচ্ছিলেন, তাঁর নাম ছিল সাঈদ। শুভ মুহূর্তে আশ-শিয়ীর কাছ থেকে সংকেত পেয়ে ইমাম সাঈদ হিমসের নিকটে অবস্থিত ইসমাঈলী সদর দফতর সালামিয়া ত্যাগ করে সওদাগরের ছদ্মবেশে উত্তর-পশ্চিম আফ্রিকায় চলে যান। শেষ আগলবী সুলতান জিয়াদাতুল্লাহ্ একবার তাঁকে চিনতে পেয়ে কারাগারে বন্দী করেন। আশ-শিয়ী তাঁকে উদ্ধার করেন এবং ৯০৯ খ্রিস্টাব্দে আগলবী বংশের পতন ঘটিয়ে জিয়াদাতুল্লাহ্কে বিতাড়িত করেন। এর পর সাঈদকে ইমাম বলে ঘোষণা করা হয়। তিনি উবায়দুল্লাহ্ আল-মাহদী নাম ধারণ করেন। হযরত মুহম্মদের (স) দুহিতা ফাতিমার বংশধর হিসেবে এ বংশের শাসকগণকে ফাতিমীয় বলা হয়।

এঁরা ফাতিমার বংশোদ্ভূত কিনা, তা নিয়ে ঐতিহাসিকগণের মধ্যে মতভেদ রয়েছে। যে সব ঐতিহাসিক উবায়দুল্লাহকে ফাতিমার বংশধর বলে স্বীকার করেন, তার মধ্যে ইবনুল আসির, ইবন খলদুন ও আল মাকরিজী প্রধান। আবার যাঁরা এ মতবাদ গ্রহণ করেন না, তাঁদের মধ্যে ইবন খাল্লিকান, ইবন ইজারী,

আস-সুয়ূতী ও ইবন তাগরিবার্দি প্রধান। তবে এটা বিশেষ প্রণিধানযোগ্য যে, ষষ্ঠ ফাতিমীয় খলিফা আল-হাকিমের রাজত্বকাল পর্যন্ত হয় কেউ এদের বংশ-তালিকা নিয়ে মাথা ঘামায়নি কিংবা তাঁদের ফাতিমীয় বংশের দাবি অস্বীকার করেনি। কিন্তু আল-হাকিমের কার্যকলাপ এবং বাগদাদ ও এর আশে-পাশে তাঁর চরদের গোপন প্রচারণা বাগদাদের খলিফা আল-কাদিরকে তাঁর বিরুদ্ধে প্রতিশোধমূলক ব্যবস্থা হিসেবে একটি ঘোষণা প্রচার করতে উৎসাহিত করে। খলিফা আল-কাদির ১০১১ খ্রিস্টাব্দে উবায়দী খলিফাদের ফাতিমীয় দাবি ভুল ও কৃত্রিম বলে প্রতিপন্ন করার উদ্দেশ্যে উক্ত ঘোষণাপত্রে নেতৃস্থানীয় সুন্নী ও শিয়া সভাষদ ও আলিমদের দস্তখৎ গ্রহণ করলেন। যাঁরা দস্তখৎ দিয়েছিলেন, তাঁদের মধ্যে শরীফ আল-মুরতাদা ও আরাদীও ছিলেন। এঁরা হযরতের (স) বংশধর ছিলেন।[১]

উবায়দুল্লাহ্ (৯০৯—৯৩৪ খ্রিঃ) একজন যোগ্য শাসক ছিলেন। তিনি ক্ষমতায় প্রতিষ্ঠিত হওয়ার পর জানতে পারলেন যে, আশ-শিয়ী ও তাঁদের ভ্রাতা তাঁর বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্রে লিপ্ত হয়েছেন। তিনি আশ-শিয়ীকে হত্যা করেন, যেমন করে প্রথম আব্বাসীয় খলিফা তাঁর প্রধান উপদেষ্টা আবু সালামাকে হত্যা করেছিলেন।[২] তিনি মরক্কো হতে মিসর সীমান্ত পর্যন্ত ভূভাগ নিজের অধিকারে আনয়ন করেন। ৯১৪ খ্রিস্টাব্দে তিনি আলেকজান্দ্রিয়া দখল করেন। তিনি সিসিলিতে একজন গভর্নর প্রেরণ করেন। স্পেনের বিদ্রোহী ইবন হাফসুনের সাথে তিনি বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্ক স্থাপন করেন। তিনি আগলবীদের কাছ থেকে উত্তরাধিকার সূত্রে একটি নৌবহর লাভ করেছিলেন। এ নৌবহরের সাহায্যে তিনি ভূ-মধ্যসাগরের বিভিন্ন দ্বীপাঞ্চলে তাঁর শক্তি প্রদর্শন করেন। তিনি তিউনিসিয়ার তীরবর্তী অঞ্চলে আল-মাহদিয়া নামক একটি নতুন রাজধানী স্থাপন করেন। তিনি ৯২০ খ্রিস্টাব্দে এ নতুন রাজধানীতে বসবাস আরম্ভ করেন। উবায়দুল্লাহ্‌র পুত্র মুহম্মদ আল-কায়িম (৯৩৪—৯৪৬ খ্রিঃ) নৌযুদ্ধে আরও কৃতিত্ব প্রদর্শন করেন। তাঁর নৌবহর দক্ষিণ ফ্রান্স ও ইটালির উপকূল আক্রমণ করে জেনোয়া ও লম্বার্ডির কিয়দংশ দখল করে। এ সব বিজয় ক্ষণস্থায়ী হয়েছিল। তাঁর সময়

১. মফীজুল্লাহ কবীর, বুওয়াইহিদ ডায়ন্যাস্টি, পৃঃ ১৯৭।
২. পূর্বে ২৪ নং অধ্যায় "আব্বাসীয় বংশের প্রতিষ্ঠা ঃ সাফফাহ ও মনসুর" পৃঃ (২১৬–২১৭) দেখুন।

একজন খারিজী শিক্ষকের নেতৃত্বে এক বিরাট বিদ্রোহ দেখা দেয়। এ বিদ্রোহ আল-কায়িমের পুত্র আল-মনসুরের (৯৪৬-৫২ খ্রিঃ) সময় পর্যন্ত চলতে থাকে। মনসুর এ বিদ্রোহীকে কিতামার পার্বত্য অঞ্চলে অনুসরণ করে হত্যা করেন।

মুইজ

মনসুরের পুত্র ও উত্তরাধিকারী মইজ (৯৫২-৭৫) এ বংশের সর্বশ্রেষ্ঠ বিজয়ী শাসক। তিনি এক শক্তিশালী নৌবাহিনী গঠন করে স্পেনে খলিফা আবদুর রহমান আল-নাসিরের সাথে প্রতিদ্বন্দ্বিতায় অবতীর্ণ হন। জওহর নামক তাঁর এক সুযোগ্য সেনাপতি ছিল। জওহর উমাইয়া খলিফা আন-নাসিরের কাছ থেকে মৌরিটানিয়া ছিনিয়ে লন। এভাবে উত্তর আফ্রিকায় মুইজের অপ্রতিহত ক্ষমতা প্রতিষ্ঠিত হয়। ৯৬৬ খ্রিস্টাব্দে সিসিলিতে ফাতিমীয় অধিকার স্থাপিত হয়। এর পর মিসর বিজয় ফাতিমীয়গণকে তাঁদের সমসাময়িক রাজা-বাদশাহদের কাছে সম্মানের আসন দান করে। ইখশীদী শাসক কাফুরের মৃত্যুর পর মিসরে গোলযোগ আরম্ভ হয়। মুইজ তাঁর প্রধান সেনাপতি জওহরকে মিসর বিজয়ের জন্য একটি সুসজ্জিত বাহিনীসহ প্রেরণ করেন। ৯৬৯ খ্রিস্টাব্দে জওহর প্রায় বিনা বাধায় মিসরের রাজধানী ফুসতাতে প্রবেশ করেন। অতঃপর জওহর কাহিরা নামক একটি নতুন শহরের পত্তন করেন। আল-কাহিরায় (কায়রো) ৯৭৩ খ্রিস্টাব্দে ফাতিমীয় রাজধানী স্থাপিত হয়। নতুন রাজধানী স্থাপন করার পর জওহর ৯৭২ খ্রিস্টাব্দে এর প্রকাণ্ড জামি মসজিদ নির্মাণ করেন। খলিফা আল-আজীজের সময় এ মসজিদে একটি বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপিত হয়। জওহর হিজাজ দখল করে মক্কা ও মদীনা শহরে আল-মুইজের নামে খুৎবা প্রতিষ্ঠিত করেন। তিনি কারমাতিগণকে পরাজিত করে সিরিয়াও দখল করেন।

মুইজ ৯৭৫ খ্রিস্টাব্দে মৃত্যুমুখে পতিত হন। তিনি জ্ঞানী, বিদ্যোৎসাহী ও সাহসী ছিলেন। তিনি সুপণ্ডিত ছিলেন এবং বিজ্ঞান ও দর্শনে পারদর্শী ছিলেন। তিনি জ্ঞানী ও গুণীর সমাদর করতেন। তাঁর শাসনে জনসাধারণ সুখী ও সন্তুষ্ট ছিল। তিনি সুযোগ্য প্রশাসক শ্রেণীর সাহায্যে একটি সুষ্ঠু শাসন ব্যবস্থা কায়েম করেন। তাঁর সময় সেনাবাহিনী ও নৌবাহিনী সংগঠিত হয়। ব্যবসা-বাণিজ্য ও শিল্পের প্রভূত উন্নতি হয়। তিনি উপজাতীয় লোকদেরকে বশে এনে তাদেরকে তাঁর গোঁড়া সমর্থকে পরিণত করেন।

আবু মনসুর নিজার আল-আজীজের (৯৭৫—৯৬ খ্রিঃ) সময় ফাতিমীয় রাজ্যের চরম উৎকর্ষ সাধিত হয়। তাঁর সময়ে সম্পূর্ণ সিরিয়া ও মেসোপটেমিয়ার

আল-আজীজ কিয়দংশ বিজিত হয়। "আটলান্টিকের তীর হতে লোহিত সাগর পর্যন্ত এবং ইয়ামন, মক্কা, দামিস্ক, এমন কি একবার মসুলেও তাঁর নামে কুৎবা পঠিত হয়। তাঁর সময় মিসরের খলিফা আব্বাসীয় খলিফার প্রতিদ্বন্দ্বী হয়ে উঠেন। এ সময় আব্বাসীয় খলিফা শিয়ী বুওয়াইহী আমীরদের প্রভাবাধীনে সমস্ত ক্ষমতা হারিয়ে দুর্বল হয়ে পড়েছিলেন। বুওয়াইহীদের ক্ষমতা আল-আজীজের সময় চরমে পৌঁছে। বুওয়াইহী আমীর আদুদ্দৌলাহ ও আল-আজীজের মধ্যে দূত বিনিময় হয়। আল-আজীজ বাইজান্টাইনদের বিরুদ্ধে যুদ্ধে যোগদানের জন্য আদুদ্দৌলাহকে আহ্বান করে পত্র লেখেন। স্পেনের প্রতিও আল-আজীজের দৃষ্টি ছিল; কিন্তু কর্ডোভার খলিফার কাছে লিখিত এক কড়া চিঠি লিখে তিনি অপমানসূচক জবাব প্রাপ্ত হন।

আল-আজীজ ফাতিমীয় খলিফাদের মধ্যে সর্বাপেক্ষা জ্ঞানী ও মহানুভব ছিলেন। তিনি জাঁকজমক পছন্দ করতেন। তিনি কায়রো এবং এর আশে-পাশে বহু নতুন মসজিদ, প্রাসাদ, পুল ও খাল নির্মাণ করেন। তাঁর সময় জ্ঞান-বিজ্ঞানের উন্নতি হয়। তাঁর সময় আল-আজহার মসজিদ একটি প্রসিদ্ধ শিক্ষায়তনে পরিণত হয়। এ সময় খ্রিস্টানগণ নির্বিঘ্নে ও সুখে-স্বাচ্ছন্দ্যে বসবাস করত। তিনি একজন রুশ মহিলার পাণি গ্রহণ করেছিলেন। তাঁর পুত্র ও উত্তরাধিকারী আল-হাকিম এ মহিলার পুত্র ছিলেন। মহিলার দু ভ্রাতা আলেকজান্দ্রিয়া ও জেরুজালেমের ধর্মযাজক ছিলেন। আল-আজীজের উজীর ঈসা ইবন নাস্তুর একজন খ্রিস্টান ছিলেন।

আল-আজীজ আব্বাসীয় খলিফাদের দৃষ্টান্ত অনুসরণ করে সেনাবাহিনীতে তুর্কী ও নিগ্রোগণকে নিযুক্ত করতে লাগলেন। এ সৈনিকদের অবিরত কলহ ও অবাধ্যতার ফলে ফাতিমীয়গণের পতন ত্বরান্বিত হয়। তুর্কী সৈনিক ও ক্রীতদাসগণ রাজ্যে সর্বেসর্বা হয়ে স্বাধীন রাজবংশ স্থাপন করে।

আল-আজীজের পুত্র ও উত্তরাধিকারী আবু আলী মনসুর আল-হাকিম (৯৯৬-১০২১ খ্রিঃ) মাত্র এগার বছর বয়সে খলিফা হয়েছিলেন। সমসাময়িক ঐতিহাসিকগণ আল-হাকিমকে অব্যবস্থিতচিত্ত বলে উল্লেখ করেছেন। তিনি সামান্য কারণে কর্মচারিগণকে কঠোর শাস্তি দিতেন। এ সব ঐতিহাসিকের মতে তাঁর এ অস্থিরচিত্ততা পরবর্তীকালে উন্মত্ততা ও জিঘাংসায় পরিণত হয় এবং এর ফলে তিনি তাঁর কয়েকজন উজীরকে হত্যা করেন। আগে আমরা উল্লেখ করেছি

যে, ফাতিমীয় শাসকগণ খ্রিস্টান ও ইহুদিদের প্রতি উদার ও সহনশীল ছিলেন। কিন্তু আল-হাকিম সেই নীতি পরিবর্তন করে খ্রিস্টানদের কয়েকটি গির্জা ধ্বংসের আদেশ দিয়েছিলেন; তার মধ্যে জেরু-জালেমের গির্জা প্রধান (১০০৯ খ্রিঃ)। এ ঘটনা ক্রুসেডের অন্যতম প্রধান কারণ। তিনি খ্রিস্টান ও ইহুদিদের প্রতি বৈষম্যমূলক নীতির প্রবর্তন করেন। তিনি তাদেরকে কালো পোশাক পরে বের হতে এবং খচ্চরে চড়ে বেড়াতে আদেশ দেন। পরিশেষে তিনি স্রষ্টার অবতার বলে দাবি করেন।

সহানুভূতিশীল লেখকদের মতে আল-হাকিমের উপরোক্ত আচরণ বিশেষ অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে বিবেচ্য। ফাতিমী রাজ্য তখন নানা অভ্যন্তরীণ ও বাহ্যিক বিপদের সম্মুখীন হয়েছিল। বিভিন্ন দলের লোকদের মধ্যে ক্ষমতার লড়াই চলছিল। এ জন্য তিনি যাবতীয় ক্ষমতা নিজের হাতে কেন্দ্রীভূত করেন এবং বিরুদ্ধাচারীদেরকে কঠোর হস্তে দমন করেন। বহিঃশত্রু বাইজান্টাইনদের ক্ষমতা খর্ব করার উদ্দেশ্যে তিনি খ্রিস্টানদের প্রতি পূর্ববর্তী সহনশীল নীতি পরিহার করেন। ইসমাঈলী প্রচারণার ক্ষেত্র সুপ্রশস্ত করার জন্য তিনি অবতারবাদের অবতারণা করেন। সমসাময়িক আব্বাসী খলিফা আল-কাদির ১০১১ খ্রিস্টাব্দে এক ঘোষণাপত্র প্রচার করে বলেন যে, আল-হাকিম ও তাঁর পূর্বপুরুষগণ ফাতিমী বংশোদ্ভূত নন, এটা আগেই উল্লেখ করা হয়েছে। ১০২১ খ্রিস্টাব্দের ২৩ ফেব্রুয়ারি রহস্যজনকভাবে আল-হাকিমের তিরোধান ঘটে। তিনি নির্জনতা ভালবাসতেন এবং প্রায়ই কায়রোর নিকটবর্তী মুকাত্তাম পাহাড়ের নির্জন স্থানে চলে যেতেন। উপরোক্ত তারিখে দিবাগত রাত্রে তিনি দুজন ভৃত্যসহ মুকাত্তাম পাহাড়ে আরোহণ করেন। পাহাড়ের পাদদেশ হতেই ভৃত্য দুজনকে বিদায় করে দেয়া হয়। তারপর আর তিনি ফিরে আসেননি। পরে অনুসন্ধান করে দেখা গেল যে, পাহাড়ের উপরে তাঁর টাট্টু ঘোড়াটি দ্বিখণ্ডিত এবং তাঁর পোশাক ছুরিকাহত অবস্থায় পড়ে রয়েছে। কিন্তু তাঁর দেহ খুঁজে পাওয়া গেল না। দ্রুজ নামে অভিহিত একটি ধর্ম সম্প্রদায়ের লোকেরা আল-হাকিমকে স্রষ্টার অবতার বলে মনে করে। মুকাত্তাম পাহাড় হতে তাঁর অন্তর্ধান এ সম্প্রদায়ের মধ্যে আর একটি বিশ্বাসের জন্ম দিয়েছে যে, আল-হাকিমকে হত্যা করা হয়নি। তিনি অদৃশ্য হয়েছেন মাত্র এবং সময়মত আবার আবির্ভূত হবেন।

শান্ত ও সুস্থির মুহূর্তে আল-হাকিম বিশেষ প্রতিভার পরিচয় দেন। ১০০৫ খ্রিস্টাব্দে খলিফা আল-মামুনের মত তিনি 'দারুল হিকমা' বা 'বিজ্ঞান-ভবন'

নামক একটি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান কায়েম করেন। ইসমাঈলী মতবাদ প্রচারই এ প্রতিষ্ঠানের মুখ্য উদ্দেশ্য ছিল। খলিফা প্রাসাদের সাথে সংলগ্ন এ বিজ্ঞান ভবনে একটি পাঠাগার ও সভাসমিতির জন্য কয়েকটি কামরা ছিল। এখানে শিক্ষানবিসগণকে ধর্মীয় বিষয় ছাড়া জ্যোতির্বিজ্ঞান ও চিকিৎসাবিজ্ঞান শিক্ষা দেয়া হত। খলিফা জ্যোতির্বিজ্ঞান গবেষণা ও পর্যবেক্ষণ পছন্দ করতেন। তিনি মুকাত্তাম পাহাড়ে একটি মানমন্দির নির্মাণ করেছিলেন। প্রত্যুষে ওঠে অশ্বারোহণে তিনি সেখানে যেতেন। তাঁর অন্তর্ধানের পূর্বে তিনি সেখানে হয়ত পর্যবেক্ষণের জন্যই গিয়ে থাকবেন।

আল-হাকিমের দরবারে অনেক জ্ঞানী-গুণী লোকের সমাবেশ হয়েছিল। মিসরের সর্বশ্রেষ্ঠ জ্যোতির্বিজ্ঞানী আলী ইবন ইউসুফ তাঁর দরবার অলংকৃত করেছিলেন। বিখ্যাত মুসলিম পদার্থবিজ্ঞানী ও আলোকবিজ্ঞানী আবু আলী-হাসান ইবনুল হায়সাম (ল্যাটিন আল-হাজেন) কিছুদিন তাঁর দরবারে ছিলেন। ইবনুল হায়সাম ৯৬৫ খ্রিস্টাব্দে বসরায় জন্মগ্রহণ করেন। তিনি নীলনদের বন্যা প্রতিরোধ করবেন বলে আল-হাকিমকে প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন। কিন্তু যখন চেষ্টা করে অকৃতকার্য হলেন, তখন খলিফার প্রকোপ এড়াবার জন্য পাগলামির ভান করেন এবং পালিয়ে আত্মগোপন করেন। তাঁকে গণিত, জ্যোতিষ, দর্শন ও চিকিৎসাবিজ্ঞানে অন্যূন একশতটি গ্রন্থের রচয়িতা বলা হয়। আলোকবিজ্ঞানে তাঁর লিখিত বিখ্যাত পুস্তক '*কিতাবুল-জানাজির*'। এর মূল আরবি কপি এখন আর পাওয়া যায় না, তবে ল্যাটিন তরজমা এখনও বিদ্যমান। মধ্যযুগের আলোকবিজ্ঞানে এ গ্রন্থের প্রভাব অপরিসীম। তিনি চক্ষুর দৃষ্টি সম্পর্কিত টলেমী ও ইউক্লিডের মতবাদের বিরোধিতা করেন। তাঁর কয়েকটি পরীক্ষার সাহায্যে তিনি বিবর্ধনকারী কাচের (Magnifying lenses) নীতি আবিষ্কারের কাছাকাছি পৌঁছেছিলেন।

আল-হাকিমের মৃত্যুর পর হতে ফাতিমীয়গণের পতন আরম্ভ হয়। উজীরদের হাতে সমস্ত ক্ষমতা চলে যায়। অষ্টম খলিফা মুস্তানসিরের আমলে (১০৩৫-৯৪ খ্রিঃ) মিসর সমৃদ্ধ ছিল। তাঁর পরেই এ বংশের অধোগতি ত্বরান্বিত হয়। বিভিন্ন দল-উপদলের অন্তর্দ্বন্দ্বে খলিফার ক্ষমতা লোপ পায়। ক্রুসেডারগণও কয়েকবার মিসর আক্রমণ করে। আগেই উল্লেখ করা হয়েছে যে, বীর কেশরী সালাহুদ্দীন ১১৭১ খ্রিস্টাব্দে শেষ ফাতিমীয় খলিফা আল-আজীজকে পদচ্যুত করে এ বংশের অবসান ঘটিয়েছিলেন।

ফাতিমীয় যুগে মিসরে সুখ-সমৃদ্ধি বিরাজমান ছিল। আল-মুইজ, আল-আজীজ ও আল-হাকিমের পরে অবনতি আরম্ভ হলেও অষ্টম খলিফা মুস্তানসিরের

আমলেও মিসর ধনৈশ্বর্যে ও শিক্ষা-দীক্ষায় বিশেষ উন্নত ছিল। ইসমাঈলী প্রচারক ও প্রখ্যাত পর্যটক নাসির-ই-খসরু ১০৪৬-৪৯ খ্রিস্টাব্দে মিসর ভ্রমণ করেন এবং মিসরের অবস্থা সম্বন্ধে এক মনোজ্ঞ বর্ণনা রেখে গিয়েছেন। খলিফার প্রাসাদে ৩০ হাজার লোক বসবাস করত। এদের মধ্যে ১২ হাজার ছিল ভৃত্য এবং এক হাজার ছিল অশ্বারোহী ও পদাতিক প্রহরী। খলিফা আল-মুস্তানসির ধনাঢ্য ছিলেন এবং তাঁর নিজের বিশ হাজার বাড়ি ছিল। এগুলির অধিকাংশই ইটের তৈয়ারি এবং পাঁচ-ছয় তলা উঁচু ছিল। রাজধানীতে খলিফার সমান সংখ্যক দোকানও ছিল। কায়রোর প্রধান রাস্তাগুলি ছাদ দিয়ে আবৃত ছিল এবং প্রদীপালোকিত ছিল। দোকানদারেরা নির্ধারিত মূল্যে বিক্রি করত। অসাধু ব্যবসায়ীকে উটের পিঠে করে রাস্তায় ঘুরান হত; ঘন্টা বাজিয়ে লোক জড় করা হত এবং সে তার দোষ স্বীকার করত। শহরে আইন-শৃঙ্খলা এত সুচারুরূপে রক্ষা হত এবং সাধারণ লোকের সততা এত প্রশংসনীয় ছিল যে, জহুরীদের দোকান ও সাররাফদের (যারা টাকা-পয়সা ভাঙ্গিয়ে দেয়) দোকানেও তালা দেয়ার প্রয়োজন হত না। ফুসতাত শহরে সাতটি প্রকাণ্ড মসজিদ ছিল, কায়রোতে ছিল আটটি। রাজ্যের সুখ-সমৃদ্ধি এবং শান্তি ও শৃঙ্খলা দেখে নাসির অবাক-বিস্ময়ে মন্তব্য করেছিলেন, "আমি এর ধন-সম্পদের পরিসীমা বা পরিমাপ করতে পারিনি এবং এখানে আমি যেমন দেখলাম, এমন সমৃদ্ধি আর কোথাও দেখিনি।" মুস্তানসির সীমাহীন আরাম-আয়েশে জীবন-যাপন করতেন। তাঁর মূল্যবান দ্রব্য-সামগ্রীর মধ্যে দামী পাথর, স্ফটিক পাত্র, স্বর্ণখচিত রেকাবী গজদন্ত ও আবলুস কাঠের কলমদান, তৈলস্ফটিক পাত্র, লোহার ফ্রেমে আঁটা মুকুর, স্বর্ণ ও রৌপ্যের পায়া বিশিষ্ট ছাতি, স্বর্ণ ও রৌপ্যের ঘুটিসহ দাবার বোর্ড, মণিমুক্তা খচিত ছোরা ও তরবারি এবং এম্ব্রয়ডারী কাপড় প্রভৃতি পাওয়া গিয়েছে। এ খলিফা ১০৭০ খ্রিস্টাব্দে অভাবের তাড়নায় তাঁর কন্যা ও মাতাকে বাগদাদে পাঠাতে বাধ্য হয়েছিলেন।

ফাতিমীয়দের আমলে জ্ঞান-বিজ্ঞানের উন্নতির বিষয় পূর্বেই বলা হয়েছে। জ্ঞান-বিজ্ঞানে কায়রো বাগদাদ কিংবা কর্ডোভার সমকক্ষ হতে না পারলেও খলিফাগণ জ্ঞানী ও গুণীদের কদর করতেন এবং তাঁরা বহু শিক্ষায়তন প্রতিষ্ঠা করেছিলেন। শিল্পকলায় মিসরের ফাতিমী খলিফাগণ বিশেষ অনুরাগী ছিলেন। জাওহর কর্তৃক নির্মিত কায়রোর মসজিদ ফাতিমীয় মিসরের সর্বপ্রাচীন স্থাপত্যের নিদর্শন। এতে ইরানী স্থাপত্যের প্রভাব বিদ্যমান। আল-হাকিম অপর একটি মসজিদ নির্মাণ করেছিলেন; তাতে পাথর ব্যবহার করা হয়েছিল। পরবর্তী যুগের কমর মসজিদে ইটের পরিবর্তে পুরাপুরি পাথর ব্যবহার করা হয়েছিল।

ফাতিমীয়গণ কায়রোতে অনেকগুলি ফটক নির্মাণ করেছিলেন। এ যুগের মৃৎপাত্র বিশেষ নিপুণতার পরিচয় বহন করে। কাঠের গায়ে, মৃৎপাত্রে কিংবা তামার পাত্রে এ যুগের শিল্পিগণ বিভিন্ন প্রাণীর মূর্তি ব্যবহার করেছে। এ যুগের মিসরীয় 'বয়ন' শিল্প বিখ্যাত ছিল।

মিসরের ও সিরিয়ার আইয়ুবী শাসকগণ

বিশ্ববিশ্রুত মুসলিম বীর সালাহুদ্দীন আইয়ুবী বংশের প্রতিষ্ঠাতা। সালাহুদ্দীনের যুদ্ধ-বিগ্রহ ও ক্রুসেডারদের বিরুদ্ধে তাঁর অভিযানের কথা আগেই বিস্তারিত আলোচনা করা হয়েছে। কিন্তু সালাহুদ্দীন কেবল যোদ্ধা কিংবা সেনাপতি ছিলেন না, তিনি জ্ঞান ও বিজ্ঞানের পৃষ্ঠপোষক ছিলেন। তাঁর সভায় বহু জ্ঞানী ও গুণী ব্যক্তির সমাবেশ ঘটেছিল। তিনি বহু মসজিদ ও মাদ্রাসা নির্মাণ করেছিলেন। তিনি বহু খাল খনন করেছিলেন ও বাঁধ নির্মাণ করেছিলেন। তাঁর দুজন উজীর বিদ্বান ব্যক্তি ছিলেন। তাঁদের নাম আল-কাজীউল ফাজিল এবং ইমামুদ্দীন আল-কাতিবুল ইসপাহানী। তাঁর কর্মসচিব ইবন শাদ্দাদ তাঁর জীবনী রচনা করে গিয়েছেন। মুসলমানদের কাছে তিনি ছিলেন মুক্তিযোদ্ধা ও গাজী, কিন্তু খ্রিস্টানগণও তাঁকে প্রকৃত বীর বলে মনে করে। নীলনদের তীর হতে দাজলার তীর পর্যন্ত তাঁর ক্ষমতা বিস্তৃত ছিল। এ অঞ্চলে তিনি ইসলামের হৃতগৌরব পুনরুদ্ধার করতে সক্ষম হয়েছিলেন।

তাঁর মৃত্যুর পর সাম্রাজ্য ছিন্নভিন্ন হয়ে পড়ে এবং তাঁর বংশধরগণ এর বিভিন্ন অংশে স্বাধীনভাবে শাসন করতে থাকেন। মিসর, দামিস্ক, মেসোপটেমিয়া, হিম্‌স, হামা এবং ইয়ামনে ভিন্ন ভিন্ন রাজবংশের উদ্ভব হয়। আইয়ুবিগণের প্রধান শাখা মিসরে শাসন করতে থাকে। সালাহুদ্দীনের ভ্রাতা আল-আদিল সিরিয়া ও মেসোপটেমিয়ায় মিসরের কর্তৃত্ব স্থাপন করতে সক্ষম হয়েছিলেন। আল-আদিলের পুত্র আল-কামিল ১২১৮ খ্রিস্টাব্দ হতে ১২৩৮ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত মিসর শাসন করেন এবং ক্রুসেডারদের সাথে যুদ্ধ করে তাদেরকে ডামিয়েটা হতে বিতাড়িত করেন। তিনি সেচ ব্যবস্থা ও কৃষির উন্নতি বিধানে যত্নবান ছিলেন। তিনি জ্ঞান-বিজ্ঞানের পৃষ্ঠপোষকতা করতেন। তাঁর শাসনে তাঁর খ্রিস্টান প্রজাগণ সুখে-শান্তিতে বসবাস করত। ১২২৯ খ্রিস্টাব্দে দ্বিতীয় ফ্রেডারিকের সাথে তাঁর সন্ধির কথা বলা হয়েছে। এ সন্ধি অনুসারে তিনি খ্রিস্টানগণকে জেরুজালেম ও প্যালেস্টাইনের কিয়দংশ ছেড়ে দিতে বাধ্য হন। শেষ আইয়ুবী সুলতান ছিলেন আল-মালিকুস সালিহ। ১২৪৯ খ্রিস্টাব্দে তাঁর মৃত্যু হলে তাঁর পত্নী শাজারুদ্দুর

নিজেকে রানী বলে ঘোষণা করেন। তিনি আশি দিন যাবৎ উত্তর আফ্রিকা শাসন করেন, নিজের নামে খুৎবা পড়ান এবং নিজের নাম মুদ্রায় অঙ্কন করেন। মিসরের মমলুকগণ (দাসগণ) সৈন্যবাহিনীতে বিশেষ প্রভাব বিস্তার করেছিল। তারা অতঃপর নিজেদের মধ্য হতে ইজ্জুদীন আইবাক নামক একজনকে সুলতান বলে ঘোষণা করে। রানী শাজারুদ্দুর ইজ্জুদ্দীনকে বিবাহ করেন। ১২৫০ খ্রিস্টাব্দে মিসরে মমলুক বংশের রাজত্ব প্রতিষ্ঠিত হয়। এর চল্লিশ বছর পূর্বে পাক-ভারতে মমলুক বংশের রাজত্ব প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল এবং দশ বছর পূর্বে ঐ বংশের সুলতানা রাজিয়ার মৃত্যু হয়েছিল।

গ্রন্থনির্দেশ

১. সৈয়দ আমীর আলী : *হিস্ট্রি অব সারাসেন্‌স্‌।*

২. পি. কে. হিট্টি : *হিস্ট্রি অব দি এরাব্‌স্‌।*

৩. P. J. Vatikiotis : *The Ftimid Theory of Stata.*

মুসলিম ও খৃষ্টান রাজ্য (ক্রুসেডের প্রাক্কালে)

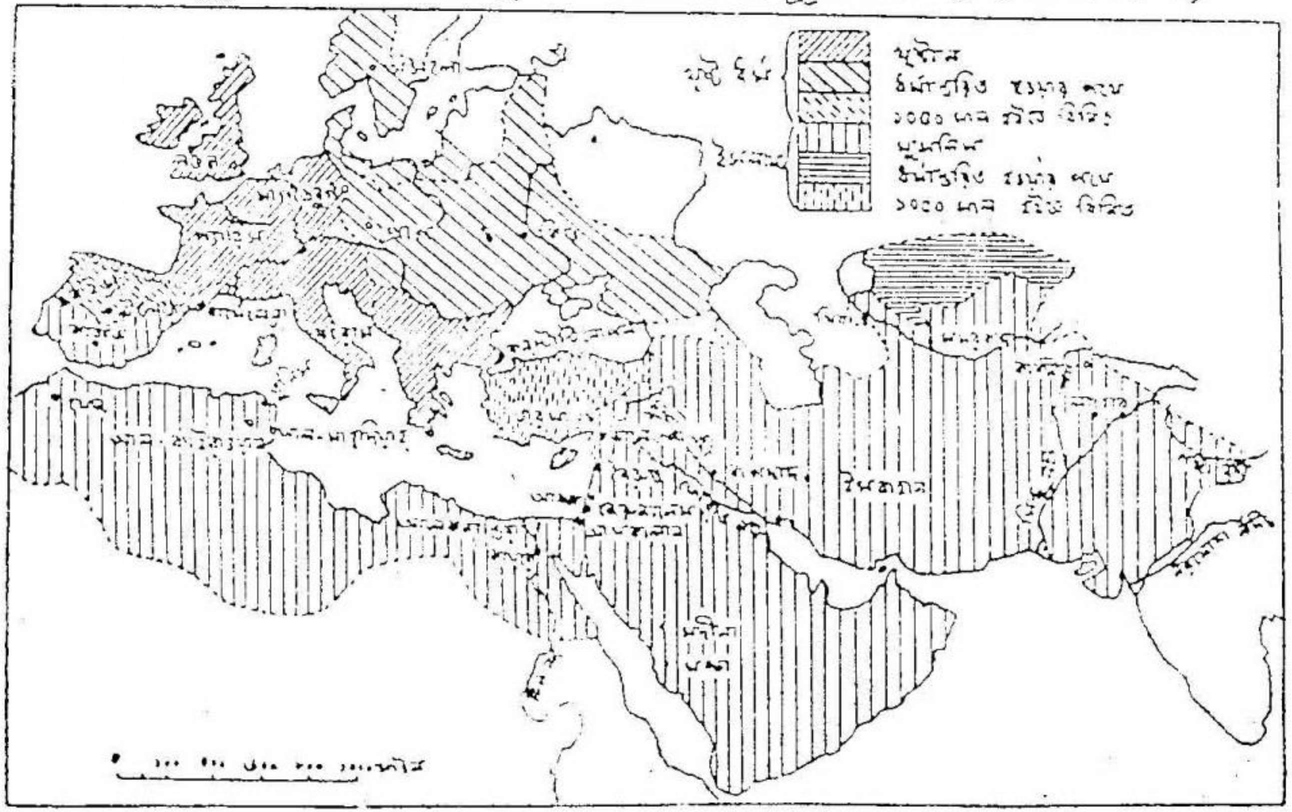

মুসলিম ও খৃষ্টান রাজ্য (ক্রুসেডের প্রাক্কালে)

৪৪

প্রাচ্য ও প্রতীচ্যের সংঘাত ঃ ক্রুসেড

পটভূমি

মুসলিম জগতের বিরুদ্ধে খ্রিস্টান জগতের ব্যাপক যুদ্ধাভিযানকে ক্রুসেড নামে অভিহিত করা হয়। নানাবিধ ধর্মীয়, রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক, বাণিজ্যিক, এমন কি, মনস্তাত্ত্বিক কারণে খ্রিস্টান প্রতীচ্য মুসলিম প্রাচ্যের বিরুদ্ধে অস্ত্র ধারণ করে। ক্রুসেডের পটভূমিকা খুঁজতে হলে দশম শতাব্দীর গোড়ার দিকে মুসলিম ও খ্রিস্টজগতের পারস্পরিক অবস্থানের কথা মনে রাখতে হবে। মুসলমানগণ সিসিলি সার্ডিনিয়া এবং বালিয়ারী দ্বীপপুঞ্জ দখল করে ভূমধ্যসাগরে নিজেদের আধিপত্য স্থাপন করতে সক্ষম হয়। ভূমধ্যসাগরের দক্ষিণ ও পূর্ব তীরবর্তী অঞ্চল আগেই তাদের করতলগত হয়েছিল। এর পর মুসলমানগণ শান্তিতে বসবাস করতে চেয়েছিল কিন্তু তাদের সীমান্ত স্বাভাবিক প্রান্তে পৌছবার পূর্বে তাদের অগ্রাভিযান থেমে গিয়েছিল। এ অস্বাভাবিক সীমান্ত অপরপক্ষের হাত হতে বিনাযুদ্ধে রক্ষা করা সম্ভব ছিল না। স্পেনে তাদের অধিকার সুপ্রতিষ্ঠিত হলেও পিরেনীজ পর্যন্ত অঞ্চল তাদের দখলে আসেনি। সিসিলি তাদের অধিকারে থাকলেও ইটালি তাদের অধীন ছিল না। বিজয়ের এ অসম্পূর্ণতা এবং সীমান্তের এ অরক্ষণীয়তা খ্রিস্টানদের পুনরাক্রমণ সহজসাধ্য করে ছিল। স্পেনে দশম শতাব্দীতেই খ্রিস্টানগণ এ প্রতি-আক্রমণ আরম্ভ করে। কিন্তু ইসলামের বিরুদ্ধে খ্রিস্টধর্মের পূর্ণাঙ্গ হামলার জন্য দুটি ঘটনা বিশেষ প্রণিধানযোগ্য। প্রথমত, ১০৩১ খ্রিস্টাব্দে স্পেনে উমাইয়া শাসনের অবসান ঘটে এবং আন্দালুসিয়ায় ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র রাজবংশের উদ্ভব হয়। এর ফলে স্পেনে খ্রিস্টান আক্রমণ জোরদার হয়। উত্তর-স্পেনের ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র খ্রিস্টান রাজগণের সহায়তায় পোপগণ এগিয়ে আসেন। তাঁরা মুসলমানদের বিরুদ্ধে ক্রুসেড আহ্বান করেন এবং ফ্রান্সের নাইটগণকে এ ব্যাপারে উৎসাহিত করেন। এভাবে ক্রুসেডের প্রারম্ভ স্পেনেই হয়েছিল। ক্যাস্টিলের রাজগণকে সিরিয়া ও প্যালেস্টাইনে যেতে আহ্বান করা হলে তাঁরা বল্লেন, "আমরা সর্বদা এখানে ক্রুসেডরত; সুতরাং আমরা আমাদের কাজের অংশটুকু সম্পন্ন করে যাচ্ছি।" দ্বিতীয়ত, ১০৯২ খ্রিস্টাব্দে মালিক শাহের মৃত্যুর পর সলজুক শক্তি দুর্বল হয়ে পড়লে বাইজান্টাইন সম্রাট আলেক্সিয়াস কমনেনাস ১০৯৪ খ্রিস্টাব্দে পোপ দ্বিতীয় উরবানের কাছে মুসলমানদের বিরুদ্ধে সাহায্যের

জন্য আবেদন করেন। এর ফলে পশ্চিমাঞ্চলের ক্রুসেড পূর্বাঞ্চলে প্রসার লাভ করে। ক্রুসেড বলতে সাধারণত পূর্বাঞ্চলে খ্রিস্ট-মুসলিম যুদ্ধকেই বুঝান হয়। ক্রুসেডের প্রধান কারণ বাহ্যত ধর্মীয়। সলজুক শক্তি যখন দুর্বল হয়ে পড়ছিল, তখন আলেক্সিয়াস কমনেনাস আশা করেছিলেন যে, তিনি এ সুযোগে সলজুকদের হাত হতে বাইজান্টাইনদের অধিকৃত রাজ্য ছিনিয়ে নিবেন, কিন্তু তিনি একাকী তা করতে পারতেন না। সেজন্য তিনি ধর্মের নামে সমগ্র প্রতীচ্যকে মুসলিম প্রাচ্যের বিরুদ্ধে লেলিয়ে দিতে চাইলেন। এ কাজের জন্য সর্বাপেক্ষা উপযুক্ত ব্যক্তি ছিলেন পোপ। পাশ্চাত্য জগতের ওপর তাঁর প্রভাব ছিল অপরিসীম। পাশ্চাত্যকে তখন শুধু ধর্মের নামেই উত্তেজিত করে তোলা সম্ভব ছিল। পোপের কাছে যখন বাইজান্টাইন সম্রাটের আবেদন পৌঁছল, তখন তিনি তুর্কীদের হাত হতে বাইজান্টাইন সাম্রাজ্য রক্ষার কথা ভাবেননি। তিনি গ্রীক ধর্মমতের সাথে রোমের ধর্মমতের পুনর্মিলনের কথা চিন্তা করেছিলেন। খ্রিস্টজগতে জেরুজালেমের তীর্থযাত্রীদের প্রতি তুর্কীদের দুর্ব্যবহারের কথা নানাভাবে অতিরঞ্জিত হয়ে প্রচারিত হল। কিন্তু এটিও খ্রিস্টানদের ধর্মোন্মাদনা জাগাবার একটি কৌশলমাত্র। কারণ সপ্তম শতাব্দীতে আরবগণ কর্তৃক সিরিয়া-প্যালেস্টাইন বিজয় কিংবা ১০৭০ খ্রিস্টাব্দে সলজুকদের জেরুজালেম বিজয় তীর্থযাত্রাকে গুরুতরভাবে ব্যাহত করেনি। মুসলমান রাজা-বাদশাহদের মোটামুটি সহনশীল শাসনে তীর্থযাত্রীদের সংখ্যা ক্রমাগত বেড়ে চলেছিল। অষ্টম শতাব্দীতে ছয়বার, দশম শতাব্দীতে ষোলবার, একাদশ শতাব্দীতে একশত সতর বার এবং দ্বাদশ শতাব্দীতে নয়বার তীর্থযাত্রিগণ 'পবিত্রভূমি'-তে এসেছিল। প্রথম ক্রুসেডের পূর্বে বাম্বার্গের বিশপের নেতৃত্বে সর্বাপেক্ষা বৃহৎ তীর্থ যাত্রীদল জেরুজালেম আসে এবং অন্যূন সাত হাজার জার্মান এ দলভুক্ত ছিল। এন্টিয়ক ও জেরুজালেম তুর্কীদের অধিকারে আসায় ইউরোপের লোকেরা বড় একটা বিচলিত হয়ে পড়েছিল বলে মনে হয় না।

তীর্থযাত্রার ব্যাপারে এ ঘটনায় কোন ইতরবিশেষ হওয়ার কারণও ছিল না। কিন্তু পোপ কর্তৃক যাবতীয় প্রচারণা ও বাগ্মিতা প্রয়োগের ফলে তারা উত্তেজিত হল। তাদেরকে বলা হল যে, বিধর্মী তুর্কীরা ধর্মস্থানকে অপবিত্র করেছে, তারা খ্রিস্টানগণকে জোরপূর্বক খৎনা করিয়েছে, খ্রিস্টানগণকে হত্যা করে তাদের নাভিচ্ছেদ করেছে কিংবা নাড়িভূঁড়ি বের করে ফেলেছে। পুণ্যভূমি জেরুজালেমকে বিধর্মীদের হাত হতে রক্ষা করে তারা অশেষ পারত্রিক, এমন কি জাগতিক কল্যাণের অধিকারী হবে। কারণ খ্রিস্টানদের ধর্মপুস্তকে লিখিত আছে যে, এটা

পৃথিবীর নাভিস্থল, এখানে 'দুধ ও মধু বয়ে যায়।' খ্রিস্টানদের ধর্মীয় উন্মাদনা এবং পোপের অসাধারণ ক্ষমতা এ ধর্মযুদ্ধ সম্ভবপর করে তুলেছিল। কিন্তু কেবল ধর্মীয় উন্মাদনা কিংবা পোপের প্রভাব দ্বারাই ক্রুসেড সম্ভব হত না। ইউরোপের রাজনৈতিক ও সামাজিক অবস্থা এ যুদ্ধের অনুকূল ছিল। ইউরোপে তখন জাতীয় রাষ্ট্র গড়ে ওঠেনি। খ্রিস্টান ও ধর্ম তখনও রাজনৈতিক ভিত্তিতে বিভক্ত হয়ে পড়ে নি। পোপের নেতৃত্বেই মিলিত হওয়া তাদের পক্ষে বেশি স্বাভাবিক ছিল। অধিকন্তু, ইউরোপে তখন নাইটদের সামন্তবাহিনী শক্তিশালী ছিল। এজন্য অতিরিক্ত ব্যয় নির্বাহের প্রশ্ন ছিল না। এরা সামরিক বাহিনী হিসেবে জায়গীর দ্বারা প্রতিপালিত হত। ধর্মযুদ্ধের জন্য নতুন করে সৈন্যবাহিনী গঠনের কিংবা অর্থ সংগ্রহেরও প্রয়োজন ছিল না। রাজারা প্রধানত এতে অংশ গ্রহণ করেননি, সম্রাটের তো কথাই নেই, কারণ তিনি ছিলেন পোপের শত্রু। কাজেই যে-সব দেশে সামন্তপ্রথা বেশি শক্তিশালী ছিল, সে-সব দেশ হতেই ক্রুসেডের জন্য সৈন্য সংগ্রহ হয়েছিল বেশি। ফ্রান্স, ইংল্যাণ্ড ও ইটালি এ সব দেশই ক্রুসেডে প্রধান ভূমিকা গ্রহণ করেছিল। ইউরোপের সামন্তপ্রথা, নাইট ও শিভালরী ব্যতীত ক্রুসেড অভিযান কল্পনাই করা যায় না। ক্রুসেড-আন্দোলন মূলত সৈনিকদের আন্দোলন, এটা নিরস্ত্র ধর্মপ্রাণ তীর্থযাত্রীদের আন্দোলন ছিল না। নিরস্ত্র লোকেরা দল বেঁধে যুদ্ধের জন্য পুণ্যভূমিতে পদার্পণ করলে তুর্কীদের হাতে তারা নিশ্চিহ্ন হয়ে যেত। ইউরোপের আত্মকলহ ও অন্তর্দ্বন্দ্ব হতে বিখ্যাত যোদ্ধজাতি ফ্রাঙ্ক ও নরম্যানদের মনোযোগ ইউরোপের বাইরে নিবিষ্ট করাই ছিল এ আন্দোলনের অন্যতম উদ্দেশ্য।

নানা প্রকার জাগতিক প্রলোভন বহু লোককে নানাভাবে ক্রুসেডে যোগদানের জন্য উৎসাহিত করেছিল। নতুন রাজ্য জয়ের বাসনা, প্রচুর অর্থ আত্মসাতের লালসা, প্রাচ্যদেশীয় নানা বিলাস সামগ্রী, বিগত জীবনের পাপ ও অন্যায়ের প্রায়শ্চিত্ত প্রভৃতি কারণেও নানা লোক ক্রুসেডের আহ্বানে সাড়া দিয়েছিল। ক্রুসেডারগণকে বহু সুযোগ-সুবিধার প্রতিশ্রুতি দেয়া হল। তাদের ভূ-সম্পত্তি গির্জার তত্ত্বাবধানে থাকবে। এগুলির ব্যাপারে কোন মামলা-মোকদ্দমা গ্রাহ্য হবে না। তাদের ঋণের ওপর কোন সুদ ধার্য হবে না। নাইটদের জন্য দুঃসাহসিক অভিযানের পুলক-রোমাঞ্চ, ধনিকের জন্য পুণ্য সঞ্চয় ও পরকালে অনন্ত সুখ-সম্ভোগ, বণিকদের জন্য বাণিজ্য প্রসার, দাগী-অপরাধীদের পাপের প্রায়শ্চিত্ত এবং দরিদ্রের জন্য সাময়িকভাবে ভোগ-বিলাসের আশা ক্রুসেডের উৎসাহকে সঞ্জীবিত রেখেছিল।

সাময়িক উত্তেজনা ও সাম্প্রতিক ঘটনাকে ক্ষণকালের জন্য দৃষ্টির বাইরে রেখে দিলে ইতিহাসের ঘটনাবলির সামগ্রিক বিচারে ক্রুসেডকে প্রাচ্য ও প্রতীচ্যের দ্বন্দ্ব হিসেবে বিচার করাই ঠিক হবে। এ দ্বন্দ্বে কখনও প্রতীচ্য আক্রমণাত্মক ভূমিকা আর প্রাচ্য আত্মরক্ষার ভূমিকায়, আবার কখনও প্রাচ্য বিজয়ীর বেশে এবং প্রতীচ্য বিজেতার বেশে দেখা দিয়েছিল। প্রাচীন ট্রয়ের যুদ্ধ এবং পারসিক যুদ্ধ হতে এর প্রারম্ভ এবং আধুনিককালে পশ্চিম ইউরোপের সাম্রাজ্যবাদী রাজ্য বিস্তারে এর চরম পরিণতি। বস্তুত, "ক্রুসেড পশ্চিম ইউরোপের রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক বিস্তারের একটি পর্যায়, এটা সাম্রাজ্যবাদের মধ্যযুগীয় অধ্যায়।"*

১০৯৫ খ্রিস্টাব্দের ২৬ নভেম্বর পোপ উরবান ক্ল্যারমন্টে তাঁর বিখ্যাত ভাষণ দান করেন। পৃথিবীতে খুব কম বক্তৃতাই এটা অপেক্ষা অধিকতর ফলপ্রসূ

প্রথম ক্রুসেড (১০৯৮-১১০৯ খ্রিঃ)

হয়েছিল। অভিজাত শ্রেণী, নাইট ও অভিযাত্রীরা পোপের আহ্বানে সাড়া দিল। প্রথম ক্রুসেডে কোন রাজা-বাদশাই এগিয়ে আসেনি; ইংলণ্ডের উইলিয়াম রাফাস, ফ্রান্সের প্রথম ফিলিপ অথবা জার্মানির চতুর্থ হেনরী কেউই এ যুদ্ধে শরীক হননি। ফ্রান্সের নোবল-নাইটগণ এ যুদ্ধে অধিক সংখ্যায় যোগদান করেন। তিনটি প্রধান বাহিনী কনস্টান্টিনোপলের দিকে যাত্রা করেছিল. লথারিঞ্জিয়া হতে একটি বাহিনী গডফ্রের নেতৃত্বাধীনে জার্মানি ও হাঙ্গেরীর মধ্য দিয়ে, উত্তর-ফ্রান্সের লোকেরা নরম্যাণ্ডির ডিউক রবার্ট, ব্লয়েসের কাউন্ট স্টিফেন, ভার্মাণ্ডয়েসের কাউন্ট হিউ, এবং ফ্লাণ্ডার্সের রবার্টের অধীনে ইটালির পথে নরম্যানদের সাথে যুক্ত হয়ে তাদের নেতা বোহেমাণ্ডের সাথে এবং দক্ষিণ-ফ্রান্সের লোকেরা টুলোর কাউন্ট রেমণ্ডের অধীনে দক্ষিণ ইটালি হয়ে যাত্রা করল। ১০৯৬ খ্রিষ্টাব্দে তারা দলে দলে কনস্টান্টিনোপলে গিয়ে উপস্থিত হল।

ইতিমধ্যে পোপের প্রচারণায় অনুপ্রাণিত হয়ে সন্ন্যাসী পিটার (Peter the Hermit) ফ্রান্সের কৃষক ও নগরবাসীদেরকে যুদ্ধে যোগদানের জন্য উত্তেজিত করতে লাগল। এর ফলে গ্রামের পর গ্রাম খালি হয়ে গেল। উত্তর-পূর্ব ফ্রান্স ও পশ্চিম-জার্মানি হতে অগণিত লোক পথিমধ্যে ইহুদিদেরকে লুণ্ঠন করে হাঙ্গেরী হয়ে কনস্টান্টিনোপলে পৌঁছল। যেখানে তারা যেত, সেখানেই লুট-তরাজ করে

* Thompson and Johnson, An Introduction to Medieval Europe, পৃষ্ঠা, ৫২৩।

বেড়াত। বাইজান্টাইন সম্রাট কখনও এরূপ অবস্থার জন্য প্রস্তুত ছিলেন না। এদেরকে অবিলম্বে জাহাজে করে এশিয়া মাইনরে পাঠিয়ে দেয়া হল। সেখানে পৌঁছামাত্র তাদের অধিকাংশ লোক তুর্কীদের হাতে কাটা পড়ল। পিটার দি হার্মিট ও কিছুসংখ্যক লোক রক্ষা পেল।

ক্রুসেড বাহিনী কনস্টান্টিনোপলে পৌঁছলে সম্রাট আলেক্সিয়াস কমনেনাস তাদের কাছ থেকে এ মর্মে আনুগত্যের শপথ গ্রহণ করলেন যে, তারা তাঁর সাম্রাজ্যের যে যে অংশ তুর্কীদের হাত হতে উদ্ধার করবে, তা তাঁকে প্রত্যর্পণ করবে। ক্রুসেড যোদ্ধাগণ রুমের সলজুক সুলতানের রাজধানী নাইসিয়া অধিকার করল (১০৯৭ খ্রিঃ)। এটা তারা বাইজান্টাইন সম্রাটের হাতে সমর্পণ করল। এর পর ক্রুসেডারগণ সিরিয়ার দিকে যাত্রা করল। পথিমধ্যে বল্ডউইন মূলবাহিনী হতে সরে পড়লেন। এডেসার আর্মিনীয় খ্রিস্টান শাসক তাঁকে ডেকে পালক পুত্র করে নিলেন এবং এডেসা নগরী তাঁকে দান করলেন। বল্ডউইন একজন আর্মিনীয় যুবরানীর পাণি গ্রহণ করে এডেসায় বসতি স্থাপন করলেন। তাঁর জন্য ক্রুসেডের এখানেই পরিসমাপ্তি। তবে 'এডেসার কাইন্টি' প্রথম ল্যাটিন রাজ্য হিসেবে তুর্কীদের সিরিয়া আক্রমণের বিরুদ্ধে বিরাট প্রতিবন্ধক হয়ে দাঁড়িয়েছিল। ক্রুসেডারগণ সিরিয়ায় ন্যূনাধিক একশত পঁয়ষট্টিটি সিরীয় শহর ও দুর্গ দখল করে নিল; তারা সাত মাস যাবৎ এন্টিয়ক অবরোধ করল। অবশেষে বোহেমাণ্ডের সেনাবাহিনী ১০৯৮ খ্রিস্টাব্দের ৩রা জুন নগরে প্রবেশ করে। বোহেমাণ্ডের অধীনে এখানে ক্রুসেডারদের দ্বিতীয় স্বাধীন রাজ্য স্থাপিত হল। অতঃপর রেমণ্ডের নেতৃত্বে অবশিষ্ট ক্রুসেডারগণ সিরিয়ার উপকূল অঞ্চল ধরে প্রায় বিনা বাধায় অগ্রসর হয়ে চলল। অবশেষে তারা ১০৯৯ খ্রিস্টাব্দের জুন মাসে জেরুজালেমের সম্মুখে উপস্থিত হল। তাদের সাথে সহযোগিতায় রত জেনোয়ার একটি নৌবহরের

জেরুজালেম উদ্ধার, ১৫ জুলাই, ১০৯৯ খ্রিঃ

সাহায্যে ১৫ জুলাই জেরুজালেম অধিকৃত হল। ইতিপূর্বে জেরুজালেম তুর্কীদের হাত হতে মিসরের ফাতিমীয়গণের হাতে চলে গিয়েছিল। মিসরীয় বাহিনীর হাত হতেই ক্রুসেডারগণ জেরুজালেম দখল করে। পবিত্রভূমি অধিকারের উন্মাদনায় ক্রুসেডারগণ এক আসুরিক নরমেধ যজ্ঞের অবতারণা করল। নারী-পুরুষ

বালক-বৃদ্ধ, নির্বিশেষে এ নিধনযজ্ঞের শিকার হল। মানুষের রক্তে রাস্তা-ঘাট ভেসে গেল। 'সলোমনের উপাসনালয়' রক্তে রক্তাক্ত হয়ে গেল। অবাধ-লুট-তরাজ চলল। খ্রিস্টানগণ হাঁটু পর্যন্ত রক্ত নিয়ে মন্দিরে উপাসনারত হল। মানুষের মৃতদেহে জেরুজালেম নগরী পরিপূর্ণ হল। কর্তিত শির, হাত, পা স্তূপাকৃতি হয়ে পড়ে রইল। অচিরেই পূতিগন্ধে নগরীর আকাশ-বাতাস দূষিত হয়ে উঠল। এর এক মাস পরে মিসরীয়গণ জেরুজালেম উদ্ধারের চেষ্টা করে আসকালানের নিকট পরাজিত হয়। এভাবে ক্রুসেডারগণ কর্তৃক তৃতীয় ল্যাটিন রাজ্য স্থাপিত হল। রেমণ্ডকে এর কর্তৃত্ব দেয়া হলে তিনি তা গ্রহণ করতে অস্বীকার করেন। গডফ্রেকে গির্জা ও নগরীর কর্তৃত্ব দান করা হল। তাঁর মৃত্যুর পর তাঁর ভ্রাতা এডেসার বল্ডউইন জেরুজালেমের রাজা উপাধি গ্রহণ করেন। এর পর সিরিয়ার উপকূলস্থ বন্দরগুলি দখল করা অপরিহার্য হয়ে পড়ল। এ ব্যাপারে ইটালির জেনোয়া, পিসা ও ভেনিসের সওদাগর ও বণিকসম্প্রদায় রণতরী সরবরাহ করে ক্রুসেডারগণকে সাহায্য করল। তারা এর বদলে এ সব স্থানে অবাধ বাণিজ্যের সুযোগ-সুবিধা লাভ করল। ১১০৯ খ্রিস্টাব্দে ত্রিপলি অধিকৃত হয়। এখানে ক্রুসেডারদের চতুর্থরাজ্য স্থাপিত হয়। এ চারটি রাজ্য এডেসা, এন্টিয়ক, জেরুজালেম ও ত্রিপলি ইউরোপীয় সামন্ত প্রথার ভিত্তিতেই গঠিত হয়। জেরুজালেমে দুটি সন্ন্যাসী সম্প্রদায় নানাভাবে ক্রুসেডারগণকে সাহায্য করে। তারা সেবা-শুশ্রূষা হতে আরম্ভ করে ধর্মের জন্য অসি ধারণ পর্যন্ত সব কাজ করতে পারত। এরা টেম্পলার (Templars) ও হস্পিটলার (Hospitallers) নামে পরিচিত; প্রথমোক্ত দল ক্রুসেডে যোগদানের জন্য জেরুজালেমে এসে সলমোনের মন্দিরের (Temple) নিকট বসতি স্থাপন করে। এ বাসস্থান হতে তাদের নাম হয় Templar. তারা সাদা পোশাকে শরীর আবৃত করে তাকে লাল ক্রুশ দ্বারা সজ্জিত করত। হস্পিটলারগণ ক্রুসেডের পূর্বেই জেরুজালেমে তীর্থযাত্রীদের সেবার জন্য একটি হাসপাতাল স্থাপন করে। অচিরেই তারা পুণ্যভূমি রক্ষার্থে টেম্পলারদের মত অসি ধারণ করতে আরম্ভ করে। এরা কাল পোশাকে সাদা ক্রুশ ধারণ করত।

ক্রুসেডের যুদ্ধে অংশগ্রহণকারী সিরীয় রাজ্যসমূহ ১১৪০ খ্রীঃ

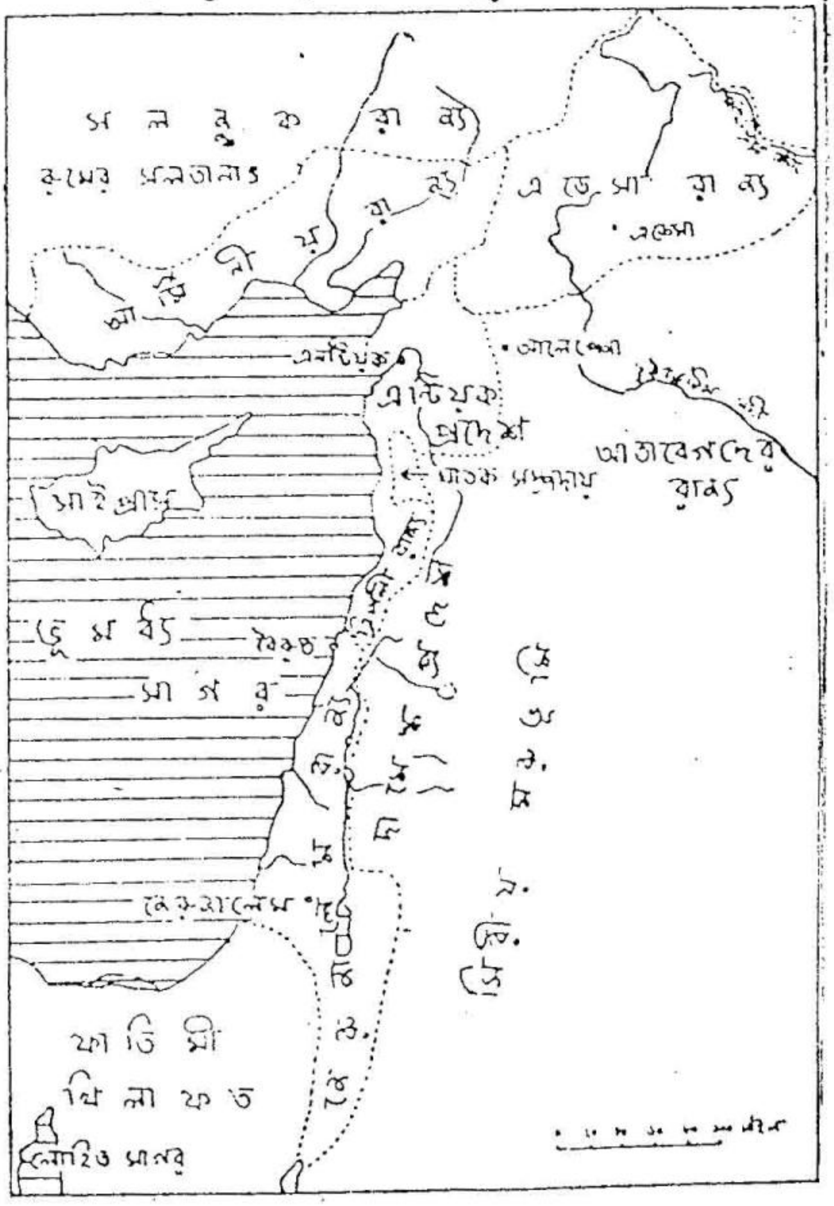

ক্রুসেডের যুদ্ধে অংশগ্রহণকারী সিরীয় রাজ্যসমূহ ১১৪০ খ্রীঃ

ইমাদুদ্দীন জঙ্গী ও দ্বিতীয় ক্রুসেড, ১১৪৭-১১৪৯ খ্রিঃ

মসুলের আতাবেগ ইমাদুদ্দীন জঙ্গীর অভ্যুদয় ক্রুসেডের মোড় সম্পূর্ণ ঘুরিয়ে দিয়ে মুসলমানদের জন্য অনুকূল অবস্থার সৃষ্টি করল। তিনি মুসলমানদের মধ্যে প্রথম বীর, যিনি ক্রুসেডারগণকে প্রতি-আক্রমণ করে শ্রেষ্ঠ মুসলিম বীর সালাহুদ্দীনের বিজয়ের পথ সুপ্রশস্ত করেন। ১১৪৪ খ্রিষ্টাব্দে তিনি এডেসা পুনরধিকার করেন। ইউরোপে তখন দ্বিতীয় ক্রুসেডের দুন্দুভি বেজে উঠল। এবার সেন্ট বার্নার্ড নামক একজন মঠাধ্যক্ষের প্ররোচনায় দুজন রাজা ক্রুশ ধারণ করতে রাজি হলেন। ফ্রান্সের সপ্তম লুই ও জার্মানির তৃতীয় কনরাডের নেতৃত্বে ফরাসি ও জার্মান বাহিনী কনস্টান্টিনোপল হয়ে জেরুজালেম পৌছল। টেম্পলার ও হস্পিটলারদের সহযোগিতায় এবং জেরুজালেম রাজা কর্তৃক প্রদত্ত এক সৈন্যবাহিনীসহ তারা দামিস্ক অবরোধ করল। কিন্তু অকৃতকার্য হয়ে অবরোধ তুলে নিল। ইমাদুদ্দীনের সুযোগ্য পুত্র ও উত্তরাধিকারী নূরুদ্দীন ১১৫৪ খ্রিষ্টাব্দে অপর মুসলিম শাসকের কাছ থেকে দামিস্ক অধিকার করেন। তিনি এডেসা রাজ্যের বিজয় সম্পূর্ণ করেন এবং এন্টিয়কের কিয়দংশ দখল করেন। এ উভয় রাজ্যের শাসকদ্বয়কে তিনি বন্দী করে নিয়ে যান। পরে উভয় শাসককে মুক্তি মূল্যের বিনিময়ে ছেড়ে দেয়া হয়।

সালাহুদ্দীনের অভ্যুত্থান

নূরুদ্দীনের একজন সুযোগ্য সহকারী ছিলেন শিরকুহ। ১১৬৪ খ্রিষ্টাব্দে নূরুদ্দীন শিরকুহকে একটি সৈন্যদল নিয়ে মিসরে চলে যেতে আদেশ করেন। মিসরে তখন শেষ ফাতিমীয় খলিফা আল-আদিদ রাজত্ব করছিলেন। শিরকুহ মিসরে গিয়ে যুযুধান সামরিক দলের কোন একটিকে হাত করে কয়েকটি সামরিক ও কূটনৈতিক বিজয়ের পর খলিফা কর্তৃক উজীর নিযুক্ত হন (১১৬৯ খ্রিঃ)। জেরুজালেমের রাজাও খ্রিষ্টান-মুসলিম দ্বন্দ্বে মিসরের গুরুত্ব উপলব্ধি করে শিরকুহের প্রতিদ্বন্দ্বী দলের সাথে সহযোগিতা করেছিলেন। উজীর হবার অল্প পরেই শিরকুহের মৃত্যু হলে তাঁর ভ্রাতুষ্পুত্র সালাহুদ্দীন (Saladin) উজীর হলেন।

আল-মালিকুন নাসির সুলতান সালাহুদ্দীন ১১৩৮ খ্রিষ্টাব্দে দাজলার তীরবর্তী তাক্রিত নামক স্থানে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর পিতা আতাবেগ জঙ্গীর একজন সেনানায়ক ছিলেন। তিনি ১১৬৪ খ্রিষ্টাব্দে পিতৃব্য শিরকুহের সাথে মিসরে

সালাহুদ্দীন আগমন করে সেখানে উজীর পদে উন্নীত হন। তাঁর জীবনে দুটি উচ্চাকাঙ্ক্ষা ছিল, প্রথমটি হল মিসর অধিকার করা এবং দ্বিতীয়টি ফ্রাঙ্কদের (ক্রুসেডারগণকে মুসলমানগণ এ নামে অভিহিত করত) বিরুদ্ধে জিহাদ করা। ফাতিমীয় খলিফার শোচনীয় অবস্থা দর্শনে তিনি মর্মাহত হলেন। তিনি সুন্নী মতাবলম্বী ছিলেন। তাই ১১৭১ খ্রিস্টাব্দে ফাতিমীয় খলিফাকে পদচ্যুত করে তিনি মিসরে আব্বাসীয় খলিফার নামে খুৎবা প্রতিষ্ঠিত করলেন। এর তিন বছর পর (১১৭৪ খ্রিঃ) তাঁর প্রভু (তাঁর পিতা ও পিতৃব্যের প্রভু) নূরুদ্দীনের মৃত্যু হলে তিনি মিসরের সুলতান হলেন। তিনি নূরুদ্দীনের পুত্রের কাছ থেকে সিরিয়া দখল করেন। ১১৭৫ খ্রিস্টাব্দে তাঁরই অনুরোধে বাগদাদের খলিফা তাঁকে মিসর, মাগরিব, নুবিয়া, পশ্চিম-আরব, প্যালেস্টাইন এবং মধ্য-সিরিয়ার কর্তৃত্ব প্রদান করেন। দশ বছর পরে তিনি মসুলও দখল করেন। এভাবে তিনি ফুরাত হতে নীলনদের তীর পর্যন্ত অঞ্চলে অপ্রতিহত ক্ষমতা প্রতিষ্ঠিত করে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র খ্রিস্টান রাজ্যগুলিকে দমন করতে উদ্যত হলেন।

কিন্তু খ্রিস্টান শক্তির মোকাবেলা করার পূর্বে সালাহুদ্দীন ঘাতক সম্প্রদায় (Assassins) কর্তৃক আক্রান্ত হয়েছিলেন। এরা জাতিধর্ম নির্বিশেষে সব লোকের প্রাণহানি করত। ১১৭৬ খ্রিস্টাব্দে সালাহুদ্দীন তাদের নেতা রশীদুদ্দীন সিনানের দুর্গ অবরোধ করে তাদের নিকট হতে ভবিষ্যৎ নিরাপত্তার প্রতিশ্রুতি আদায় করলেন। সালাহুদ্দীনের নেতৃত্বাধীনে যখন মুসলিম শক্তি সম্মিলিত হল, তখন জেরুজালেম রাজ্য উত্তরাধিকারের দ্বন্দ্বে ক্ষত-বিক্ষত হচ্ছিল। এ সময় চ্যাটিলনের রেজিনাল্ড নামক একজন দুঃসাহসিক ফরাসি সর্দারের নিষ্ঠুর ও জঘন্য আচরণে যুদ্ধ অনিবার্য হয়ে উঠল। তিনি জেরুজালেমের অধীনে কারাক নামক দুর্গের ভারপ্রাপ্ত সেনাপতি ছিলেন। ল্যাটিন নেতাদের মধ্যে তিনি ছিলেন ন্যায়-অন্যায় জ্ঞানশূন্য এবং বর্বর-প্রকৃতির। তিনি হিজাযের উপকূলবর্তী অঞ্চলে নৌ-অভিযান প্রেরণ করে হজ্বযাত্রিগণকে হত্যা করতেন এবং মুসলমান বাণিজ্য-কাফেলা লুণ্ঠন করতেন। পরিশেষে সালাহুদ্দীনের সাথে শান্তিচুক্তি ভঙ্গ করে তিনি একটি মিসরীয় কাফেলা লুণ্ঠন করলেন। এ কাফেলা নাকি সালাহুদ্দীনের ভগ্নীকে পাহারা দিয়ে নিয়ে যাচ্ছিল। সুলতান সালাহুদ্দীন প্রতিজ্ঞা করলেন যে, এ দুর্বৃত্তকে তিনি নিজ হাতে হত্যা করবেন। ১১৮৭ খ্রিস্টাব্দে টাইবেরিয়াস অবরোধ করে সালাহুদ্দীন তা দখল করলেন (১ জুলাই)। এর পর তিনি হিত্তিনের যুদ্ধে (৩-৪ জুলাই) খ্রিস্টানগণকে শোচনীয়ভাবে পরাজিত করেন এবং হাজার হাজার

লোককে বন্দী করেন। জেরুজালেমের রাজা গাই দি লুসিগনান বন্দী হয়ে সালাহুদ্দীনের নিকট উপস্থিত হলে সুলতান তাঁকে বন্ধুজনোচিত সম্মান প্রদর্শন করেন। কিন্তু দস্যু রেজিনাল্ড তাঁর নিকট ভিন্ন ব্যবহার প্রাপ্ত হলেন। বিশ্বাসঘাতক সালাহুদ্দীনের হাতে নিহত হলেন। এক সপ্তাহ অবরোধের পর পবিত্র নগরী জেরুজালেম আত্মসমর্পণ করল (২ অক্টোবর, ১১৮৭ খ্রিঃ)। খ্রিস্টানগণ ১০৯৯ খ্রিস্টাব্দে যে নগরীকে মানুষের শব ও শোণিতস্রোতে পরিপূর্ণ করে তুলেছিল, সালাহুদ্দীনের জেরুজালেমে প্রবেশের সময় সেখানে কোন নরহত্যাই সংঘটিত হয়নি। গ্রীক ও সিরীয় খ্রিস্টানগণকে পূর্ণ নাগরিক অধিকারসহ নগরে থাকবার অনুমতি দেয়া হল। ফ্রাঙ্ক সৈন্যগণকে চল্লিশ দিনের ভেতর মুক্তি মূল্য দিয়ে নগর ত্যাগ করবার অনুমতি দেয়া হল। যখন ধনাঢ্য খ্রিস্টানগণ নিজ নিজ মুক্তি সম্পন্ন করে দরিদ্র লোকদেরকে ফেলে যাচ্ছিল এবং যখন জেরুজালেমের প্যাট্রিয়ার্ক নিজের ধনসম্পদ, গির্জার মূল্যবান পেয়ালা-বাসন ও টাকা-পয়সা নিয়ে দ্রুত নগর ত্যাগ করলেন, তখন সদাশয় সালাহুদ্দীন প্রায় দশ সহস্র লোকের মুক্তি মূল্য স্বয়ং দান করলেন এবং তাঁর ভ্রাতা সাইফুদ্দীন আরও সাত সহস্র লোকদের মুক্তি দান করলেন। ১১৮৯ খ্রিস্টাব্দের মধ্যে জেরুজালেম রাজ্য সমেত প্রায় সমগ্র লাটিন অধিকৃত অঞ্চল সালাহুদ্দীনের অধিকারে আসে। কেবল ত্রিপলি, টায়ার ও এন্টিয়ক এবং আরও দু-একটি ছোটখাট শহর লাটিন অধিকারে থাকল।

জেরুজালেমের পতন তৃতীয় ক্রুসেডের ডঙ্কা বাজিয়ে দিল। এ ক্রুসেডে রাজা-সম্রাটগণ যোগদান করেছিলেন বলে একে 'রাজাদের ক্রুসেড' বলা হয়।

তৃতীয় ক্রুসেড
১১৮৯-৯২ খ্রিঃ

জার্মান সম্রাট ফ্রেডারিক বার্বারোসা ইংলণ্ডের রাজা রিচার্ড কোর ডিলায়ন (শার্দুল হৃদয়) এবং ফ্রান্সের রাজা ফিলিপ অগাস্টাস তৃতীয় ক্রুসেডে যোগদান করেন। সম্রাট প্রথমে যাত্রা করেছিলেন কিন্তু গন্তব্যস্থলে পৌঁছবার পূর্বেই তিনি সিলিসিয়ায় নদীগর্ভে নিমজ্জিত হন। ইংলণ্ডের রাজা রিচার্ড পথিমধ্যে সাইপ্রাস দখল করেন। তাঁর মধ্যে এবং ফ্রান্সের রাজা ফিলিপ অগাস্টাসের মধ্যে কোন মতের মিল ছিল না। ক্রুসেডারগণ আক্কা (Acre) অবরোধ করল। জেরুজালেমের রাজা গাই (Guy) আক্রমণে অগ্রণীর ভূমিকা গ্রহণ করলেন। ফ্রান্সের রাজা তাদের সাথে যোগদান করলেন। রিচার্ড এর পরে পৌঁছলেন। তাঁর আগমনে খ্রিস্টানদের মধ্যে আনন্দের হিল্লোল বয়ে গেল। এখন উভয় পক্ষে দুই প্রধান বীর রিচার্ড ও সালাহুদ্দীনের নেতৃত্বে যুদ্ধ পুর্ণোদ্যমে আরম্ভ হল। প্রায় দুই বছর ধরে অবরোধ চলল (২৭ আগস্ট ১১৮৯—

১২ জুলাই ১১৯১ খ্রিঃ)। নৌ-বহর এবং আগ্নেয়াস্ত্রের জন্য খ্রিস্টানদের বিশেষ সুবিধা হল। সালাহুদ্দীনের একক নেতৃত্ব তাঁর সুবিধার কারণ ছিল। সালাহুদ্দীন খলিফার নিকট সাহায্য প্রার্থনা করে নিরাশ হলেন। অবশেষে মুসলমানগণ দুটি শর্তে নগর সমর্পণ করল; তারা আক্কায় পবিত্র ক্রুশ পুনঃ সংস্থাপন করবে এবং ২০০,০০০ স্বর্ণ মুদ্রার বিনিময়ে আক্কার মুসলিম সেনাবাহিনী মুক্তি লাভ করবে। কিন্তু এ অর্থ দিতে দেরি হওয়ায় রিচার্ড সাতাশ হাজার বন্দীকে অন্যান্য মুসলমানদের সম্মুখে হত্যা করলেন। তাঁর এ ব্যবহার জেরুজালেমের পতনের পর সালাহুদ্দীনের উদার ব্যবহারের সম্পূর্ণ বিপরীত ছিল।

আরও কিছুকাল যুদ্ধ চলার পর তৃতীয় ক্রুসে[illegible]য়ে আসল। ফিলিপ অগাস্টাস সৈন্যবাহিনী রেখে দেশে চলে গেলেন। রিচার্ড বহু চেষ্টা করেও জেরুজালেম পুনরুদ্ধার করতে ব্যর্থ হলেন। তিনি সালাহুদ্দীনের সাথে সন্ধি স্থাপনের জন্য ব্যাকুল হয়ে উঠলেন। পরস্পর আলাপ-আলোচনা চলতে লাগল। রিচার্ড সালাহুদ্দীনের ভ্রাতা সাইফুদ্দীনকে একবার এক আলোচনায় ডেকে পাঠালেন। কিন্তু কোন ফল হল না। রিচার্ড একবার প্রস্তাব করলেন যে, সালাহুদ্দীনের ভ্রাতার সাথে তাঁর (রিচার্ডের) ভগ্নীর বিবাহ হোক এবং বর-কনেকে উপঢৌকন স্বরূপ জেরুজালেম ছেড়ে দেয়া হোক। এর ফলে খ্রিস্টান ও মুসলমানদের বিরোধ স্থায়ীভাবে মিটমাট হয়ে যাবে। কিন্তু পাদ্রীরা এ প্রস্তাব মানতে রাজি হলেন না। পরিশেষে ২ নভেম্বর ১১৯২ খ্রিস্টাব্দে শান্তি স্থাপিত হল। এ সন্ধি অনুসারে সিরিয়ার উপকূল অঞ্চল জেরুজালেমের রাজার হাতে ছেড়ে দেয়া হল। মুসলমানগণ খ্রিস্টানগণকে জেরুজালেমে অবাধ প্রবেশাধিকার দান করবে। সালাহুদ্দীন এ শান্তির ফল ভোগ করবার জন্য বেঁচে ছিলেন না। পর বছর ১২৯৩ খ্রিস্টাব্দের ১৯ ফেব্রুয়ারি তাঁর মৃত্যু হয়। সালাহুদ্দীনের স্বপ্ন ছিল ল্যাটিন রাজ্যগুলি দখল করা। তাঁর সেই উদ্দেশ্য সফল হয়নি। এন্টিয়ক, ত্রিপলি এবং জেরুজালেম রাজ্যের কিয়দংশ খ্রিস্টানদের হাতেই রয়ে গেল, কিন্তু তিনি জেরুজালেম শহর পুনরুদ্ধার করেছিলেন।

চতুর্থ ক্রুসেড ১২০২-১২০৪ খ্রিঃ

পোপ তৃতীয় ইন্নোসেন্ট ১১৯৮ খ্রিস্টাব্দে যখন আরেকবার ধর্মযুদ্ধ আহ্বান করলেন, তখন তাঁর বাগ্মিতা ও আকুল আবেদন ক্লেরমন্টে এক শতাব্দী পূর্বেকার পোপ উরবানের বাগ্মিতার কথাই স্মরণ করিয়ে দিল। কিন্তু তাঁর আবেদন যে ক্রুসেডের জন্য দিল, তা মুসলমানদের বিরুদ্ধে প্রযুক্ত না হয়ে খ্রিস্টানদের বিরুদ্ধে পরিচালিত হল। সুতরাং

একে ক্রুসেড বললে সত্যের অপলাপই হবে। এ ক্রুসেডে কোন রাজাই যোগদান করেননি। ফ্রান্সের ফিলিপ ও ইংলণ্ডের জন পরস্পর কলহে লিপ্ত হলেন। জার্মানীতে গৃহবিবাদ শোচনীয় রূপ পরিগ্রহ করে। প্রথম ক্রুসেডের মতই ফ্রান্সের নোবল-নাইটগণই প্রধানত এতে যোগদান করল। ভেনিশিয়ার বণিকদের কাছে ক্রুসেডারগণ খাদ্য ও জাহাজ চাইল। বণিকরা পঁচাশি হাজার মার্ক দাবি করল, তদুপরি বিজিত রাজ্যের ও সম্পত্তির অর্ধেকও দাবি করল। অর্থগৃধ্নু ভেনিশীয়গণ এ যুদ্ধকে লুটতরাজের উছিলা হিসেবে ব্যবহার করল। ক্রুসেডারগণ প্রথমে মিসর অধিকার করতে চাইল। কিন্তু ভেনিশীয়গণ মিসরের সাথে তাদের প্রাচীন ব্যবসায় হারাতে রাজি ছিল না। অধিকন্তু তারা তাদের পাওনা পুরাপুরি দাবি করে বসল। তাদের পরামর্শে প্রথমে হাঙ্গেরীর রাজার অধীন জারা শহর আক্রমণ করা হল। তারপর তারা কনস্টান্টিনোপলে অন্তর্দ্বন্দ্বের সুযোগে সেদিকে যাত্রা করল। তারা এ নগরী লুণ্ঠন করল। পবিত্র গির্জা সান্টা সোফিয়ার পবিত্রতা নষ্ট করল; এর মূল্যবান দ্রব্যসামগ্রী লুণ্ঠন করল; নগরীর গলিতে গলিতে তারা লুণ্ঠন ও হত্যাকাণ্ড চালিয়ে মূল্যবান দ্রব্যসামগ্রী আত্মসাৎ করল; নারীর মর্যাদা ক্ষুণ্ণ করল; পাঠাগারের মুল্যবান পুঁথি-পুস্তক বিনষ্ট করল। দুষ্প্রাপ্য শিল্পদ্রব্যগুলি তাদের পৈশাচিক বর্বরতায় ধ্বংসপ্রাপ্ত হল। বাইজান্টাইন সাম্রাজ্যের তীর সংলগ্ন অঞ্চল ও কয়েকটি দ্বীপ ভেনেশীয়দের অধিকারভুক্ত হল। কনস্টান্টিনোপলে একটি ল্যাটিন রাজ্য স্থাপিত হল। ফ্লাণ্ডার্সের কাউন্ট বল্ডউইন সম্রাট বলে ঘোষিত হলেন। ১২০৪ খ্রিস্টাব্দ হতে ১২৬১ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত কনস্টান্টিনোপলে কোন বাইজান্টাইন সাম্রাজ্য ছিল না। এরপর গ্রীকগণ পুনরায় স্বাধীনতা লাভ করে।

ছোটদের ক্রুসেড (১২১২ খ্রিঃ)

একটি বার বছর বয়স্ক ফরাসি বালক প্রচার করতে আরম্ভ করল যে, প্রভু যীশু তাকে একদল্ বালক নিয়ে জেরুজালেমের গির্জা উদ্ধার করতে যাবার জন্য আদেশ করেছেন। এ আহ্বানে সাড়া দিয়ে হাজার হাজার ছেলেমেয়ে সমুদ্রের দিকে যাত্রা আরম্ভ করল। তাদের দৃঢ় বিশ্বাস ছিল যে, পুণ্যভূমির দিকে সমুদ্রের ওপর দিয়ে তাদের জন্য রাস্তা হয়ে যাবে। জার্মান ছেলেমেয়েরা বহু কষ্ট স্বীকার করে রোমে পৌঁছলে পোপ তাদেরকে বুঝিয়ে-সুজিয়ে দেশে পাঠিয়ে দিলেন। প্রায় ত্রিশ হাজার ফরাসি বালক-বালিকা মার্সাই বন্দরে পৌঁছে হতাশ হয়ে দেখল যে, সমুদ্র তাদের জন্য কোন পথ করে দিচ্ছে না। এতে নিরাশ হয়ে অনেকেই বাড়ি ফিরে আসল। দুজন বণিক পাঁচ-ছয় হাজার ছেলেমেয়েকে বিনা পয়সায় প্যালেস্টাইনে পৌঁছে দেবার অঙ্গীকারে তাদেরকে জাহাজে পুরে দাস হিসেবে বিক্রি করে আসল।

অবশিষ্ট ক্রুসেড ছোটখাট রকমের ছিল। পঞ্চম ক্রুসেড ১২১৯ খ্রিস্টাব্দে সংঘটিত হয়। ক্রুসেডারগণ মিসর আক্রমণ করে ডামিয়েটা দখল করে। কিন্তু মিসরের আইয়ুবী সুলতান আল-কামিল দু বছর যাবৎ যুদ্ধ করে খ্রিস্টানগণকে তাড়িয়ে দেন। ১২২৭ খ্রিস্টাব্দে সম্রাট দ্বিতীয় ফ্রেডারিক কর্তৃক ষষ্ঠ ক্রুসেডের আয়োজন করা হয়। সুলতান আল-কামিল অভ্যন্তরীণ কলহে ব্যাপৃত থাকায় তিনি ফ্রেডারিকের সাথে এক শান্তি চুক্তিতে আবদ্ধ হন। ক্রুসেডারগণ বিনা রক্তপাতে জেরুজালেম ফিরে পেল। কিন্তু মোঙ্গল চেঙ্গিজ খানের আক্রমণে বিতাড়িত হয়ে খাওয়ারিজমশাহের তুর্কিগণ পুনরায় জেরুজালেম দখল করে। ফ্রান্সের রাজা সেন্ট লুইয়ের নেতৃত্বে সপ্তম ক্রুসেড পরিচালিত হয়। তিনি ডামিয়েটা দখল করে মিসরের অভ্যন্তরে প্রবেশ করলে তাঁর সৈন্যদল মুসলমানদের হাতে বিধ্বস্ত হয় এবং তিনি স্বয়ং বন্দী হন (১২৫০ খ্রিঃ)। একমাস বন্দী অবস্থায় থাকার পর তিনি ও তাঁর সঙ্গীয় লোকেরা মুক্তি-মূল্য দিয়ে খালাস পেলেন। ১২৭০ খ্রিস্টাব্দে লুই পুনরায় অষ্টম ক্রুসেড পরিচালনা করে কার্থেজে মৃত্যুমুখে পতিত হন। এর পর একে একে ল্যাটিন রাজ্যগুলি মুসলমানের দখলে আসে। সর্বশেষে ১২৯১ খ্রিস্টাব্দে আক্কা (Acre) অধিকৃত হয়। এ সঙ্গে জেরুজালেমের ল্যাটিন রাজ্যের অবসান ঘটে। এভাবে দুই শতাব্দীর প্রাচ্য ও প্রতীচ্যের দ্বন্দ্বের অবসান ঘটে।

ছোটখাটো ক্রুসেড

ক্রুসেডের ফল

ইউরোপে শক্তিশালী রাজতন্ত্র গঠনে ক্রুসেড সহায়তা করেছিল। দুই শতাব্দী ধরে সামন্ত অভিজাত শ্রেণী তাদের অর্থসম্পদ নিয়ে এ যুদ্ধে যোগদান করে। এর ফলে অভিজাত শ্রেণী দুর্বল হয়ে পড়ে। যেহেতু ফ্রান্সের সম্ভ্রান্ত শ্রেণী অধিক সংখ্যায় ক্রুসেডে যোগদান করেছিল, সেজন্য এর প্রতিফল ফ্রান্সেই বেশি দেখা দেয়। অভিজাত শ্রেণী তাদের সম্পত্তি বিক্রয় করল কিংবা বন্ধক রাখল। এদের মধ্যে যারা মৃত্যুমুখে পতিত হল কিংবা প্রাচ্যে বসবাস আরম্ভ করল, তাদের সম্পত্তি রাজসরকারে বাজেয়াপ্ত হল। যারা ফিরে আসল, তারা ক্রুসেডের ব্যয় নির্বাহ করতে গিয়ে বহু সম্পত্তি হারাল এবং তাদের পূর্বাবস্থা আর ফিরে আসল না। অন্যপক্ষে সম্ভ্রান্ত লোকগণ প্রাচ্যদেশের বিলাসব্যসনে অভ্যস্ত হয়ে দেশে প্রত্যাবর্তন করলে এ সব বিলাস সামগ্রীর ব্যয় নির্বাহ করতে গিয়ে তারা বিব্রত বোধ করল। এভাবে সম্ভ্রান্ত শ্রেণীর ক্ষমতা খর্ব হওয়ায় রাজার ক্ষমতা বৃদ্ধি পেল। আবার যে সব রাজা ক্রুসেডে যোগদান

রাজনৈতিক

করেছিল, তারা জরুরি খরচ মিটাতে নতুন নতুন কর ধার্য করার সুযোগ পেল। ফ্রান্সের ফিলিপ অগাস্টাস এবং ইংলণ্ডের দ্বিতীয় হেনরী ক্রুসেড উপলক্ষে ইউরোপে সর্বপ্রথম সরাসরি ট্যাক্সপ্রথা চালু করেন।

সিরিয়া প্যালেস্টাইনের লাটিন রাজ্যে দুই শতাব্দী ধরে খ্রিষ্টানগণ পার্শ্ববর্তী মুসলমানদের সাথে পাশাপাশি বাস করতে থাকে। এ প্রথম তারা বুঝতে পারল

সামাজিক

যে, আরব সভ্যতা ও বাইজান্টাইন সভ্যতা পাশ্চাত্য সভ্যতা অপেক্ষা অনেক উন্নত। ক্রুসেডের মাধ্যমে প্রাচ্য ও প্রতীচ্যের যোগাযোগের ফলে দৈনন্দিন জীবনযাত্রার বহু জিনিস পাশ্চাত্যে পরিচিত হয়। তারা প্রাচ্য দেশীয় আচার-ব্যবহার, পোশাক-পরিচ্ছদ ও খাদ্যরীতি প্রভৃতি অনুকরণ করতে আরম্ভ করে। দাঁড়ি রাখা, আলখেল্লা পরা প্রাচ্যের দেখাদেখি পাশ্চাত্যেও ফ্যাশন হয়ে দাঁড়াল। ইউরোপের লোকেরা মসলিন ও অন্যান্য কাপড়, কম্বল, কার্পেট, নতুন রং, নীল (Indigo), ওষুধপত্র, মসলা, সুগন্ধি দ্রব্য, মুসব্বর, লবঙ্গ, চন্দন-কাঠ, পাউডার, আয়না ইত্যাদি এবং মাটি, কাচ, স্বর্ণ, রৌপ্য ও এনামেলের তৈরি শিল্পদ্রব্য প্রভৃতি জিনিস বেশি পরিমাণ আমদানি করতে থাকে। চিনির চাহিদাও ইউরোপে বেড়ে যায়। এ সব দ্রব্যের চাহিদার ফলে ব্যবসা-বাণিজ্য বহু পরিমাণে বেড়ে যায়। ইটালির বন্দরসমূহ বহু সমৃদ্ধিশালী হয়ে ওঠে। ক্রুসেডের ফলে ভূমিদাসদের অবস্থার পরিবর্তন হয়। ভূম্যধিকারিগণ ক্রুসেডে যোগদান করার পূর্বে অর্থের বিনিময়ে অনেক ভূমিদাসকে মুক্তিদান করে। কেউ কেউ ভূম্যধিকারীদের অনুপস্থিতির সুযোগে তাদের দাসত্ব বন্ধন ছিন্ন করে। নতুন শহর ও শিল্প গড়ে উঠার ফলে দাসগণ ম্যানর হতে মুক্তিলাভ করে শহরে কলকারখানায় যোগদান করে। এ সব পরিবর্তনের ফলে ধীরে ধীরে বুর্জোয়া শ্রেণীর উদ্ভব হয়।

ক্রুসেডের ফলে পশ্চিম ইউরোপের নগরীকরণ (Urbanisation) ঘটে। ইটালির ভেনিস, জানোয়া, পিসা ও অন্যান্য নগরী এবং ফ্রান্সের মার্সাই ও অন্যান্য

অর্থনৈতিক

সামুদ্রিক বন্দর এ সময় ব্যবসা-বাণিজ্যে ফুলে-ফেঁপে ওঠে। পশ্চিম ইউরোপে প্রাচ্যদেশীয় জিনিসপত্র একবার পরিচিত হলে ইউরোপে এ সব পণ্যদ্রব্যের চাহিদা শতগুণ বেড়ে যায়। এর ফলে ইউরোপের অন্যান্য স্থানে যেমন জার্মানি, ফ্রান্স ও ফ্লাণ্ডার্সে বহু নগর ও বন্দর গড়ে ওঠে। ভেনিস ও জেনোয়া হতে অগণিত জাহাজ ইউরোপে ও সিরিয়ার মধ্যে চলাচল করতে থাকে। তাদের সাদা পালে সমস্ত ভূমধ্যসাগর ভরে যায়। মুসলমানদের

সাথে ব্যবসা-বাণিজ্য করবার উদ্দেশ্যে ক্রুসেডারগণ স্বর্ণমুদ্রার প্রচলন করে। এর ফলে সিসিলির ডুকাট (Ducat), ফ্লোরেন্সের ফ্লোরিন (Florin) এবং ভেনিসিয়ার সিকুইন (Sequin) চালু হয়। ধর্মযোদ্ধাগণ নগদ টাকা-পয়সা বহন করে নেয়ার অসুবিধা বোধ করে। ব্যবসায়িগণ দূরদেশে টাকা-পয়সা নিয়ে আসা-যাওয়া করতে অসুবিধার সম্মুখীন হয়। এর ফলে আরবদের কাছ থেকে তারা ব্যাঙ্ক প্রথা গ্রহণ করে এবং চেক ইত্যাদি দেয়ার প্রথা চালু হয়। ইটালিতে এ সময় বহু ব্যাঙ্কার পরিবার এ কাজে আত্মনিয়োগ করে। অবশ্য ক্রুসেড না হলেও ইউরোপে নগর-বন্দর গড়ে উঠত এবং ব্যবসা-বাণিজ্য প্রসার লাভ করত। কিন্তু ক্রুসেড এ সব কাজ বহুগুণে ত্বরান্বিত করে দেয়।

এ কথা সর্বজনস্বীকৃত যে, আরব জ্ঞান-বিজ্ঞান ইউরোপে প্রসার লাভ করার ফলে রেনেসাঁর অগ্রগতি দ্রুততর হয়। কারণ প্রাচীন জ্ঞান-বিজ্ঞান বিশেষত গ্রীক এবং হেলেনীয় জ্ঞান-বিজ্ঞান আরবগণের হাতে সংরক্ষিত ও সম্প্রসারিত হয়। এ সব জ্ঞান-বিজ্ঞান স্পেন এবং সিসিলির মাধ্যমে ইউরোপে পরিচিত ও প্রচলিত হয়। এ ব্যাপারে ক্রুসেডের কি অবদান রয়েছে, তা নিয়ে পণ্ডিতদের মধ্যে বিতর্ক রয়েছে। ক্রুসেডের সময় আরবীয় সভ্যতা অবনতির পথে নেমে যাচ্ছিল। এ কথা অনস্বীকার্য যে, ফ্রাঙ্কগণ ও অন্যান্য ক্রুসেডারগণ আরবদের তুলনায় জ্ঞান-বিজ্ঞানে অনগ্রসর ছিল। আরবদের চিকিৎসা ব্যবস্থা উন্নত ধরনের ছিল। তারা বহু হাসপাতাল স্থাপন করেছিল। ইউরোপে দ্বাদশ শতাব্দী হতে হাসপাতালের উদ্ভব ও প্রসার ক্রুসেডের প্রত্যক্ষ ফল বলে ধরে নেয়া যেতে পারে। খ্রিস্টানগণ হাম্মামখানার বিরোধী ছিল। ইউরোপে সর্বসাধারণের স্নাগানার প্রবর্তন ক্রুসেডের ফলেই সম্ভব হয়েছিল। এ সময় সিরিয়া হতে 'কালিলা ওয়া দিমনা' এবং 'সহস্র ও এক রজনী'র উপাখ্যান ইউরোপে নীত হয়। ক্রুসেডের ফলেই ইউরোপীয় মিশনারিগণ আরবি এবং অন্যান্য ইসলামী ভাষায় মনোযোগী হয়। যুদ্ধ-বিগ্রহের ব্যাপারে আরবদের প্রভাব সুস্পষ্ট। তীর-ধনুকের ব্যবহার, নাইটগণের ভারী যুদ্ধপোশাক, বর্মের নিচে তুলার গদির ব্যবহার ক্রুসেডের প্রত্যক্ষ ফল। সংবাদ আদান-প্রদানের জন্য কবুতরের ব্যবহারও তারা আরবদের কাছ থেকে শিক্ষালাভ করে। ইউরোপের 'শিভালরী' সিরিয়ায় পূর্ণতা লাভ করে। সৈনিকদের ঢাল, পতাকা, বিশেষ চিহ্ন (Badge) ও বর্মের ওপর কুলচিহ্ন বা পরিচয় চিহ্ন (Heraldicdevia) অঙ্কন আরবদের কাছ থেকে এ

জ্ঞান-বিজ্ঞান ও শিল্প

সময় ইউরোপে প্রসার লাভ করে। বড় সুরক্ষিত দুর্গের ব্যবহার এবং অবরোধের কলাকৌশলও তারা আরবগণের কাছ থেকে শিক্ষাপ্রাপ্ত হয়। ইউরোপে বায়ু তাড়িত কলের (Windmill) ব্যবহার ক্রুসেডারগণ আমদানি করে। জেরুজালেমের গির্জা ও সিরিয়ার বিভিন্ন মসজিদ ইংলণ্ড, ফ্রান্স, স্পেন ও জার্মানির বহু গির্জার স্থপতি শিল্পকে প্রভাবিত করেছিল।

ক্রুসেড বহু ইউরোপীয় নাগরিকের ভৌগোলিক জ্ঞানের পরিধি সম্প্রসারিত করে এবং তাদের সাধারণ জ্ঞানের পরিসীমা বৃদ্ধি করে। দুই শত বছর ধরে-

ভৌগোলিক অনুসন্ধান, ভ্রমণ ও নৌবিদ্যা

হাজার হাজার ইউরোপীয় প্রাচ্যে সফররত ছিল। এর ফল সহজে অনুমেয়। ইউরোপীয়দের ভ্রমণ ও সমুদ্রযাত্রা ক্রুসেডের অবশ্যম্ভাবী ফল। আরবগণের কাছ থেকে তারা নৌ-বিদ্যায় সুশিক্ষা লাভ করে এবং কম্পাস ও এ্যাস্ট্রলেবের ব্যবহার জানতে পারে।

গ্রন্থনির্দেশ

১. টম্পসন এণ্ড জনসন : *এ্যান ইনট্রোডাকশন টু মেডিয়্যাভাল ইউরোপ।*
২. হেনরী পিরেন : *এ হিস্ট্রি অব ইউরোপ।*
৩. পি. কে. হিট্টি : *হিস্ট্রি অব দি এ্যারাব্‌স্।*

ঘটনাপঞ্জি

তারিখ	ঘটনা
	হযরতের জীবনী
৫৭১	হযরত মুহম্মদের জন্ম
৬১০	নবুয়ত লাভ
৬১৩	ধর্ম প্রচারে আদিষ্ট
৬১৫	আবিসিনীয়ায় হিজরত
৬১৬	বনু হাশিমের বিরুদ্ধে অসহযোগ
৬১৯	আবু তালিব ও খাদিজার মৃত্যু (শোকের বছর)
৬২১	আকাবার প্রথম অঙ্গীকার
৬২২	আকাবার দ্বিতীয় অঙ্গীকার
	হিজরত
৬২৪	বদরের যুদ্ধ
৬২৫	উহুদের যুদ্ধ
৬২৭	খন্দকের যুদ্ধ
৬২৮	হুদায়বিয়ার সন্ধি
	খাইবারের যুদ্ধ
৬২৯	মুতা অভিযান
৬৩০	মক্কা বিজয়
	হুনায়নের যুদ্ধ
৬৩০–৬৩১	তবুক অভিযান
	প্রতিনিধি প্রেরণের বছর
৬৩২	বিদায় হজ্ব ওফাত

তারিখ	ঘটনা
	খুলাফা-ই-রাশিদীন
৬৩২	আবু বকর খলিফা নির্বাচিত
	উসামার অভিযান
৬৩২—৬৩৩	রিদ্দার যুদ্ধ
৬৩৪	আজনাদায়নের যুদ্ধ
	আবু বকরের মৃত্যু
৬৩৫	দামিস্কের আত্মসমর্পণ
৬৩৬	ইয়ারমুকের যুদ্ধ
৬৩৭	জেরুজালেমের আত্মসমর্পণ
	কাদিসিয়ার যুদ্ধ মাদায়িন অধিকার জালুলার যুদ্ধ
৬৪১	বেবিলনের (মিসরের) আত্মসমর্পণ,
	আলেকজান্দ্রিয়ার সন্ধি
৬৪২	নিহাওন্দের যুদ্ধ
৬৫৬	উসমানের শাহাদৎ
৬৫৬	উষ্ট্রের যুদ্ধ
৬৫৭	সিফফিনের যুদ্ধ
৬৬১	আলীর শাহাদৎ
	উমাইয়া যুগ
৬৮০	কারবালার শোচনীয় হত্যাকাণ্ড
৬৮৩	ইয়াজিদের মদীনা আক্রমণ
	মক্কা অবরোধ

ঘটনাপঞ্জি

তারিখ	ঘটনা
৬৮৬	জাব নদীর যুদ্ধ
৬৯২	হাজ্জাজের মক্কা ও মদীনা আক্রমণ
৭০২	ওয়াসিত নগরীর পত্তন
৭০৫—৭১২	মধ্য-এশিয়া বিজয়
৭১১	স্পেন বিজয়
৭১২	সিন্ধু বিজয়
৭১৪—৭১৫	কনস্টান্টিনোপল আক্রমণ
৭২১	টুলোর যুদ্ধ
৭৩২	টুরসের যুদ্ধ
৭৪৭	মার্ভের পতন
৭৪৯	কুফা অধিকার ও আবুল আব্বাসের নামে বাইয়াৎ
৭৫০	জাবের যুদ্ধ দামিস্ক বিজয়
	আব্বাসীয় যুগ
৭৫৪	নাসিবিনের যুদ্ধ
৭৬২	বাগদাদের পত্তন
৮০৩	বার্মাকীদের পতন
৮৩০	বাগদাদে বায়তুল হিকমার প্রতিষ্ঠা
৮৩৩	মুতাজিলা মতবাদ প্রতিষ্ঠা সরকারী ফরমান
৮৩৬	রাজধানী সামাররায় স্থানান্তরিত
৮৬৯—৮৮৩	জাঞ্জ (নিগ্রো) বিদ্রোহ
৯৪৬	বুওয়াইহী মুইজুদ্দৌলার বাগদাদ প্রবেশ
১০৫৫	সালজুকদের বাগদাদ প্রবেশ
১০৭১	মালাজকার্দের যুদ্ধ
১০৯২	মালিক শাহের মৃত্যু
১০৯৫	পোপ উরবানের ক্লেরমন্টের বক্তৃতা
১০৯৬	ক্রুসেড আরম্ভ
১০৯৯	ক্রুসেড যোদ্ধাদের হাতে জেরুজালেমের পতন
১১৮৭	সালাহুদ্দীন কর্তৃক জেরুজালেম পুনরধিকার
১২৫৮	বাগদাদের পতন
১২৯১	জেরুজালেমের লাটিন রাজ্যের পতন
১৪৯২	গ্র্যানাডার পতন
১৬০৯	স্পেন হতে মুরদের বহিষ্কার

উল্লেখযোগ্য সন-তারিখ

খুলাফা-ই-রাশিদীন

(৬৩২—৬৬১)

হযরত আবুবকর	৬৩২—৬৩৪
হযরত উমর	৬৩৪—৬৪৪
হযরত উসমান	৬৪৪—৬৫৬
হযরত আলী	৬৫৬—৬৬১

উমাইয়া খলিফাগণ

(৬৬১—৭৫০)

মু আবিয়া	৬৬১—৬৮০
ইয়াজীদ (১ম)	৬৮০—৬৮৩
মুআবিয়া (২য়)	৬৮৩
মারওয়ান	৬৮৩—৬৮৫
আবদুল মালিক	৬৮৫—৭০৫
ওয়ালীদ	৭০৫—৭১৫
সুলায়মান	৭১৫—৭১৭
উমর ইবন আব্দুল আজীজ	৭১৭—৭২০
ইয়াজীদ (২য়)	৭২০—৭২৪
হিশাম	৭২৪—৭৪৩
ওয়ালীদ (২য়)	৭৪৩—৭৪৪
ইয়াজীদ (৩য়)	৭৪৪
ইব্রাহীম	৭৪৪
মারওয়ান (২য়)	৭৪৪—৭৫০

আব্বাসীয় খলিফাগণ

(৭৫০—১২৫৮)

সাফ্ফাহ	৭৫০—৭৫৪
মনসুর	৭৫৪—৭৭৫
মাহদী	৭৭৫—৭৮৫
হাদী	৭৮৫—৭৮৬
রশীদ	৭৮৬—৮০৯
আমীন	৮০৯—৮১৩
মামুন	৮১৩—৮৩৩
মুতাসিম	৮৩৩—৮৪২
ওয়াসিক	৮৪২—৮৪৭
মুতাওয়াক্কিল	৮৪৭—৮৬১
মুন্তাসির	৮৬১—৮৬২
মুস্তায়ীন	৮৬২—৮৬৬
মুতাজ	৮৬৬—৮৬৯
মুহতাদী	৮৬৯—৮৭০
মুতামিদ	৮৭০—৮৯২
মুতাদিদ	৮৯২—৯০২
মুকতাফী	৯০২—৯০৮
মুকতাদির	৯০৮—৯৩২
কাহির	৯৩২—৯৩৪
রাদী	৯৩৪—৯৪০
মুত্তাকী	৯৪০—৯৪৪
মুস্তাক্ফী	৯৪৪—৯৪৬
মুতী	৯৪৬—৯৭৪
তায়ী	৯৭৪—৯৯১

কাদির	৯৯১—১০৩১
কায়িম	১০৩১—১০৭৫
মুকতাদী	১০৭৫—১০৯৪
মুস্তাজহির	১০৯৪—১১১৮
মুস্তারশিদ	১১১৮—১১৩৫
রশীদ	১১৩৫—১১৩৬
মুকতাফী	১১৩৬—১১৬০
মুস্তানজিদ	১১৬০—১১৭০
মুস্তাদী	১১৭০—১১৮০
নাসির	১১৮০—১২২৫
জাহির	১২২৫—১২২৬
মুস্তানসির	১২২৬—১২৪২
মুস্তাশিম	১২৪২—১২৫৮

(অ)
অক্ষু নদী – ৩১, ১৩৫, ১৫৬, ১৯৩।
অরেলিয়ান –৪১।
(আ)
আইন শামস – ১২৪।
আইরিনী – ২২৪, ২২৭।
আইসিস – ২৯।
আইয়ুবী শাসকগণ (মিসর ও সিরিয়া) –৩৮৬।
আক্কাদীয় – ২১।
আকাবা – ৫৮।
আকাবা উপসাগর – ২৭, ৭৮, ৯২।
আখতাল – ১৭৬, ২০৬।
আজনাদায়নের যুদ্ধ –১১০, ১১৪।
আজরু –৭৮।
আজান– ৬৪।
আজর বাইজান–১২৪, ১৩৬, ২০৯।
আদন– ১২, ৪৬।
আদী – ৬৬।
আফসীন –২৫১, ২৫২।
আফ্রিকা –১১, ১৩০, ১৫৬, ১৫৭, ১৭৩, ১৮৩, ১৯৩, ১৯৪, ২১৯, ২২৯।
আফগানিস্তান– ৩১।
আনতারা ইবন শাদ্দাদ– ৪৩।
আন-নাকিস– ১৯৬।
আন-নাসির লি দীনিল্লাহ– ২৮২।
আনসার –৫৯,৭২, ৮৫, ৮৭, ৯৭, ১০১, ১০৫, ১২৯, ১৫৮, ২২২।
আনাস ইবন মালিক – ৮২, ১৭২, ২০৫।
আবদ শাম্‌স– ৪৭, ৫৫।
আবদুল-উজ্জা –৪৬।
আবদুল মুত্তালিব –৪৭, ৪৯।
আবদুর রহমান–৫৪, ১৫৮, ১৬৩, ২০১।
আবদুর রহমান ইবন আউফ–১৩২, ১৩৪।
আবদুর রহমান ইবন মুল্‌জাম–১৪৯।
আবদুর রহমান ইবন আশ আস– ১৭৩।
আবদুর রহমান (প্রথম, স্পেনের উমাইয়া শাসক) – (৩৫১–৩৫৪)।
আবদুর রহমান্ (দ্বিতীয়, স্পেনের উমাইয়াশাসক) –(৩৫৪-৩৫৮)।
আবদুর রহমান (তৃতীয়, কর্ডোভার উমাইয়া শাসক) (৩৫৮–৩৬২)।
আবদুল্লাহ (মহানবীর পিতা)–৪৬, ৪৯।
আবদুল্লাহ (হযরত ওমরেরপুত্র) –১৩২, ১৫৮, ১৬৩।
আবদুল্লাহ ইবন মাসুদ –৫৬, ২০৫।
আবদুল্লাহ ইবন উবাই –৬৮, ৭৮।
আবদুল্লাহ ইবন জুবাইর –৬৮, ১৫৮, ১৬৩, ১৬৭, ১৬৮, ১৭০, ১৭১, ১৭৬।
আবদুল্লাহ ইবন আব্বাস – ১৪৪, ১৯৪, ২০৫।
আবদুল্লাহ ইবন আলী মারওয়ান– ২০০, ২০১।
আবদুল্লাহ ইবন ওমর – ২০৫।
আবদুল্লাহ ইবন হামাদান– ২৬৩।
আবদুল্লাহ (আল মনসুরের পিতৃব্য) –২১৭।
আবদুল্লাহ (হযরত আলীর পৌত্র) –২১৯।
আবদুল্লাহ(তাহিরের পুত্র) – ২৪৩।
আবদুল মালিক–(১৬৮-১৭৬), ১৭৭, ১৯১, ২১০।
আমোরীয় – ২১, ২৬।
আরামীয়– ২১, ২৩, ২৬, ৩৪।
আমান –৭৮।

আবদুল আজীজ – ১৭৪, ১৭৭।
আবদুল হামিদ – ২০৬।
আবদুর রহমান আল গাফিকী –১৯৪।
আবরাহা– ৩৮।
আব্বাস (মামুনের পুত্র) –২৫০।
আব্বাস (হযরতের পিতৃব্য)–১৯১, ১৯৪।
আব্বাস ইবন আবদুল মুত্তালিব – ৮০।
আব্বাসীয় যুগে সামাজিক ও অর্থনৈতিক জীবন – (৩০১-৩১০)।
আব্বাসীয় যুগে জ্ঞান-বিজ্ঞান ও শিল্পকলা –(৩১১ –৩৩২)।
আব্বাসীয় যুগে শিক্ষা পদ্ধতি–(৩৪২–৩৪৬)।
আব্বাসীয় শাসন পদ্ধতি–(২৮৯– ৩০০)।
আব্রাহাম– ২৬।
আবিদ ইবন শারইয়াহ– ২০৬, ২১১।
আবিসিনিয়া – ৩৮, ৫৫, ৯৩।
আবু আত্তন – ১৯৯, ২০০।
আবু ইসহাক – ২৪৫।
আবু উবায়দা – ৯৮, ১১০, ১১৫, ১৩২।
আবু জহল – ৫৬, ৬৬।
আবু জাফর –১৯৫, ১৯৯।
আবু জাফর আল মনসুর –(২১৭–২২১), ২২২।
আবু জার আল গিফারী –১৩৮, ১৩৯।
আবু তালেব – ৪৪, ৪৯, ৫০, ৫৪, ৫৭।
আবু নুয়াস– ২৩৩।
আবু মূসা আল আশআরী– ১৪৭, ১৪৮।
আবু মুসলিম – ২১৬, ২১৭ ।
আবু মুসলিম খোরাসানী –১৯৮, ১৯৯।
আবু রায়হান আল বেরুনী –৩১৮।
আবু লুলুয়া – ১৩২।
আবু সুফিয়ান–৪৪, ৫৫, ৬৬, ৬৭, ৬৮, ৭২,৭৫,৭৬, ৮৯।
আবু সালামা–১৯৯, ২১৬, ২১৭।
আবু সাইদ আল-হাসান আল-জান্নাবী–২৫৮।
আবু ফুৎরুস নদী –২০১।
আবু হানীফা – ২০৫।
আবুল আব্বাস–১৯৫, ১৯৯, ২০০, ২০৪।
আবুল আব্বাস আস সাফ্ফাহ–২১৪, ২১৬, ২১৭।
আবুল ফাওয়ারিস – ২৬২।
আবুল ফারাজ আল ইস্পাহানী – ২৬৩।
আবুল ফিদা – ৩২১।
আম উল ফীল – ৩৮।
আমওয়াস ১২৮।
আম গিসিয়া– ১০৯।
আমর ইবন সাদ – ১৬৮, ১৭১।
আমর – ৪৫, ১২৪, ১৫৬।
আমর ইবন হাজরামী –৬৫।
আমর ইবনুল আস – ৭৩, ১০৪, ১০৯, ১২৪, ১৪৬, ১৪৭, ১৪৮, ১৪৯, ১৫০ ।
আমস – ২৭।
আমিনা –৪৯।
আমুন-রা–২৯।
আর্মিনিয়া – ১৭৩, ১৯৩, ২০৫, ২০৯, ২২৯, ২৫০, ৩০১ ।
আমুরিয়া – ১৭৮।
আর রাজী – ৩১৫।
আর রাদী বিল্লাহ – ২৫৯।
আরদাশীর – ৩৬।
আরাফাতের ময়দান – ৮০, ১৭০।
আল আজীজ–৩৮১, ৩৮২।
আল আলা – ১০৪, ১০৫।

আল আহ্সা – ২৫৮।
আল আমীন–২৩০, (২৩৫–২৩৯), ২৪০।
আল ওয়াফিদী – ২৪৭।
আল কাদির – ৩৮৩।
আল কালিস – ৩৮।
আল কীমিয়া – ৩১৯।
আল কিন্দি – ৩১২।
আল ফারাবী–২৬৩, ৩১৩।
আল-বাত্তাল–১৯৩।
আল মাজুসী –৩১৫।
আল মামুন – ২২০, ২৩০, ২৩৫, ২৩৬, ২৩৭, (২৪০–২৪৯)।
আল মাহদী – (২২২–২২৪), ২৩১।
আল মুনতাসির ইলক খান –২৬৬।
আল লাত – ৪৬ ।
আল হাকিম–(৩৮২– ৩৮৪) ।
আলহাদি – ২২২, (২২৪–২২৫)।
আল হামরা প্রাসাদ (গ্রানাডায়) –৩৭১ ।
আল হিমার – ১৯৭ ।
আল হিরা – ১০৮, ১০৯ ।
আলেকজান্ডার –৩১, ৩৫ ।
আলেকজান্দ্রাটা – ৩১ ।
আলেকজান্দ্রিয়া – ৩১, ৩২, ৩৩, ৩৪, ৪১, ১২৪, ১২৫, ১২৬ ।
আলেক্সিয়াস কমনেনাস–৩৮৯, ৩৯৩ ।
আলেপ্পো– ১১৭, ২২৪, ২৬৩ ।
আলোর দুর্গ– ১৭৯ ।
আল্লিসের যুদ্ধ –১০৮ ।
আলী ইবন আবদুল্লাহ – ২৩৭ ।
আলী ইবন ঈসা –২৩৭, ২৩৯, ২৫৮ ।
আশ আশ– ১০৫ ।
আশতার – ১৪৮ ।
আশুর নাসির পাল – ২২ ।
আশুর বানিপাল –২৩ ।
আশুরা–৮৪ ।
আসওয়াদ –১০৫ ।
আসমা –১১১, ১৭১ ।
আসাদ –১৯২।
আসিরিয়া –২১, ২৬ ।
আসিরীয়–২১, ২২, ২৩, ২৭ ।
আহওয়াজ–১৩০, ২১৯, ২৩৭, ২৪৪, ২৫৭ ।
আহমদ ইবন তুলুন – ২৫৭ ।
আহমদ ইবন নাসর – ২৫২, ২৫৩ ।
আহল বায়ত – ১৯৫ ।
আহলুল আদলওয়াত তাওহীদ–২০৭ ।
আহলুল কলম – ২৩২ ।
আয়লা – ৭৮ ।
আয়েশা–৮১, ৯৭, ৯৮, ১০০, ১৪৫, ১৪৬ ।

(ই)

ইউসুফ –১৯৪, ১৯৬ ।
ইউসুফ (আ)–২৯ ।
ইউক্লিড – ৩২ ।
ইওয়ান ই কিসরা – ১২১ ।
ইকরিমা –১০৪, ১০৫ ।
ইখনাটনের – ৩০ ।
ইখশীদি (তুর্কী বংশ) – ২৬২, ২৬৩ ।
ইদ্রিস – ২২৪ ।
ইদ্রিস ইবন আবদুল্লাহ–(হাসানের প্রপৌত্র) –২৬১।
ইবন আবিদুয়াদ – ২৫৩ ।
ইবন আবি সারাহ – ১৩৬ ।

ইবন ইসহাক – ৪৭ ।
ইবন খলদুন – ২০২, ৩২২।
ইবন জুবায়ের – ২০৮ ।
ইবন তাবাতাবা – ২৪০।
ইবন নুবাতা – ২৬৩ ।
ইবন মাতার – ২৪৮ ।
ইবন মসাওয়াইহ্ – ২৪৭ ।
ইবন মুকলা – ২৫৮ ।
ইবন শারাহ বিল আশমাবী –২০৫ ।
ইবন শিহাব জুহরী – ২০৫ ।
ইবন সাবাহ – ১৩৯ ।
ইবন সীনা – ৩১৪, ৩১৬ ।
ইবন হুনাইফ –১৪৫ ।
ইবন হুবায়রা – ১৯৯ ।
ইবননুল আসীর –৩২১, ৩২৩ ।
ইবনুল জওজী –৩২৩ ।
ইব্রাহীম –১৯৫, ২১৯, ২২২, ২২৪ ।
ইব্রাহীম আস্সাবী –৩২৩ ।
ইব্রাহীম ইবন আগলব– ২৬১ ।
ইব্রাহীম ইবন মুহম্মদ আবু মুসলিম– ১৯৮।
ইব্রাহীম মাসুলী –২২৩ ।
ইমাম আলী আর রিজা– ২৪১, ২৪২ ।
ইমাম আহম্মদ ইবন হাম্বল – ২৪৬ ।
ইমাম গাজ্জালী – ৩২৭ ।
ইমাম জাফর আস সাদিক – ২০৭ ।
ইমাম বুখারী –২৪৭ ।
ইমামশাফিয়ী –২৪৭ ।
ইমাদুদ্দৌলাহ –২৬৫ ।
ইরাক–১১, ১০৭, ১১৪, ১১৯, ১২১, ১২৮, ১৩০, ১৩২, ১৫৫, ১৫৮, ১৬০, ১৬৩, ১৬৪, ১৬৮, ১৬৯, ১৭২, ১৭৩, ১৭৫, ১৭৯, ১৮৬, ১৯৬, ১৯৭, ২০২ ।
ইরান – ৩২ ।
ইসরাইল -২৩, ২৭, ২৮ ।
ইসমাঈল – ২৬৪ ।
ইসাইয়া – ২৭ ।
ইস্পাহান – ২৫৯ ।
ইয়াজ দজির্দ –১২০, ১২২, ১২৩, ১২৪, ১৩৫ ।
ইয়াজীদ–১৫৭, ১৫৮, ১৫৯, ১৬৩, ১৬৪, ১৬৬, ১৬৭, ১৬৮, ১৭১, ২১১ ।
ইয়াজীদ (দ্বিতীয়) – ১৯১, ২০৩ ।
ইয়াজীদ (তৃতীয়)–১৯৬, ২০৩ ।
ইয়াজীদ ইবন আবু সুফিয়ান – ১০৯ ।
ইয়াহিয়া ইবনে খালিদ বারমাকী –২২৫, ২৩১ ।
ইয়াজীদ ইবন মুহাল্লাব–১৮৫, ১৮৮, ১৯১।
ইয়াজীদ ইবন হুবায়েরা – ২১৬ ।
ইয়াকুব (সফফারী বংশের প্রতিষ্ঠাতা) –২৬৪ ।
ইয়ামন –১১, ১২, ৩৬, ৩৮, ৪০, ৪১, ৪৭, ৭৮, ৭৯, ৮১, ৮৯, ১০০, ১০৪, ১০৫, ১৯৭, ২০৯, ২১১ ।
ইয়ামামার – ৮১, ১০০, ১০৫, ২০৯ ।
ইয়ামামার যুদ্ধ – ১০৫ ।
ইয়ারমুকের যুদ্ধ – ১১৬, ১২০ ।
ইয়াস্রেব – ৪৬, ৬০, ৬৩ ।
ইয়াহিয়া – ১৯৬ ।

(ঈ)

ঈদুল আজহা – ৮৪ ।
ঈসা – ২১৭, ২১৯, ২২৩ ।

(উ)

উমর (দ্বিতীয় খলিফা) –৯৮ ।
উইতিজা – ১৮২ ।
উকবা – ১৭৩ ।
উকাজ – ৪৫ ।

উকায়দির –৭৯ ।
উজ্জা – ৪৬, ৭৬ ।
উবাদা ইবন সামিত – ১২৫ ।
উবায়দুল্লাহ ইবন জাহস – ৪৭, ৬৫ ।
উবায়দুল্লাহ ইবন জিয়াদ – ১৬৪, ১৬৫ ।
উমর ইবন সাদ – ১৬৪ ।
উমর ইবন আবদুল আজিজ – ১৭৭, ১৮৩, ১৮৫, (১৮৬–১৯০) ।
উমর ইবন রাবিয়া – ২০৬ ।
উমরা – ৯১, ১৫৮ ।
উমান–১২, ১৪, ৭৯, ৮৯, ১০০, ২০৯, ২১৫ ।
উমাল–১০৫ ।
উম্মে কুলসুম – ৫০, ১৩৫ ।
উম্মাহ – ৬৩, ৮৭, ৮৮ ।
উম্মাহাতুল মুমিনীন – ১২৯ ।
উরদুন – ১৩০ ।
উশর –(৯০–১২৮) ।
উসমা ইবন জায়দ –৮১, ৯৯, ১০৩, ১০৯ ।
উসমান ইবন হুওয়াইরিস–৪৭ ।
উহুদের যুদ্ধ – ৬৮, ৬৯ ।
(এ)
একবাটানা – ৩৫ ।
একিজা – ১৮২ ।
একিমেনীয় সাম্রাজ্য – ৩৫ ।
এজেকিল – ২৭ ।
এজিসা – ৩৪৮ ।
এডেসা – ৩৯৬ ।
এডেসার গীর্জা – ১৬২ ।
এথেনেসিয়ান – ৩৩, ৩৫ ।
এন্থনী –৩৪ ।
এন্টিয়ক –৩২, ৩৬, ১১০, ১১৬, ২৭৭ ।
এন্টি গোনাস –৩১ ।
এন্টিপেটার –৩১ ।
এপি কিউরিয়ান মতবাদ – ৩২ ।
এ্যামরিয়ন –২৫১ ।
এরাটস্থিনিস – ৩২ ।
এ্যারাগণ – ৩৪৮ ।
এ্যারিস্টটল – ৩৩, ২৪৮, ৩১২ ।
এ্যারিয়ান –৩৩, ৩৫ ।
এরিস্টার্কাস –৩২ ।
এরিস্টফিনিস –৩২ ।
এশিয়া মাইনর –১৭৩ ।
ক্যাম্বিসেস – ২৮, ৩৫ ।
ক্যাস্টিল – ৩৭১, ৩৭৩ ।
কোপার্নিকাস – ৩২ ।
কিন্নিসরিন – ১৩০, ২১৬ ।
কিন্দা রাজবংশ–৪১, ৪৫, ১৭৩ ।
কিরমান–১২৪, ১৩০, ১৩৫, ১৭০, ১৭৩, ২০৯ ।
কুতায়বা ইবন মুসলিম –১৭৩, ১৭৮, ১৮৫ ।
কুদায়দ –৪৬ ।
কুর্দিস্তান –২৬৪ ।
কুফা –১২২, ১২৩, ১২৭, ১২৮, ১৩৩, ১৩৬, ১৩৭, ১৩৮, ১৩৯, ১৪০, ১৪২, ১৪৩, ১৪৪, ১৪৬, ১৪৮, ১৪৯, ১৬৮, ১৬৯, ১৭১, ১৭২, ১৭৫, ১৮৭, ১৯৯, ২০৯, ২১৬, ২১৯, ২২০ ।
কুবা – ৫৯ ।
(ও)
ওসিরিস – ২৯ ।
ওল্ডটেস্টামেন্ট –২৭ ।
ওয়াদি মুসা – ৪০ ।
ওদায়না – ৪০ ।
ওয়ারাকা ইবন নওফল – ৪৭, ৫২ ।

ওয়াদিল উল কুরা – ৯১, ৯২ ।
ওয়ালাজার যুদ্ধ – ১০৮ ।
ওয়াদি আরাবা –১১০ ।
ওয়াদী লাক্কো – ৩৪৮ ।
ওয়ালীদ (প্রথম) – ১৭৪, ১৭৬, ১৭৭, ১৮৪, ১৮৫, ১৮৬, ১৮৭, ২০৩, ২১২ ।
ওয়ালীদ (দ্বিতীয়) –১৯৬, ২০৩ ।
ওয়াশ মাগীর – ২৬৫ ।
ওয়াসিক – ২৫২, ২৫৩, ২৫৫ ।
ওয়াসিত–১৭২, ২১৬, ২১৯, ২৩৮ ২৬০ ।
ওয়াসিফ – ২৫৮ ।
ওয়াসিল ইবন আতা – ২০৭ ।
ওয়াহাব ইবন মুনাব্বিহ – ২০৬ ।
(ক)
কওম – ১৮, ৪৩ ।
কর্ডোভা – ১৮২, ৩৪৮, ৩৫৮, ৩৬৬, ৩৭৪ ।
কনস্টান্টাইন – ৩৪, ২২৪ ।
কনস্টান্টি নোপল –৩৪, ৩৫, ৩৬, ১২৫, ১৮৫, ১৮৮, ২২৪ ।
কনস্টান্টিয়াস – ৩৮ ।
কাইসার – ১৩২ ।
কাউন্ট জুলেন – ১৮২ ।
কাহতাবা – ১৯৯, ২০০ ।
কাহিনা – ১৭৪ ।
কাতারুন নাদা –(২৫৭–২৬২) ।
কার্থেজ – ১৩৭, ১৭৩ ।
কাদরিয়া – ২০৭ ।
কাদিসিয়ার যুদ্ধ – ১১৯, ১২০ ।
কানান – ২৬ ।
কানানীয় – ২১, ২৫, ২৬ ।
কান্দাহার – ২১৮ ।
কপ্টিক – ৩৫ ।
কাবা–৪৭, ৫১, ৫৬, ৬৪, ৬৫, ৭৬, ৮৪, ১৩১, ১৩৯, ১৭১, ২২২, ২৩০, ২৩৭ ।
কাব আল আহবার – ২০৬ ।
কাবউল আশরাফ – ৬৮ ।
কাবুল – ১৩৫, ১৭৩ ।
কাবুস বুওয়াইহী – ২৬৬ ।
কবিলা – ১৮, ৪৩ ।
কারকার – ২৩ ।
কার মোনা –১৮৩, ৩৪৮ ।
কারবালা –১৬৩, ১৬৪, ১৬৬, ১৬৯, ১৯৪, ১৯৯, ২০৩ ।
কালদীয় –২১, ২৪, ২৭ ।
কাশগড় –১৭৮ ।
কাশ্মীর –২১৮ ।
কাস্পিয়ান সাগর–১২৩, ১৩৬, ১৯৩, ২১৮, ২২৩, ২২৯, ২৩৭, ২৫১ ।
কাসিম (হারুনুর রশিদের ৩য় পুত্র)– ২৩০ ।
কাসরুল খুলদ –২২০ ।
কায় কাউস – ২৬৬ ।
কায়রোয়ান – ১৭৩, ২৬১ ।
কায়সার আমরা – ২০৮ ।
(গ)
গজনী – ১৩৫ ।
গনীমা – ৯০, ১০৮, ১০৯, ১২০, ১২৯, ১৮৩, ১৯৮, ২০৪ ।
গাসসান – ৪১, ৪৩, ৭৫, ৮৫, ১৫৩ ।
গ্যালেন – ৩৩ ।
গ্যালিসিয়া –১৮৩ ।

গ্রানাডা -১৮২, ৩৭৩ ।
গ্রেগরী-১৩৬ ।
গুর্গাও-১৮৫, ১৯৯ ।
গ্রীক-৩১, ৩৬, ২১৫ ।
কুব্বাতুস সাখরা - ১৭৬, ২০৮ ।
কুরআন-২৯ ।
সাইরাস -২৭, ৩৫, ১২৪, ১২৫, ১২৬ ।
কুরাইশ -১৮, ৪৬, ৪৭, ৪৯, ৫১, ৫৪, ৫৫, ৫৬, ৫৭, ৬৬, ৬৭, ৭০, ৭১, ৭২, ৭৩, ৭৪, ৭৫, ৭৬, ৭৭, ৯৮, ১০১, ১৩৭ ।
কুসাই -৪৬, ৪৭ ।
কুসীদ -৪৫, ৭৯, ৮০ ।
প্রথম ক্রুসেড -(৩৯২-৩৯৪) ।
২য় ক্রুসেড -(৩৯৫-৩৯৮) ।
৩য় ক্রুসেড-(৩৯৮-৩৯৯) ।
৪র্থ ক্রুসেড -৩৯৯ ।
ছোট খাট ক্রুসেড -(৪০০-৪০১) ।
ক্রুসেডের পটভূমি-(৩৮৯-৩৯২) ।
ক্রুসেডের ফলাফল-(৪০১-৪০৪) ।
খাওয়ারিজমের যুদ্ধ - ১৩৫ ।
খন্দকের যুদ্ধ - (৭০-৭১), ৮৮, ৯১ ।
খলিল - ২০৫ ।
খসরু - (১ম)-৩৬, ৮১ ।
খাইবার -৭০, ৯১ ।
খাইবারের যুদ্ধ - ৭৪ ।
খাকান - ১৯২, ১৯৩ ।
খাজার - ১৩৬, ১৯৩ ।
খাত্ - ১৩০ ।
খাদিজা - ৪৪, ৫০, ৫২, ৫৪, ৫৭ ।
খারাজ - ১২৮, ১৯৩, ২১০ ।
খালিদ ইবন ওয়ালিদ -৬৯, ৭৩, ৭৫, ৭৬, ৭৯, ১০৪, ১০৮, ১০৯, ১১০, ১১৪, ১১৫, ১১৬, ১৫২ ।
খালিদ (ইয়াজীদের পুত্র) -১৬৮ ।
খালিদ আলকাসরী -১৯২, ১৯৪ ।
খালিদ ইবন বারমাক - ১৭৮, ১৯৯ ।
খালিদ ইবন ইয়াজিদ - ২০৬ ।
খারিজী -১৪২, ১৪৭, ১৪৯, ১৫১, ১৬৯, ১৭০, ১৭২, ১৮৭, ১৯১, ১৯২, ১৯৭, ১৯৮, ২০৪, ২০৭ ।
খুজিস্তান - ২১, ১২৩ ।
খুমুস -১২৯, ২১০ ।
খুরাসান-১২৪, ১৩০, ১৭৩, ১৭৫, ১৮৫, ১৮৮, ১৯১, ১৯২, ১৯৭, ১৯৯, ২০২, ২০৪, ২০৯, ২১৫ ।
খুলাফা ই রাশিদীন -১৪৯, ১৫৩, ১৭৫, ১৮৬, ১৮৯, ২১০, ২১৪ ।
(জ)
জওহর (ফাতেমীয় সেনাপতি) - ২৬২ ।
জজিরা - ২০৯, ২৫৯ ।
জর্ডন - ১১, ৪০ ।
জমীলা - ২০৮ ।
জরীর - ১৭৬, ২০৬ ।
জহর ব্রত -১৭৯ ।
জয়নব-৪১, ৫০ ।
জয়নুল আবেদীন -১৯৫ ।
জাকাত-৫৩, ৮৪, ৮৬ , ১০১, ১০২, ১০৩, ১৭৫, ২১০ ।
জাক্সার্টেস - ১৭৮ ।
জাতুস সালাসিল - ১০৮ ।

জাফর -২৩১, ২৩২ ।
জাফর-ইবন-আবু তালিব - ৫৬ ।
জাবনদী -১৬৯, ২০০ ।
জারবিরা -২০৭ ।
জাবালা -৮৫, ১৫৩ ।
জাবালুত তরিক-১৮২, ১৮৩ ।
জাবের যুদ্ধ -২০৪, ২১৭ ।
জাবিয়া -১২৮ ।
জাবির ইবন হাইয়ান-৩১৯ ।
জাভা -২১৫ ।
জামীল-২০৬ ।
জার্মানি-২১৫ ।
জারবা -৭৮ ।
জালুলা -১২২ ।
জাস্টিনিয়ান - ৩৬ ।
জাহহাক - ১৬৮ ।
জাহিলিয়া যুগ - (৪০-৪৭) ।
জায়দ ইবন আমর - ৪৭ ।
জায়দ - ৫০, ৫৪, ৭৫, ৭৭ ।
জায়দান - ১২৭ ।
জায়দ (হুসায়নের পৌত্র) - ১৯৪, ১৯৬ ।
জেন্দাবেস্তা - ৩৫ ।
জেরেমিয়া - ২৭ ।
জেরুজালেম - ২৪, ২৭ ,৩৩, ৩৬, ৯১, ১১৮, ১২৪, ১৩০, ১৭৬, ১৮৪, ২০৮, ৩৯৩, ৩৯৪, ৩৯৬, ৩৯৭ ।
জোরো এস্টার - ৩৫ ।
জিকরাওয়াইহ -২৫৮ ।
জিদ্দা -১২ ।
জিবাল হাসান ইবন বুওয়াইহ -২৫৯ ।
জিব্রালটার -১৮২ ।
জিব্রীল ইবন বখতীয়ু - ২৪৮, ৩১৪ ।
জিবাত্রায় - ২৫১ ।
জিম্মী -১০৯, ১৫৩ ।
জিযয়া-৭৮, ৯০, ৯২, ৯৩, ১১৫, ১১৮, ১২৮, ১৯২, ১৯৩, ২০৪, ২১০ ।
জিরা - ১৭ ।
জিহাদ - ১২৯, ২১৪ ।
জিয়াদ - ১৪৯, ২০৬ ।
জিয়াদাতুল্লাহ আল আগলাব-২২৯, ২৪৩, ২৬২ ।
জিয়ারী বংশ - ২৬৫ ।
জুদাইয়া- ৩৩ ।
জুনদুব -২৩ ।
জুনওয়াস -৩৮ ।
জুন্দিসাবুর - ১২৩ ।
জুনায়দ - ১৯৩ ।
জুবায়দা- ২২৬, ২৩৫, ২৪০, ২৪৪ ।
জুবায়ের-১২৪, ১২৫, ১৩২, ১৪০, ১৪১, ১৪৩, ১৪৪, ১৪৫ ।
জুমা - ৮৩ ।
জুমা মসজিদ (দামিস্কে) - ২০৮ ।
জুলকাদা - ৪৫ ।
জুলহিজ্জা- ৪৫ ।
জুলকাসসা - ১০৩, ১০৪ ।
জুহরা - ৬৬ ।
জুহায়র - ৪৫ ।

(ট)

টরসাস - ২৪৫, ২৫০ ।
টলেডো- ১৮২, ৩৪৮, ৩৭৪ ।
টলেমী - ৩১, ৩২, ৩৩ ।
টায়ানা - ২৪৫, ২৫০, ২৫১ ।

অস্ট্রিয়ানা – ২০৯, ২৬৫, ৩১৩ ।
ফোন – ৩৬, ১২১, ২২০ ।
স – ৩৩ ।
ন –১৯৪, ৩৪৯ ।

ভিড – ২৭ ।
)
রাত –৬১ ।
বর (হযরতের পুত্র)-৫০ ।
– ৪৫ ।
অভিযান –৭৮, ৯৩ ।
ওয়াবুন –১৬৯ ।
করীত – ১১৯ ।
কওয়া – ৮৫ ।
ঙ্গীর – ২২৪, ২২৯ ।
বারিয়া –১২৮ ।
বারিস্তান –১৩০, ১৮৫, ২১৮, ২৩১,
৫১, ২৫৯, ২৬৪ ।
নহা –২৪৩ ।
রিক –১৮২, ১৮৩, ১৮৫ ।
রাগোনা –১৮৩ ।
লহা–৫৪, ১৩২, ১৩৪, ১৩৫, ১৪০,
৪১, ১৪৩, ১৪৫, ১৮৭ ।
হির (হযরতের পুত্র) – ৫০ ।
হির ইবন হুসায়েন – ২৬৪ ।
য়িফ–৪৬, ৫৭, ৫৮, ১৫৬, ১৭১,
১২ ।
য়মা – ৯২ ।
তগলাথ পিলেসার –২৩ ।
তহামা – ১১ ।
তুর্কোমান–১৯২, ১৯৩ ।
তুখারিস্তান –১৩৫, ১৭৮ ।
তুগ্রিল বেগ –২৭৪, ২৭৬, ২৭৭ ।
তুতমোসিস –(৩য়) ফের আউন –২৮ ।
তুতন খামেন – ২৮ ।
ত্রিপলি –১৩৬ ।
(দ)
দজলা–২১, ২২, ১১৯, ১২১, ১৩০,
১৯৭, ২০২, ২১৯, ২৩১, ২৩৯ ।
দাখিল – ১৯ ।
দার্দানেলিস-৩১ ।
দামাবান্দ – ১২৩ ।
দামিস্ক –২৩, ২৬, ৩৬, ১১৪, ১৪৬,
১৪৯, ১৫৫, ১৫৮, ১৬৪, ১৬৭, ১৬৮,
১৭০, ১৭৫, ১৮৩, ১৮৭, ১৯৬, ২০১,
২১০, ২১১, ২১৬ ।
দামিস্কের মসজিদ –১৪৪ ।
দাহনা –১২।
দাহরান – ১২ ।
দাবিক – ১৮৫ ।
দারুস সালাম – ২১৯ ।
দায়লাম – ২২৯ ।
দেবল বন্দর – ১৭৯, ১৮২ ।
দীওয়ান – ১২৯ ।
দীওয়ানুল বারিদ – ১৬১, ২১০ ।
দীওয়ানুল খাতাম – ১৬১, ২১০ ।
দুমাতুল জন্দল – ১৪৭ ।
দুমার সালিস – ১৪৮, ১৫১, ১৫৬ ।
(থ)
থিওডোর – ১১০, ১১৬ ।
থিওডোরাস – ১২৪ ।

থিওডোসিয়াস – ৩৪ ।
থিওফিলাস – ৩৮, ২৫১ ।
থীবস–২৮ ।
থ্রেস– ৩৫ ।
(ন)
নাফস সাকিয়া–২১৯ ।
নারবোন –৩৪৯ ।
নাসর ইবন সাইয়ার –১৯৩, ১৯৫।
নাসর ইবন সাবাহ – ২৪০, ২৪৩ ।
নাসিবেনের যুদ্ধ – ২১৭ ।
নাহরাওয়ান – ২৪২ ।
নিকে ফোরাস – ২২৮ ।
নিজামুল মুল্‌ক –২৭৮, ২৭৯, ২৮০, ২৮১ ।
নিনিভা – ২২০ ।
নিহাওয়ান্দ – ১৯৯ ।
নুরুদ্দীন – ৩৯৬ ।
(প)
পয়িটিয়ার্স – ১৯৪, ৩৪৯ ।
পাঞ্জাব – ২০৯ ।
পাপাইরাস – ২৯ ।
পামীরা – ৩৩, ৪০, ৪১ ।
পারস্য – ৩৫, ৩৬, ১৩২, ১৪৯, ১৬৮, ১৬৯, ১৭২, ২০৪, ২০৯, ২১৯ ।
পারস্যোপসাগর–১১, ১২৩, ১৫৬, ২৩৭, ২৫৮ ।
পারসিক–৩১, ৯৩, ১১৯, ১২০, ১৩৬, ১৭৫, ২০৫, ২৩৪, ২৩৯ ।
প্যালেস্টাইন–২৬, ২৮, ৩৩, ৩৬, ১১০, ১৮৫, ১৯৭, ২০১, ২১৬ ।
পার্সিপলিস – ৩১, ৩৫ ।
প্লাটো – ৩৩, ২৪৮, ৩১২ ।
পেট্রা – ৩৩, ৪০, ৪১ ।
পিটার দি হ্যার্মিট – ৩৯২ ।
পোপ উরবান – ৩৯২ ।
পোপ তৃতীয় ইন্নোসেন্ট–৩৯৯ ।
পিরামিড – ২৮, ২৯, ৩০ ।
পিরেনীজ – ১৮৩ ।
(ফ)
ফখরী – ৩২২ ।
ফজল বার্মাকী – ২৩১ ।
ফজল ইবন রাবী – ২৩৫, ২৩৬, ২৩৭, ২৩৮, ২৪৩ ।
ফজল ইবন সহল– ২৩৫, ২৩৬, ২৪০, ২৪৪ ।
ফরগণা–১৭৮ ।
ফাতেমা (হযরতের কন্যা) – ৫০, ১৬৯ ।
ফাতেমা (খলিফা আবদুল মালিকের কন্যা) –১৮৭ ।
ফাতিমীয় বংশ – (৩৭৯–৩৮৬) ।
ফাতহ মক্কা – ৭৬ ।
ফাদাক – ৭৪, ৯২, ১৮৭ ।
ফারস – ১২৪, ২১৯, ২৪৪ ।
ফারাজ দাক (কবি) –১৬৪, ২০৬ ।
ফারমা –১২৪ ।
ফ্রাঙ্ক–১৯৪ ।
ফ্রান্স –২৫, ১৯৩ ।
ফোরাত–২১, ২২, ৪১, ১০৮, ১২০, ১৩০, ১৯১, ২১৬, ২১৯, ২২৪, ২৫৯ ।
ফ্রেডারিক বার্বারোসা–৩৯৮ ।

(ব)
বদরের যুদ্ধ – ৬৫, ৬৭, ৮৮ ।
বনু আওস – ৪৩, ৫৮, ৬০, ৮৭, ৯৮ ।
বনু আব্বাস –৪৩, ১৯৯ ।
বনু আবস – ১০৩ ।
বনুআব্বাস –(৩৬৮–৩৬৯)।
বনু আসাদ – ৭০, ১০২, ১০৪ ।
বনুউমাইয়া – ৪৪, ৫৮ ।
বনু কাইনুকা – ৬০, ৬৯, ৯১ ।
বনু কুরাইজা – ৬০, ৭০, ৭১, ৭৪, ৯১ ।
বনু খজরজ–৪৩, ৪৭, ৫৮, ৬০, ৮৭, ৯৮ ।
বনু খুজা'আ – ৭৫ ।
বনু গাতফান – ৭০, ৯১, ১০২ ।
বনু জুবয়ান – ৪৩, ১০৩ ।
বনু তগলিব – ৪৩, ১০৪ ।
বনু তমীম – ১০২, ১০৩, ১০৪।
বনু তায়ী – ১০৩, ১০৪ ।
বনু নাজির – ৬০, ৬৮, ৬৯, ৯১ ।
বনু নাসর – ৩৭০, ৩৭৩ ।
বনু বকর – ৪৩, ৭৫ ।
বনু মুত্তালিব – ৫৪, ৫৬ ।
বনু সাকিফ – ৫৮, ৭৭, ৮৯, ১৫৬ ।
বনু সুলাইম – ৭০ ।
বনু হানীফা – ১০২, ১০৪, ১০৫ ।
বনু হাওয়াজিন – ৪৩, ৪৯, ৭৭, ৮৯ ।
বলখ–১৩৫, ১৫৬, ১৭৮, ২৩০, ২৬৪ ।
ফিনল্যান্ড –২১৫ ।
ফিনিসীয়–২০, ২৫, ২৬, ২৮, ৩২ ।
ফিলিস্তিন – ১১ ।
ফিলিপ অগাস্টাস – ৩৯৮ ।
বসরা–১২২, ১২৩, ১২৪, ১২৮, ১৩৩, ১৩৬, ১৩৭, ১৩৯, ১৪০, ১৪১, ১৪৪, ১৪৫, ১৪৬, ১৪৯, ১৫৬, ১৬৮, ১৭০, ১৭১, ১৭২, ২০৫, ২০৯, ২২০, ২৫৭।
বসফোরাস – ২২৪ ।
বু- আসের যুদ্ধ – ৪৩ ।
বাইজান্টাইন–৩১, ৩৪, ৩৫, ৩৬, ৪১, ৪৩, ৯৩, ১০৬, ১০৭, ১০৯, ১১০, ১২৪, ১২৫, ১২৬, ১২৭, ১৫৭, ১৬০, ১৬১, ১৬২, ১৭৫, ১৮৫, ১৯৩, ২০৯, ২১০, ২১৮, ২২৪, ২২৭, ২৩১, ২৫১, ২৫২।
বাইবেল – ২৯ ।
বাকু–২১৮।
বার্কা – ১৩৬, ১৭৪ ।
বাকিউল গারকদ্দ – ৮১ ।
বাগদাদ–২১৪, ২১৯, ২২০, ২২২, ২২৬, ২৩৭, ২৩৮, ২৪০, ২৪১, ২৪২, ২৪৬, ২৪৭, ২৫০ ।
বাগদাদের পতন – (২৮৬–২৮৮) ।
বার্বার–১৫৭, ১৭৩, ১৭৪, ১৭৬, ১৮৮, ১৯৩ ।
বাবক – ২৪৪, ২৫০ ।
বারমাকী বংশ – ২৩০, ২৩২, ২৩৫ ।
বারসিলোনা – ১৮৩ ।
বাল (ফোয়ারা বা কূপের দেবতা) – ৪৬।
বালবাক – ১৫৫ ।
বালাতুল শুহাদা – ১৯৪ ।
বার্লির যুদ্ধ – ৬৮ ।
বাহম'ণ – ১০৮ ।
বাহরাইন –১২, ১০৪; ১০৫, ১৩০, ২০৯।
ব্রাহ্মণাবাদ – ১৭৯ ।
বায়তুল মাল – ১৫৩, ১৮৬ ।
বায়তুল হিকমা – ২৪৭ ।
বেঞ্জামিন – ১২৫, ১২৬ ।
বেদুঈন – ১৫, ১৬, ১৭, ১৯, ২১, ২৩, ৪১, ৪৩, ৪৪, ৪৫, ৬০, ৬৫, ৭০, ৭২, ১০০ ।
বেরিটাস – ৩৩ ।
বেলুচিস্তান – ১৭৯ ।
বিদায় হজ্ব – ৮০, ৮১, ৮৭ ।
বিল বায়স – ১২৪ ।
বিস্তুন বুওয়াইহী – ২৬৫ ।

বুওয়াইবের যুদ্ধ - ১১৯ ।
বুওয়াইহী বংশ -(২৬৮-২৭৩) ।
বুখারা -১৫৬, ১৭৮ ।
বুজাখা -১০৩ ।
বুরান (মামুনের স্ত্রী) -২৪৪ ।
বুসির -২০০ ।
ব্যাবিলন - ২১, ২২, ২৪, ২৮, ৩৫, ৪১, ১২০, ১২৫, ১২৬, ২২০ ।
(ভ)
ভারত মহাসাগর -২১৮ ।
ভূমধ্যসাগর -২৬১ ।
(ম)
মক্কা - ১২, ৪৩, ৪৪, ৪৬, ১৫৮, ১৬৩, ১৬৪, ১৬৬, ১৬৭, ১৭০, ১৭১, ১৭৪, ১৭৬, ১৭৭, ১৮৪, ১৯১, ২০৩, ২০৫, ২২০, ২২১, ২২৪ ।
মজনু -২০৬ ।
মজদক -২২৩ ।
মদীনা-১২, ৪৩, ৪৫, ৪৬, ৪৭, ১৫৫, ১৫৮, ১৬৬, ১৬৮, ১৭৭, ১৮৪, ১৮৯, ২০৩, ২০৫, ২১৯, ২২২, ২২৪ ।
মদীনার গঠন তন্ত্র - ৬২ ।
মনোফিসীয় - ৩৫ ।
মণী- ২২৩ ।
মনসুরা - ১৯৩ ।
মমী - ২৯ ।
মসজিদ -ই -নববী -৯৭, ১১১, ১১৪, ১৮৪ ।
মসুল -২১৬, ২২৫, ২২৯, ২৬৩ ।
মস্কত - ১২ ।
মাওলা - ১৯ ।
মাওয়ালী-১৭৫, ১৯০, ১৯৩, ২০৪, ২১৪ ।
মাকনা - ৭৮ ।
মাকরান - ১৩০, ১৭৯ ।
মাগান - ২১ ।
মাজান্দারান - ২৪৪ ।
মাজিয়ার - ২৫১ ।
মাজুনা - ২২৩ ।
ম্যাজরকা - ১৮২ ।
মাদায়িন - ১০৮, ১২১ ।
মা' বাদ - ২০৮ ।
মার্ভ - ১৩৫, ১৯৩, ১৯৮, ২০৯ ।
মারদুক - ২৪ ।
মারদাবীজ - ২৬৫ ।
মারওয়ান - ১৬৮, ১৭৪, ১৯৬, ২০২, ২০৩, ২০৪ , ২৫৩ ।
মারজ-ই-রাহিত - ১৬৮ ।
মারজুস সুফফার - ১১৪ ।
মারীব - ৩৭ ।
মারীবের বাঁধ - ৩৭ ।
মালয় - ২১৫ ।
মালাগা - ১৮২, ৩৪৮ ।
মালভিয়া - ২১৮ ।
মালাজকার্দ - ২৭৭ ।
মাল্টা -২৬১ ।
মালিক-শাহ জালালুদ্দৌলাহ -২৭৮ ।
মাসিডন -৩১, ৩৫ ।
মাসিসা -২১৮ ।
মাসলাম -১৮৫, ১৮৮, ১৯৩ ।
মাসুদী -৩২২ ।
মাহদী-২১৮, ২২০, ২২৩ ।
মিনায়ী রাজ বংশ -৩৭, ৩৮ ।
মিনুচিহর -২৬৬ ।
মিসর -২৩, ২৪, ২৫, ২৮, ২৯, ৩১, ৩২, ৩৩, ৩৪, ৩৫, ৩৬, ৪১, ১২৪, ১৩২, ১৪০, ১৫৬, ১৫৭, ১৬৮, ১৮৯, ২০০, ২০৯ ।
মিরাজ - ৫৭ ।
মিহরান - ১১৯ ।
মিসকাওয়াইহ -৩২১, ৩২৩ ।
মিসকিন আদ দারিমী - ২০৬ ।
মু'আবিয়া -১০৯, ১৩৬, ১৩৮, ১৪০, ১৪২, ১৪৩, ১৪৪, ১৫৫, ১৫৬, ১৫৭, ১৫৮, ১৫৯, ১৬০, ১৬১, ১৬২, ১৬৩, ১৬৮, ১৯৫, ২০৩, ২০৬, ২০৯, ২১০ ।

মু- আবিয়া -- (২য়) - ১৬৮, ২০৭ ।
মেডিনা - ৩৪৮ ।
মেডিনা সিডোনিয়া - ১৮৩ ।
মেরনাইট খ্রিস্টান - ১৬২ ।
মেরিডা - ১৮৩ ।
মেসোপোটামিয়া-১০৪, ১১৯, ১২২, ১৯৮ ।
মুওয়াহহিদ - ৩৭০ ।
মুওয়াফ ফাক - ২৫৫, ২৬৪ ।
মুইজ (মিসরের ফাতেমীয় শাসক) - ৩৮১ ।
মুকতাফী - ২৫৮ ।
মুকদাদির - ২৫৮, ২৫৯ ।
মুকান্না - ২২৩ ।
মুখতার - ১৬৮, ১৬৯, ১৭০ ।
মুগীরা - ১৩২।
মুতাসিম-(২৫০-২৫২) ।
মুতাওয়াক্কিল-২৫০, ২৫৩, ২৫৪, ২৫৫।
মুতামিদ - ২৫৫, ২৫৭, ২৬৪ ।
মুতাজ-২৫৫।
মুতাদিদ - ২৫৭, ২৫৮ ।
মুতাজিলা -২০৫, ২০৭, ৩৩১, ৩৩৫ ।
মুতিম-৫৮ ।
মুতা অভিযান - ৭৫ ।
মুতার যুদ্ধ - ৭৭ ।
মুতানাববী (কবি) - ২৬৩ ।
মুত্তাকী - ২৬০ ।
মুনজির - ৪৩ ।
মুন্তাসির - ২৫৪, ২৫৫ ।
মুরাবিত - ৩৬৯ ।
মুসলিম ইবন উকাবা - ১৬৬ ।
মুসআব - ১৭০, ১৭১ ।
মুসায়লামা -১০২, ১০৪, ১০৫ ।
মুসান্না -১০৫, ১০৮, ১১০, ১১৪, ১১৯ ।
মুসাইবন শাকির - ২৪৭ ।
মুসাইবন নুসাইর - ১৮২, ১৮৩, ১৮৫ ।
মুস্তায়ীন - ২৫৫ ।
মুহররম - ৪৫ ।
মুহম্মদ (হযরত আবু বকরের পুত্র) - ১৪৯ ।
মুহম্মদ ইবন তুমার্তা - ৩৭০ ।
মুহম্মদ ইবন তুগজ - ২৬২ ।
মুহতাদিবিল্লাহ - ২৫৫ ।
মুহম্মদইবন মূসা আল খাওয়ারিজমী - ৩১৮ ।
মুহম্মদ আল হানাফিয়া - ১৬৯, ১৭০, ১৯৫ ।
মুহম্মদ ইবন কাসিম - ১৭৮, ১৭৯ ।
মুহাল্লাব - ১৭০, ১৭১, ১৭২, ১৭৩, ১৭৮ ।
মুয়াজ ইবন জাবাল - ৮৯ ।

(য)

যুযুধান -৫১, ১৩৩, ১৭০ ।

(র)

রেনেশাঁ - ৩৭৪ ।
রজব - ৪৫ ।
রডারিক - ৩৪৮।
রাবীয়া ইবন হারিস - ৮০ ।
রা (মিসরীয়দের সূর্য দেবতা) - ২৯ ।
রাই -১৯৯ ।
রাওর - ১৭৯ ।
রাওয়ান্দিয়া সম্প্রদায় - ২১৮ ।
রাক্কা -২১৯, ২২৮, ২৩৫, ২৪২, ২৪৩।
রাজা দাহির - ১৭৮ ।
রাজা ইবন হায়া - ১৮৫ ।
রাতবিল - ১৭৩ ।
রাবউল খালী - ১২ ।
রাবাজা - ১০৩, ১৩৯ ।
রাবিয়া বসরী - ২০৭ ।
রামহরমুজান - ১২৩ ।
রামলা ১২৮ , ১৮৫ ।
রামসেস - (২য়) - ২৮ ।
রোমান - ২২, ৩১, ৩২, ৩৩ ।
রোমানাস - ২৭৭ ।
রিদওয়ানের চুক্তি - ৭২ ।
রিদ্দার যুদ্ধ- ১০০, ১০২, ১০৬ ।

রিবা – ৮৬ ।
রিয়াদ – ১২ ।
রুকনুদ্দৌলাহ – ২৬৫ ।
রুকাইয়া – ৫০, ৫৫, ১১৩ ।
রুসাফা–২২০ ।
রুস্তম– ১২০ ।
(ল)
লখমী বংশ – ৪৩ ।
লবীদ – ৪৫ ।
লায়লা– ২০৬ ।
লিওন – ১৮৩ ।
লুরিস্তান – ২১ ।
লোহিত সাগর–১১, ১২৬, ১৮৮ ।
(শ)
শাবীব – ১৭২ ।
শামসী – ২৩ ।
শামীর – ১৬৫, ১৬৯ ।
শাম্মাসিয়া ফটক – ২৪৮ ।
শালমানেজার – ২৩ ।
শার্লিম্যান – ২২৭ ।
শাশ – ১৭৮ ।
শাহরাজোর – ২০০ ।
শাহাদাত – ৮৩ ।
শায়থ – ১৮ ।
শায়জার – ১১৫ ।
শায়বান – ২৬২ ।
শেবার রানী – ২৭ ।
শিরকুহ – ৩৯৬ ।
শিয়া সম্প্রদায় –১৪২, ১৫০, ১৬৬, ২০৩, ২০৪, ২৪১ ।
(স)
সওম – ৮৪ ।
সউদী আরব –১২ ।
সদকা –৯০ ।
সব্‌অ মুয়াল্লাকাত –৪৫ ।
সলজুক বংশ –(২৭৪–২৮১) ।
সলমান –২৭ ।
সমর কন্দ – ১৭৮ ।
সাইপ্রাস – ২৫, ১৩৬ ।
সাইফুদ্দীন –৩৯৯ ।
সাঈদ –২০৮ ।
সাজা –১০২ ।
সার্ডিনিয়া –২৫, ১৯১, ২৬১ ।
সাদ –১৩২, ১৫২ ।
সায়াহুন –১৭৮ ।
সাদ্ ইবন উবাদা–৯৮ ।
সাদ ইবন মুয়াজ – ৭১ ।
সাদ ইবন আবিওয়াক্কাস – ১১৯, ১২০, ১২১, ১২২ ।
সানবাদ –২১৮ ।
সানা –৩৮ ।
সানায় গুমদান –৩৮ ।
সানাতুল উফুদ –৭৯, ৮৯ ।
সাফওয়ান-ইবন-উমাইয়া –৭৭ ।
সাফফারী বংশ–২৬৪,২৬৫ ।
সাবায়ী – ২৩, ৩৭, ৩৮ ।
সামরা–২৫০, ২৫২, ২৫৭ ।
সামানী বংশ –২৬৪, ২৬৫ ।
সামুদ –২৩ ।
সারগণ–২১, ২৩, ২৭ ।
সাররাখ – ২৪২ ।
সারজিয়াস – ১১০ ।
সারাগোসা – ১৮৩, ১৮৮ ।
সালমান – ৭০ ।
সালাহউদ্দিন – (৩৯৬–৩৯৯) ।
সালাত – ৮৩ ।
সাল্লামা – ২০৮ ।
সাসানীয়–৩৬, ১০৬, ১০৭, ২০৯, ২১৯ ।
সাহিবুজ জানাদিকা – ২২৩ ।
সাহিবুল খারাজ – ২১০ ।
সাহিবুল শুরতা – ২১০ ।
সেতুর যুদ্ধ – ১১৯ ।
সেন্টজন (গীর্জা)–১১৪ ।
সেন্ট টমাস (গীর্জা)–১৮৭ ।
সেভিল–১৮৩ ।

সেমিটিক-২০, ২১, ২২, ২৫, ২৮, ৩৪, ১২১।
সেলুসিয়া - ১২১ ।
সেলিউকাস - ৩১ ।
সি'আয়া-৯০ ।
সিজারিয়া-১১৮।
সিজিস্তান -১২৪, ১৩০, ১৩৫, ১৭৩, ২০৯, ২৬৪।
সিজিকাস দ্বীপ -১৫৭ ।
সিন্দুনদী -১৫৬, ২১৮ ।
সিন্দুদেশ -১৭৮, ১৭৯, ১৮৮, ১৯৩ ।
সিন্দ ইবন আলী -২৪৮ ।
সিনাই -২৬ ।
সিফফীনের যুদ্ধ-১৪৯, ১৫০, ১৫৬, ২০৭ ।
সিবত ইবনুল জওজী -৩২৩ ।
সিবাওয়াইহ - ২০৫ ।
সিরিয়া - ২১, ২৩, ২৪, ২৮, ৩১, ৩২, ৩৪, ৩৬, ৪০, ৪১, ৪৭, ৫০, ৬৫, ৭৭, ৭৮, ৮১, ৯৩, ১০৭, ১১০, ১১৪, ১২৮, ১৩৬, ১৩৯, ১৪৪, ১৫৮, ১৬২, ১৬৭, ১৬৮, ১৬৯, ১৭৯, ১৮৩, ২০১, ২০৯ ।
সিসিলি - ২৫, ১৯৩, ২০৯, ২৪৩ ।
সিরিয়ার যুদ্ধ - ১৩২ ।
সুন্নী - ১৫০, ২২১ ।
সুরাহবিল - ১০৪, ১০৫, ১১৪ ।
সুলায়মান ইবন কুলতুমিশ - ২৭৮ ।
সুলায়মান (খলীফা) -১৮৪, ১৮৫, ১৮৮, ২১২।
সুস - ১২৩ ।
সুহাইল ইবন আমর -৭২ ।
সূফীবাদ -(৩৩৭-৩৩৯)।
সোগদিয়ানা - ৩১, ১৭৮, ১৯৩ ।
সৈয়দা সুকায়না (হুসায়নের কন্যা)-২১২।
সিংহল-২১৫ ।
স্ট্রাবো - ৩৩ ।

(হ)
হযরত মুহম্মদ - ১২, ১৫, ২৭, ৩৮, ৪৩, ৪৬, ৪৭, ৪৯, ৯৭, ৯৮, ৯৯, ১০০, ১০১, ১০২, ১০৫, ১০৬, ১০৯, ১১২, ১৩৯, ১৫২, ১৫৮, ১৬৩, ২০৩।
হযরত মুসা - ২৬, ৯০।
হযরত ঈসা - ৯০।
হযরত আবুবকর-৫৫, ৫৯, ৭৮, ৮১, (৯৭ -১১২), ১১৪, ১২৭, ১৩১, ১৩২, ১৪৯, ১৫০, ১৫২, ১৫৮, ১৬৩।
হযরত উমর-৫৬, ৮১, ৮৫, ৯৭, ৯৮, ১০৭, ১১১, (১১৪-১৩৩), ১৩৪, ১৩৬, ১৫০, ১৫৩, ১৫৮, ১৮৬, ১৮৯।
হযরত উসমান-৫৪, ৭২, ৭৮, ৯০, ১২৬, ১৩২, ১৩৪, ১৪২, ১৪৪, ১৪৫, ১৪৬, ১৪৮, ১৫৭।
হযরত আলী-৫০, ৫৪, ৭৩, ৭৮, ১৩২, ১৩৪, ১৩৫, ১৩৬, ১৪০, ১৪১, ১৪২, (১৪৩-১৫১), ১৮৭, ১৯২, ১৯৪, ২০৩, ২০৫, ২০৮, ২১৯ ।
হযরত ইব্রাহীম - ৪৭ ।
হযরত বিলাল - ৫৫, ৬৪, ৮৫ ।
হযরত আবু আইয়ুব আনসারী - ৫৯ ।
হজ্ব - ৭৪, ৮৪, ১৬৬, ১৭০, ১৯১ ।
হম্মুরাবি বিধি - ২১, ২৪ ।
হরমুজ -১০৮, ১২০।
হস্তীর বছর -৪৯ ।
হাকাম (২য়) স্পেনের উমাইয়া শাসক-(৩৬২-৩৬৫)।
হাজারা মউত-১৪, ৪১, ৭৯, ৮৯, ১০৫, ১৯৭।
হাজরে আসওয়াদ - ৫১।
হাজ্জাজ ইবন ইউসুফ-১৭১, ১৭২, ১৭৩, ১৭৪, ১৭৬, ১৭৭, ১৭৮, ১৭৯, ১৮৬, ২০৬, ২৪৮।
হাজিব আল মনসুর-৩৬৫।

হাফসা –১৩১, ১৩৮।
হামাদান – ১৯৯, ২৩৭।
হামাদান কারমাত–২৫৮।
হামাদানী – ২৫৯ ।
হাম্মাদ – ২০৬ ।
হামজা – ৫৬, ৬৯, ৭৬ ।
হালিমা – ৪৯।
হালকুখান –২৮৮, ৩৩০।
হাররা –১২।
হাবাবা –২০৮ ।
হারাম শরীফ –১৩১, ১৬৭ ।
হারুরা –১৪৭ ।
হাররার যুদ্ধ –১৬৬ ।
হারিস –১৯২ ।
হারারান –১৯৮ ।
হারুনুর রশীদ–১৬০, ২২২, ২২৩, ২২৪, ২২৫, (২২৬–২৩৪), ২৩৫, ২৩৭ ।
হারসামা –২২৯, ২৩৬, ২৩৮, ২৩৯, ২৪১ ।
হাসা –১২ ।
হাসান আল বসরী –২০৫, ২০৬ ।
হাসান ইবন সাবিত – ৯১।
হাসান–১৪৫, ১৫৫, ১৬০, ১৬৫, ২০৩, ২২২।
হাসান ইবন নুমান –১৭৩।
হাসান ইবন কাহতাবা–২১৬ ।
হেমিটিক – ২০, ২৮, ৩৪ ।
হেরাত –১৩৫, ১৫৬ ।
হেরাক্লিয়া – ২২৮ ।
হেলেনিক সভ্যতা – ৩২ ।
হেলেনিষ্টিক সভ্যতা – ৩১ ।
হেলিও পলিস – ৩২ ।
হিকসস– ২৮ ।
হিজায–১২, ১৪, ৪৬, ৫৩, ১০০, ১৭৫, ১৭৭, ১৯৭, ২০৯ ।
হিজরত – ৫৮, ৬০, ৭৬ ।
হিন্দা – ৭৬ ।
হিপারকাস – ৩২ ।
হিব্রু–২০, ২১, ২৩, ২৫, ২৬, ২৭, ৩৩।
হিময়ার বংশ – ৩৮, ৪৬, ১৬৯ ।
হিমস – ১১৫, ১৩০, ১৯৭ ।
হিরড – ৩৩ ।
হিরাক্লিয়াস – ৩৬, ৮১, ১১০, ১১৫, ১১৬, ১২৫, ১২৬ ।
হিরা–৪১, ৪৩, ৫০, ৫১ ।
হিলাল আসসাবী – ৩২৩ ।
হিলফুল ফুজুল –৪৯
হিশাম– ১৯১, ১৯২, ১৯৪, ১৯৫, ১৯৬, ২০২, ২১২ ।
হিশামুল কালবীর – ৩২০ ।
হিশাম(২য়) স্পেনের উমাইয়া শাসক – ৩৬৫ ।
হুজায়ফা – ১০৪, ১০৫ ।
হুদায়বিয়ার সন্ধি – ৭২, ৭৪, ৭৫, ৭৬, ৮১, ৮৮, ৯১ ।
হুবায়ন ইবনুল হাসান – ২৪৮ ।
হুবাল – ৪৬ ।
হুমায়মা – ১৯৮ ।
হুলওয়ান – ২৩৭ ।
হুসাইন – ১৫৮, ১৬৩, ১৬৪, ১৬৫, ১৬৯, ১৯৪ ।
হুসায়ন ইবন ইসহাক – ২৪৮ ।